ধর্ম ও সমাজ

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

RELIGION AND SOCIETY

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৭৫
তৃতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৩৯৮
—পঞ্চাশ টাকা—

॥ জর্জ অ্যালেন এণ্ড আনউইনের সহিত বন্দোবস্তক্রমে প্রকাশিত ॥

এই গ্রন্থের রচনাকাল—১৯৪২ সাল

অনুবাদ ঃ
শ্রীশুভেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রচ্ছদপট-অঙ্কন
শ্রীঅজিত গুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও বাণী মুদ্রণ, ১২, নরেন সেন স্কোয়ার
কলিকাতা ৯ হইতে বংশীধর সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত

বাপীকে

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের আরও কয়েকটি বঙ্গানুবাদ বই

ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য

(East & West in Religion)

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

সূচী

ধর্ম ও সমাজ

ধর্ম ও সমাজ— :

প্রথম ভাষণ

ধর্মের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান সংকট—সামাজিক ব্যাধি—যুদ্ধ ও নব বিধান—আমাদের যুগের প্রধান দুর্বলতা ধর্মনিরপেক্ষতা—দ্বান্দ্বিক জড়বাদ—আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বিশ বৎসর ব্যাপী সক্রিয় সম্পর্কের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট কমলা বক্তা রূপে নির্বাচন পর্যন্ত আমাকে যে সকল সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, তার জন্য প্রথমেই তাঁদের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। মহান্ ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট এই বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যে কোন বিদ্বানের পক্ষেই গর্বের বিষয়। আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের কথা এই যে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রিয় কন্যার নামে যে বাৎসরিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছেন তাতে আমি বলবার সুযোগ পাচ্ছি।

ভারতীয় জীবন ও চিন্তাধারার কোন একটি দিকের তুলনামূলক আলোচনা হল বক্তৃতামালার নির্দিষ্ট বিষয়। আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপকতার জন্য এই ব্যাপারে আমাদের স্বাধীন ব্যাখ্যার সুযোগ আছে। 'ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে সামাজিক পুনর্গঠন' বিষয়টি আমি আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি এবং বর্তমানের দুর্যোগময় মুহূর্তে বিষয়টির গুরুত্ব খুব বেশী বলে মনে করি।

আওরঙজেব তাঁর শিক্ষক মোল্লা সাহেবকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "আপনি আমার পিতা শাহজাহানকে বলেছিলেন যে আপনি আমাকে দর্শনশাস্ত্র পড়াবেন। আমার বেশ স্মরণ হয় যে সত্য সত্যই বহু বৎসর ধরে আপনি আমার কাছে এমন সব সূক্ষ্ম তত্ত্বকথার অবতারণা করেছেন যা মনকে কোন রকমেই তৃপ্ত করতে পারে নি, মনুষ্যসমাজের যা কোন কাজে আসে না,—কতকগুলি কায়াহীন ধারণা ও নিছক কল্পনা,—যাদের বৈশিষ্ট্য শুধু এই যে তাদের বোঝা যেমন শক্ত, ভোলা তেমনি সোজা আপনি কখনও কি শেখাতে চেষ্টা করেছেন যে কি করে একটা শহরকে অবরোধ করা যায় বা কি করে একটা সৈন্যবাহিনীকে সাজাতে হয়? এসব দরকারী জিনিস আমি অন্যের কাছে শিখেছি, আপনি শেখান নি।"[১] আমার বর্তমান বক্তৃতামালার একটা উদ্দেশ্য হল এই আভাস দেওয়া যে বর্তমান জগৎ যদি একটা সংকটময় অবস্থায় এসে থাকে তো সে এইজন্য যে সে 'নগর-অবরোধ" ও "ব্যূহ রচনা" সম্বন্ধে সবই জানে, কিন্তু জীবনের মৌলিক শ্রেয়বোধ সংক্রান্ত সমস্যা,

১ A treasury of the World's Great letters, ed. by M. Lincoln Schusler (1941) Pages 90-91.

ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে কিছুই জানে না, ওগুলিকে "কায়াহীন ধারণা এবং নিছক কল্পনা" বলে উড়িয়ে দেয়।

বর্তমান সঙ্কট

আমরা এখন মানবজাতির জীবনের এক চরম সম্ভাবনাময় মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছি। মানব-ইতিহাসের আর কোন যুগে এতগুলি লোককে এমন অসম্ভব বোঝা বহন করতে হয় নি অথবা এত লোককে এমন মর্মান্তিক যন্ত্রণার ও এতখানি বেদনাদায়ক নিপীড়নের পাত্র হতে হয় নি। আমরা যে জগতে বাস করছি তা সর্বজনীনভাবে বিয়োগান্ত। এখানে ঐতিহ্যের সংযম এবং প্রচলিত আইন ও শৃঙ্খলার বন্ধন বিস্ময়করভাবে শিথিল। সেদিন পর্যন্ত যে সমস্ত ধারণা সামাজিক ন্যায় ও শিষ্টাচারের অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে হত, বহু শতাব্দী ধরে যে সমস্ত ধারণা সামাজিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও চালনা করেছে, তারা আজ অদৃশ্য। ভুল-বোঝাবুঝি, তিক্ততা ও দ্বন্দ্বে আজ পৃথিবী শতচ্ছিন্ন। আকাশ-বাতাস সংশয়, অনিশ্চয়তা ও ভবিষ্যতের জন্য আশঙ্কায় পরিপূর্ণ। আমাদের জাতির পরিবর্ধমান কষ্ট, আর্থিক সঙ্গতির ক্রমাবনতি, যুদ্ধের অভূতপূর্ব ব্যাপ্তি, শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে মতানৈক্য এবং যে সমস্ত ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা ধ্বংসোন্মুখ শৃঙ্খলা ও পঙ্গু সভ্যতাকে বাঁচাতে একান্তভাবে ইচ্ছুক তাদের নিশ্চেষ্টতা[১] সারা পৃথিবীতে যে মনোভাবের সৃষ্টি করেছে তা আসলে বিপ্লবাত্মক। "বিপ্লব" বললেই যে শাসক-গোষ্ঠীর হত্যা ও অরাজক গুণ্ডামি বুঝতে হবে তা সব সময়ে ঠিক নয়। সভ্য জীবনের ভিত্তির গভীর ও আমূল পরিবর্তনের যে কোন প্রবল ইচ্ছাকেই বৈপ্লবিক ইচ্ছা বলা যেতে পারে। "বিপ্লব" কথাটাকে দু'রকম অর্থে ব্যবহার করা হয় (১) আকস্মিক ও প্রচণ্ড অভ্যুত্থানের ফলে শাসনবিপর্যয়, যেমন ফরাসী বা বলশেভিক বিপ্লব; (২) সামাজিক সম্পর্কের এক পদ্ধতি থেকে আর এক পদ্ধতিতে বহুদিনব্যাপী ক্রমপরিবর্তন, যেমন ব্রিটিশ শিল্প-বিপ্লব। পরিবর্তন মানেই বিপ্লব নয়, কেননা ইতিহাসে পরিবর্তন সর্বদাই ঘটেছে, পরিবর্তনের দ্রুত মাত্রাই বৈপ্লবিক যুগ সূচনা করে। বর্তমান যুগ বৈপ্লবিক, কেননা পরিবর্তনের গতি এখন অত্যন্ত ক্ষিপ্র। আমাদের আশেপাশে সর্বত্র ভাঙাচোরার আওয়াজ পাচ্ছি, সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বদলে যাচ্ছে, যেসব বিশ্বাস ও ধারণা মানুষের মনকে এতদিন ধরে প্রভাবিত করে আসছে তারা আজ অনাদৃত, মনুষ্যমনের মৌল প্রত্যয়গুলোও বদলে যাচ্ছে। বুদ্ধিমান, সূক্ষ্মানুভূতি-সম্পন্ন ও উদ্যমী মানুষদের ধারণা হয়েছে যে রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও শিল্পনীতির বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলি ও তাদের পরিচালনার মধ্যে এমন ত্রুটি আছে যা মানবতাকে বাঁচাতে হলে বর্জন করতেই হবে।

পৃথিবী কত প্রকারে ধ্বংস হতে পারে সে-কথা বিজ্ঞানীরা আমাদের বলেন।

---

১ বার্ক বলেছেন যে যাদের হাতে ক্ষমতা নেই তারা বিপ্লব বাধায় না, যাদের হাতে ক্ষমতা তারা যখন তার অসদ্ব্যবহার করে তখনই বিপ্লব ঘটে।

কোন দূর ভবিষ্যতে চন্দ্রমার অতিসান্নিধ্য বা সূর্যের উত্তাপ হ্রাসের ফলে পৃথিবী ধ্বংস হতে পারে। কোন ধূমকেতু এসে পৃথিবীর ঘাড়ে পড়তে পারে অথবা পৃথিবী থেকেই বিষাক্ত গ্যাস নিঃসৃত হতে পারে। কিন্তু এ সবই অনেক দূরবর্তী সম্ভাবনার কথা। নিকটতর সম্ভাবনা হচ্ছে যে মনুষ্যজাতি নিজের স্বেচ্ছাকৃত কর্মের ফলেই ধ্বংস হবে। মানুষের প্রকৃতিতে যে সমস্ত স্বার্থপরতা ও নির্বুদ্ধিতার প্রবল আধিপত্য তারাই তার সর্বনাশ ডেকে আনবে। আমাদের ভোগ্যা এই বসুন্ধরাতে সমরোপকরণ-সজ্জায় যে পরিমাণ শক্তি নিয়োগ করছি, তার সামান্য একটা অংশ ব্যয় করলেই একে সকলের পক্ষে সুখভূমি করে তুলতে পারি,[১] অথচ আমরা জগতে মৃত্যুর ও ধ্বংসের লীলা বাধাহীন রেখেছি, এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? ধ্বংস করার একটা অন্ধ আকুলতা যেন মানুষকে পেয়ে বসেছে, এবং এ যদি আমরা না নিবারণ করতে পারি, তাহলে আমরা অন্তিম ধ্বংসের দিকেই দ্রুত এগিয়ে যাব এবং চিন্তার দিক থেকে অন্ধকার ও নীতির দিক থেকে বর্বর এমন যুগের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, যার মধ্যে মানুষের মহত্তম অতীত কীর্তিসকল একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই ভয়াবহ পরিণতির আভাস আমাদের একটা ভারী বোঝার মত পীড়া দিচ্ছে, আমাদের মনকে যন্ত্রণা দিচ্ছে ও অন্তরকে অশান্ত ক'রে তুলছে। আমরা তীব্র বেদনাদায়ক পীড়া, বিপুল উদ্বেগ ও নানাবিধ ভ্রান্তি-অপনোদনের যুগে বাস করছি। পৃথিবী মোহগ্রস্ত।

স্বল্পসংখ্যক মহাত্মার কাছ থেকে এক উন্নততর পৃথিবীর আশ্বাসই আমাদের ভবিষ্যতের আশা। গত কয়েক দশকে শুধু যে আমাদের চাঞ্চল্যকর ঐহিক উন্নতিই দৃষ্ট হয়েছে তাই নয়, নৈতিকবোধ ও সামাজিক অনুভূতিও স্পষ্টতঃ বেড়েছে। বিজ্ঞানচর্চার ফলাফল ও তৎসংশ্লিষ্ট নব নব উদ্ভাবনাকে মনুষ্য-জীবনের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োগ করার বাসনা প্রবলতর হচ্ছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে আমাদের ধারণার সুস্পষ্ট অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অপরিণত বয়স্কদের শ্রমিক হিসাবে খাটানোর বিরুদ্ধে আন্দোলন, কারখানার মজুরদের সম্বন্ধে নানাবিধ বিধি, বৃদ্ধ বয়সে পেনসনের ব্যবস্থা, দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, এইসব থেকে বোঝা যায় যে সমাজের প্রত্যেক সদস্যের প্রতি সামাজিক দায়িত্ববোধ ক্রমবর্ধমান। পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে আর কখনও শান্তির জন্য এত গভীর আকাঙ্ক্ষা ও যুদ্ধের প্রতি এমন সর্বব্যাপী ঘৃণা দেখা যায় নি। এই যুদ্ধে বহুকোটি লোকের প্রতিহিংসাস্পৃহাবর্জিত সাহস ও অনাড়ম্বর আত্মবলিদান নৈতিক বোধ ও মানবতা-প্রীতির প্রসারের সাক্ষ্য দেয়।

আজ যা ঘটছে তা কোন এক দেশবিশেষের সাময়িক পরিবর্তন মাত্র নয়, তা সে দেশ গ্রেট ব্রিটেনই হোক বা জার্মানীই হোক, রাশিয়াই হোক বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই হোক। এটা সমগ্র মানবসমাজের একটা বিশাল বিক্ষোভ। এটা শুধু যুদ্ধ নয়, বরং একটা বিশ্ব-বিপ্লব, যুদ্ধ তার একটা অংক মাত্র। এটা সমগ্র চিন্তাধারা ও সভ্যতার কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন, এ সংকট আমাদের সভ্যতার মূল পর্যন্ত

---

১ স্যামুয়েল বাটলার বলেছেন, মানুষ ছাড়া সকল প্রাণীই জানে যে জীবনের উদ্দেশ্য হল তাকে সম্ভোগ করা।

নাড়া দিয়েছে। ইতিহাস আমাদের সময়কার লোকদের এই যুগসন্ধিক্ষণে এনে ফেলেছে, আমাদের চেষ্টা করতে হবে এই বিপ্লবকে যোগ্য আদর্শের সেবায় নিয়োগ করতে। বিপ্লবের গতি আমরা উলটে দিতে পারি না। পুরাতন যে ব্যবস্থা হিটলার, মুসোলিনি, টোজোকে জন্ম দিয়েছে, তা আজ ক্ষয়িষ্ণু। যারা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, তাদের উপলব্ধি করতে হবে যে তারা স্বাধীনতার নববিধানের শুভ সূচনা করছে। আমাদের শত্রুদের এইজন্য দমন করতে হবে যে তারা পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে আছে, নূতনের পথ সুগম করতে আমাদের সাহায্য করছে না। আমরা যদি শান্তি স্থাপন করতে চাই এবং ভবিষ্যৎ দুর্গতির বীজ বপন রোধ করতে চাই তবে মানুষের মনের কাপুরুষোচিত জাড্যকে পরিহার করতেই হবে। স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের কারণগুলো নিশ্চিহ্ন করতে হবে এবং নবজীবনের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করতে হবে, তার জন্য আমাদের দীর্ঘকাল আদৃত ধ্যানমূর্তিগুলিকে বিসর্জন দিতে হবে। পারতপক্ষে সংঘর্ষের রোষ, দুঃখের চাপ, আগ্রাসনের প্রতি বিতৃষ্ণা, শত্রুদের সম্বন্ধে আমাদের ন্যায়বিচারবুদ্ধিকে যেন আবিল না করে। অমানুষদের সঙ্গেও আমাদের মনুষ্যোচিত ব্যবহার করতে হবে, আমাদের মন দূর ভবিষ্যতের দিকে নিবিষ্ট রাখতে হবে, দেখতে হবে যেন বিবেচনাহীন ঘৃণা তার সম্ভাবনাকে আচ্ছন্ন না করে।

পৃথিবী এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে মাত্র দুটি পথ খোলা আছে, হয় সমগ্র পৃথিবীকে এক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে হবে, নয়ত কিছুদিন অন্তর অন্তর যুদ্ধ বাধবে। যে সমাজে আমরা বাস করি তা আমাদেরই সৃষ্টি। যে সকল প্রতিষ্ঠান বিকৃতমূর্তি ধারণ করছে তার কর্ণধার আমরাই এবং আমাদের রুগ্ন সমাজকে রোগমুক্ত করার উপযোগী ওষুধ আমাদেরই আবিষ্কার করতে হবে। যে সভ্যতা কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রগতি ও মানবতায় উল্লাস বোধ করত সে যদি আজ যন্ত্রণাক্লিষ্ট হয়ে থাকে, তার মানে এ নয় যে ইতিহাসের এক অপ্রতিরোধ্য বিধান তাকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টির মুহূর্তে ভীষণ বেদনার উদ্ভব নূতন নয়।[১] জগৎ ক্রমবর্ধমান বেদনার মধ্য দিয়েই নূতন সাম্যাবস্থায় গিয়ে পৌঁছবে।

১ আধুনিক মানুষ একটা পরিণতি, কিন্তু আগামীকালই তাকে অতিক্রম করে যাবে অন্য লোক, সে বহুদিনব্যাপী বিকাশের ফল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে মানবজাতির চরম আশাভঙ্গের কারণ। আধুনিক মানুষ তা জানে। সে জানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, সংগঠন কতখানি উন্নতিসাধন করতে পারে, আবার সে এও জানে যে তা থেকে সর্বনাশও হতে পারে। সে এও দেখেছে যে সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত শাসকরা শান্তির জন্য সম্পূর্ণ প্রয়াসী হয়েও "শান্তির সময়ে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও" এই মন্ত্র গ্রহণ করেছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম, মানব-সৌভ্রাত্র, আন্তর্জাতিক সামাজিক গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের "একাত্মবোধ" সবাই অগ্নিস্নানের আসল পরীক্ষায় অর্থাৎ বাস্তবতার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে। সমস্ত কল্যাণমূলক ব্যবস্থার মধ্যেই দুর্মর সংশয় হয়ে গেছে। মোটের উপর অত্যুক্তি না করেও বলতে পারি যে সাম্প্রতিক মানুষ মনস্তাত্ত্বিক বিচারে প্রায় প্রাণান্তকর আঘাত পেয়েছে, এবং তার ফলে গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। সি. জি. ইউঙ (Jung) Modern Man is search of a soul, ইংরাজী অনুবাদ (১৯৩৩) পৃষ্ঠা ২৩০-৩১।

কখনও কখনও হয়ত পিছিয়ে পড়তে হবে কিংবা ঘা খেতে হবে, তা সত্ত্বেও মনুষ্যজাতি নিশ্চয়ই এক সুস্থতর জগতের দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু যাওয়ার বেগ আমাদের সাহস ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করবে। যে সব সৃষ্টিধর্মী লক্ষ্য জাতির মুক্তির সহায়ক হতে পারে সেগুলি অনেক সময়ে ইচ্ছা বা আবেগের অভাবে নয়, বরং মানসিক অস্বচ্ছতা এবং ভীরুতায় বিফল হয়ে যায়।

সামাজিক ব্যাধি

আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি জাগতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করছে না বলেই আমাদের সামাজিক জীবনে স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতি বিভিন্ন জাতি সৃষ্টি করেছে। তাদের ভাষা ভিন্ন, ধর্ম ভিন্ন, ভিন্ন তাদের ঐতিহ্য। মানুষের কাজ হল জগতের শৃঙ্খলা স্থাপন করা এবং জীবনযাপনের এমন প্রণালী আবিষ্কার করা যাতে বিভিন্ন গোষ্ঠীরা শান্তিতে বাস করতে পারে, তাদের বিভেদের সামঞ্জস্য করতে পশুশক্তির আশ্রয় না নিতে হয়। পৃথিবীটা সংগ্রামী জাতিদের রণক্ষেত্র রূপে ব্যবহারের জন্য নয়, বরং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে মানব-মহিমা, উন্নত জীবন ও প্রাচুর্যলাভের জন্য ব্যবহার্য সাধারণ সম্পত্তি।

বিশ্ব-ঐক্য লাভের প্রয়োজনীয় পরিবেশের অভাব নেই, অভাব শুধু মানুষের ইচ্ছার। মানুষকে মানুষ থেকে পৃথক করে রাখার ভৌগোলিক কারণ, সুউচ্চ পর্বত ও গভীর মহাসমুদ্র, আর মানুষকে আলাদা করে রাখছে না। পরিবহন ব্যবস্থা ও যোগাযোগ সাধনের যে সকল সুযোগ হয়েছে, তাতে পৃথিবী ঘনিষ্ঠ পল্লীতে পরিণত হয়েছে। ধর্ম ও আচার কোন একটি বিশেষ সীমায় সার্থক। কিন্তু বিজ্ঞান কোন রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক সীমায় আবদ্ধ নয়, তার ভাষা সকলেই বুঝতে পারে। মানুষের ওপর যন্ত্রের প্রভাব যন্ত্রপূর্ব যুগের সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসমন্বিত পৃথিবীর গঠন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। শিল্পবিপ্লব অর্থনৈতিক সম্পর্ককে এমন সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত করেছে যে, আমরা এখন বিশ্ব-অর্থনীতি-যুক্ত বিশ্ব-সমাজের সভ্য হয়ে উঠেছি। এই বিশ্ব-সমাজের জন্য বিশ্ব-শৃঙ্খলা ও সংগঠনের প্রয়োজন। বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে একই প্রকারের মহাজাগতিক উপাদান সমগ্র মানবজীবনের ভিত্তি। দর্শন কল্পনা করে যে প্রকৃতি ও মানবের পিছনে এক বিশ্বচেতনা বিরাজমান। ধর্ম সকলের মধ্যেই একই আধ্যাত্মিক সাধনা ও সংগ্রামের কথা বলে।

মনুষ্যসমাজের বিকাশের আদিযুগে গোষ্ঠীগত চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছিল, এবং এমন অবস্থায় তাদের বিকাশ হয়েছিল যে তাতে স্বভাবতই এক গোষ্ঠী থেকে আর এক গোষ্ঠীর ব্যবধান ও পারস্পরিক অজ্ঞতার সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষ যখন নির্ভরযোগ্য সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপনের ও গোষ্ঠীগত কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দমন করার মত শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের প্রয়োজন অনুভব করল তখনই জাতি-রাষ্ট্রের উদ্ভব হল। এতে মানুষের উপকারই হল, কারণ জাতি-রাষ্ট্রের মধ্যে সেই জাতির লোকেরা সৃজনমূলক কর্মের এমন বিস্তৃত সুযোগ পেল, যা অন্য

উপায়ে সম্ভব হত না। বহু জাতিই জাতীয় সংহতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে, আর একটু এগুলেই তারা বিশ্বৈক্যবোধ লাভ করতে সমর্থ হবে।

মানবতার মূল জাতি ও জাতীয়তা ছাড়িয়ে অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে। আমাদের পৃথিবী এত ক্ষুদ্র হয়ে পড়েছে যে দেশভক্তির আর স্থান নেই। ঐতিহাসিক পটভূমিকা, জলহাওয়ার প্রভাব ও ব্যাপক অন্তর্গোত্রীয় বিবাহের জন্যই বর্তমানের বিভিন্ন জাতির বর্তমান রূপ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আমাদের সকলেরই মানসিক ক্রিয়াগুলি এক, একই প্রকারের মানসিক পরিস্থিতিতে একই প্রকারের সাড়া আমরা সকলেই দিয়ে থাকি, আমাদের সকলেরই একই প্রকারের মৌলিক আবেগ, একই রকমের সাধ ও সাধনা।*ডারউইন তাঁর 'মানুষের উদ্ভব' (Descent of Man) গ্রন্থে বলেছেন: "মানুষ যখন সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সমন্বয়ে বড় সমাজ গড়ে ওঠে, তখন সামান্যতম যুক্তি প্রয়োগ করলে প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝতে পারে যে তার সামাজিক সহজাত বুদ্ধি ও সহানুভূতি অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও এক জাতির সকল লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিতে হবে। মানুষ এই পর্যায়ে পৌঁছলে, সকল জাতির মানুষের মধ্যে তার সহানুভূতি প্রসারণের পক্ষে মাত্র কৃত্রিম বাধাই থাকতে পারে।" গোষ্ঠীর সীমার ক্রমশঃ বিস্তৃতি সভ্যতার অগ্রগতির একটা স্বীকৃত লক্ষণ। ডারউইন বেঁচে থাকলে কোন বিশেষ জাতিই পবিত্র, এক বিশেষ জাতিই দেবতাদের প্রিয় ইত্যাদি কথা শুনে অবাক হতেন।

মানুষের রাষ্ট্রীয় প্রত্যয় চিন্তা যে রূপই নিক না কেন, নাৎসীই হোক কি কমিউনিস্টই হোক, ফ্যাসিস্টই হোক কি গণতান্ত্রিকই হোক, জাতীয়তাবাদের তাগিদ ও তার আদর্শ এখনও তাদের মন আচ্ছন্ন করে আছে। আর তাই মানুষের শক্তি মানুষের প্রগতি ও উন্নতির মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে, আশেপাশের সংকীর্ণ উপধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। আমরা এখনও যেন সেই আদিম গোষ্ঠীতেই আছি, যার মধ্যে শুধু যাদের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ আছে বা যারা মোটামুটি খুব বেশী পরিচিত তাদেরই স্থান আছে। শিশুকাল থেকে এক রকমের বিকৃত শিক্ষা পেয়ে আমরা জাতীয়তাবাদী "প্রবৃত্তি"র দাস হয়ে পড়েছি। নীচতা, পাশবিকতা, হিংসা সবই আমাদের স্বাভাবিক মনে হয় যদি তা জাতির স্বার্থসংশ্লিষ্ট করা হয়।

জাতীয়তাবাদ সহজাত প্রবৃত্তি নয়। এটা একটা অর্জিত কৃত্রিম ভাবাবেগ। নিজের জন্মভূমিকে ভালবাসতে হলে বা নিজের ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হলেই যে প্রতিবেশীদের সঙ্গে হিংস্র বিরোধিতা করতে হবে তার কোন মানে নেই। আজ যদি জাত্যভিমানের অনুভূতি তীব্র হয়ে থাকে, তাহলে মানুষের আত্মপ্রবঞ্চনার ক্ষমতা যে কত বেশী তাই প্রমাণিত হল। স্বার্থচিন্তা, সম্পত্তির প্রতি লোভ এবং কর্তৃত্বের লালসাই সমকালীন মানুষের কার্যকরী আদর্শ। দেশভক্তি দেবভক্তিকে বিনষ্ট করেছে, প্রবৃত্তির আবেগ যুক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে। যাদের পার্থিব সম্পত্তির সৌভাগ্য নেই তারাই ভূপৃষ্ঠের অন্যায় ভাগাভাগির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগের এক চতুর্থাংশ ব্রিটিশ অধিকারে। ফ্রান্সের অধিকারের বিস্তৃতি তার পরেই। হল্যান্ড, বেলজিয়াম এবং পর্তুগালের ন্যায় ছোট ছোট দেশেরও বড় বড় উপনিবেশ আছে। জার্মানি বাঁচবার জন্য জমি চায়, বিস্তার চায়, আধিপত্য

চায়। বাসভূমির বিস্তারের প্রয়োজন অতৃপ্ত ও উচ্চাভিলাষী শক্তিসমূহের রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। আমরা যদি মেনে নিই যে সবচেয়ে শক্তিশালী জাতিই পৃথিবীর অধিকারী হবে, তাহলেই বিধিনির্দিষ্ট ভবিতব্যের অনুসরণ কাণ্ডজ্ঞানহীন নিষ্ঠুরতার রূপ নেয়। একজন অক্সফোর্ডের পণ্ডিত হিটলারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তাঁর নীতি কি, আবেগপূর্ণ একটি কথায় উত্তর এসেছিল "জার্মানী" এবং আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে সে উদ্দেশ্য থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নি। তাঁর কথা "এস আমরা অমানুষ হই। যদি জার্মানিকে উদ্ধার করতে পারি, পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় কাজ করব। এস আমরা অন্যায় করি, যদি জার্মানিকে উদ্ধার করতে পারি তাহলে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় অন্যায়ের প্রতিকার হবে। এস আমরা নীতি বর্জন করি, যদি আমাদের লোকদের উদ্ধার করতে পারি। তখন নীতির পুনর্স্থাপনের পথ দেখতে পাওয়া যাবে।"[১] হিটলার 'মাইন কাম্ফ'[২] নামক গ্রন্থে বলেছেন, "পররাষ্ট্র নীতি উদ্দেশ্যসাধনের একটি উপায় মাত্র এবং আমাদের নিজ জাতির সুবিধাই একমাত্র উদ্দেশ্য ও অগ্রগতির লক্ষ্য। জাতির স্বার্থই একমাত্র বিবেচ্য। রাষ্ট্রনৈতিক, ধর্মসম্বন্ধীয় ও মানবিক অন্য সব বিবেচনাই এর জন্য অগ্রাহ্য করতে হবে। সমস্ত মানবজীবন জাতীয়-দক্ষতা-রূপী একমাত্র লক্ষ্যের কাছে বলি দিতে হবে।"[৩] একটি জার্মান বিমান বিমান-বিধ্বংসী কামান দ্বারা ভূপাতিত হলে তার তরুণ চালককে এক ফরাসী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তার তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, "তুমি সৈনিক এবং বীরের মত মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পার। তোমার আয়ু আর এক ঘণ্টাকাল। তুমি কি তোমার পরিবারের কাছে কোন বাণী পাঠাতে চাও?" তরুণটি ঘাড় নাড়ল। যে সমস্ত নারী ও শিশু বিমানচালকের দ্বারা ভয়ঙ্করভাবে আহত হয়েছিল তাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ডাক্তার বললেন, "তুমি শীঘ্রই তোমার স্রষ্টার মুখোমুখি দাঁড়াবে, তুমি যা করেছ তা চোখের সামনে দেখে তুমি নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হয়েছ।" মুমূর্ষু বিমান-চালক উত্তর দিল, "না, আমার শুধু এই দুঃখ যে আমার নেতার আদেশ আর আমি পালন করতে পারব না। হাইল হিটলার।" বলেই তার জীবনদীপ নিভে গেল।

---

১ জিলবার্ট মারের Deeper Causes of the War (১৯১৪) ৪৩ পৃঃ

২ পৃঃ ৬৮৬

৩ ফিকটে তাঁর Doctrine of the State-এ বলেছেন: "রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শক্তির আইন ছাড়া কোন আইন বা ন্যায় নেই। যে সব জাতির ভবিতব্য তত্ত্বের দিক থেকে নির্ধারিত হয়েছে, তাদের সমস্ত প্রকার শক্তি ও বুদ্ধির সাহায্য নিয়ে সেই ভবিতব্যকে সফল করার নৈতিক অধিকার আছে।"

"জার্মানদের রাজ্যবিস্তারের যে সমস্ত অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দেখা যায় তা এই গভীর অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ যে জার্মানী তার শক্তি ও জাতীয় উদ্দেশ্যের পবিত্রতা, তার দেশভক্তির গভীরতা, তার প্রায়োগিক নিপুণতা, তার শাসনব্যাপারে সততা, তার সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রত্যেক শাখায় কৃতকার্যতা এবং তার দর্শন, কলা ও নীতিবিদ্যার সুউচ্চ মান দ্বারা জার্মান জাতীয় আদর্শকে সকলের ঊর্ধ্বে স্থাপন করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।" Sir Eyre Crowe's "Memorandum" of January 1, 1907.

নাৎসীবাদও একটি দেশের গণ-আন্দোলন। রুশ সরকার ধর্মবিরোধী হতে পারে, কিন্তু রুশ দেশের লোক তা নয়। রাশিয়া যখন বর্তমান যুদ্ধে যোগ দেয়, তখন মস্কোতে যে ধর্মানুরাগী জনসমুদ্র রুশীয় সমরশক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং হিটলারকে ধর্মের সব চেয়ে মারাত্মক শত্রু বলে নিন্দিত করার জন্য সমবেত হয়েছিল, সে কথা পরের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সংগ্রামকে সরকারীভাবে "পবিত্র সোভিয়েৎ পিতৃভূমির জন্য ও জনগণের মুক্তির জন্য সংগ্রাম" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কোন জাতিবিশেষ নয়, সমস্ত যুগটাই জাতীয়তাবাদী। রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত শাসনযন্ত্র, কারিগরিবিদ্যায় প্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় সাম্প্রতিক যন্ত্রপাতি, এবং সর্বব্যাপী প্রচার দ্বারা সমগ্র প্রজাবৃন্দের দেহ, মন ও আত্মাকে সামগ্রিকভাবে নিয়োজিত করা যায়। সার্বভৌম রাষ্ট্র ও সর্বাত্মক সমাজ অভিন্ন হয়ে ওঠে। ব্যক্তির নিজস্ব জীবনযাত্রার অধিকারকে অগ্রাহ্য করাও হয় এবং মানুষের স্বভাব, সদ্‌গুণ, প্রীতি ও দয়া অদৃশ্য হয়। মনে হয় আমরা এমন এক আসুরিক শক্তির দ্বারা অভিভূত হয়েছি যা মানুষকে নিম্নতর প্রাণীর পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দেবপ্রতিম মানব পশু যূথভুক্ত হয়ে পড়ছে। পৈশাচিক মন্ত্র আমাদের বিশ্রামহীন, অন্তঃসারশূন্য জীবনযাপন করতে বাধ্য করছে, এ জীবন যেমন হৃদয়হীন তেমনি অমার্জিত, তার আদর্শ যেমন তুচ্ছ তেমনি স্থূল। সৈন্যদলের শৃঙ্খলায় মানবতা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বহু শতাব্দী ধরে ধৈর্যের সঙ্গে হাতড়ে হাতড়ে মহান্ প্রয়াসের ফলে আমরা জানতে পেরেছি যে নিজের ও অপরের জীবন পবিত্র। প্রত্যেকের নিজস্ব জ্যোতি ও নিজস্ব দ্যুতি আছে, আমাদের দৃষ্টি যদি যথেষ্ট সূক্ষ্ম হয় তাহলেই তা আমাদের নজরে পড়ে। আমাদের সকলের মধ্যেই ভাল হবার ইচ্ছা ওতপ্রোতভাবে রয়েছে। তার উপর যত রকম চাপান দেওয়া হোক, যত রকমে তাকে ঢাকবার চেষ্টা করা হোক বা যত রকমে তার রূপান্তর ঘটাবার চেষ্টা করা হোক, তাকে নষ্ট করা যায় না। সে সর্বদা বিরাজমান এবং যে তাকে আবিষ্কার করতে পারে সে-ই তার কাছে আন্তরিক সাড়া পাবে। তা সত্ত্বেও ধনতান্ত্রিক সমাজের বর্তমান সংগঠন, ক্ষাত্র ঐতিহ্য এবং অগণিত স্বাধীন স্বপ্রধান রাষ্ট্র সম্বলিত খণ্ডিত পৃথিবী মানুষের আত্মাকে হত্যা করেছে।

এই উন্মত্ত দেশভক্তি, ক্ষমতার জন্য এই অন্ধ বাসনা, বিবেকবর্জিত সুবিধাবাদ অল্পবিস্তর পৃথিবীর সকল জাতিকেই পেয়ে বসেছে। এই পরস্পরবিরোধী রাষ্ট্রসমূহের জগতে স্বাভাবিক প্রবণতাই হল অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা। ব্যাপারটা যেন নিজের দেশ আর সবাইয়ের মধ্যে বিরামহীন সংগ্রাম। সাধারণতঃ এই সংগ্রাম কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে চলে কিন্তু প্রায়ই সংগ্রামটা প্রকাশ্য ও সশস্ত্র হয়ে পড়ে। পৃথিবীর সমগ্রতা, স্বাস্থ্য ও সাংগঠনিক ঐক্য বজায় রাখার জন্য যে শক্তি ব্যয়িত হওয়ার কথা তা একটি গোষ্ঠী বা শ্রেণী, একটি জাতি বা জাতীয় রাষ্ট্রকে অন্যের উপর প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে ব্যয় হয়। রাষ্ট্র অতিকায় দাস-চালক হয়ে দাঁড়ায় ও আমাদের অন্তর্জীবনের মৃত্যু হয়। আমাদের ভেতরটা যত প্রাণহীন হয়, জাতির উদ্দেশ্যসাধনে ততই আমরা নিপুণ হয়ে উঠি। আমাদের সকলপ্রকার অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান হয়, আমাদের জীবনের সামান্যতম ঘটনাও এমন এক যন্ত্রদ্বারা

নিয়ন্ত্রিত হয়, যে কার্যসাধনে সম্পূর্ণ নির্মম ও সকলপ্রকার বিরোধিতার প্রতি ক্ষমাহীন। আমাদের অন্তরাত্মাকে যান্ত্রিক করার অধিকার নিয়ে এবং আমাদের ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত শুধু দৌড়বার শিক্ষা দিয়ে রাষ্ট্রই জীবনের চরম লক্ষ্য হয়ে ওঠে।[১]

যা আমাদের পরিচিত তাই শাশ্বত এ ভুল যেন আমরা না করি। বর্তমান ব্যবস্থার প্রতি আমাদের পক্ষপাত বিশ্বের অলংঘ্য নিয়ম বলে মনে করার প্রয়োজন নেই। মানুষের প্রকৃতিতে সত্যের প্রতি আবেগ ও করুণা ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে এবং তার বিকাশের জন্য আমাদের পৃথিবীতে মৈত্রীপূর্ণ পরিবেশে স্বাধীন ব্যক্তিরূপে বাস করা প্রয়োজন। আমাদের আত্মবিনাশের শক্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং প্রকৃতির ঐশ্বর্যকে সকলের সুখ ও স্বাস্থ্যের কাজে লাগিয়ে, পৃথিবীতে ভদ্র প্রতিবেশী হিসেবে বাস করার জন্য চাই শান্তির ইচ্ছা এবং সুবিধাভোগী শ্রেণীসমূহের ও জাতীয় রাষ্ট্রের অনেক দাবির বিসর্জন। আমরা যদি সত্যই দেশভক্ত হই, তাহলে আমাদের প্রীতি স্থানীয়, জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আবদ্ধ রাখলে চলবে না, তা সমগ্র মানবসমাজে ব্যাপ্ত করে দিতে হবে। সকলের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, শান্তি ও সামাজিক সুখ আমাদের প্রিয় হওয়া প্রয়োজন। আমরা দেশের জন্য লড়াই না করে, মানব সভ্যতার জন্য যুদ্ধ করব এবং সমবায় সংস্থার মাধ্যমে মানবসমাজের সর্ববিধ উন্নতির জন্য পৃথিবীর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ব্যবহার করব। এর জন্য আমাদের নূতন পাঠ নিতে হবে, আমাদের বিশ্বাস ও কল্পনাকে প্রসারিত করতে হবে। যে ব্যক্তি চারপাশে যে সব শক্তি কাজ করছে তার গতি ও প্রকৃতি বুঝে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে তার মাধ্যমেই বিশ্বের ইচ্ছা ও যুক্তি কার্যকরী হয়। কক্ষপথে ভ্রাম্যমাণ নক্ষত্রদের গতির মত আমাদের অভিব্যক্তি আর অনায়ত্ত ব্যাপার নয়। তার মাধ্যম হল মানুষের মন ও ইচ্ছা। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাধান্য ও পবিত্রতার আদর্শে এক নূতন যুগের মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে, তাদের মধ্যে যেন মানুষের সৌভ্রাত্র ও শান্তিপ্রীতি বিকশিত হয়।

যুদ্ধ ও নব সংস্থা

অধ্যাপক আর্নল্ড টয়েনবী তাঁর Study of History (ইতিহাস পাঠ) নামক গ্রন্থে কি অবস্থায় নূতন সভ্যতার উৎপত্তি হয়, কি ভাবে তা উন্নতি লাভ করে আর কি অবস্থায়ই বা তার ধ্বংস হয়, এসব আলোচনা করেছেন। সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ কোন জাতিবিশেষের প্রাধান্য কিংবা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় স্বয়ংক্রিয় প্রভাবের উপর নির্ভর করে না। মানুষ এবং তার পারিপার্শ্বিকের দুরূহ সম্পর্কের সমন্বয় থেকেই সভ্যতার উৎপত্তি হয় এবং তিনি প্রক্রিয়াটাকে কতকটা "দ্বন্দ্বে আহ্বান ও তার

---

১ "উপকরণের সঙ্গে যে ধর্ম নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে সে প্রকৃতি-পূজার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি। রাষ্ট্র-উপাসনার তুলনায় পশুপূজা সুযৌক্তিক ও মর্যাদাপূর্ণ। একটি ষণ্ড বা কুমীরের খুব বেশী নিজস্ব মূল্য না থাকতে পারে, কিন্তু কিছু আছে কেননা তাদের চেতনা আছে। রাষ্ট্রের তাও নেই।" Mc Taggart.

প্রতিক্রিয়া" রূপে কল্পনা করেছেন। অবস্থাবিপর্যয় সমাজকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করে এবং সেই দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়ে সমাজকে যে প্রয়াস ও দুঃখবরণ করতে হয় তারই মধ্যে নূতন সভ্যতার জন্ম হয় ও বৃদ্ধি হয়। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য জীবের অনন্ত প্রয়াসই জীবন। পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা যখন সফল হয় তখনই প্রগতি হয়, আর পরিবর্তন যখন এত দ্রুত হয় বা এমন সহসা হয় যে খাপ খাওয়ানোর সময় পাওয়া যায় না, তখনই হয় ধ্বংস। একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে মানুষের বুদ্ধির জন্য বা পৃথিবীতে তার আধিপত্যের জন্য জগতের সমস্ত জীবিত প্রাণীর যা প্রয়োজন তার দাবি মেটানো থেকে মানুষ নিষ্কৃতি পেয়েছে। আদিম সভ্যতাকে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা বাহ্যপ্রকৃতির, কিন্তু পরবর্তী সভ্যতাকে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে বা হচ্ছে তা হল অন্তর্মুখী ও পারমার্থিক। বস্তুতান্ত্রিক বা যান্ত্রিক প্রগতি দিয়ে এখনকার সভ্যতার বৃদ্ধির পরিমাপ করা চলবে না, দেখতে হবে মন ও আত্মার কতখানি সৃজনক্ষম বিকাশ হয়েছে। বর্তমান সভ্যতাকে বাঁচতে হলে পারমার্থিক মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধা, সত্য ও সৌন্দর্যপ্রীতি, সততা, ন্যায়বিচার ও করুণা, দলিতদের প্রতি সহানুভূতি, মানুষের প্রতি সৌভ্রাত্রানুভূতি, এসব গুণের বিকাশ প্রয়োজন। যারা ধর্ম বা কুল, জাতি বা রাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে অন্য সকলের সঙ্গে পার্থক্য বজায় রাখতে চায়, তারা মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়তা করছে না, বাধা সৃষ্টি করছে। ইতিহাসে সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের অভাব নেই, তারা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে নি, যথোপযুক্ত জ্ঞান ও উদ্যোগী মন তৈরী করতে পারে নি। বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বর্তমানের সংকটাপন্ন পৃথিবীতে শুধু যে একটা ঐতিহাসিক যুগেরই সমাপ্তি দেখছেন তাই নয়, মনুষ্যজাতির ও তার অন্তর্গত আত্মবোধবিশিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির একটি আধ্যাত্মিক যুগেরও সমাপ্তি দেখতে পাচ্ছেন। সমকালীন মানুষকে অভিব্যক্তির চরম গৌরবময় পরিণতি বলে মনে করার প্রয়োজন নেই। পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্বের ইতিহাস শতকোটি বৎসরের ইতিহাস। ভূবিদ্যায় স্বীকৃত প্রত্যেক যুগে এমন সব জীব পৃথিবীতে আধিপত্য করেছে যাদের তখন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ধন বলে ধরা যেতে পারত। কিন্তু যেসব প্রাণী স্থায়ী হয় নি, তার স্থানে অন্য প্রকারের প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে।[১] অভিব্যক্তির পরবর্তী সোপান

১ ১৯৩৯ সালে ডান্ডীতে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশানের যে অধিবেশন হয় তার প্রাণীবিদ্যা বিভাগের সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক জেমস রিচি অভিব্যক্তিবাদের ফলাফলের কথা এইভাবে বলেন, "অভিব্যক্তির পথে জীবনের অবিচলিত অগ্রগতির ১২০ কোটি বৎসরের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করার পর এরকম চিন্তা অত্যন্ত স্পর্ধার কথা বলে মনে হবে যে সবশেষের আগন্তুক মানুষই সৃষ্টির শেষ কথা বা চরম গৌরবময় কীর্তি, আর তার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অভিব্যক্তির মহৎ পদক্ষেপ শেষ সীমানায় পৌঁছেছে। পৃথিবীতে জীবনের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে গেলে এরকম ধারণা আরও স্পর্ধার বলে মনে হবে যে, আগামী একশ কোটি বৎসরে অতীতকালে যে জীবনধারা এত নব নব উদ্ভাবনা শক্তির পরিচয় দিয়েছে, তার ভবিষ্যৎ উন্নতি শুধু মানুষের মস্তিষ্কের প্রসারতা বা মানুষের উন্নততর সামাজিক গঠনের মত তুচ্ছ পরিবর্তনের মধ্যে সীমিত থাকবে। একথা সত্য যে শুধু অতীতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আমরা আর বেশী কিছু

মানুষের দেহে নয়, তার মনে, তার আত্মায়। তার প্রকাশ হবে জ্ঞান ও বোধের বিস্তৃতিতে, নবযুগের উপযোগী নব চারিত্রিক সমন্বয়ের বিকাশে। যখন সে দার্শনিক চেতনা লাভ করবে, বোধশক্তি যখন তার তীব্রতা লাভ করবে, সমগ্রের অর্থ সম্বন্ধে অনুভূতি গভীর হবে, তখনই যথাযোগ্য সামাজিক জীবন সম্ভব হবে এবং তার প্রভাব যে শুধু ব্যক্তির উপরই পড়বে তা নয়, জাতিকেও প্রভাবিত করবে। এই নূতন সংস্থার জন্য আমাদের যুদ্ধ করতে হবে, প্রথমে আমাদের আত্মার অন্তর্জগতে, পরে বহির্জগতে।

বর্তমান যুদ্ধ সভ্যতা ও অসভ্যতার দ্বন্দ্ব নয়, কেননা প্রত্যেক যোদ্ধাই তার নিজের মতে যা সভ্যতা তার রক্ষার জন্যই প্রাণপণ করছে। মৃত অতীতকে পুনরুজ্জীবিত বা অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত ভগ্নপ্রায় সভ্যতাকে রক্ষা করার চেষ্টা এ নয়। এটা ধ্বংসের শেষ পর্যায়, এর পরেই দীর্ঘ গর্ভযন্ত্রণার অবসানে নূতন বিশ্ব-সমাজের জন্ম। আমাদের পরিবর্তনের গতি মন্থর বলে নূতন ধারণাকে জন্মাবার জন্য লড়াই করতে হচ্ছে, হিংস্র উৎপাত করে তার পথ পরিষ্কার করতে হচ্ছে। পুরাতন জগতের মৃত্যুকালে যদি হিংসা, ধ্বংস, দুঃখ, ভয় ও বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব ঘটে থাকে, পতনের সময় সে অনেক ভাল সুন্দর ও সত্য বস্তুকে নিয়ে পড়ে। তার জন্য যদি রক্তপাত হয়, বহু লোকের জীবননাশ হয়, বহু লোকের মন বিকৃত হয়ে যায়, তা হলে বুঝতে হবে নূতন জগতের সঙ্গে আমরা শান্তির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছি না। এই নূতন জগতের অন্তর্নিহিত অবিভাজ্যতা এখন বাহিরেও অবিভাজ্যরূপে প্রকাশ পেতে চাইছে। আমরা যদি স্বেচ্ছায় অগ্রসর না হতে পারি, আমাদের পিঠে যে মৃত বস্তুর বোঝা জমে উঠেছে, তাদের যদি নিজে নিজে ঝেড়ে ফেলতে না পারি, তাহলে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা আমাদের চোখ খুলে দেবে এবং তাতেই যে সমস্ত অচলায়তন আমাদের উদার মনকে পঙ্গু এবং বুদ্ধি আবিল করে রেখেছে, তারা খসে পড়বে।

অমঙ্গলের আবির্ভাব আকস্মিক ঘটনা নয়। হিংসা, পীড়ন, ঘৃণা—এসব যে দেখা যাচ্ছে তা বিশৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচারের জন্য যে ঘটছে তা নয়, বরং তা নৈতিক শৃঙ্খলার উপস্থিতিই নির্দেশ করছে। প্রকৃতির মূল নীতি সংহতি, একতা, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা যদি পদদলিত হয়, তাহলে বিশৃঙ্খলা ঘৃণা ও যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু আশাই করা যায় না। ইতিহাসের একটা যুক্তি আছে। যা কিছু পুরানো হয়ে গেছে, যা কাজের বাইরে চলে গেছে, শুধু প্রগতির পথ বন্ধ করে আছে, তাদের দূরীভূত করার জন্য বিশৃঙ্খলা ও হট্টগোলের প্রয়োজন আছে। এখনও এই হিংসাজর্জর পৃথিবীতে যখন পশুবল, ভয়, মিথ্যা ও নিষ্ঠুরতাই

কল্পনা করতে পারি না, কিন্তু অভিব্যক্তির দীর্ঘ পথ যদি ভবিষ্যতের আভাস বয়ে এনে থাকে, তাহলে বলতেই হবে যে বর্তমানের গৌরবময় যুগ মনুষ্যজাতির জীবনের প্রগতির একটা ধাপ মাত্র, অভিব্যক্তির আরও গৌরবময় ভবিষ্যতের যাত্রায় একটা দূরত্ব নির্দেশক চিহ্নমাত্র। অন্যথায় এই প্রকার কল্পনা করতে হয় যে, অভিব্যক্তির যে প্রগতি ও সৃষ্টিশক্তি অবল্পনীয় যুগ যুগ ধরে অবিচলিতভাবে চলে যাচ্ছে, যার মধ্যে কোন ক্লান্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, তা কালের অতি তুচ্ছ অংশ ব্যাপী মনুষ্যজাতির সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নিজেকে ফুরিয়ে ফেলেছে।"

মানুষের জীবনে একমাত্র সত্য বলে মনে হচ্ছে, তখনও সত্য ও প্রেমের মহান আদর্শ ভেতরে ভেতরে কাজ করে যাচ্ছে। পশুবল ও মিথ্যার শাসনের ভিত্তিমূলকে ক্ষীণ করছে। বিশ্বে ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করার মত আমাদের সাহস ও কল্পনাশক্তি যদি না থাকে, তা হলে তা সিদ্ধ হবে ঐশী ন্যায়ের আসুরিক অনুচরদের হিংস্র আচরণের মাধ্যমে। যে ঝড়-ঝাপটার মধ্যে আমরা রয়েছি, তা সত্ত্বেও ভবিষ্যতের উপর ভরসা রাখতে পারি! এই নৈতিক নিশ্চয়তায় আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এই সমস্ত হট্টগোল ও অনাসৃষ্টির মধ্যে একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে। এই সব আক্ষেপ ও উৎক্ষেপের ফলে হয়ত পারমার্থিক শ্রেয় বোধ আমাদের বেড়ে যাবে এবং তাতে মানুষ উচ্চস্তরে উন্নীত হবে। যুদ্ধ যে শুধুই কুবুদ্ধিচালিত চিত্তবিকার-তাড়িত উন্মত্ত, অশান্ত জনতার কোলাহল তা নয়. বিশ্বস্ত, সহনশীল, শান্তিস্থাপনের ও পুনরুজ্জীবনের জন্য উদ্যোগী, প্রতীক্ষমাণ ব্যক্তিমানুষের মানবাত্মারও সংগ্রাম। মানুষ ধ্বংসও করে, গঠনও করে। কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র হতে পারে। সে পরিণতি হয়ত বহুদূরে। এর জন্য বহু বর্ষ, বহু দশক বা বহু শতাব্দী লাগতে পারে। নববিশ্বের জন্ম হয়ত অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে হবে, কিন্তু মানুষের আদর্শ যে চিরকালের জন্য ধূলিলুণ্ঠিত হবে এ অচিন্তনীয়। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এক গোপন জ্ঞানের উৎস আছে, জীবনের অবিভাজ্যতার আত্মিক বোধ আছে, তার জন্যই মানুষের অন্তর উন্নততর জীবনে বিশ্বাস রাখে। কখনও কখনও এ বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ে, আশা ক্ষীণ হয়। কিন্তু এই সব অন্ধকার যুগের পরেই ঊষার উদয় হয়, মানুষের জীবন অবর্ণনীয় ঐশ্বর্যে ভরে ওঠে। আমাদের মুখের প্রতিবাদ বা সাময়িক বিজয় কালের গতিকে ব্যাহত করতে পারে না, মানুষের আশা ও বাসনার অগ্রগতির স্রোতে ভেসে যায়। নৈতিক অভিব্যক্তির ফলে যখন মানুষের অসহিষ্ণুতা ক্ষমতাপরায়ণতা, শত্রুকে দমন করার অযৌক্তিক আনন্দ নষ্ট হবে, যে সব আরাম ও সুবিধা ত্যাগ করতে পারলে সমাজকে অন্যায় ও ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচানো যায়, সে সব যখন মানুষ স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করতে পারবে, তার আগে হয়ত বহু শতাব্দী গত হবে, কিন্তু পৃথিবীর অগ্রগতি বাধা পাবে না, যেহেতু পৃথিবীর বিধাতা অবাস্তব স্বেচ্ছাচারী নন। আমাদের সভ্যতার শেষ হলেই ইতিহাস শেষ হবে না, হয়ত নবযুগের সূচনা হবে।

আমাদের যুগের প্রধান দুর্বলতা ধর্মনিরপেক্ষতা

বর্তমান দুর্গতির প্রধান কারণগুলি কি? যুদ্ধের কারণ বলতে অতি-গৌণ, গৌণ ও মুখ্য কারণের কথা ভাবতে পারি। কারণ বলতে আমরা হিটলারের ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বের কথা, তার কল্যাণবিমুখ প্রতিভার কথা, কিংবা, ভার্সাই সন্ধির যুদ্ধ-দোষ-সংক্রান্ত ধারাগুলির সম্বন্ধে জার্মানীর বিতৃষ্ণার কথা, কিংবা এক মহান জাতির গর্ব ও কল্পনাপ্রবণতার উপর আঘাতের কথা ভাবতে পারি। আর আমরা জাতিপুঞ্জের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের বিফলতা বা বিস্মৃতির জনবহুল ক্ষেত্রে জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষাসমূহের সংঘর্ষের মধ্যেও সূত্র খুঁজে পেতে পারি। কিন্তু এত বড়

দুর্ঘটনার জন্য এগুলির কোন একটা কারণকে দায়ী করা যায় না। আসলে প্রত্যেকটিই কারণ নয়, কারণ সঞ্জাত ফল। সমস্ত পৃথিবীর আশাভরসা নষ্ট হয়েছে এক ভ্রান্ত দর্শনের বিভ্রান্তিকর স্বীকৃতি, বিশ্বাস ও মূল্যের আধিপত্যের জন্য।[১]

সভ্যতা একটি বিশিষ্ট জীবনধারা, মানবাত্মার এক অভিযান। জাতির জৈবিক একতা বা রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তার সারমর্ম পাওয়া যাবে না, যে সব মূল্যবোধ তাদের সৃষ্টি করে ও রক্ষা করে তাদের মধ্যেই সভ্যতার মর্ম নিহিত। মানুষেরা জীবনের যে রূপ ও মূল্য মেনে নিয়েছে তার প্রতি আনুগত্য ও গভীর শ্রদ্ধাকে ব্যক্ত করার জন্যই রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সংগঠনের সৃষ্টি। প্রত্যেক সভ্যতা একটা ধর্মের বহিঃপ্রকাশ, কেননা ধর্ম মানেই পরম মূল্যে বিশ্বাস এবং তা লাভ করার জন্য জীবনচারণা। সভ্যতার ধারক যে সব শ্রেয় বস্তু, তারাই যে পরম বস্তু এ বিশ্বাস যদি আমাদের না থাকে তো সভ্যতার রীতিনীতি কেউ মানবে না এবং প্রতিষ্ঠানগুলি নষ্ট হয়ে যাবে। ধর্মবিশ্বাসই আমাদের জীবনের ধরনকে রক্ষা করার আবেগ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে, সে বিশ্বাস যদি কমে যায় তো রীতিনীতিকে মান্য করা একটা অভ্যাস মাত্রে দাঁড়ায় এবং সে অভ্যাসও ধীরে ধীরে লোপ পায়। যেমন নাৎসী এবং কমিউনিস্ট মতবাদ ঐহিক ধর্মভিত্তিক। অনুমোদিত চিন্তা বা বিশ্বাস থেকে কোনরকম বিচ্যুতি অপরাধ। রাষ্ট্রই ধর্ম-প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে বলে পোপও আছে, ইনকুইজিশানও আছে। মতবাদ গ্রহণ করার সময় বীজমন্ত্র উচ্চারণ করি। তারপর অবিশ্বাসীদের খুঁজে বার করে তাদের ফাঁসিকাঠে চড়াই। আমরা ধর্মের শক্তি ও আবেগ ব্যবহার করি। ঐহিক বিশ্বাস থেকে এমন এক চালনাশক্তি, এমন এক মনস্তাত্ত্বিক গতিশীলতা প্রকাশ পায়, যা যারা তার বিরোধিতা করে তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না।

মানুষের প্রকৃতি এবং পরিণতি সম্বন্ধে ধারণা থেকেই সভ্যতার প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। মানুষকে শুধু কি জীববিদ্যার দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে সব চেয়ে চালাক পশু বলে? সে কি শুধু একটা অর্থনৈতিক সত্তা, যোগান ও সরবরাহের নিয়মে বদ্ধ এবং শ্রেণীসংগ্রামের আসামী? সে কি এক রাষ্ট্রনৈতিক পশু, যার মনের কেন্দ্রস্থল শুধু অতিমাত্রায় রাজনীতি দিয়ে ভরা, যেখানে বিদ্যা, ধর্ম, জ্ঞান এসবের স্থান নেই? অথবা সে এক পারমার্থিক উপাদানে গঠিত, যার ফলে সাময়িক সুযোগ-সুবিধাকে অগ্রাহ্য করে যা সত্য ও নিত্য তার দিকে ঝোঁকে? মানুষকে কি শুধু জীববিদ্যা, রাষ্ট্রবিদ্যা বা অর্থবিদ্যার ভাষায় বিচার করব না তার পারিবারিক বা সামাজিক জীবন, ঐতিহ্য ও দেশপ্রীতি, ধর্মীয় আশা ও সান্ত্বনা যার ইতিহাস প্রাচীনতম সভ্যতার থেকেও পুরাতন তার প্রতি প্রীতি, এই সব ধরে নিয়ে বিবেচনা করব? যুদ্ধের গভীরতর অর্থই হল যে তা থেকে মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণায় অসম্পূর্ণতা ধরতে পারি, এবং তার সত্যকার মঙ্গল যার মধ্যে আমাদের সকলকার চিন্তাপ্রণালী ও জীবনধারা জড়িত তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। আমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি করুণার ধারা স্তব্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার সকল

---

১ বাইবেলে জেমসের পত্রলেখক জিজ্ঞাসা করেছেন, "তোমাদের মধ্যে যুদ্ধ হয় কেন?" নিজেই জবাব দিয়েছেন, "তোমার নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে বাসনার লড়াই তাই থেকে।"

প্রচেষ্টা যদি নিষ্ফল হয়ে থাকে, তা শুধু এই জন্য যে মানুষের অন্তরে ও মনে যে সমস্ত অসুয়াপরায়ণ, স্বার্থপর ও দুষ্ট বাধা আছে, সেগুলিকে আমাদের জীবন থেকে দূর করতে পারিনি। আজ যদি আমরা জীবনে হতমান হয়ে থাকি তো তা কোন দুর্ভাগ্যজনিত নয়! আমাদের জীবনের ঐহিক সরঞ্জামকে সুষ্ঠু করার কীর্তি আমাদের মনে একটা গর্ব ও আত্মপ্রত্যয়ের ভাব এনেছে যাতে আমরা জড়জগৎকে শোষণের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে শিখেছি, তাকে শোধন করতে বা তাতে মানবতা আরোপ করতে শিখিনি। আমাদের সামাজিক জীবন আমাদের উপকরণ যোগাচ্ছে, কিন্তু লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট করছে। আমাদের যুগের মানুষকে ভয়ঙ্কর অন্ধতায় গ্রাস করেছে, তারা শান্তির সময় কঠোর অর্থনৈতিক নিয়ম দিয়ে এবং যুদ্ধের সময় আক্রমণ ও নিষ্ঠুরতা দিয়ে মানুষের দুঃখকে পণ করে জুয়া খেলতে ইতস্ততঃ করে না। মানুষের পারমার্থিক উপাদানকে বর্জন করাই জড়বস্তুর প্রাধান্যের প্রধান কারণ, এবং এই জড়প্রাধান্য আমাদের সকলকেই পীড়িত করছে ও বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সভ্যতার মৌলিক দুর্বলতাই হল জড়ের কাছে মানবের পরাভব।

ভগবদ্‌গীতা বলেছেন, মানুষ যখন নিজেকে পৃথিবীর দেবতা বলে মনে করে, নিজেকে মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে, অজ্ঞতা দ্বারা ভ্রান্ত হয় তখন তারা অসুরিক বিকারে ও অহঙ্কারে পূর্ণ হয়, এবং নিজেকে জ্ঞান ও শক্তিতে পরম বলে ঘোষণা করে।[১] মানুষ নিজেকে স্বপ্রধান মনে করে বিনয় ও আজ্ঞাবহতা বর্জন করেছে। সে "দেবতার মত" হতে[২] নিজেই নিজের প্রভু হতে চায়। জীবনকে আয়ত্তাধীন ও নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টায়, ঈশ্বরবিহীন সংস্কৃতি গড়বার চেষ্টায়, সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। স্বনির্ভরতাকে সীমাহীন করে ফেলে। এই ধর্মদ্রোহিতা, এই প্রসাদবর্জিত প্রকৃতির জয়গান থেকেই যুদ্ধের উৎপত্তি। একাধিনায়করা নিজেদের ঈশ্বরের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস লোপ করতে চান কেননা তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বী সহ্য করতে পারেন না। আমরা যে সভ্যতার আওতায় বাস করি তার পয়গম্বর ও অদ্বিতীয় সৃষ্টি হিটলার। যখন মূল্যবোধের নিশ্চিত অবনতি দেখতে পাই তখন কিং লিয়ারের ডিউক অর্ফ আলবানির মতই বলতে হয় "এ মড়কের যুগ যখন উন্মাদ অন্ধকে চালিত করে" ('Tis the time's 'plague, when mad men lead the blind)। যেহেতু আমাদের নেতারা ঊর্ধ্বলোকের জ্যোতিদ্বারা উদ্ভাসিত হননি, তারা শুধু পার্থিব বুদ্ধির আলোই প্রতিফলিত করছেন, তাই তাঁদের লুসিফারের গতিই হবে, তাঁরা বুদ্ধির দম্ভে বিনাশের গহ্বরে পতিত হবেন।

But man, proud man !
Dress'd in a little brief authority,—
Most ignorant of what he's most assured

---

১ ঈশ্বরোঽহম্‌ অহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্‌ সুখী।
................ইতি অজ্ঞান বিমোহিতাঃ।

ষোড়শ অধ্যায়, ১৪-১৫

২ বাইবেল, জেনেসিস, তৃতীয়—৫

His glassy essense,— like an angry ape,
Plays such fantastic tricks before high heaven
As make the angels weep.[১]

(কিন্তু দাম্ভিক মানুষ, স্বল্পস্থায়ী ক্ষমতায় আসীন, যেটা জানে বলে মনে করে সেই সম্বন্ধেই সব চেয়ে অজ্ঞ,…কুপিত বনমানুষের মত স্বর্গের সামনে এমন সব কীর্তি করে যে দেবদূতেরা শোকাচ্ছন্ন হন।)

সে নিজেকে সকল বস্তুর ঊর্ধ্বে ও শীর্ষে স্থাপন করে, এবং আধিভৌতিক ও যান্ত্রিক, দৃশ্য ও স্পৃশ্য জগতের উপর রাখে অন্ধবিশ্বাস। তার শিল্প ও ব্যবসায় মানুষের অভাব মিটানোর জন্য না হয়ে পরিচালিত হয় ঐশ্বর্য ও মুনাফার জন্য। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পৃথিবীকে পরমাণু সমূহের আকস্মিক যোগাযোগ থেকে উৎপন্ন বলে ঘোষণা করা হচ্ছে. সৃষ্টির আদিতে যেমন হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল. অন্তিমেও সেই হাইড্রোজেন গ্যাসের মেঘে তার সমাপ্তি। যুক্তিবাদ প্রাচীন মতবাদের আক্ষরিক সার্থকতাকে অস্বীকার করে ভালই করেছিল, কিন্তু এখন সে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে ঈশ্বরের অস্তিত্বই পৃথিবীময় আজ অস্বীকৃত হচ্ছে। পাশবিক প্রবৃত্তি ও অসীম ক্ষমতাপ্রিয়তা নিয়ে মানুষ ঐশী অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে এবং সর্ব মানবিক ভোটাধিকার, একই রকমের বস্তুর বিপুল সংখ্যায় উৎপাদন, শৌখিনী সেবার ভিত্তিতে নূতন জগৎ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। সময় সময় সে মামুলী ভাবে প্রায় অচেনা ঈশ্বরকে প্রশংসাও করে। মূলবিহীন ধর্মনিরপেক্ষতা অথবা ধর্মভাবের সামান্য স্পর্শযুক্ত মানুষ ও রাষ্ট্রের পূজা সমকালীন বিশ্বাসের অঙ্গীভূত। মানুষ শুধু ঐহিক ভোগেই সন্তুষ্ট, একথা যে মতবাদকে প্রকাশ করে তা মানুষকে, পারমার্থিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে সম্পূর্ণভাবে শ্রেণী ও গোত্র, রাষ্ট্র ও জাতির ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখছে, মানুষকে তার প্রিয় স্বপ্ন ও দার্শনিক চিন্তা সমূহ থেকে ভুলিয়ে নিয়ে তাকে ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন করে তুলছে। এমন কি যারা দার্শনিক মন্ত্র হিসাবে জড়বাদকে অস্বীকার করে এবং নিজেদের ধর্মপরায়ণ বলে দাবি করে তারাও জীবনে জড়বাদীর ভঙ্গী গ্রহণ করে। মুখে আমরা যাই বলি না কেন, শক্তির লালসা, নিষ্ঠুরতায় আনন্দ ও আধিপত্যের অভিমান এসব আদর্শের দ্বারাই আমাদের শত্রুদের মতই আমরা পরিচালিত হই। পৃথিবী যন্ত্রণার কাতরধ্বনিতে ভারাতুর হয়েছে এবং সুবিচারের প্রার্থনা জানাচ্ছে।

ঐহিক স্তর ভিন্ন অন্য কোন স্তরের অপূর্ণ বাসনা মানুষের যদি না থাকে তবে মানুষ ধর্মের কথা মানবে না। উত্তম খাদ্য, নরম বিছানা, সুন্দর পোশাকেই আমরা যথেষ্ট সন্তুষ্ট হতে পারি না। দারিদ্র থেকেই যে শুধু দুঃখ ও অসন্তুষ্টি আসে তা নয়। মানুষ একটি অদ্ভুত জীব, অন্য সমস্ত পশু থেকে তার মৌলিক পার্থক্য আছে। তার দৃষ্টি বহুদূরপ্রসারী, তার আশা অজেয়, তার সৃষ্টি-ক্ষমতা এবং আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। এগুলি যদি বিকশিত না হয় বা অপূর্ণ থাকে, তা'হলে ঐশ্বর্যজাত সকল প্রকার সম্ভোগের মধ্যেও তার মনে হবে যে জীবনে সুখ নেই।

---

১ শেক্সপীয়র। মেজার ফর মেজার, ২য় অংক, ২য় দৃশ্য

মানবপ্রেমী মহান লেখক, শ ও ওয়েলস, আর্নল্ড বেনেট ও গলস্‌ওয়ার্দিকে সুপ্রভাতের প্রবক্তা বলে মনে করা হয়। তাঁরা বর্তমান জীবনের ত্রুটি, অসঙ্গতি ও দুর্বলতা সব প্রকাশ করে দিয়েছেন কিন্তু তাঁরা জীবনের গভীরতর ধারাগুলিকে উপেক্ষা করেছেন, সময়ে সময়ে তাদের মিথ্যা চিত্র দিয়েছেন। বিশেষ করে তাঁরা তাদের স্থান পূরণ করতে পারে এমন কিছু দেন নি। ঐতিহ্য, নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম বাদ দিলে যে শূন্যতা থাকে, তা অন্য লোকে জাতি ও শক্তির অস্পষ্ট আবেগ দিয়ে ভরিয়ে তুলছে। সমকালীন মানসিকতা রুশোর "সোস্যাল কনট্রাক্ট", মার্কসের "ক্যাপিটাল", ডারউইনের "অরিজিন অফ স্পেসিস" আর স্পেঙ্গলারের "ডিক্লাইন অফ দি ওয়েস্ট"-এর সৃষ্টি। আমাদের মন ও অন্তরের বিশৃঙ্খলা আমাদের বহির্জীবনে অনাসৃষ্টি ও বিশৃঙ্খলার আকারে প্রকাশ পাচ্ছে। প্লেটো বলেছেন, "মানুষের মনে যে সব শ্রেয়োবোধ আছে তাই বাইরে রাষ্ট্র সংবিধান হিসাবে প্রতিফলিত হয়।"[১] যে সব আদর্শ আমাদের প্রিয়, যে সব বস্তুকে আমরা মূল্য দিই তার পরিবর্তন না করতে পারলে আমরা তা সমাজে প্রতিফলিত করতে পারব না। আমরা নিজেদের যতখানি বদল করতে পারব, ভবিষ্যৎকেও ততখানি আয়ত্ত করতে পারব। আমাদের যুগের অভাব হল আত্মার, দেহে কোন ত্রুটি নেই। আত্মার অসুখে আমরা ভুগছি। শাশ্বতের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র আবিষ্কার করতে হবে এবং যে তুরীয় সত্য জীবনে শৃঙ্খলা আনে, গরমিলের মধ্যে সামঞ্জস্য আনে, ঐক্য ও উদ্দেশ্যের বোধ জাগায় তাতে আমাদের বিশ্বাস ফিরে পেতে হবে। তা যদি না পারি তো যখন বন্যা আসবে, ঝড় উঠবে, তখন আমাদের বাড়ী তাদের ধাক্কা সামলাতে না পেরে পড়ে যাবে।[২]

দ্বান্দ্বিক জড়বাদ

কিন্তু জড়বাদী কি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্য, পৃথিবীর মূর্ত বাস্তবতার উপর নির্ভর করতে বলে সঙ্গত কাজই করেনি? এই পৃথিবীই একমাত্র বস্তু যার সম্বন্ধে আমরা খানিকটা নিশ্চিত থাকতে পারি; ধর্মীয় পরলোক হয়ত মনগড়া স্বপ্ন এবং তার অস্তিত্ব যদি থাকেও তো তা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়। সব দেশের ভাববাদী বুদ্ধিজীবীদেরই মার্কস্‌বাদ আকর্ষণ করে। আমাদের অনেকে ভারতবর্ষের অবস্থায় অতৃপ্ত হয়ে সোবিয়েৎ মতবাদে আকৃষ্ট হন। সেখানে শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শ

১ রুশো বলছেন, "হে মানব, অমঙ্গলকারীর জন্য বাইরে খুঁজতে যেও না, তুমিই তিনি। যে অমঙ্গল তুমি কর, এবং যে অমঙ্গলের তুমি পাত্র তাছাড়া আর কোন অমঙ্গল নেই এবং দুই, তোমা থেকেই আসে।"

২ রাসকিন বলেছেন, "যখন থেকে মানুষ মহাসমুদ্রকে বশ করেছে তখন তার বালুচরে উল্লেখযোগ্য তিনটি মাত্র সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে: টায়ার, ভেনিস আর ইংলণ্ড। এই মহাশক্তিত্রয়ের মধ্যে প্রথমটির স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট আছে, দ্বিতীয়টির আছে ধ্বংসাবশেষ; তৃতীয়টি তাদের মহত্ত্বের উত্তরাধিকারী, কিন্তু সে যদি তাদের শিক্ষা ভুলে যায় তো আরও উঁচুতে উঠেও তার অধিকতর বেদনাদায়ক পতন হবে।"

তুলে ধরা হয়, কৃষিজীবী জনগণের কাছে শিল্পদর্শনের প্রচার করা হয়, এবং শ্রমিকদের যোগ্যতাকে মহিমান্বিত করার জন্য লোকমনস্তত্বের অদ্বিতীয় প্রয়োগ-কৌশল ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীতে প্রায় স্বর্গ রূপে কল্পিত সোবিয়েৎ রাশিয়া তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজ্ঞান। তার উদ্দেশ্য হল পৃথিবীর সর্বত্র এক নূতন ধরনের রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং সেই উদ্দেশ্যে বর্তমান সংস্থাগুলিকে সে এমন নানাবিধ উপায়ে আবেগপূর্ণ ভাষায় আক্রমণ করে যে লোকের মনে একটা কুসংস্কার দাঁড়িয়ে গেছে যে অন্তর্ঘাতী প্রচারই বুঝি তার অস্তিত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাদের এই আক্রমণের প্রতিক্রিয়াও এমনি উচ্চ কলরবে হয় যে আসল তথ্য কি বোঝাই শক্ত। সামাজিক মতভেদ এর আগে আর কখনও এতখানি কোলাহল ও এমন সোচ্চার গোঁড়ামির সঙ্গে প্রকাশিত হয়নি। অথচ তার সব চেয়ে বেশী নিন্দুকেরাও অস্বীকার করতে পারবে না যে রাশিয়ায় একটা বিরাট পরীক্ষা চলছে, যার গুরুত্ব আমেরিকান বা ফরাসী বিপ্লবের থেকে বেশী। পৃথিবীর স্থলভাগের এক ষষ্ঠাংশের অধিবাসী প্রায় বিশ কোটি লোকের সমগ্র সম্প্রদায়ের, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক, সম্পূর্ণ কাঠামোটা ঢেলে সাজাবার চেষ্টা সেখানে চলেছে। কুড়ি বৎসরের মধ্যে সেখানে জমিদার ও ধনিকরা অদৃশ্য হয়েছে এবং কৃষক ও শিল্পকলাবিদদের সামান্য ব্যবসায় ছাড়া আর ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক প্রয়াসের কোন স্থান নেই।

পৃথিবীতে সমভোগবাদের ডাকে আজ ধর্মপ্রচারের আবেগ যুক্ত হয়েছে। সমভোগবাদ বর্তমান অকল্যাণকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করেছে, স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট কার্যসূচী দিয়েছে এবং রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়েছে বলে দাবি করছে। গরীব দুঃখীর জন্য উদ্বেগের কথায়, সম্পদ ও সুযোগের ন্যায্য বিতরণের দাবির কথায়, সকল জাতিই সমান এই কথা জোর করে বলায়, সে এমন একটি সামাজিক বাণী প্রচার করেছে যার সঙ্গে সকল ভাববাদীদেরই মতৈক্য আছে। কিন্তু সামাজিক কর্মসূচীর প্রতি আমাদের সহানুভূতি আছে বলেই আমাদের মার্কসীয় দর্শন গ্রহণ করতে হবে তার মানে নেই। ঐ দর্শনে চরম সত্তার ধারণা ঈশ্বরবিহীন, মানুষকে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির দান বলে মনে রাখা হয়, এবং ব্যক্তিত্বের পবিত্রতাকে অস্বীকার করা হয়। মার্কসবাদকে সামাজিক বিপ্লবের ফলদায়ী হাতিয়ার হিসাবে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা আর তার দার্শনিক পশ্চাদ্‌পটকে স্বীকার করার মধ্যে অনেক তফাৎ।

মার্কসবাদ নির্বিচারী সমর্থকদের এবং তার আপোসহীন বিরোধীদের দুইয়ের কাছেই একটা বিশ্বাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মুখ্য দাবি হল যে এ বৈজ্ঞানিক, কোন আপ্ত বাক্য প্রসূত নয়, তথ্যসমূহের বিষয়মুখী চর্চা থেকে জাত। দৈবী প্রেরণাপ্রাপ্ত অতএব অভ্রান্ত, শাস্ত্রকারদের অনুশাসন উদ্ধার করে সকল তর্কের মীমাংসা করা রূপ স্কলাসটিসিসম্ বা পণ্ডিতম্মন্যতা থেকে বিজ্ঞান বহু শতাব্দী আগেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। মার্কস যখন বলেছিলেন, "আমি মার্কসপন্থী নই", তখন তিনি এই বলতে চেয়েছিলেন যে কোন একটি বিশেষ মতকেই চরম, সম্পূর্ণ এবং অপ্রতিরোধ্য বলে মানতে তিনি প্রস্তুত নন। রোজা লুক্সেমবুর্গ গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে লিখে গেছেন "মার্কসবাদ সাময়িক সত্যতা দাবি করে, আগাগোড়া

ডায়ালেক্‌টিকের উপর স্থাপিত হওয়াতে, ও মত নিজের বিনাশের বীজ নিজের মধ্যেই বহন করে।" দুঃখের বিষয়, সকল অন্ধ বিশ্বাসীরাই যে পদ্ধতি অনুসরণ করে. মার্ক্‌সপন্থীরাও সেই পথ অনুসরণ ক'রে যারা তাদের মতে বিশ্বাসী নয় তাদের বিশ্বাসঘাতক বলে নিন্দা করে। ফ্যাসিস্টদের কাছে সমভোগবাদীরা অভিশপ্ত ধর্মদ্রোহী, আর সমভোগবাদীদের কাছে ধনিকরা শয়তানের অনুচর। আমরা সবাই দেবদূত আর আমাদের বিরোধীরা শয়তান। তুমি যদি আমার মত, যাকে আমি সত্য বলে জানি, তাতে বিশ্বাসী না হও তো তোমার আনুগত্য ও বাধ্যতা, তোমার সাহস ও সততা. তোমার অনুরাগ ও উন্নত মন সবই দূষ্য। আমরা পরিত্রাণ পেলুম, তোমরা ধ্বংস হলে। সন্দেহ করা বা তর্ক করা একটা ভীষণ অপরাধ, যার জন্য অপরাধী-শিবিরের উৎপীড়নই উপযুক্ত শাস্তি।

মার্কস্‌বাদকে অন্যতম ধর্মবিশ্বাস মনে করার দরকার নেই। আমরা বিজ্ঞানসেবীর স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা ও বিনয়ের মনোভাব নিয়ে এই মতবাদ বিচার করব। মার্কস-পন্থীদের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী মানুষের সত্যকার পূরণের পক্ষে এবং বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যা দ্বারা উৎপাদনের প্রয়োজন মিটানোর পক্ষে বেশী কার্যকরী। সমাজতন্ত্রের দাবি নৈতিক দাবি কিন্তু সে দাবি বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রয়োজনীয় বলে মনে করার জন্য যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে দ্বান্দ্বিক জড়বাদ প্রকল্প ইতিহাসের ধারার ব্যাখ্যা হিসাবে অধিকতর তৃপ্তিকর। মূল্য সম্বন্ধীয় ধারণা, যা ধনিকেরা কিভাবে শ্রমিকদের শোষণ করে তার বর্ণনা দিয়েছে, দ্বান্দ্বিক জড়বাদ, ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা, প্রগতির শ্রেণীগত ব্যাখ্যা এবং শ্রমিকদের অধিকারলাভের প্রণালী হিসাবে বিপ্লবের সমর্থন মার্কসীয় মতবাদের মূলকথা।

শ্রমিকেরা যে উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি করছে এবং বুর্জোয়ারা যা হরণ করছে ভূমিহীন শ্রমিকের কাছে তাই হল ধনতান্ত্রিকের লাভ বা মুনাফা। কিন্তু ধনিকের ধারণা, মুনাফা তাদের সাংগঠনিক দক্ষতা ও ঝুঁকি নেবার যোগ্য পুরস্কার। আমি মার্কসের মূল্য সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের আলোচনা করার যোগ্য নই, তবে সিদ্ধান্তটি সকল সমালোচনায় উত্তীর্ণ হয়নি। যাঁরা মার্কসীয় দর্শনের অনুরাগী তাঁরাও বলেন যে ঐ সিদ্ধান্ত তথ্যের সঙ্গে খাপ খায় না ও নিজের মধ্যেও অসঙ্গতি-বর্জিত নয়।[১]

মার্কস্‌ হেগেলের কাছে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির জন্য ঋণী। তাঁর মতে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে জড়বস্তুর ক্রমপ্রকাশই হল বিশ্বজাগতিক অভিব্যক্তি। মার্কস্‌ জড়বাদী অধিবিদ্যায় বিশ্বাসী এবং দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রয়োগকর্তা। মার্কস্‌ জড়বাদী অধিবিদ্যার কোন প্রমাণ দেননি। তিনি ইতিহাসের জড়বাদী ধারণার কথা বলেছেন অথবা সামাজিক ঘটনাবলীর অর্থনৈতিক কারণের উল্লেখ করেছেন এবং মনে করেছেন ও দুটি জড়বাদী অধিবিদ্যারই ফল, কিন্তু বাস্তবিক ওদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই।[২]

---

১ এইচ. জে, লাস্কি "কার্ল মার্ক্‌স", (১৯৩৪) ২৭ পৃঃ

২ বার্টরাণ্ড রাসেল বলেন, "তাঁর অধিবিদ্যা মিথ্যা হলেও তাঁর অর্থনৈতিক বিকাশের মতবাদ সত্য হতে পারে, আবার অধিবিদ্যা সত্য হলেও অর্থনৈতিক মতবাদ মিথ্যা হতে বাধা নেই

মার্কস্ তাঁর "ফয়েরবাকের উপর একাদশ সন্দর্ভে" বলেছেন, "ফয়েরবাক সমেত আগেকার সমস্ত জড়বাদের প্রধান ত্রুটি হল যে তারা বিষয় (Gegenstand), সত্তা, সংবেদন শুধু বিষয় (object) অথবা অনুধ্যানের আকারে বোঝবার চেষ্টা করেছে, মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কার্য বা ব্যবহারের আকারে নয়, আত্মমুখী ভাবে নয়।" এইজন্যই জড়বাদের সঙ্গে বিরোধে ভাববাদের সক্রিয় দিকটাকেই বড় করে তোলা হয়েছে। অর্থাৎ অন্য ধরনের জড়বাদে জড়ের ধারণার সঙ্গে সংবেদনের ধারণা জড়িয়ে রইল। জড়বস্তুকে সংবেদনের যুগপৎ কারণ ও বিষয় বলে ধরা হল এবং সংবেদনকে একটা নিষ্ক্রিয় বস্তু বলে ধরা হল যা দিয়ে মন বহির্জগতের ছাপ পেতে পারে। কিন্তু ছাপকে নিষ্ক্রিয় ভাবে গ্রহণ করার কথা উঠতেই পারে না। জড়বস্তু মনকে সক্রিয় করে এবং আমরা যে জড়বস্তু প্রত্যক্ষ করি তা মানুষের সৃষ্টি। এমন কি খুব সরলতম সংবেদনেও মন সক্রিয়। আমরা শুধু যে প্রতিবেশকে প্রতিফলিত করি তাই নয়, তাকে পরিবর্তিত করি। কোন জিনিসকে জানতে হলে তার একটা ছাপ গ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়, তাকে নিয়ে সফল ক্রিয়া করতে পারা চাই। সর্বপ্রকার সত্যের প্রমাণ হল ব্যবহারিক। যেহেতু আমরা যখন কোন বিষয় নিয়ে কাজ করি তখন তাকে পরিবর্তিত করি, তাই সত্যের মধ্যে অনড় কিছু থাকতে পারে না। সত্য ক্রমাগত বদলাচ্ছে ও বিকশিত হচ্ছে। এখন যেটা সত্যের প্রায়োগিক রূপ নামে খ্যাত, মার্কস্ সেইটে গ্রহণ করেছেন। তিনি জ্ঞানকে বস্তুর উপর ক্রিয়া বলে মনে করেন, এটা জড়শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন রূপে ব্যাখ্যাত কর্ম। কিন্তু জ্ঞানের নিজস্ব মূল্য আছে। মানুষ জানতে চায়, জড়বস্তুর উপর শুধু আধিপত্য করবার জন্য নয়। জানার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা সম্পূর্ণতা আছে। নিশ্চিত ও সম্পূর্ণ জ্ঞানের মধ্যে আমাদের জ্ঞানীয় সত্তার গভীরতম আকূতি তৃপ্তিলাভ করে।

মার্কস তাঁর জড়বাদকে দ্বান্দ্বিক বলে উল্লেখ করেন কেননা তার মধ্যে প্রগতিশীল পরিবর্তনের মূল তত্ত্ব নিহিত আছে। তাঁর মতকে জড়বাদী বলার কারণ এ নয় যে তিনি জড়কে মনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন বা মনকে জড়বস্তুরই অনুমিত গুণ ছাড়া আর কোন অস্তিত্ব আরোপ করতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মত জড়বাদ, কারণ তিনি মনে করেন, ভাবগুলি বস্তুর উপর ক্রিয়ার দ্বারা, তাদের আকার ও শক্তিকে পরিবর্তিত করে ইতিহাসকে প্রভাবান্বিত করে। যে সব জড়বস্তুকে মার্কস্ সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান নিয়ামক বলে মনে করেন তারা নৈসর্গিক বস্তুমাত্র নয়, তারা মানসিক ক্রিয়ার ছাপযুক্ত মানবিক উৎপাদন। তারা শুধু নৈসর্গিক বিষয় নয়, মানবমনের শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত বিষয়। তারা শুধুমাত্র কয়লা, জল বা বিদ্যুৎ নয়, কিভাবে এইসব নৈসর্গিক শক্তিকে মানবীয় উদ্দেশ্যসাধনে লাগানো যায় তারই জ্ঞান। যখন বলা হয় যে উৎপাদনী শক্তির বিকাশই ইতিহাসের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে, তখন আমাদের বোঝা উচিত যে এই উৎপাদনী শক্তিসমূহ

এবং হেগেলের প্রভাবে না পড়লে একথা তাঁর কখনও মনেই হত না যে এমন একটা শুদ্ধ প্রায়োগিক ব্যাপারের ভিত্তি বিমূর্ত অধিবিদ্যার মধ্যে থাকতে পারে।" Freedom and Organisation (১৯৩৪), ২২০ পৃঃ

শুধু জমির উর্বরতা, ধাতব ধর্ম সৌর উত্তাপ, বাষ্পশক্তি বা বিদ্যুৎপ্রবাহের মত নৈসর্গিক শক্তিই নয়, মানবমনের শক্তিও বটে। মার্ক্স উৎপাদনী প্রক্রিয়া সমূহ থেকে মানুষের বুদ্ধিকে বাদ দিতে বাধ্য হয়েছেন, কেননা সেটা ভাবসংক্রান্ত, অতএব তাঁর মতে আসলে গৌণ ব্যাপার। অথচ উৎপাদনী প্রক্রিয়াগুলি বহু শতাব্দী ধরে রয়েছে, তারা উৎপাদনের কাজে তখনই লাগল যখন মানুষের বুদ্ধি তাকে আবিষ্কার করে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রয়োগ করলে। বর্তমানেও কোন অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক শক্তি থাকতে পারে যা জানার অপেক্ষায় ও অজ্ঞাত উদ্দেশ্যের ব্যবহারের প্রতীক্ষায় রয়েছে। যন্ত্রের ব্যবহার, পশুদের পোষ মানানো, কৃষিকর্ম থেকে আরম্ভ করে বাষ্প ও বিদ্যুতের ব্যবহার পর্যন্ত উৎপাদনী শক্তির আবিষ্কার ও ব্যবহার সবই মানুষের মন, কল্পনা ও উদ্দেশ্যের ক্রিয়া। উৎপাদনী উপাদানগুলি নিজে নিজে বিকশিত হয় না। যদিও মার্ক্স কখনও বাস্তব উপাদানকেই উৎপাদনী শক্তি বলে ধরেছেন, মানসিক উপাদানকে বাস্তবের বহিরঙ্গের প্রতিফলন বলে মনে করেছেন যেন তারা অর্থনৈতিক আন্দোলনের ছায়া মাত্র, তবু তার আসল উদ্দেশ্য হল উৎপাদনী শক্তির প্রকৃতির মধ্যে উভয় রকমের উপাদানকেই অঙ্গীভূত করা। যেমন যন্ত্র তৈরী মানুষের বুদ্ধিজীবনেরই অংশ।

হেগেলের ভাববাদের সঙ্গে পার্থক্য দেখাবার জন্য মার্ক্স নিজের মতবাদকে "জড়বাদ" নাম দিয়েছেন। হেগেলের মতে পার্থিব ঘটনাপুঞ্জ শুদ্ধ ভাবজগতের ছায়া মাত্র। কিন্তু মার্ক্স বলেন যে মন ও প্রকৃতি শরীরী বস্তু, ভাবের অশরীরী প্রতিফলন নয়। তাছাড়া, হেগেলের কাছে পরিবর্তন শুধু দৃষ্টিবিভ্রম, অথচ মার্ক্সের মতে পরিবর্তনই আসল সত্য। যে সব জিনিস আমরা দেখি, অনুভব করি, যাদের জানতে পারি তারাই আসল, আর তারা অনবরত বদলে যাচ্ছে নিজগুণে, কোন পরমের ক্রিয়া বা ইচ্ছার ফলে নয়। মার্ক্স প্রায়োগিক মন ও বস্তুর সমন্বয় বিশ্বাসী, অথচ হেগেলের মতে ওগুলি পরমের মধ্যে নিমজ্জিত। ফয়েরবাকের উপর তৃতীয় সন্দর্ভে মার্ক্স স্থূল জড়বাদকে অস্বীকার করেছেন। "মানুষ অবস্থা ও শিক্ষা দ্বারা গঠিত অতএব পরিবর্তিত মানুষ অন্য অবস্থা ও পরিবর্তিত শিক্ষায় গঠিত, এই মতবাদ উপস্থাপিত করবার সময় জড়বাদীরা ভুলে যান যে অবস্থাকে মানুষই পরিবর্তন করে এবং শিক্ষকও নিজেকে শিক্ষিত করে।" মার্ক্স সামাজিক পরিবর্তনকে প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষের বুদ্ধির সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল বলে মনে করেন।

মার্ক্সের মতে জড়ই বিশ্বের আদিম উপাদান, কিন্তু নাম দিয়ে আমরা যেন বিভ্রান্ত না হই। কঠিন, অনড়, অচেতন জড় কখনও সত্তার মূল তত্ত্ব হতে পারে না। মূল তত্ত্বের প্রকৃতি হচ্ছে চেতনা, স্বয়ংক্রিয় গতি। জড়কে স্বয়ংক্রিয়, নিত্য গতিবিশিষ্ট এবং স্বতঃস্ফূর্ত বলে ব্যাখ্যা করা মানেই জড়ের মধ্যে জড় নয় এমন প্রাণ ও চৈতন্য আরোপ করা। দ্বান্দ্বিক জড়বাদে জড় মনের বিপরীত নয়। তার মধ্যে শুধু যে মনের শক্তি ও সম্ভাবনাই নিহিত আছে তাই নয়, প্রকৃতিতেও তারা এক। যাকে সে চালনা করছে তারই অংশ। তার মূল ও অনিবার্য প্রকাশ হল দ্বান্দ্বিক বিকাশ। সত্তার যদি একটা অন্তর্লীন ধাঁচ থাকে, জড়ের মধ্যে যদি জীবন ও মন সৃষ্টি

করার ঝোঁক থাকে, তাহলে জড় বললে যা বোঝা যায়, তা নিশ্চয়ই আদিম উপাদান নয়।

বিশ্বপ্রকৃতির সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত দেওয়া মার্কসের ততটা উদ্দেশ্য নয় যতটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বোঝবার সূত্র ধরিয়ে দেওয়া। পরমাণুর বিশ্লেষণ বা গ্রহের জন্মকথা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাননি। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছেন আর ইতিহাসের সঙ্গে প্রাকৃতিক ঘটনার তফাৎ এই যে ইতিহাস মানুষের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আলোচনা করে। প্রকৃতিতে অচেতন অন্ধ শক্তিসমূহের লীলা প্রত্যক্ষ করা যায়। ইচ্ছা-প্রণোদিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে না। মানুষের ব্যবহারে আমরা ভাব খুঁজি, বিশেষ বিশেষ পরিণতি ইচ্ছা করি, কিন্তু ফল সব সময় আমাদের ভাবনা বা ইচ্ছামত হয় না। প্রাত্যহিক জীবনে মানুষকে যে সব পরস্পরবিরোধী শক্তি চালিত করে তারা এমন অবস্থায় নিয়ে ফেলে যার সঙ্গে তার ঈপ্সিত অবস্থার মিল হয় না। ঐতিহাসিক প্রভাব আকস্মিক নয়। আমরা বলতে পারি না, যে কোন মুহূর্তে যে কোন ঘটনা হতে পারত। আমরা আগেকার সব ব্যাপার হয়ত জানতে পারি না কিন্তু তা হলেও বলব যে কার্য মাত্রের কারণ আছে এবং মানুষের মনোভাবও কারণ সকলের অন্যতম। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া যে সব শক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয় তারা সুদ্ধ ভৌগোলিক বা জৈবিক নয়। জলবায়ু, ভূসংস্থান, মৃত্তিকা বা জাতি এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে কিন্তু তাকে নির্দিষ্ট করে না। মানব-সমাজের পরিবর্তনের তত্ত্ব অন্যপ্রকার।

আমরা যদি বলি, যা বাস্তব তাই যুক্তিসিদ্ধ, তা হলে যা আছে তাকে বজায় রাখলেই চলবে, কাজেই আমরা রক্ষণশীল হব। কিন্তু আমরা যদি বলি যুক্তিসিদ্ধ হলে তবেই তা বাস্তব হয় তা হলে আমাদের প্রয়াস হবে বর্তমান বিধানের মধ্যে যৌক্তিকতার প্রতিষ্ঠা করা, কাজেই আমাদের মনোভাব হবে সংস্কার বা বিপ্লব-প্রবণ। মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গী শেষোক্ত ধরনের। তা পৃথিবীকে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা এবং মানুষের স্বাধীনতার সত্যকার অস্তিত্ব স্বীকার করে। আমাদের ক্রিয়া যদি আমাদের বাইরের কোন জিনিস দিয়ে নির্ধারিত হয়, তাহলে সে আর আমাদের ক্রিয়া থাকে না।

হেগেলের পক্ষে ডায়ালেকটিক্ ন্যায়শাস্ত্রেরই অংশ। ভাবের বিকাশ হয় বিপরীত পক্ষের নিরন্তর বিরোধিতার মধ্যে। প্রত্যেক ভাবই সত্যের একটা দিক দেখায় এবং আমাদের তার বিপরীত ভাবের ইঙ্গিত দেয় এবং সে বিপরীত ভাবও আংশিক সত্য। এই দুইয়ের সংঘর্ষ থেকে নূতন এবং উচ্চতর ভাবের উৎপত্তি হয়, তা থেকে আবার নূতন বিরোধিতা ও সংঘর্ষের জন্ম হয়। এই ভাবেই বাদ, প্রতিবাদ ও সংবাদ চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ও অবিমিশ্র সত্যতে পৌঁছানো যায়। আমরা যদি সত্তার ধারণা নিয়ে শুরু করি তো স্বভাবতই অ-সৎ অর্থাৎ সত্তাহীনতার ধারণা এসে পড়ে। এই দুই ধারণার সংঘর্ষ থেকে এমন একটা নূতন এবং উচ্চতর ধারণা আসে যাতে বিরোধের মীমাংসা হয়। ভব ও অভবের দ্বন্দ্ব থেকে ভূয়মান ভাবের জন্ম হয়। এই নূতন চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে নূতন খণ্ডনের

সৃষ্টি হয়, তাদের মীমাংসা করতে গিয়ে উচ্চতর ভাবের সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়া চলতে চলতে একেবারে শেষে পরম ভাবে পৌঁছায়। হেগেলের মতে এই হল "ভাবের স্বয়ং বিকাশ"। খাঁটি ন্যায়শাস্ত্রসম্মত উপায়ে হেগেল এই পদ্ধতিতে সমগ্র দর্শন, ইতিহাস এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করেছেন। হেগেলের মতে ইতিহাস ক্রমিক আত্মোপলব্ধি বা মনের মূর্তরূপ বোঝায়। সুতরাং এ নিশ্চিতভাবে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বিকশিত হয়।

মার্কস্ কিন্তু ভাব ও তার নিজ বিকাশের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেননি, তিনি এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন সমাজের ঐহিক বিকাশের ক্ষেত্রে। তিনি ঐতিহাসিক অভিব্যক্তিকে তার পরিবর্তন ও পরস্পরবিরোধী প্রবণতা দিয়ে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ঐতিহাসিক বিকাশও সত্য সত্যই বিরোধ-পরম্পরার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। যে কোন ঘটনা সমাবেশ থেকে তার বিরোধী সমাবেশের সৃষ্টি হয় এবং সংঘর্ষ থেকে সমন্বয়জনিত উচ্চতর সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

হেগেল ও মার্কস উভয়েই ঐতিহাসিক অভিব্যক্তিকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিসঞ্জাত বলে মনে করেন। তফাৎ এই যে হেগেলের বিশ্বাস, ইতিহাসের মধ্যে এক বিশ্বচৈতন্য মূর্ত হয়ে উঠছে, পার্থিব ঘটনা তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র, মার্কসের মত হল যে ঐতিহাসিক ঘটনাই হল আসল, সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হল গৌণ। "ক্যাপিটাল" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে, মার্কস জড়বাদী দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ও ভাববাদী দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির পার্থক্যের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি যে হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি থেকে মূলতঃ পৃথক তাই নয়, আমার পদ্ধতি ওর সম্পূর্ণ বিপরীত। হেগেলের মতে চিন্তা প্রক্রিয়া (যাকে তিনি একটা স্বাধীন সত্তায় পরিবর্তিত করে তার নাম দিয়েছেন ভাব) বাস্তবের স্রষ্টা, তার মতে বাস্তব হল ভাবের বাহিরের মূর্তি। অপর পক্ষে, আমার মত হল জড়ই মানুষের মস্তিষ্কে ব্যাখ্যাত ও পরিবর্তিত হয়ে ভাব হয়ে প্রকাশ পায়। যদিও হেগেলের হাতে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি রহস্যায়িত হয়েছে, তবু একথা মানতেই হবে যে তিনি প্রথমে এর গতির সাধারণ আকারগুলি সমগ্রভাবে এবং সম্পূর্ণ সচেতনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। হেগেলের লেখায় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বিপরীত ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। "ওর রহস্যময় আবরণের মধ্যে যুক্তির শাঁস আছে তাকে আবিষ্কার যদি করতে চাও তো ওকে সোজা করে দাঁড় করাতে হবে।"[১] হেগেল ভাববিকাশকে ন্যায়সঙ্গত ও কালাতীত আবশ্যিক পরম্পরারূপে দেখিয়েছেন এবং ঐহিক কাঠামোর পরম্পরাকে আকৃতি মাত্রতে পর্যবসিত করেছেন। হেগেল দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির যে সব সূত্র দিয়েছেন সবই মার্কস মেনে নিয়েছেন। ভাবের স্থলে জড়কে বসানোতে দার্শনিক ভাববাদের জায়গায় বৈপ্লবিক বিজ্ঞান এসে বসেছে। মার্কস ও হেগেল উভয়েরই মতে ঐতিহাসিক বিকাশ ন্যায়শাস্ত্রসম্মত ও সুযৌক্তিক। হেগেল মনকেই চরম সত্তা বলে গ্রহণ করায়

১ মার্কস কুগেলমানকে লেখেন, "হেগেলের ডায়ালেক্টিক সমস্ত ডায়ালেক্টিকের মূল তত্ত্ব, কেবল তার রহস্যময় খোসাটাকে ছেঁটে ফেলতে হবে। এবং আমার পদ্ধতির ঠিক সেইটুকুই বৈশিষ্ট্য।"

ইতিহাসের এই ব্যাখ্যা সঙ্গতভাবেই দিতে পেরেছেন। কিন্তু মার্কসের কাছে জড়ই চরম সত্তা এবং জগৎ কোন তর্কশাস্ত্রের সূত্র ধরে চলেছে একথা জড়বাদীর পক্ষে চিন্তা করা দুরূহ।

মার্ক্সবাদীরা ধরে নেয় যে বহির্জগৎ ঠিক যে দিকে গেলে তারা খুশী হয় সেই দিকেই অবশ্যম্ভাবী ভাবে যাচ্ছে। তাদের মতে পৃথিবীটা সমভোগবাদী সমাজ তৈরী করার দিকে চলেছে। এরকম সমাজের আবশ্যকতা ঐতিহাসিক। সে পরিণতি জড় বিশ্বেরই অবদান বলে মনে হয়। মার্ক্স লিখছেন, "শ্রমিক শ্রেণীর কোন আদর্শের সাধনা করার নেই, তাদের শুধু নূতন সমাজের উপাদানগুলিকে মুক্ত করতে হবে।" ধনিকতন্ত্রের সূত্রগুলি "অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে দুর্নিবার ভাবে চলেছে।" এঙ্গেলস্ লিখছেন, "একটি গাণিতিক প্রতিজ্ঞা থেকে যেমন নিশ্চিত ভাবে আর একটি নূতন প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করা যায়, আমরা ঠিক তেমনি নিশ্চিতভাবে বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি ও অর্থবিদ্যার সূত্রগুলি থেকে সামাজিক বিপ্লবকে প্রমাণ করতে পারি।" তথ্য এবং আদর্শ, সত্তা ও শ্রেয়কে অভিন্ন বলে মনে করা বিজ্ঞানসম্মত নয়। এ একটা প্রকল্প মাত্র, বিশ্বাসের বস্তু। আমরা কেন ধরে নেব যে জগতের শক্তি সব আমাদের বাসনার পোষকতা করছে? "দার্শনিক ছদ্মবেশী পুরোহিত মাত্র।"—ফয়েরবাকের এই কথাটি মার্ক্স বার বার বলতে ভালোবাসেন। অথচ মার্কস যখন ঘোষণা করছেন যে জগতের বুনটের মধ্যে মানবসমাজের আদর্শ গাঁথা রয়েছে তখন তিনি দার্শনিকতাই করছেন। এটা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর লক্ষণ।

যদিও মার্কস্ মনে করেন যে তাঁর মত বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত, দূরকল্পনা-প্রসূত নয়, তবু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে তাঁর ব্যাখ্যা তাঁর বিশিষ্ট মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। যখন তিনি বলেন যে মনুষ্যসমাজের অভিব্যক্তি সামন্ততন্ত্র থেকে ধনিকতন্ত্রে, আবার ধনিকতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে চলেছে তখন তিনি এমন সব কথা বলেন যার মধ্যে বিপুলসংখ্যক তথ্যের বর্ণনা মিশে রয়েছে। সুনির্বাচিত ঘটনাপুঞ্জ দিয়ে একটা ঐতিহাসিক যুগকে নির্দেশ করা যায় ও তার প্রবণতা এদিকে কি ওদিকে তারও সূচনা দেওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্যের যুগও বলা যায়, অথবা শিল্পপ্রধান যুগ, সাম্রাজ্যবাদের যুগ, জাতীয়তার যুগ, উদারপন্থার যুগ, কোনটা বলব সেটা যখন যে ধারাকে জোর দিতে চাই বা যেটাকে ব্যক্তিগত ভাবে আমরা বেশী গুরুত্ব দিই তার উপর নির্ভর করে। বিংশ শতাব্দীর কতকগুলি ঘটনাকে বড় করে দেখিয়ে তাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিপরীত বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, আবার ঝোঁকটা অন্য কতকগুলি ঘটনার উপর দিয়ে এও সাব্যস্ত করতে পারি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ধারাই বিংশ শতাব্দীতে অব্যাহত রয়েছে। এ সব বেশ চিত্তাকর্ষক কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে সত্য নয়। ইতিহাস কতকগুলি ঘটনার বর্ণনা নয়, ঘটনাগুলিকে কিভাবে দেখি তাই ইতিহাস। কাজেই তার মধ্যে নির্বাচন ও ব্যাখ্যা দুইই এসে পড়ে। তবু লর্ড অ্যাকটনের কথায় ঐতিহাসিক তথ্য ও ঐতিহাসিক চিন্তার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকা চাই। মার্ক্সবাদীরা প্রাচীন কালকে ক্রীতদাস অর্থনীতির সঙ্গে, মধ্যযুগকে

ক্রীতদাস অর্থনীতি সঙ্গে, বর্তমান যুগকে ধনিকতন্ত্রের সঙ্গে আর আগামী যুগকে "উৎপাদনের উপাদানকে জাতীয়করণের" সঙ্গে এক করে দেখছেন। কিন্তু এই পরিষ্কার বিভাগ সব দেশে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। হেগেলও ইতিহাসের এই রকম ব্যাখ্যা করে কতকগুলি মনগড়া বৈশিষ্ট্যের কথা তুলেছেন। এক বিবৃতিতে গ্রীসকে "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে", রোমকে রাষ্ট্রের সঙ্গে, আর রোমীয় জগৎকে "ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের মিলনের" সঙ্গে এক করে দেখিয়েছেন। অন্য এক বিবৃতিতে প্রাচ্যকে "অনন্তে"র সঙ্গে, গ্রীক-রোমান যুগকে "সান্তে"র সঙ্গে আর খ্রীষ্টীয় যুগকে "অনন্ত ও সান্তের সমন্বয়ে"র সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কিন্তু ইতিহাস কোন বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলে না। ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি সব সময়েই বিসংবাদ পরম্পরার পথ ধরে চলে না। তার বিকাশ হয় বিভিন্ন গতিতে, বহুবিধ ভঙ্গীতে, কখনও এক অবস্থা থেকে উল্টো অবস্থায় আবার কখনও অটুট ধারায়। মার্ক্স যখন বলেন "বিসংবাদ ছাড়া প্রগতি হয় না, এই সূত্র আজ অবধি সভ্যতা মেনে এসেছে" তখন তাকে যুক্তি-নিরপেক্ষ প্রস্তাব মাত্র বলব। মার্ক্স বলেন যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে যেতে হলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধিপত্য ও ধনিকতন্ত্র স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অথচ রাশিয়ায় যখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে দেশ সামন্ততান্ত্রিক সমাজের স্তরে ছিল, ধনিকতন্ত্রী স্তরে ছিল না।

প্রগতির অনিবার্যতায় মার্ক্সের বিশ্বাস আছে। সমাজ এগিয়েই চলেছে। প্রত্যেক পরবর্তী অবস্থা প্রগতি সূচনা করে এবং পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে সুযৌক্তিক আদর্শের নিকটতর হয়। সুযৌক্তিক আদর্শ হল স্বাধীন সমাজ। সে সমাজে প্রভুত্ব থাকবে না, ক্রীতদাসও থাকবে না, ধনীও থাকবে না, দরিদ্রও থাকবে না। সে সমাজে পণ্যদ্রব্য বিশেষ ব্যক্তির খেয়াল মাফিক না হয়ে সামাজিক চাহিদার তাগিদে উৎপন্ন হবে এবং উৎপন্ন দ্রব্য ন্যায়সম্মতভাবে বিতরিত হবে। ইতিহাসের নিজস্ব গতিতেই এসব ঘটনা ঘটবে, আমরা তাকে সাহায্যও করতে পারব না, বাধাও দিতে পারব না। কিন্তু ইতিহাসে ধ্বংস হওয়ার ও পিছিয়ে যাওয়ার বহু উদাহরণ আছে এবং ইতিহাস সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে চলছে এ কথাও বলা চলে না। মানুষের প্রগতি অনিবার্য এ কথারও নিশ্চয়তা নেই। সে রকম বললে অন্ধ বিশ্বাসে বিশ্বাস করতে হয়। ব্যক্তির জীবনেই হোক আর সমাজের জীবনেই হোক, কোন সঠিক মুহূর্তে নূতন যুগ তার পূর্বনির্দিষ্ট দ্বন্দ্ব নিয়ে আরম্ভ হবে সেটা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ক্রমবর্ধমান। ইতিহাস নিত্য প্রবাহিত বলে তার আদিও কেউ জানে না, অন্তও জানে না। মার্ক্সীয় তত্ত্ব আরোহী পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নয়, অবরোহী সিদ্ধান্ত। মার্ক্স হেগেলের যুক্তিকে নিজের জড়বাদী অভিমতের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন।

আমাদের শ্রেণীসংগ্রাম বর্জন করা উচিত, বলপ্রয়োগ না করা উচিত, মানুষের ভালমন্দ জ্ঞান ও সামাজিক সংহতিকে উদ্বুদ্ধ করা উচিত ইত্যাদি উদারনৈতিক মতের মার্ক্স নিন্দা করেন। তিনি বলেন, এই সব মতের ভিত্তি হল এই যে, ধনিকশ্রেণীকে যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রভাবান্বিত করা যায়। কিন্তু এ ধারণা ভুল। যে

আর্থিক পরিস্থিতিতে আমরা বাস করি তাই দিয়েই আমাদের উদ্দেশ্য গঠিত হয়। ধনিকদের সঙ্গে সংগ্রাম আমরা ইচ্ছা না থাকলেও করতে বাধ্য হব।

হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির ত্রুটি মার্কসের ব্যাখ্যাতেও থেকে গেছে। হেগেলের মতে, দ্বন্দ্ব বা বিরোধই মূল তত্ত্ব এবং সমস্ত প্রগতির ভিত্তি। এই মতবাদ বিকশিত করতে গিয়ে হেগেল বিপরীত ও বিভিন্নের মধ্যে গোলযোগ করে ফেলেছেন। ক্রোচে এই কথাটা তাঁর বই 'What is Living and what is Dead in the philosophy of Hegel'[১]-এ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আলো আর অন্ধকার পরস্পরের অভাব সূচনা করে। তারা বিসংবাদী। একটা থাকলে আর একটা থাকে না। বিপরীত বস্তুরা পরস্পরকে বাতিল করে। কিন্তু স্বতন্ত্র বস্তুরা, যেমন সত্য ও সৌন্দর্য, দর্শন ও কারুকলা, এরা একটা আর একটাকে বাতিল করে দেয় না। সীমার ধারণা থেকে নৈতির ধারণা স্বতন্ত্র। নৈতি প্রকৃতির একমাত্র রূপ নয়। অর্থনৈতিক উপাদান যদি ঐতিহাসিক অভিব্যক্তিকে প্রভাবিত করে, তাহলেই যে অন্য উপাদান এই অভিব্যক্তিতে কাজ করবে না, এ ধারণা যুক্তিযুক্ত নয়। অর্থনৈতিক অবশ্যম্ভাবিতা এবং ধর্মীয় ভাববাদ পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় ইতিহাসের ভবিষ্যৎ গড়তে পারে।

মার্কস ইঙ্গিত করেছেন যে বিরোধপরম্পরার মধ্য দিয়ে সমাজবিকাশ ততক্ষণ চলতে থাকবে যতক্ষণ সমস্ত মানবসংসার সমভোগবাদী না হয়ে যায়। সর্বজাগতিক সমভোগবাদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিজাত অভিব্যক্তি শেষ হয়ে যাবে। হেগেল তাঁর ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ প্রুশীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল বলে মনে করেছেন। কারণ, তিনি প্রুশীয় রাষ্ট্রের মধ্যে পরম ভাবের নিখুঁত প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলেন। মার্কস কিন্তু বলেন, রাষ্ট্রীয় অভিব্যক্তি এখানেই শেষ হতে পারে না। রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্য দিয়ে সামাজিক অভিব্যক্তি তখনই শেষ হবে যখন সমাজব্যবস্থায় শ্রেণী ও শ্রেণীবিরোধ অন্তর্হিত হবে। হেগেল যে ধরে নিয়েছিলেন, প্রুশীয় রাষ্ট্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রকম দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ শেষ হয়ে যাবে, তার জন্য মার্কস তাঁর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু মার্কস কি হেগেলের সমালোচনা এই জন্য করেছেন যে, হেগেলের প্রুশীয় রাষ্ট্রে না হোক তাঁর নিজস্ব সমভোগবাদী সমাজের মধ্যে ইতিহাসের পথ ফুরিয়ে যাবে? জড়শক্তির নিরন্তর লীলার মধ্যেই যদি মানবসমাজের অভিব্যক্তি নিহিত থাকে, সংঘর্ষ ও শ্রেণীসংগ্রাম পরম্পরার মধ্য দিয়ে ধনিকতন্ত্রের শেষ হয়ে যদি শ্রেণীহীন সর্বসম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয় তো এই নূতন সমাজই বা জড়শক্তি নির্ধারিত ডায়ালেকটিকস্ সঞ্জাত প্রগতির বিধি থেকে নিস্তার পাবে কেন? যদি নিস্তার না পায় তো নূতন বিরোধ কি আবার দেখা দেবে? অথবা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় জড়জগতের অন্তর্লীন নিয়ম আর খাটবে না এবং প্রকাশমান অভিব্যক্তির এক অজ্ঞাত প্রণালী থেকে নূতন বিধানের উৎপত্তি হবে? ডায়ালেকটিক যদি মূলতঃ বিপ্লবীপন্থী হয় তো শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা হলেই বা তা থামবে কেন?

---

১ ইংরাজী অনুবাদ (১৯১৫)

আর যদি শ্রেণীসংঘর্ষ শেষ হবার পরেও অভিব্যক্তির সম্ভাবনা থাকে তবে শ্রেণীসংঘর্ষ ছাড়াও প্রগতির অন্য কারণ নিশ্চয়ই আছে। মার্কস স্বীকার করেছেন যে সমভোগবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার পরও সামাজিক অভিব্যক্তির স্থান থাকবে। তাহলে সমাজজীবনের কি সংঘর্ষ তাকে চালনা করবে? সমভোগী সমাজেও ডায়ালেক্‌টিক্‌ তত্ত্ব কাজ করবে, যদিও তার ক্রিয়াপদ্ধতির খুঁটিনাটি বর্ণনা আমরা দিতে পারি না; আমরা ধরে নিতে পারি যে প্রগতি বৈপ্লবিক ও সমাজবিরোধী পথ না ধরে অভিব্যক্তি ও সহযোগিতার পথ ধরে চলবে। আর্থিক সমস্যাজনিত আত্মবিকাশের বাধাগুলি দূর হবে, আর সৃষ্টিধর্মী ব্যক্তিত্ব উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ পাবে। ভয় ও ঘৃণা, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও স্বার্থসিদ্ধির বদলে প্রীতি ও সৌহার্দ্য, সাহস ও অজানাকে আয়ত্ত করার প্রয়াস প্রাধান্যলাভ করবে। দুঃখকষ্ট থাকবে, কিন্তু থাকবে উচ্চতর স্তরে। মানুষকে অসুখী করে বলে নয়, তাকে অমানুষ করে বলে বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থা অন্যায়। মানুষের লক্ষ্য সুখ নয়, গৌরব ও মর্যাদা লাভই তার উদ্দেশ্য।[১] ইতিহাসে ডায়ালেক্‌টিকীয় গতিবাদের মধ্যে এইটুকু সত্য আছে যে বিসম্বাদী মত ও স্বার্থের সংঘাত ও আলোচনা থেকে তত্ত্বীয় ক্ষেত্রে নব জ্ঞান ও ব্যবহারিক জগতে নূতন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হবে, কেননা সমগ্র প্রকৃতিই সমন্বয়ের প্রয়াসী। মতবিরোধের মীমাংসা না করে তার শান্তি নেই।

ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা অনুসারে অর্থনৈতিক ঘটনা, বিশেষ করে অর্থ উৎপাদনই আসল, আর আমরা যাকে সংস্কৃতি, ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি, সামাজিক এবং মননশীল জীবন বলি তা সবই উৎপাদন প্রণালী দিয়ে নির্ধারিত হয় এবং তারই প্রত্যক্ষ ফল। উৎপাদনব্যবস্থাই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং তাই সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও মননশীল জীবনের বাস্তব ভিত্তি। যখন নূতন শক্তি বা নূতন প্রায়োগিক উদ্ভাবনার দ্বারা উৎপাদন প্রণালীর পরিবর্তন হয় তখন উৎপাদন ব্যবস্থাও বদলায়। তারা তখন সম্পত্তি, শক্তি ও মত-রূপে ভাবের উপরতলা সৃষ্টি করে। এইসব কারণে উৎপাদন ব্যবস্থার নবীকরণ হয়, এইভাবে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সামাজিক প্রগতি সাধিত হয়। যখন সমকালীন উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে উৎপাদনের জড়শক্তির বিরোধ হয়, তখনই সংকটের সৃষ্টি হয়। এই তত্ত্বটি সারল্যের জন্যই বেশ মনে লাগে আর তাছাড়া আর্থিক ঘটনা যে জীবনে ও ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দখল করে আছে এই অতি সত্য কথার জন্য তত্ত্বটির উপর বিশ্বাস আসে। যা ঘটে তার কতকগুলিকে সাবধানে বেছে নিলে এবং আর কতকগুলিকে বাদ দিলে তত্ত্বটিকে যুক্তিযুক্ত ও একমাত্র সিদ্ধান্ত বলে দেখানো যায়। আর্থিক অবস্থার উপর জোর দেওয়াটা ঠিকই, কিন্তু তাকেই ইতিহাসের একমাত্র নিয়ামক বলাটা ভুল।

অ্যারিস্টট্‌ল অনেকদিন আগেই আমাদের শিখিয়ে গেছেন যে আগে আমাদের

১ বেন্থামকে নীৎসের বর্বর আঘাত "মানুষ সুখ ইচ্ছা করে না, শুধু ইংরাজরা করে"— মার্কসের সমর্থন লাভ করত। 'ক্যাপিটালে' মার্কস বলছেন, "বেন্থাম নীরস সারল্যের সঙ্গে বর্তমান দোকানদারকে, বিশেষতঃ ইংরাজ দোকানদারকে স্বাভাবিক মানুষ বলে ধরে নিয়েছেন।"

বাঁচতে হবে, তার পরে ভাল ভাবে বাঁচার প্রশ্ন উঠবে। আমাদের আগে খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই, আশ্রয় চাই। তবেই আমরা ছবি আঁকতে পারব, তাতে রঙ লাগাতে পারব কিংবা মনোরাজ্যে বিচরণ করতে পারব। শুধু বাঁচা ও ভাল ভাবে বাঁচার তফাৎকে মার্কস একটা তত্ত্বে দাঁড় করিয়েছেন। তফাৎটা কি করে হল এঙ্গেল্স তার ব্যাখ্যা করেছেন। "মার্কস এই সরল তথ্যটি আবিষ্কার করলেন (যা এতদিন নানা মতবাদের অরণ্যে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল) যে মানুষের খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, আশ্রয় আগে চাই তবেই তারা রাষ্ট্রনীতি, বিজ্ঞান, রূপকলা, ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে কৌতূহলী হতে পারবে। এর অর্থ এই যে রাষ্ট্রীয় সংবিধান, আইনকানুন ও বিচারপদ্ধতি, নন্দনতাত্ত্বিক এমন কি ধর্ম সম্বন্ধীয় ভাবের ভিত্তি হল একটা জাতি বা যুগের বিশেষ সময়ে তৎকালীন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ এবং তাদের বিকাশের সমসাময়িক অবস্থা। এর অর্থ হল শেষেরগুলি দিয়ে আগেরগুলি ব্যাখ্যা করতে হবে, কিন্তু এতদিন আগের বিষয়গুলি দিয়েই শেষের বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে।" সমস্ত শক্তির মধ্যে উৎপাদনী শক্তিই যে আদি নিয়ামক তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তা বলে আদি উপাদান দিয়ে সব জিনিসের ব্যাখ্যা করা চলে না। অপরিহার্য ঘটনাই কার্যকরী কারণ নয়। পরিবর্তন ঘটানোর কারণের মধ্যে ঐতিহ্য, প্রচার এবং ভাবাদর্শও আছে। মার্কস উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদনী প্রণালীর মধ্যে তফাৎ করেছেন। মানুষের মন সক্রিয় হলে তবেই উৎপাদনী শক্তি প্রণালীবদ্ধ হয়ে ওঠে। সমস্ত নব উদ্ভাবনাই আগে মানুষের মনে ধারণা রূপে দেখা দেয়। শর্ত ও কারণ এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে যে, সূত্রগুলিকে জট ছাড়িয়ে তফাৎ করা খুব দুরূহ। যদি শুধু অর্থনৈতিক শক্তি থেকেই সংস্কৃতি জন্মায় তো মানুষ উদ্দেশ্যহীন হবে আর ইতিহাস ভ্রান্তি হয়ে যাবে। ইতিহাস যদি ঘটনাসমূহের যান্ত্রিক স্রোত না হয়, তো মানুষই ঠিক করবে এবং লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার উপায় নির্ধারণ করবে।

সমাজকে সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখাটা ভুল। অর্থনৈতিক সংগঠনের গুরুত্ব নিঃসন্দেহ কিন্তু তাই সমাজের একমাত্র সত্য নয়। যদিও এঙ্গেলস স্বীকার করেন যে "উপরতলার ভিন্ন ভিন্ন আন্দোলনও ঐতিহাসিক সংঘর্ষের প্রগতিকে প্রভাবান্বিত করে" তবু সে স্বীকৃতিকে নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি আবার ঘোষণা করলেন, "এসব আন্দোলন পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক আন্দোলনকেই অগণিত আকস্মিক ঘটনার উপর প্রাধান্য লাভ করতে হবে।" অন্যঃকারণগুলিকে ধরাছোঁয়ায় পাচ্ছি না বলেই সেগুলির অস্তিত্ব নেই বলে ধরতে পারি না। উৎপাদন ব্যবস্থা একপ্রকার ভাবাদর্শের জন্ম দেয়, আবার তা পরে উৎপাদনের নূতন ব্যবস্থার সৃষ্টি করে এই যে মত, এ তো অনুমান মাত্র। উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তার উপর নির্ভরশীল ভাবাদর্শ পর্যায়ক্রমে কাজ করে না, তারা একসময়েই থাকে এবং একসঙ্গেই ক্রিয়া করে। আবার, এ কথা বলতে পারি না যে ভাবাদর্শ উৎপাদন ব্যবস্থারই ফল, কেননা আমাদের ধর্মীয় ভাবগুলি অর্থনৈতিক অবস্থার ফল নয়। আদিম মানুষ অনুভব করে যে সে সর্বশক্তিমান্ নয়, কতক ঘটনা ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটে এবং কিছু ইচ্ছা-

অনিচ্ছার অপেক্ষা না রেখেই ঘটে। যে জগতে সে বাস করে, তা তার সৃষ্টি নয়। গ্রহণ ও ভূমিকম্প তার সম্মতির অপেক্ষা করে না। সুতরাং সে দেবতায় বিশ্বাস করে এবং যে সব ঘটনা ও ব্যাপারের মানে খুঁজে পায় না, তার দায়িত্ব তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। মানুষের বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছা থেকেই পরকালে বিশ্বাসের উদ্ভব, উৎপাদন পদ্ধতির কোন সম্পর্ক নেই সে বিশ্বাসের সঙ্গে। এঙ্গেলস্ স্বীকার করেছেন যে উৎপাদন পদ্ধতি দ্বারা ধর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় না। তিনি বলেছেন, "ধর্ম আর কিছুই নয়, যে সব বহির্জাগতিক ঘটনা তার প্রাত্যহিক জীবনকে প্রভাবান্বিত করে তারই উৎকট প্রতিফলন। সে প্রতিফলনে জাগতিক শক্তিগুলিই অতিপ্রাকৃত শক্তির মূর্তি গ্রহণ করে। ইতিহাসের শুরুতে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিই এইভাবে প্রতিফলিত হত আর পরের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে তারা বিভিন্ন লোকের মধ্যে বহু বিচিত্র ও বিভিন্ন ব্যক্তি রূপে প্রকাশিত হত।"[১] ধর্মের ক্ষেত্রে যা সত্য অন্য সাংস্কৃতিক সংস্থা সম্বন্ধেও তা সত্য। খুব সীমিত অর্থেই আমরা বলতে পারি যে একটা সমাজের আর্থিক পদ্ধতিই সকল প্রকার আইনকানুনঘটিত, রাষ্ট্রীয় এবং মননপ্রসূত ঘটনাবলীর আসল ভিত্তি। এসব ঘটনা তাকে বাদ দিয়ে হয় না এটা ঠিক। মাটি ছাড়া গাছ জন্মায় না, কিন্তু মাটি গাছের উৎপত্তির কারণ নয়, যদিও মাটির মধ্য থেকেই তাকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। বীজ থাকা চাই এবং অন্য অবস্থায়ও ব্যবস্থা করা চাই। ঠিক সেই রকম ভাবাদর্শের জন্য অর্থনৈতিক সংস্থার প্রয়োজন কিন্তু তা বলে তাদের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা ও থেকে হবে না। জীবন না থাকলে সৎ জীবনের কথা ওঠে না, কিন্তু আমাদের সব শ্রেয় ও প্রেয়র হিসাব শুধু জীবন থেকে পাওয়া যাবে না।

মার্কস স্বীকার করেন যে ইতিহাসে শৃঙ্খলা আছে কিন্ত তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়। এই শৃঙ্খলা নৈর্ব্যক্তিক শক্তি, পরমাত্মা, যান্ত্রিক প্রকৃতি অথবা আর্থিক উৎপাদনের স্বয়ংক্রিয় ঘটনাপ্রসূতও নয়। ইতিহাস মানুষেরাই গড়ে, কোন এ বা ও বিশেষ লোক নয়, মানুষের গোষ্ঠী বা শ্রেণী। শ্রেণীসমূহের ক্রিয়াকলাপ শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিবিশেষদের উদ্দেশ্য থেকে যে বোঝা যাবেই এমন কথা নেই। মহৎ ব্যক্তিরা শ্রেণীদেরই প্রতিনিধি, তাদের কাছ থেকেই নিজেদের মহত্ত্ব সাধন করার সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন। নির্ধারিত ব্যাপার ঘটবার প্রণালী মানসিক প্রয়াস দ্বারাই সিদ্ধ। মার্কস প্রস্তাব করেছেন যে, ঐতিহাসিক পরিবর্তন শ্রেণীসংঘর্ষ থেকেই সৃষ্টি হয়। উৎপাদনী শক্তিসমূহ ইতিহাসের মূল উপাদান আর উৎপাদনী ব্যবস্থা এইসব শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন আকারের বিকাশ, বাকী সব জিনিসই ভাবাদর্শের ওপর নির্ভরশীল। মানুষের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি সাধন করার প্রণালী বা ধরন হল শ্রেণীসংগ্রাম। আমাদের জ্ঞান যত বাড়ছে উৎপাদনী শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও বাড়ছে, আর সেই সঙ্গে উৎপাদনী শক্তিসমূহও অনবরত বিকশিত হচ্ছে এবং তা থেকেই সমাজের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো বদলাচ্ছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বিশেষ শ্রেণীর কর্তৃত্ব মূর্ত হয়ে আছে এবং ঐসব শ্রেণীরা উৎপাদনী শক্তি-

১ Anti-Dühring P. 353-4

সমূহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতঃ তাল রেখে চলতে পারে না। ক্ষমতাধিষ্ঠিত শ্রেণীরা তাদের সুবিধাগুলি আঁকড়ে থাকতে চায়, বিনা বাধায় পরিবর্তনকে বরণ করে নেয় না। উৎপাদনী যন্ত্র মানুষকে পীড়ন করে না, যে সামাজিক অবস্থিতিতে সেই যন্ত্র কাজ করে, তাই পীড়াদায়ক। পরিবর্তিত আর্থিক প্রয়োজন থেকেই রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের দাবী ওঠে এবং যখন প্রভাবশালী শ্রেণীরা রাজনৈতিক পরিবর্তন ঠেকিয়ে রাখতে চায়, তখনই সংঘর্ষ বাধে। পরিবর্তনকারী শক্তিসকল যখন যথেষ্ট শক্তিসঞ্চয় করে তখনই শ্রেণীসংঘর্ষ বৈপ্লবিক স্তরে পৌঁছায়, পুরানো রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি হিংস্র ভাবে চুরমার করে দেয় এবং ভিন্ন শ্রেয় বোধ ও ভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে নূতন পদ্ধতি বিকশিত হয়। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব এইভাবে বোঝানো হয়েছে—"বর্তমান সময় পর্যন্ত সমস্ত সমাজের ইতিহাসই হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস; স্বাধীন মানুষ ও ক্রীতদাস, অভিজাত ও সাধারণ জনতা, জায়গীরদার ও ভূমিদাস, কারিগর সংঘের অধ্যক্ষ ও সাধারণ সদস্য, এক কথায় পীড়ক ও পীড়িত অনবরত পরস্পরের সঙ্গে বিরোধিতার মধ্যে বাস করছে এবং পরস্পরের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করছে। এ যুদ্ধ কখনও প্রচ্ছন্ন থেকেছে কখনও প্রকাশ্য হয়েছে, আর যুদ্ধের ফলস্বরূপ হয় সমগ্র সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে, নয় উভয় শ্রেণীই ধ্বংস হয়েছে।" প্রায় সমস্ত দেশে এবং সমস্ত কালেই শ্রেণীসংগ্রাম ঘটেছে এবং এখন আগের থেকে তার ভূমিকা গুরুতর হয়েছে, কিন্তু ইতিহাস শুধু শ্রেণীসংঘর্ষের বিবরণ নয়। ঘরোয়া যুদ্ধের চেয়ে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের সংখ্যাও বেশী, হিংস্রতাও বেশী আর মানুষের আদিম কালের ইতিহাসে উপজাতি ও নগর পরস্পরকে আক্রমণ করেছে। বর্তমান যুদ্ধেও শ্রেণীচেতনার থেকে জাতীয়তার অনুভূতিই প্রবলতর। ইতিহাসে আগাগোড়াই দেখা গেছে যে শাসক ও শাসিত, ধনী ও নির্ধন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেশের শত্রুর সম্মুখীন হয়েছে। আমাদের দেশের ধনী মনিবদের থেকে আমরা বিদেশী মজুরদের বেশী ঘৃণা করি। ধর্ম নিয়েও যুদ্ধ হয়, যেমন ইউরোপে ধর্মসংস্কারের পক্ষে ও বিপক্ষে যুদ্ধ প্রায় দুই শতাব্দী ধরে চলেছিল। গরীব, বড়লোক, রাজা, চাষা, অভিজাত ও মজুর সকল শ্রেণীর লোক উভয় পক্ষেই ছিল এবং উভয়েই বিপুল উন্মাদনার সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানেও কতিপয় লোক ব্যতিরেকে মার্কসবাদীরা যে দেশের অধিবাসী সেই ধনিকতন্ত্রী দেশের জন্যই যুদ্ধ করছে। আমরা বর্তমান যুদ্ধকে শ্রেণীবোধের বিকৃত আকার বলে ধরে নিতে পারি না। ভারতে হিন্দু-মুসলিমের সংঘর্ষ বা আয়ার্লণ্ডে প্রোটেস্টাণ্ট-ক্যাথলিকের ঝগড়া শ্রেণীসংঘর্ষের প্রকাশ নয়। শ্রেণীসংগ্রাম ও অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ধর্ম ও জাতিকে নিয়ে যুদ্ধও আছে। মানবিক অভিব্যক্তিতে শেষেরগুলির প্রভাবই বেশী।

আবার এ কথাও ঐতিহাসিক সত্য নয় যে, ধনিকতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী ফল যুদ্ধ। এ কথা হয়ত সত্য যে ধনিক সাম্রাজ্যের নূতন নূতন ক্রেতামণ্ডলী দরকার আর তা পাবার জন্য যুদ্ধ করা হয়। কিন্তু ধনিক তন্ত্রের বয়স তো কয়েক শতাব্দী মাত্র, অথচ যুদ্ধ তো সহস্র সহস্র বৎসর আগেও ঘটেছে। এক ভিন্ন প্রকারের সামাজিক ব্যবস্থা সব দেশে কায়েম হইলেই যে পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি আসবে তার

কোন নিশ্চয়তা নেই। সমভোগবাদী রাশিয়া বৈদেশিক আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও যুদ্ধ করে আবার অন্য দেশের ধনিকতন্ত্রের ধ্বংসের জন্যও যুদ্ধ করে। যদি সব দেশে সমভোগবাদের প্রতিষ্ঠা হয়ও তো সমভোগবাদের আসল প্রকৃতি এবং কিভাবে তাকে চালনা করতে হবে এ নিয়ে মতভেদ শুরু হবে।* কোনও একসময়ে মানুষের মধ্যে মতবিরোধ বা স্বার্থসংঘাত একেবারে থাকবে না এ কথা ভাবাই যায় না। মানবিক আচরণের মূল উৎস বহুধা। ভূমিপ্রীতি, শক্তিলালসা, দল বাঁধার প্রবৃত্তিও উচ্চাশা বা সম্পত্তি-লোলুপতার মতই সক্রিয়। যাদের সঙ্গে আমাদের মতে মেলে না বা যারা আমাদের আসক্তি ও বাসনা চরিতার্থ করার পথে বাধাস্বরূপ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রবণতা যতদিন না প্রশমিত করা যাবে, ততদিন যুদ্ধ হতেই থাকবে, সমাজব্যবস্থা যাই হোক না কেন। মানুষের স্বভাব যতদিন না বদলাবে, যতদিন তীব্র মতবিরোধের মীমাংসা সমরাস্ত্র দিয়ে হবে, ততদিন আমাদের আশা যে এমন একদিন আসবে যখন আমাদের বিরোধের মীমাংসা অসিমুখে না হয়ে মানসিক শক্তিপ্রয়োগ করে হবে, তা পূর্ণ হতে পারে না। জাতি, ধর্ম, দেশভক্তিসঞ্জাত শক্তিসকলকে বাদ দিয়ে ইতিহাসকে শুধু কতকগুলি অন্তর্দ্বন্দ্বের পর্যায় বলে দেখা মানবিক অভিব্যক্তির জটিল সমস্যাকে অতি সরল করা। এঙ্গেলস কিছু সতর্কভাবে বাণী উচ্চারণ করেছেন, "তিনি ও মার্কস্ সময় সময় তর্কের ঝোঁকে কোন কোন বিবরণকে অতিরঞ্জিত করেছেন। তাঁরা এ কথা কখনও চিন্তা করেন নি যে তাঁদের সূত্র দিয়ে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে, তা যদি হত তো ঐতিহাসিক যুগকে জানা সরল সমীকরণ সমাধানের মতই সহজ হত।"

মার্কস এই সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন যে বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে যে বিপুল পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হচ্ছে তা বণ্টনের ব্যবস্থা যদি ভিন্ন প্রকারের হত তো সকল মানুষের অভাবই দূর হতে পারত এবং তাতে যারা এখন ক্ষুধায় কাতর তাদের অসন্তোষ দূর হতে পারত। ক্ষুধার্ত লোকরা যত বেপরোয়া হতে পারে তৃপ্ত লোকেরা তা কখনও হয় না, এবং কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর আবেদন ক্ষুধার্তদের কাছেই। এই গ্রন্থের উপসংহারে বলা হয়েছে "কমিউনিস্টরা তাদের মত ও লক্ষ্যকে গোপন করতে ঘৃণাবোধ করে। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করছে যে তাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য বর্তমান সমস্ত প্রকার সামাজিক অবস্থার জোর করে ধ্বংস করা প্রয়োজন। শাসক সম্প্রদায় কমিউনিস্ট বিপ্লবের ভয়ে কম্পমান হোক। শ্রমিক শ্রেণীর শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছু হারাবার ভয় নেই, অথচ জয় করবার জন্য সারা পৃথিবীই রয়েছে। সকল দেশের শ্রমিক এক হও।" আর্থিক জগতে স্বকীয় অবাধনীতিবাদের (**Laissez-faire individualism**) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে মার্কস ঠিকই করেছেন। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অসাম্যের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই। আর্থিক জগতে সব স্বার্থের আপনাআপনি সামঞ্জস্য হয়ে যাবে বলে যে ধরে নেওয়া হয় বা প্রত্যেক ব্যক্তি যদি সুবুদ্ধিচালিত হয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে তাতেই সমাজের সব চেয়ে বেশী লোকের কল্যাণ আপনা-

* সাম্প্রতিক চীন রাশিয়ার মতভেদ এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করেছে—অনুবাদক

আপনি হয়ে যাবে বলে যে বিশ্বাস তা যুক্তিসহ নয়। কোন ব্যক্তি নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি যেভাবে করে, সামাজিক কর্তব্যও সেই পথেই সমাধান করে না। জনসাধারণ রুজিরোজগার ব্যবস্থা, খাদ্য ও ন্যায়সঙ্গত রক্ষাকবচ যতটা চায়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় ততটা আসক্ত হয় না

জড়বাদী প্রকল্প, এমন কি দ্বান্দ্বিক (ডায়ালেক্‌স্‌ ঘটিত) জড়বাদের সংশোধিত আকারও অন্য ধরনের জড়বাদের চেয়ে বেশী সন্তোষজনক নয়। মন শুধু জড়ের ক্রীড়নক এবং ভৌত সংস্থায় প্রাকৃতিক অবস্থা, প্রত্যেক কালের সামাজিক ও আর্থিক সংগঠন ও যে ভৌত পদ্ধতির মন একটা পরিণতি মাত্র সেই সব দিয়ে মনের ভাব ও অভিব্যক্তি নির্ধারিত হয় এরকম মত একপেশে ও বিভ্রান্তিকর। ইতিহাস যে একটা আঙ্গিক বা সৃষ্টিধর্মী প্রক্রিয়া এই প্রস্তাব মার্ক্স শুধু যে হেগেলের কাছেই শিখেছিলেন তা নয়, তাঁর ইহুদী পূর্বপুরুষরাও তা জানতেন। এই অর্থপূর্ণ ধাঁচ, এই সৃষ্টিধর্মী আন্দোলনকে শুধু উৎপাদনী শক্তির বিকাশ দিয়ে বোঝা যায় না। মানুষের সৃষ্টি করার ঝোঁক থেকেই বিকাশের জন্ম হয়। এই সৃষ্টি করার আগ্রহের উৎস কোথায় ? শুধু জান্তব সত্তা নিয়ে মানুষ সন্তুষ্ট থাকে না কেন ? যদি ধরেও নেওয়া যায় যে পৃথিবী ডায়ালেক্‌টিক্‌সের প্রয়োজনেই যথাসময়ে সার্থকতার দিকে, এক নূতন সত্তার দিকে এগিয়ে চলেছে, তাহলেও তার জীবন ও গতির উৎস কোথায় ? ইতিহাস এক অর্থপূর্ণ পদ্ধতি বলা মানেই জড়বাদী মতের সম্পূর্ণতাকে অস্বীকার করা। তাকেই অন্তিম তথ্য বলে ধরা মানেই একে রহস্যাবৃত করে রাখা। আর রহস্যের আবরণই ধর্মের উৎপত্তির ক্ষেত্র। আবার ধর্মের লক্ষ্যই মানুষের স্বভাবকে বদলানো আর মার্কসের বিশ্বাস সে ফল সামাজিক পরিবর্তন থেকেই সাধিত হবে। তিনি বলেন, "বহির্জগতে নিজের ক্রিয়া দ্বারা পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষ নিজের স্বভাবই বদলে দেয়।"[১] সামাজিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী মানুষ তার প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। তিনি লিখছেন, "মঃ প্রুধোঁ জানেন না যে সমস্ত ইতিহাস মানুষের স্বভাবের পরিবর্তনের পর্যায় ছাড়া আর কিছুই নয়", আর ধর্মের উদ্দেশ্যও ঠিক তাই।

বিজ্ঞান ও ইতিহাসের ঐতিহাসিক বিতর্ক এখন সেকেলে, কেননা যে বিজ্ঞান ধর্মকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করে সেও নেই, সে ধর্মও নেই। ধর্মের অবিশ্বাস্য মতবাদ আজকের সমস্যা নয়, যে বিশ্বকে বিজ্ঞান সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারে না তার মধ্যে আত্মার স্থান কি এইটাই সমস্যা। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভাবরাজ্য আছে এবং চিরকাল থাকবে ; তাকে পর্যবেক্ষণ করে বা বহির্জগতের পরিবর্তন দিয়ে আয়ত্তে আনা যাবে না।

যে সব ভারতীয়রা মার্ক্সীয় সামাজিক কর্মসূচী দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন তাঁরা ভারতীয় জীবনধারার মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাকে অবশ্যই খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। একটা মনগড়া আদর্শ জগৎ ইউটোপিয়ার সৃষ্টি করা আর ঐতিহাসিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে তফাৎ আছে। কোন বিশেষ কালের

---

১ ক্যাপিটাল ১ম, ১৯৮ পৃঃ

বাস্তব সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা অমূর্ত ধারণা, নিখুঁত সামাজিক ব্যবস্থার একটা কাল্পনিক আদর্শকেই ইউটোপিয়া বলে। অপরদিকে ঐতিহাসিক আদর্শকে বাস্তব অবস্থিতির সঙ্গে সংযোগ রাখতে হয়, এবং তারই ভিত্তিতে আপেক্ষিক ত্রুটিহীনতার চেষ্টা করতে হয়, একেবারে চরম সম্পূর্ণতা সম্ভাব্য নয়। ঐতিহাসিক বিকাশ কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সম্বন্ধে বাস্তব পশ্চাদপট দিয়ে নির্ধারিত হয় যদিও তার ভবিষ্যৎ বিকাশ অনির্দেশ্য। ভবিষ্যৎকে আগে থেকে মুক্ত করা যায় না এবং স্বাধীন মানবাত্মা অন্তরের ও বাহিরের প্রয়োজনকে জয় করে ইতিহাসের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। ভারতের পক্ষে আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের জীবনের পারমার্থিক লক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমভোগবাদীদের মূল তত্ত্ব মানব সৌভ্রাত্র থেকেই জন্মেছে। যে তরুণেরা মনে করে যে ধর্মের যুগ চলে গেছে, তাদের বলি যে একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে দৃঢ় মতামত প্রকাশ করবার যোগ্যতা তাদের সব চেয়ে কম, আর সেইজন্যই তারা ঐ বিষয়ে খুব উৎসাহী। এ সম্বন্ধে প্লেটোর উপদেশ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক নয়।[১]

হিটলারের রাশিয়া আক্রমণ উপলক্ষে কি সরকারী, কি বেসরকারী সব ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা দেশভক্তির উদ্দীপনা উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। তাদের আর "প্রতিবৈপ্লবিক" ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যোগসাজসের সন্দেহ করা চলে না। রুশ সরকারের সমর্থনে ধর্মীয় সংস্থাদের অকপট উৎসাহের ফলে স্ট্যালিন সেখানকার অর্থোডক্স ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতাদের সরকারীভাবে অভ্যর্থনা করেছেন এবং তাঁদের একজন প্যাট্রিয়াক নামধারী প্রধান ও একটি নিয়ন্ত্রক সমিতি হোলি সিনড নির্বাচিত করার জন্য জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করার স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে।[২] সোভিয়েত সরকার ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার করেন, ধর্মীয় সংস্থার যথার্থ অধিকার-ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে চান না। সেকালের ধর্মীয় সংস্থায় নির্বোধ গণতন্ত্রবিরোধী

---

১ "বৎস, তুমি এখন ছেলেমানুষ, যত দিন যাবে ততই তোমার এখনকার মতামতের অনেকগুলি সম্পূর্ণ উল্টে যাবে। কাজেই সব রকম প্রশ্নের বিচার করার আগে কিছুদিন অপেক্ষা কর। সব চেয়ে বড় প্রশ্ন হল, দেবতাদের সম্বন্ধে ঠিকভাবে ধারণা করা, আর তুমি ভালভাবে জীবনযাপন করবে কি করবে না; তুমি তো এখন সেগুলোকে তুচ্ছ বলে মনে কর। তুমি যদি আমার উপদেশমত চল তো এসব ব্যাপারে যতদিন না স্পষ্ট ও নিশ্চিত বিচারের ক্ষমতা তোমার আসে ততদিন অপেক্ষা কর এবং সব দিক থেকেই জানবার চেষ্টা কর সত্য কোন্ পথে। ইতিমধ্যে দেবতাদের সম্বন্ধে অবিশ্বাস থেকে বিরত থাক।" Laws 888 (A. E. Taylors কৃত ইংরেজী অনুবাদ)

২ ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ সালের মার্শাল স্ট্যালিনের সঙ্গে মস্কো, লেনিনগ্রাড ও ইউক্রাইনের অধ্যক্ষদের সাক্ষাৎকারের সরকারী বিবরণীতে এই গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ আছে:

"সাক্ষাৎকারের সময় মেট্রোপলিটান সের্গিয়ুস সভাপতিকে জানান যে, অর্থোডক্স ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ মস্কো এবং সমস্ত রুশের প্যাট্রিয়ার্ক নির্বাচন করা ও হোলি সিনড গঠন করার জন্য শীঘ্রই বিশপদের এক সম্মেলন আহ্বান করার সিদ্ধান্ত করেছেন। সরকারের প্রধান কমরেড স্ট্যালিন তখন বলেন, সরকারের এ প্রস্তাবে কোন আপত্তি নেই।"

দৃষ্টিভঙ্গী এবং রোমানফ বংশের প্রতি প্রাচীন আনুগত্যের জন্যই আগে তাদের ভীষণভাবে বিরোধিতা করা হত। যে সব অবাঞ্ছিত বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, এখন আর তার আলোচনা করে লাভ নেই। হতে পারে রুশ সরকারের এই নীতি পরিবর্তন রাষ্ট্রনৈতিক কারণেই ঘটেছে। উদ্দেশ্য যাই হোক, এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত জনগণের জীবনে ধর্মের স্থান মেনে নিয়েছে।

আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তা

মার্কস ও তাঁর অনুগামীরা যে লক্ষ্য রেখে কাজ করেন অর্থাৎ অবাঞ্ছিত ঘৃণার ভাবকে বিলুপ্ত করা সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন। নূতন জগতের শৃঙ্খলাকে ঐক্য ও চালনাশক্তি দিতে হলে একটা গভীর আধ্যাত্মিক উদ্যম চাই। তা থেকেই সামাজিক কর্মসূচীর যুক্তিযুক্ত ভিত্তি আসতে পারে। পরলোকগত আঁরি বেয়ার্গসঁ বলেছেন, "যে ঈশ্বর সমস্ত মানবের পক্ষে একই, তাঁর দিকেই দেখ, তাঁর দর্শন যদি সকল মানুষ লাভ করতে পারে তাহলেই যুদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাবে।" বেয়ার্গসঁ যে ঈশ্বরের দর্শনলাভের কথা বলেছেন, তা আমরা কি করে পেতে পারি? যে সকল বস্তু সকলের পক্ষেই এক, সমস্ত ব্যর্থতা ও পাপ অতিক্রম করে তার সম্বন্ধে কি করে অন্তর্দৃষ্টি পাব? প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা ও আসল মূল্যের আবিষ্কার ও উচ্চতর সত্যালোকের সঙ্গে তার সম্পর্কের আবিষ্কারই সমস্ত ধর্মের মূল ভিত্তি। মানুষ যখন বুঝতে পারবে যে পাশব প্রকৃতির ঊর্ধ্বে যে সত্তা তার মধ্যে তার স্থান, তখন সে আর ঐহিক সাফল্য বা জড়জাগতিক বিজ্ঞানের জয়লব্ধ ফলে সন্তুষ্ট থাকতে পারবে না। সে যে আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে পারে, তা থেকেই বোঝা যায় যে সে শাশ্বত সত্যের অনুসন্ধানী। এই অনুসন্ধানের মধ্যেই তাঁর জীবন। দৈবের কাছে পৌঁছবার মানবিক প্রয়াসই উপাসনা। ধর্মীয় অভ্যাস আমাদের বিবেককে স্পর্শ করে এবং আমাদের অমঙ্গল ও নীচতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে সহায়তা করে, লোভ, লালসা ও ঘৃণার হাত থেকে রক্ষা করে, নৈতিক শক্তিকে মুক্ত করে এবং জগৎ উদ্ধারের অভিযানে যোগ দেবার সাহস দেয়। যে অমঙ্গল আজ সারা সভ্যজগৎকে ধ্বংস করার উদ্যোগ করেছে তাকে প্রতিরোধ করার জন্য যে মানসিক উপায়ে যোগ প্রয়োজন, একমাত্র ধর্মের মধ্যেই তার পরিকল্পনা ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান রয়েছে। তার মানে আমাদের চিন্তা ও আচরণকে ভাবরাজ্যের খণ্ডসমূহের কাছে সমর্পণ করতে হবে।

অতীতে ধর্মের সঙ্গে যাদু, ডাইনী-বৃত্তি, হাতুড়েগিরি ও অনেক কুসংস্কার মিশে ছিল। যেসব মতবাদ আগে দিব্যজীবনের পথ সুগম করেছিল, আজ তারা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে; তাদের আর মানুষ ও ভগবানের মধ্যে প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আধ্যাত্মিক জীবনের আসল সারল্যকে নষ্ট করতে দেওয়া চলবে না। নাম থেকেই বোঝা যায় যে ঐতিহাসিক বিভিন্ন রূপের স্পষ্ট ত্রুটি সত্ত্বেও ধর্মই মানবসমাজের সংহতিকে গভীরভাবে অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম। আসলে ধর্ম পারমার্থিক অভিযানে যোগ দেবার আহ্বান। ধর্ম বলতে অভ্যাস ও আচরণ বোঝায়, ধর্মতত্ত্ব নয়। অনন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মার দম্ভ চূর্ণ করার একমাত্র উপায় ধর্ম। মানবাত্মা যখন তার

উৎস ও শর্ত ভুলে পরম আত্মসম্পূর্ণতার দাবী করে তখন সে উম্মাদ ও আত্ম-বিনাশকারী হয়ে উঠে। ব্যক্তি ও অনন্তের মধ্যে হৃত সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ধর্মের উদ্দেশ্য।

বিশিষ্ট নীতি বা গুহ্য সূত্র ধর্মের আসল জিনিস নয়, এমন কি অনুষ্ঠান বা উৎসব যার উপর আমাদের অনেকের বিতৃষ্ণা আছে, তারাও ওর অপরিহার্য অঙ্গ নয়। আসল ধর্মে বহুযুগের জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত আছে, যাকে ল্যাটিনে বলে **Philosophia Perennis.** আমরা বলি সনাতন ধর্ম, বর্তমান যুগের চিন্তায় বিভ্রান্তিকর নৈরাজ্যের মধ্যে তাই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক। ধর্মগুলি সত্যের ভূমিকা গ্রহণ করে না। মানুষ সত্যকে যেভাবে দেখেছে বা বুঝেছে, যা সে বিশ্বাস করেছে তাই ধর্মে প্রতিফলিত হয়; যে সত্য সর্বকালের ও সর্বজনের তারই বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রকাশ হল বিভিন্ন ধর্ম। সেণ্ট অগস্টিন বলেছেন, "যাকে খ্রীষ্টধর্ম বলা হয় তা প্রাচীনকালেও ছিল এবং মনুষ্যজাতির সৃষ্টি থেকে তা কখনও বিলুপ্ত হয় নি। খ্রীষ্ট সশরীরে আবির্ভূত হওয়ার পর থেকে সেই সত্যধর্মকে খ্রীষ্টধর্ম বলা হতে লাগল।"[১]

এই নবসৃষ্টির বেদনার্ত যুগে ভারতবর্ষ তার দুঃখ সহার তপস্যার গভীরতা থেকেই পৃথিবীতে আলোক আনবার অধিকারী, তাকেই বিশ্বজনীন বাণীর বাহক হতে হবে। ভারত একটি জাতীয় সত্তা নয়, কেননা জাতীয়তার লক্ষ্য আসল নয়। বিশুদ্ধ জাতিসত্তা নৃতত্ত্বের কল্পনার বাইরে নেই। আসল জীবনে এক ধরনের সমস্ত বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া সহজ নয়। সব জায়গায়ই মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় নিদর্শনের কিছু নমুনা পাওয়া যায়, এমন কি একই পরিবারের সকলে একই রকম জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় না। ভারতীয় সংস্কৃতিতে জাতিসংক্রান্ত ছুঁৎমার্গ নেই, তার প্রভাব সকল জাতির উপর পড়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির অনুভূতি ও লক্ষ্য আন্তর্জাতিক। ভারতবর্ষের ধর্মের জাতিরূপ হিসাবে হিন্দুধর্মের প্রকৃতিও তাই, এবং তার মধ্যে এমন এক প্রাণশক্তি আছে যার জন্য সব রকম রাষ্ট্র-নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যেও সে টিঁকে আছে। যখন থেকে ইতিহাস লেখা হয়েছে তখন থেকে হিন্দুধর্ম শাশ্বত আত্মার পবিত্র শিখার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে, এমন কি যখন সাম্রাজ্য ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, রাজবংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তখনও তা থেকে সে ভ্রষ্ট হয় নি। এই ধর্মই আমাদের সভ্যতার মধ্যে আত্মার প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং নরনারীকে বাঁচাবার তত্ত্ব শোনাতে পারে।

মানুষ শুধু বেঁচে থেকে সন্তুষ্ট নয়, তার মধ্যে মহৎ জীবনযাপন করার একটা সহজাত প্রেরণা আছে। যখন সেই মহৎ জীবনের প্রেরণা বিশ্বজাগতিক সমর্থন পায় তখনই আমরা ধর্মের আবেগ পাই। এমন লোক নেই যে কখনও না কখনও এইসব মৌলিক প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছে, আমি কি, কোথা থেকে এসেছি, কিই বা আমার পরিণতি?[২] তাছাড়া বিশ্বজগতের রহস্য আমাদের বিস্ময়ে আপ্লুত

১ Lib. de vera religione, ch. 10

২ এই ছড়াটা শুনুন :

করে, তার শৃঙ্খলাকে বিশ্বাস করতে শিখি আর চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর অনন্তকাল ধরে খুঁজতে থাকি। ব্যক্ত জগতের অন্তরালে যে সত্য আছে, যে সত্য সকল মানুষের পক্ষে, সকল দেশে এবং সকল কালে সত্য, সেই সর্বব্যাপী পরম সত্যকে আবিষ্কারের আকুল বাসনা আমাদের সকলেরই আছে। সমস্ত ধর্মের সার হল রহস্যের অনুভূতি। গ্যয়টে বলেন, "চিন্তাশীল মানুষের সব চেয়ে বড় সুখ হল, যা জানা যায় তাকে জানা, আর যা জানাব উপায় নেই তার সামনে ভক্তিভরে অবনত হওয়া।" কতকগুলি তথ্য ও মূল্য আছে যার কোন ব্যাখ্যা আমরা জানি না। জগৎ কেন আছে আমরা জানি না, যে সব বস্তুকে আমরা শ্রেয় মনে করি, যা দেশকালব্যাপী জগতের চেয়ে কম বাস্তব নয়, তার সঙ্গে জগতের কি সম্পর্ক তাও আমরা জানি না। আমাদের সকলের মধ্যে এমন এক ভাব আছে যে সকল যুক্তিতর্কের ঊর্ধ্বে, সে যুক্তিকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে মাত্র, সেইজন্যই আমরা মানুষেব যুক্তির যে সীমা আছে তা বুঝতে পারি ও স্বীকাব করি। এ দুটোকে আলাদা করা যায় না, কেননা ভাবের মধ্যেই সমস্ত ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় তারই উচ্চাংশের নির্দেশে, এবং আত্মা যখন সক্রিয় হয়, তখন আমরা ঈশ্বরের দর্শন পাই। বুদ্ধিবৃত্তি মানবমনের নৈসর্গিক প্রবণতা হলেও, অখণ্ডতা তার স্পষ্ট নিয়তি। এক এক সময় হয়ত আমরা প্রত্যেকেই কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ অনুভব করি, যখন মনে হয় আমরা আর কঠিন মাটিতে পা দিয়ে বেড়াচ্ছি না, হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছি, যখন আমাদের সমস্ত সত্তার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে একটা উপস্থিতি মিশে যায়, যা অবর্ণনীয় হলেও অবোধ্য নয়, যখন আমরা দিব্যানন্দকে যেন স্পর্শের সীমার মধ্যে পাই, যেখানে সমস্ত স্বার্থচিন্তা ও অপূর্ণ বাসনা পরিতৃপ্তি ও প্রসন্নতায় পর্যবসিত হয়। এসব অন্তর্দৃষ্টি ও প্রফুল্লতার মুহূর্ত উন্নতি ও প্রসারতার মুহূর্ত, এর মধ্যে নিজেকে গভীরতর ও সমৃদ্ধতর করে যাওয়া যায় অথচ বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা থেকে যায়। এইসব প্রলয়ংকর গভীরতা ও সুতীব্র পুলকময় অভিজ্ঞতার মুহূর্তে যখন আমরা পক্ষারূঢ় হয়ে পরম সত্তাকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাই তখন আমাদের অন্তর আলোকময় হয়, আমাদেব চারপাশে পবমাত্মাব অস্তিত্ব অনুভব করি, মনে এক অপূর্ব স্বচ্ছতা আসে, মনে হয় আমরা সহৃদয় বিশ্বেরই অচ্ছেদ্য অংশ। অকলঙ্ক চরিত্রের অধিকারী অখণ্ড সত্যবাদী অনেক মানুষ গুরুগম্ভীর বাক্যে ঘোষণা করেছেন কিভাবে তাঁদের সমস্ত সত্তা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আধ্যাত্মিকতাই তাঁদের জীবন, আনন্দ ও আলোক। তাঁদের সমস্ত প্রকৃতি সক্রিয় অনুসন্ধান ও বোধি। তাঁরা যদিও নিজেদের আধ্যাত্মিকতাব প্রশান্তিতে বাস করেন তবু তাঁদের দেহে প্রগাঢ় ও আবেগময় প্রাণবত্তা।

"O, whither go all the nights and days ?
And where can tomorrow be ?
Is anyone there, when I'm not there ?
And why am I always me ?"

Walter de la Mare, Pleasures speculations. (1940)

এসব হেঁয়ালি একটা শিশুর মনেও উদয় হয়, যদিও আজ পর্যন্ত কোন দার্শনিকই এর সম্পূর্ণ সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি।

জীবনেরই চিরন্তন রহস্য ও বিস্ময়বোধ, তার প্রসাদ ও শক্তি থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। যখন আমরা কাঙ্ক্ষিত বস্তুকে আয়ত্তে পাই তখনকার মহাহ্লাদই ধর্ম, আর তা যদি না পাওয়া যায় তো মানুষ মৃতকল্প। "হে গার্গি, যে এই অবিনশ্বরকে না জেনে পৃথিবী ত্যাগ করে, সে দীন ও করুণার পাত্র, অপরপক্ষে যে অবিনশ্বর কি তা জেনে পৃথিবী থেকে প্রয়াণ করে সেই ব্রাহ্মণ।"[১] আবার "তাঁকে যদি ইহলোকেই জানি, তাতেই জীবনের সফলতা, আর যদি না জানি তো ঘোর সর্বনাশ।"[২] অনন্তের সঙ্গে সংস্পর্শ স্থাপনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত নয় এমন মানবজীবন নিরর্থক। প্লটিনাস বলছেন, "এই চরম, পরম ও আদিম সুন্দরের প্রেমিকরাই সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়, তাতেই তারা প্রেমের যোগ্য হয়। এর জন্য জীবাত্মার চরম ও কঠিনতম সংগ্রাম; আমাদের সমস্ত প্রয়াস এইজন্য যে আমরা যেন মহত্তম দর্শনের অংশ থেকে বঞ্চিত না হই। সেই পরমানন্দময় দর্শন পেলে ধন্য, না পেলে সব নিষ্ফল।

"যে বর্ণ বা দৃশ্য আকারের আনন্দে বঞ্চিত হয়েছে, অথবা যার শক্তি, সম্মান বা রাজত্ব গেছে, সে সত্যিকার নিষ্ফল নয়, কিন্তু যা পেলে রাজত্ব স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করা যায় তাঁকে যে পায়নি সে-ই সত্যি সত্যি বিফল হয়েছে।" সর্বোত্তমের দর্শন না পেলে জীবন অপূর্ণ। দেহেরও যেমন চোখ আছে, আত্মারও সেই রকমই চোখ আছে, সেই চোখ দিয়েই সে অখণ্ড সত্যকে জানতে পারে, ঈশ্বর রূপ আত্মার পরিপূর্ণতাকে ভালবাসতে শেখে। "চোখ যেমন আকাশকে দেখে, ঋষিরা সর্বদা ঈশ্বরের সর্বোচ্চ আবাসস্থল তেমনি প্রত্যক্ষ করেন[৩]।" মনুষ্য গোত্রের সকল শাখাতেই[৪] এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে, যদিও কালভেদে ও লোকভেদে তার ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হয়েছে। মুশা বলে উঠলেন, "অনন্ত ঈশ্বরই আমার আশ্রয়, তার নীচেই চিরস্থায়ী অস্ত্র।"[৫] খ্রীষ্ট্রীয় স্তোত্রেও এইরকম নিত্যধামে পৌঁছবার, পর্বত ও পৃথিবীর জন্মের পূর্বে যিনি ছিলেন তাঁর সান্নিধ্যে আনার অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে।[৬] আধ্যাত্মিক জগৎ প্লেটোর দর্শনেরও অপরিহার্য অঙ্গ। তাই হল তার

---

১ যো বা এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ ;
অথঃ এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥

২ মহতীবিনষ্টিঃ।

৩ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ তদ বিষ্ণোঃ পরমং পদং দিবীবচক্ষুরাততম্।—ঋগ্বেদ

৪ ঋষি আর্য ম্লেচ্ছানাং সমানং লক্ষণম্।

৫ Deut xxxiii 27

৬ Psalm Xc 2.

হরিণ যেমন জলস্রোতের জন্য আকুল হয়, আমার আত্মাও, হে ভগবান, তোমার জন্য তেমনি আকুল। আমার আত্মা ঈশ্বরের জন্য, জীবন্ত ঈশ্বরের জন্য তৃষিত; কখন আমি সেই ভগবানের সামনে দাঁড়াব? Psalm XL ii. 1-2.

আবার—হে ঈশ্বর, তুমি আমার দেবতা, তোমাকেই আমি সর্বদা খুঁজি, আমার আত্মা তোমার জন্য তৃষিত শুষ্ক, তৃষ্ণার্ত জলহীন দেশে আমার দেহ তোমাকেই চায়। Psalm Lx. iii. 1.

মতে সত্যসুন্দর ও কল্যাণের ক্ষেত্র ও আকাশ। মানবমন জড়জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তাকে পরমসত্তার অতীন্দ্রিয় ও তুরীয় জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আনা যায়। সেণ্ট পল লিখছেন, "যদি আমাদের বাইরের মানুষটা ধ্বংসও হয়, ভিতরের মানুষটা প্রতিদিন নব নব রূপ গ্রহণ করে···যখন যা আমাদের চোখের সামনে তা না দেখে যা অদৃশ্য তাই দেখি, কেননা যা সহজে দেখা যায় সে অনিত্য, আর যা দেখা যায় না তাই নিত্য।"[১] প্লটিনাস (২০৭-২৭০ খ্রীঃ অঃ) বলছেন, "অনেক সময় এমন হয়েছে যখন আমার দেহ থেকে আমি উঠে গেছি, সমস্ত বাইরের বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ আত্মসর্বস্ব হয়েছি, তখন অপূর্ব সৌন্দর্য দেখেছি, তখন মনে হয়েছে সর্বোচ্চ সত্তার সঙ্গে সাযুজ্য এবং ভগবানের সঙ্গে সমতার নিশ্চয়তা লাভ করেছি।"[২] "একবার সেখানে পৌঁছলে, সে অভিজ্ঞতার বদলে আত্মা বিশ্বজগতে কিছুই চাইবে না; সমস্ত স্বর্গরাজ্য দিতে চাইলেও না। তার থেকে উঁচু, তার থেকে ভাল আর কিছুই নেই, সে অবস্থা অনতিক্রম্যও।"[৩] অগাস্টিন্ তাঁর "স্বীকৃতি" এই স্মরণীয় কথা দিয়ে আরম্ভ করেছেন, "হে প্রভু, তুমি আমাদের তোমার নিজের জন্য সৃষ্টি করেছ, এবং যতদিন না তোমাতে আশ্রয় পাচ্ছি, ততদিন আমাদের অন্তর অস্থির থাকবে।" তাঁর লেখার অনেক জায়গার এমন সব কথা আছে যা থেকে বোঝা যাবে যে জীবনের অনেক মাহেন্দ্রক্ষণে তিনি যা সৎ তাতে পৌঁছেছিলেন "এবং এক ঝলকে, এক লম্ফে সেই অনন্ত জ্ঞানকে ছুঁতে পেরেছিলেন যা নিত্য।" মুহম্মদ জোর দিয়ে বলেছেন যে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা যে "ভগবান তাঁর নিজের গলার শিরা থেকে নিকটতর"[৪] তাঁর মতে এ ছাড়া ভগবানের অস্তিত্বের আর কোন প্রমাণের আবশ্যকতা নেই। সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাসের এক উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল। যখন তিনি নেপল্‌সে মাস্ (Mass) উৎসবে যোগ দিলেন, তখন তিনি কালিকলম পরিত্যাগ করেন আর তাঁর অসম্পূর্ণ রচনা "সুমা থিয়লজিয়া"তে একটি বর্ণও যোগ করেন না। যখন তাঁকে লেখাটা সম্পূর্ণ করতে বলা হল, তখন তিনি উত্তর দিলেন, "আমি যা দেখেছি, তার পরে আমি যা লিখেছি ও শিখিয়েছি সবই তুচ্ছ হয়ে গেছে।" সুফী মিষ্টিক বোগদাদের জনায়েদকে যখন তাঁর এক শিষ্য জিজ্ঞাসা করে, "আমি শুনেছি আপনার কাছে ঈশ্বরজ্ঞানের মুক্তা আছে, হয় সেটা আমাকে দান করুন, নয় বিক্রয় করুন।" তখন জনায়েদ উত্তর দেন, "আমি তোমাকে তা বিক্রয় করতে পারব না, কেননা তার মূল্য দেবার ক্ষমতা তোমার নেই। তোমাকে দানও করতে পারি না, কেননা তাহলে সে বস্তু তুমি এত সস্তায় পাবে যে তার মূল্য বুঝতেই পারবে না। তুমি আমার মতই সেই মহাসমুদ্রে (ঐশ্বরীয়) ঝাঁপ দিয়ে পড়, তাহলে নিজেই সে মুক্তা লাভ করতে পারবে।"[৫] যখন আমরা আসল বস্তুর স্পর্শ পাই তখন আমরা

---

১ ২য় কোরেন্থিয়ান ৪. ১৬-১৮
২ Enneads IV. 8. 1
৩ Enneads VI. 7.
৪ কোরাণ ৫০, ১৫
৫ নিকলসন Mystics of Islam (1914) P 34.

Lost unto God, as lights in light, we fly,
Grown one with will.

(তখন ঈশ্বরের মধ্যে হারিয়ে যাই, যেমন আলো আলোতে মিশে যায়, আমরা সেই ইচ্ছার সঙ্গে এক হয়ে উড়ে যাই।)

হাসি-কান্না, স্নেহ-ক্ষমার মতই ধর্মীয় অভিজ্ঞতা প্রাচীন। ঐশ্বরিক অনুভূতি নানা উপায়ে আসে, নৈসর্গিক সংযোগে, মঙ্গলের আবাধনায়।

(Through) A Sunset touch,
A fancy from a flower-bell, someone's death
A chorus ending from Euripides.

(এক সূর্যাস্তের স্পর্শে, একটি পুষ্পকোরকের কল্পনায়, কারুর মৃত্যু থেকে, কিংবা, ইউরিপিডিসের অন্তিম কোরাস থেকে)

আর এ অভিজ্ঞতা হতে জীবনের সামান্য স্বরণ থেকে আরম্ভ করে ভগবানেব মধ্যে আনন্দের মত্ত আবেগ পর্যন্ত আসতে পারে।

অন্তরের যে সম্পদ আমাদের ভাবকে রূপ দিতে প্রেরণা দেয়, বিশ্বাসের বস্তু খুঁজে বেড়াতে উৎসাহিত করে, সততাব অভিযানে পথ দেখায়, তারই নাম ধর্ম। সৌন্দর্য, কল্যাণ ও সত্যের জন্য মনের প্রয়াসই ভগবান লাভ করার প্রয়াস। মাতৃবক্ষে পানরত শিশু, অসংখ্য নক্ষত্রের দিকে আবদ্ধদৃষ্টি নিরক্ষর বর্বর, বীক্ষণাগারে অণুবীক্ষণ সাহায্যে জীবনরহস্য-সন্ধানী বিজ্ঞানী, বিশ্বের সৌন্দর্য ও কারুণ্য সম্বন্ধে নির্জনে চিন্তাবত কবি, নক্ষত্রখচিত আকাশ, হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখর বা শান্ত সমুদ্রের দৃশ্যে ভক্তিমুগ্ধ সাধারণ মানুষ, কিংবা সর্বোচ্চ বিভূতি, মহৎ ও সৎ মানুষের সামনে শ্রদ্ধাবনত লোক, এদের সবাইয়ের মধ্যেই অন্তরের ক্ষীণ অনুভূতি, স্বর্গের আভাস পৌঁছয়।

আসল ধার্মিকেব কাছে ধর্ম খুবই সোজা, সেখানে গুহ্যসূত্রের গোঁড়ামির, অনুভবের বা অতিপ্রাকৃত উপাদানের নিগড় নেই। তার মধ্যে শুধু দেশকালের উপর যে পরমাত্মা বিরাজ করছেন তাঁর সত্তার স্বীকৃতি আছে। সে ধর্মের ব্যবহারিক প্রকাশ শুধু এই সূক্তিতে "যে কল্যাণ সাধন করে সেই ঈশ্বরীয়" ন্যায়সঙ্গত কার্য করা, সুন্দরকে ভালবাসা, সত্যের উপলব্ধিতে বিনয়নম্র হয়ে বলা এই তো সব চেয়ে বড় ধর্ম।[১] এ অভিজ্ঞতা কোন বিশেষ জাতি বা আবহাওয়ায় সীমাবদ্ধ নয়।

---

১ আইনস্টাইনের উক্তি : মানুষের বাসনা ও লক্ষ্যের নিষ্ফলতা আর নিসর্গে ও চিন্তারাজ্যে যে গরিমা ও অত্যাবশ্যক শৃঙ্খলা প্রকাশ পায় তা প্রত্যেক ব্যক্তিই উপলব্ধি করে। সে ব্যক্তিব অস্তিত্বকে কারাগার মনে করে এবং বিশ্বকে এক সার্থক সমগ্রতারূপে অনুভব করতে চায়। সমস্ত যুগের ধার্মিক প্রতিভাবানদের এই ধরনের ধর্মীয় অনুভূতিই বৈশিষ্ট্য। সেখানে কোন বিশিষ্ট মতবাদ বা নরাকৃতি দেবতার স্থান নেই। অতএব এমন কোন ধর্মসংস্থা থাকতে পারে না, যার কেন্দ্রীয় শিক্ষার ভিত্তি ঐ অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। এইজন্যই আমরা যুগে যুগে ধর্মদ্রোহীদের মধ্যেই এমন লোকের দেখা পাই যারা উচ্চতম পর্যায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে সমৃদ্ধ। তাঁদের সমসাময়িক লোকেরা কখনও বলেছে নাস্তিক, কখনও বলেছে সন্ত। এইদিক দিয়ে দেখলে

আত্মা যখন নিজের অধিকাব ফিরে পায়, যে কোন দেশে বা যে কোন জাতির গণ্ডীর মধ্যে যখনই সে অন্তরের গভীরে কেন্দ্রীভূত হয়, যখনই সে পরিবেশের গভীরতর জীবনস্রোতে সাড়া দিতে পারে, তখনই সে তার নিজের সত্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন হয় ও আনন্দপূর্ণ জীবনের অধিকারী হয়ে পারমার্থিক জীবনের পুলক শিহরণ উপভোগ করে। জ্ঞান ও সুখের অপার সাগর সদৃশ্য পরমাত্মায় যার চেতনা লুপ্ত হয়, তার জন্ম হলে কুল পবিত্র হয়, জননীর বাসনা সফল হয়, ধরণী পবিত্রা হয়।[১]

যে জগৎ ক্রমাগতই গভীর বিয়োগান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে তাব আর কোনও দিক থেকে মুক্তি আসার সম্ভাবনা নেই। মানবজাতির আসল আধ্যাত্মিক ঐক্য প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতির অতি গভীর স্তরেব অধিবাসী, কোন এক সম্প্রদায়ের আকস্মিক সদস্যতা লাভের দ্বারা যে ঐক্যভাব আসে, তা থেকে অনেক গভীরস্তরের এবং এই ঐক্যজ্ঞানের উপরেই বিশাল মানবসমাজের মৌল আধ্যাত্মিক উপাত্তের প্রতিষ্ঠা। যে সব ব্যবহারিক বাধা আমাদের পরস্পর থেকে আলাদা করে রেখেছে সে আর তার সামনে স্থায়ী হয না। আমবা যদি আধ্যাত্মিক সত্তারূপ কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন না হই, তাহলে আমবা নৈরাজ্য ও প্রতিযোগিতামূলক সমাজের লোভ ও ভয় থেকে মুক্ত হব। এই সমাজকে প্রত্যেকের দৈহিক ও মানসিক প্রগতিক ব্যবস্থা সম্বলিত মানব সম্প্রদায়ে পরিবর্তিত করতে হলে আমাদেব চেতনাকে প্রসারিত কবতে হবে, আমাদের বোধশক্তিকে বাড়াতে হবে, জীবনের উদ্দেশ্যকে বুঝতে হবে এবং তাব সাধনাই আমাদের জীবনের ব্রত করতে হবে। চেতনার বিস্তৃতি বা বোধশক্তিব বৃদ্ধি সহজ নয়। আসল বস্তু যে আমাদেব চোখে ধবা পড়ে না, আমরা যে অন্ধ, অন্ধ বলেই যা আপাত প্রতীয়মান তাকেই আসল বস্তু বলে ভুল করি, এ জ্ঞান সহজ। কিন্তু অন্ধত্বের চিকিৎসা করে দিব্যদৃষ্টি ফিরে পেতে হলে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। আমাদের চেতনাকে লোভ ও ভয়ের বিকৃতি, অহমিকার অধ্যায় থেকে মুক্ত করতে হবে আর যখন আমাদের অন্তর পবিত্র ও একাগ্র হবে তখনই আমাদের মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারবে। আমরা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হব, আমাদের স্বভাব পুনর্গঠিত হবে, আমরা জগতের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারব, ঈশ্বর পৃথিবীতে আমাদের যেভাবে বাস করতে বলেন সেইভাবে জীবনযাপন করব। সমস্ত সৃষ্টির লক্ষ্য হল মানবজীবনের অভিব্যক্তি, মানুষের পুনর্গঠন। মানুষের স্বভাব না বদলাতে পারলে, মানবজীবন ও মানবসমাজে পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে না। কায়াহীন ধারণা ও বাসনা প্রবোচিত কল্পনা নিয়ে আওরঙ্গজেবের শ্লেষাত্মক মন্তব্য সত্ত্বেও আমাদের কবির কাছে আলোক ও দার্শনিকের কাছে পদ্ধতি আয়ত্ত করা

ডেমোক্রিটাস, আসিসির ফ্রান্সিস ও স্পিনোৎসা পরস্পরের নিকট আত্মীয় বলে মনে হবে।" H. Gordon Garbedian, Albert Einstein (1934) P 307.

১ কুলম্ পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
অপারসম্বিৎসুখসাগরেঽস্মিল্লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ।

দরকার। এঁরা আত্মাকে যে সব শক্তি চালিত করেন তাদের সম্বন্ধে সচেতন এবং এই জগতেব মধ্যেই উন্নততর জগতের স্বপ্ন জড়িয়ে রাখতে পারেন।

আমাদের এখনকার প্রয়োজন হচ্ছে মানুষের জীবনযাপন প্রণালীর গভীর পরিবর্তন। আমরা নিজেদের যতটা বদলাতে পারব ততই আগামীকালের সম্ভাবনা আমাদের আয়ত্তে আসবে। এ আত্মপরিবর্তন স্বতঃস্ফূর্ত নয়। ইতিহাসে যে অর্থপূর্ণ ধাঁচ দেখতে পাই তাতে সাড়া দিলে তবেই পরিবর্তন সম্ভব। তা হবে আসল সত্তার কাছে নিজেকে সমর্পণ। ধর্মাচরণ। ভারতের 'মিস্টিক' ধর্ম বলে যে আধ্যাত্মিক বস্তু সকলের মধ্যেই নিহিত, তাকে আমাদের জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে। সত্যকে লাভ করার জন্য পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে নিজেকে আসক্তিহীন করতে হবে। সাধনার ধন লাভ করার পর ঐতিহাসিক জগতে নবশক্তি ও নিশ্চয়তা নিয়ে ফিরে আসতে পারব, সে শক্তি ও নিশ্চয়তা হবে যুগপৎ আধ্যাত্মিক ও সামাজিক। সম্ভবতঃ ঐ ধর্মই নবজগতের ধর্ম হবে এবং মানুষকে জাতীয় গণ্ডী সত্ত্বেও এক সাধারণ কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করবে।

দ্বিতীয় ভাষণ

ধর্মের অনুপ্রেরণা ও বিশ্বের নববিধান

ধর্মের বিরোধিতা—ধর্মের মাধ্যমে সহযোগিতা—ব্যক্তির প্রকৃতি—জ্ঞান বনাম কর্ম—নববিধান—গণতন্ত্রের গতি।

জগৎ যদি নিজের আত্মাকে খুঁজে পেতে চায় তো ধর্ম যেসব রূপে বর্তমানে আমাদের কাছে প্রচলিত, তার মধ্যে সে আত্মার খোঁজ পাবে না; তারা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ না করে প্রতিদ্বন্দ্বী দলে ভাগ করছে। তারা জীবনের সামাজিক দিকটার ওপর জোর না দিয়ে ব্যষ্টির ওপর জোর দিচ্ছে। ব্যক্তিগত বিকাশের মূল্যটাকে অতিশয় বাড়িয়ে ধরে সামাজিক বোধ ও কল্পনাকে নিরুৎসাহিত করছে। তারা ধর্মের চেয়ে ধ্যানের, প্রয়োগের চেয়ে তত্ত্বের গুণগান বেশী করে। স্বর্গরাজ্যের ধারণা দিয়ে মানুষকে ইহলোকে স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের প্রয়াস থেকে বিমুখ করে। তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি ফুরিয়ে গেছে, তারা যে সব বাণীর উপর নির্ভর করে থাকে তার মধ্যে প্রাণসঞ্চার না করতে পেরে এখন মরা খোলসে পরিণত হয়েছে। প্রাণহীনতা ঢেকে রাখার জন্য তারা আচার-অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটির উপর ভরসা রাখে, কেননা অভ্যাস ও আচরণ সেগুলিকে অযথা মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে, যে সেবাপ্রকৃতি সুযোগের জন্য তৃষিত হয়ে আছে তার নিজেকে উৎসর্গ করার আকুলতার কাছে সেসব আচারানুষ্ঠান অপ্রাসঙ্গিক বোধ হবেই। মোটের উপর বর্তমান অনাসৃষ্টির তারা সমর্থনই করে, অবস্থা বদলানোর জন্য উৎসাহ দেয় না। মার্কসের বিশ্বাস, শ্রেণীবিহীন সমাজের বিকাশের পক্ষে ধর্ম একটা বাধা এবং "নির্ভর নব বিশ্ব" (Brave new world)-এর মুক্ত ধী ধর্মের আবেশ থেকে মুক্তি পাবে তখনই যখন তারা বুঝতে পারবে যে জীবনের অর্থ, উদ্দেশ্য ও পরিণতির বৈজ্ঞানিক সত্যকে ধর্মের মধ্যে কি মিথ্যা আকার দেওয়া হয়েছে। বলা হয় "ধনিকতন্ত্র বিনাশের পর যে সমাজ দেখা দেবে, তা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে শ্রেণীবিহীন ও সংঘর্ষমুক্ত সমাজে পৌঁছবার পথে সব রকম ধর্ম ও কুসংস্কারের স্বাভাবিক মৃত্যু হবে।"[১] ধর্মকে কুসংস্কার প্রতিপন্ন করার জন্য প্রবল প্রচারকার্য চালানো হয়; "১৯৩৭ সালের মে মাসের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন ধর্মমন্দির অবশিষ্ট থাকবে না। সোভিয়েত রাষ্ট্র থেকে ঈশ্বরকে মধ্যযুগের অভিজ্ঞান হিসাবে বিতাড়িত করা হবে"[২] ১৯৩৯ সালের ২৩শে আগস্ট রাশিয়া জার্মানীর মধ্যে যে সখ্য ও অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয় তার পরে রাশিয়ায় ঈশ্বর বিরোধী আন্দোলনের সম্পাদক ঘোষণা করেন, "রুশ-জার্মান চুক্তি থেকে নিরীশ্বরবাদের প্রচারের সুবিধা হবে কেননা

---

১ M. Bukharin, The A. B. C. of Communism.

২ ১৯৩২ সালের ১৫ই মের ডিক্রী।

সোভিয়েত সরকারও যতখানি খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী, হিটলার ও তাঁর সরকারও ততখানিই খ্রীষ্টধর্মের শত্রু।" এখন জার্মানী আর সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ চলেছে আর জার্মানীর পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অভিযানের নেতা গ্রেট ব্রিটেন রাশিয়ার সহায়ক অতএব ঈশ্বর বেচারার অবস্থা সঙ্গীন। রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে এখন মনে হচ্ছে যে জার্মানী ঈশ্বরবর্জিত আর রাশিয়া ঈশ্বরনিষ্ঠ।[১]

ধর্মের মাধ্যমে সহযোগিতা

পৃথিবী যেমন জাতি ও কুলে বিভক্ত, তেমনি নানা ধর্মেও বিভক্ত। প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, আরব, ইহুদী, হিন্দু, খ্রীষ্টান কেউই পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পারছে না। এক ঈশ্বরে বিশ্বাস থেকে শান্তি ও ঐক্য আসবে এরকম ভাবা গিয়েছিল। কিন্তু তার যখন এই ব্যাখ্যা হল যে সব লোক একই রকম ভাববে এবং একই রকমে চলবে তখন তা থেকে যে উৎপাত শুরু হল, রাজাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা লোকেদের বিরুদ্ধ ভাবও ততটা করতে পারে নি। বিশ্বজনীনতা ধর্মের উদ্দেশ্য হতে পারে, কিন্তু ধর্মসম্প্রদায়গুলি হল লৌকিক ও স্বতন্ত্র এবং সহযোগিতা বুদ্ধির পরিপন্থী। এমন কি সমস্ত খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়কে এক করাব চেষ্টাও নিষ্ফল হয়েছে, তারা প্রত্যেকে তাদের নিজেদের বিশিষ্ট মন্ত্র এবং ক্রিয়াকর্মের জন্য পীড়াপীড়ি করছে।[২]

---

১ গ্রেট ব্রিটেন যখন ইউরোপের কেন্দ্রীয় শক্তিসমূহের সঙ্গে সখ্যতাপ্রয়াসী ছিল, তখন লর্ড লয়েড ফ্যাসিস্ট ইতালী সম্বন্ধে বলেন, "খুব বেশী রকম কর্তৃত্বমূলক শাসনতন্ত্র বটে কিন্তু তা থেকে ধর্মীয় বা আর্থিক স্বাধীনতার অথবা অন্য ইউরোপীয় দেশের কোন ভয়ের কারণ নেই।" হিটলারকে দেখানো হয় ধর্মভীরু ক্যাথলিক রূপে, তিনি খ্রীষ্টবিরোধী কমিউনিস্ট "যারা ক্যাথিড্রাল ধ্বংস করেছে, পুরোহিতদের হত্যা করেছে, স্ত্রীজাতিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেছে" তাদের শত্রু। ১৯৩৫ সালে ক্যান্টারবেরীর আর্কবিশপ বলছেন, "১৫ বৎসরের উপর রাশিয়ায় ঈশ্বরবর্জিত স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এখনও সেখানে হাজার হাজার বিশপ ও পাদ্রী জেলে পচছেন নয় বরফ জমা সাইবেরিয়ার খনিতে খাটতে বাধ্য হচ্ছেন।" ১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলার যখন রাশিয়াকে আক্রমণ করল তখন "হঠাৎ অদৃশ্যে গীর্জাগুলি ভরে গেল, পূজাবেদীর সামনে যাদুমন্ত্রের মত পুরোহিতদের আবির্ভাব হল, দেখেও বিশ্বাস হয় না যে মস্কো ক্যাথিড্রালে প্যাট্রিয়ার্ক গেয়ারগেস ১২,০০০ লোককে প্রার্থনার নির্দেশ দিচ্ছেন।" Douglas Read, All our To morrow (1942) P 84.

২ রুশো লিখছেন, "সমাজ হয় বিশিষ্ট নয় সামান্য, তার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক বিবেচনা করলে ধর্মকেও দুভাগে ভাগ করা যায়, মানুষের ধর্ম ও নাগরিকের ধর্ম। প্রথমটির জন্য মন্দির, পূজাবেদী, ক্রিয়াকর্ম কিছুই দরকার হয় না, সে শুধু মহান ভগবানের উপর আন্তরিক বিশ্বাস, অনন্তকালের সুনীতির বাধ্যতা দ্বারা সীমায়িত। সেই হল আসল আস্তিকতা, পবিত্র ও সরল সুসমাচারের ধর্ম, বলা যেতে পারে স্বাভাবিক ঈশ্বরীয় অধিকার বা বিধান। অন্যটি এক-এক দেশের তাদের অধিবাসীদের জন্য বিধিবদ্ধ, তাদের নিজেদের দেবতা আছে, নিজেদের পৃষ্ঠ-পোষক আছে তাদের প্রত্যেকের ধর্মমত আছে, ক্রিয়াপদ্ধতি আছে, আইনদ্বারা বাঁধা বিশ্বাসের

হিন্দুধর্মের মধ্যে কিন্তু বোঝবার ও সহযোগিতা করার প্রয়াস দেখা যায়। পরম বস্তুর কাছে পৌঁছবার ও তাঁকে লাভ করার যে বিভিন্ন উপায় থাকতে পারে এ কথা সে স্বীকার করে। হিন্দুদের কাছে যা অনন্ত ও সর্বব্যাপী তাকে আদায়ই হ'ল ধর্মের সারমর্ম; ঐতিহাসিক ঘটনার উপর তার সার্থকতা নির্ভর করে না। আমাদের মধ্যে যে ঈশ্বরীয় বিভূতি আছে তার মৌলিক সত্যের কাল্পনিক চিত্র নিয়েই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমতবাদের সৃষ্টি। আমাদের সত্যবোধ অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ব্যক্ত হয়; কেননা আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যেসব প্রতীকে অভ্যস্ত হয়েছি তারাই আমাদের ঈশ্বরের মর্মগ্রহণ করতে সাহায্য করতে পারে। হৃদয় চিন্তা ও মন দিয়ে গঠিত ধারণাগুলিই সেই সব প্রতীক।[১] তাদের না হলে আমাদের চলে না কেননা কালাতীতকে কালের কাঠামোয়, অবিনশ্বর ঈশ্বরের লীলাকে নশ্বর জগতের মধ্যে প্রত্যক্ষ করার একমাত্র উপায়ই তারা। কাব্য, পুরাণ ও প্রতীকতার উদ্দেশ্যই হ'ল আধ্যাত্মিক জাগরণ ও বিকাশের পথ করে দেওয়া। সব ধর্মসূত্রই হ'ল সান্ত মনের অনন্তকে প্রণিধান করার চেষ্টা। চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার সহায়ক হিসাবেই তাদের মূল্য। লোকেদের জাতি ও ইতিহাস, লিঙ্গ ও মেজাজের প্রয়োজনেব সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়েছে বলেই তাদের বিভিন্নতা। কিন্তু তারা সবই সাময়িক মাত্র[২] কাজেই অসহিষ্ণুতার কোন সার্থকতা নেই। বুদ্ধিসঞ্জাত অনড ধারণাগুলির সঙ্গে ধর্মকে এক বলে ভাবা ঠিক নয়, কেননা ওগুলি সবই তো মনেব সৃষ্টি। যে ধর্ম নিজেকে চরম ও পরম বলে দাবী করে সে নিজের মতসমূহকে বাকী সমস্ত বিশ্বের উপর চাপাতে চায় এবং নিজের মান অনুসারে অন্য লোকেদের সভ্যতা বিতরণ করতে চায়। সমস্ত লোককে নিজের কাঠামোতে ভাববার জন্য দু-তিন রকমের বিশ্বাসপদ্ধতি যদি যুগপৎ চেষ্টা করে তো সংঘাত অবশ্যম্ভাবী, কেননা জগতে যদি পরম বস্তুর স্থান থাকেও তো একাধিক পরমের স্থান নিশ্চয়ই নেই। একাধিক পরমের সংঘর্ষ যে আমাদের কাছে হাস্যকর মনে হয় না, তার সরল কারণ এই যে ও আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। ধর্মজীবনকে আপ্তবাক্যের স্বীকৃতি ও অনুসরণের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে, তার উপর বহিরঙ্গের আনুষ্ঠানিক প্রভাব অনিবার্য। পুরোহিত ও গীর্জাই তখন পরমার্থের স্থান অধিকার করে আর সকলের কাছেই ধর্মেব বিশেষ সূত্রগুলি স্বীকার করার দাবী করা হয়। তুমি

বহিরঙ্গ আছে। যে দেশটি সেই সব অনুসরণ করে, তাব অধিবাসীদেব দৃষ্টিতে বাহিরের সারা জগৎ কাফের, বিদেশী ও বর্বর। তাদের কাছে মানুষের ধর্ম ও অধিকাব শুধু নিজেদের পূজাদেবী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।" Social Contract Bk. IV

১ হৃদাহমনীষা মনসাভিকল্পিত: ঋগ্বেদ ১, ৬১, ২, হৃদামনসামনীষা: ১০ম ১৭৭, ২

২ এই সুপরিচিত শ্লোক বলছে,

রূপম্ রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতম্
স্তুত্যানির্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যৎ তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতম্।

যদি এইসব সূত্র মেনে নিয়ে দলে ভিড়ে যাও তো বরাবরের জন্য অনেক সুবিধা ও সুযোগ পাবে। জীবনের তুলনায় যন্ত্রটি অতিমাত্রায় সরল, এর ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট আর তার ফলও আদমসুমারীর পরিসংখ্যানের দ্বারা বেশ সুনির্দিষ্টভাবে হিসাব করা যায়, কিন্তু ওর প্রভাব শুধু আমাদের স্বভাবের খোসাটার ওপর। আমরা যদি মনে করি যে জোর করে অন্য লোকের মধ্যে আমাদের ধর্ম প্রচার করার অধিকার আছে কেননা আমাদের ধর্ম তাদের চেয়ে উচ্চস্তরের তাহলে আমরা নৈতিক অসঙ্গতির অপরাধে অপরাধী হব যেহেতু উৎপীড়ন, অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ঊর্ধ্বগতির পরিপন্থী। হিন্দুধর্মের এমন কোন গুহ্যসূত্র নেই যার গ্রহণ বা বর্জনের উপর তার অস্তিত্ব নির্ভর করে কেননা তার বিশ্বাস ভাবসূত্রকে অতিক্রম করবে। হিন্দুর কাছে সকল ধর্মই সত্য, যদি তার অনুসরণকারীরা সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তার নির্দেশগুলি পালন করে। তাহলেই তারা সূত্র আক্রমণ করে অভিজ্ঞায় পৌঁছবে, বাধাবুলিকে অতিক্রম করে সত্যের আভাস পাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে শঙ্কর ছয় রকমের গোঁড়া ধর্মমতের উল্লেখ করেছেন। একই সত্যের ভিন্ন ভিন্ন বহির্প্রকাশ তিনি সামগ্রিক গুণগ্রাহিতার সঙ্গে বিচার করতে পারতেন। ইবনাল আরবী লিখেছেন, "আমার অন্তর সব রকম আকারই গ্রহণ করতে পারে, সে যুগপৎ হরিণশিশুর ক্রীড়াভূমি, খ্রীষ্টান সাধুদের মঠ, পৌত্তলিকের মন্দির, তীর্থযাত্রীর কাবা বা টোরার টেবিল আর কোরাণ পুস্তক। আমার প্রেমের দেবতা তাঁর উট যেদিকে চালান, আমি সেই দিকেই তাঁর অনুসরণ করি। আমার ধর্ম ও আমার বিশ্বাসই সত্য।[১] রামকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন আকারের বিশ্বাস ও উপাসনা অভ্যাস করতেন। যারা আধ্যাত্মিক মুক্তি খোঁজে তাদের হিন্দুধর্ম সব রকমে সহায়তা করে এবং যে তুরীয় সত্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যক্ত তার প্রত্যভিজ্ঞা তাদের কাছে এনে দেয়, এইখানেই হিন্দুত্বের ধর্মীয় মূল্য। ধর্মসূত্র ভিন্ন বটে কিন্তু ঐতিহ্য ও জীবনযাপন প্রণালী একই। যখন আমরা সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য ও সংজ্ঞা নিয়ে তর্ক করি তখন আমরা বিভক্ত। কিন্তু আমরা যখন ধর্মজীবনের ধ্যান ও প্রার্থনা কাণ্ডের আশ্রয় নিই, তখন আমরা মিলিত হই। প্রার্থনা যত গভীর হবে, ব্যক্তি ততই ভূমার উপলব্ধির মধ্যে হারিয়ে যাবে। অহমিকার কাঠিন্য গলে যাবে, সূত্রগুলির পরীক্ষা-সাপেক্ষতা প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং সকল আত্মার এক চরম সত্তার মধ্যে তীব্রভাবে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ব্যাপারটা আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়বে। সকল প্রকার ধর্মজিজ্ঞাসার মৌলিক একতা আমরা বুঝতে পারি আর ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়পত্রের মধ্যে একই ধরনের অভিজ্ঞতার হদিস পাই।[২] ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সবই পরম প্রতীক ওঙ্কারের মধ্যে রয়েছেন এবং সেই

"হে প্রভো, রূপবিবর্জিত তোমাতে আমার ধ্যানের রূপ আরোপ করেছি। হে অখিলের গুরু, আমার স্তুতিতে তুমি যে অনির্বচনীয় সে সত্য থেকে দূরে গেছি। তীর্থযাত্রা করে তুমি যে সর্বব্যাপী তাও অস্বীকার করেছি। হে জগদীশ্বর, তুমি আমার এই তিন দোষ ক্ষমা কর।

১ Nicholson, Mystics of Islam (1914) P 105

২ "বৃষ্টির জল যেমন মহাসমুদ্রে পৌঁছায় তেমনি সূর্য, শিব, গণপতি, বিষ্ণু ও শক্তির উপাসকরা আমার কাছে পৌঁছায়।

পরমকে তাঁদের ভক্তরা পূজো করে।[১] যদিও সকল রাস্তাই একই শিখরগামী তবু প্রত্যেক লোকেই নিজের পছন্দমত কোন জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করে। আমরা সবাই ঐতিহ্যের সৃষ্টি এবং ইতিহাসের স্রোতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকি। হিন্দুত্ব কোন বিশেষ মন্ত্রসূক্ত বা গ্রন্থ বা প্রেরিত পুরুষ অথবা প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে জড়িত নয়; তাকে বলা যেতে পারে ক্রমান্বয়ে নব নব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সত্যের নিরলস অনুসন্ধান। মানুষের ঈশ্বরচিন্তার অবিরাম অভিব্যক্তিই হিন্দুধর্ম। এই ধর্মে স্রষ্টা ও ঋষির যেমন শেষ নেই তেমনই শাস্ত্রগ্রন্থেরও শেষ নেই। এই ধর্ম সকল নূতন অভিজ্ঞতা, সত্যের নূতন প্রকাশকে সমাদর করে। প্রদীপ যেমনই হোক তার আলো সর্বত্র সমাদৃত, যেমন যে বাগানেই ফুটুক গোলাপ সব সময়েই সুন্দর।

আচার বিচার ও বিশিষ্ট মতবাদের সঙ্গে যে ধর্ম এক হয়ে গেছে তা থেকে আধ্যাত্মিক জীবনকে পৃথক করে দেখতে হবে কেননা আধ্যাত্মিক জীবনে চেতনার পরিবর্তনই আসল কথা, অন্য সব তার উপায় মাত্র। খ্রীষ্টীয় প্রতীকের ভাষায় ধর্মের উদ্দেশ্য হ'ল ঈশ্বরপুত্রের অনন্ত নবজন্ম আর তাঁর দ্বারা স্বাভাবিক স্বার্থসঞ্জাত ভেদ থেকে উদ্ধার। সংগঠিত ধর্ম যদি মানুষের জীবন ও সমাজকে পরিবর্তিত করতে সক্ষম না হয়ে থাকে সে শুধু এইজন্য যে তারা এটা যথেষ্ট স্পষ্ট করে বলেনি যে পারমার্থিক সত্তার দিকে পথ দেখানোই তাদের একমাত্র সার্থকতা। মানব-স্বভাব পরিবর্তন করতে হলে মানুষের উপর ভাসা ভাসা ভাবের প্রয়োগ না করে তার স্বভাবকে আমূল পরিবর্তন করার প্রয়োজন। সমস্ত ধর্মেরই লক্ষ্য হ'ল আধ্যাত্মিক জীবন। তাদের উদ্দেশ্য একই, কেবল নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে কতখানি প্রগতি দেখাতে পারে সেইখানেই তাদের তফাৎ। এক ধর্মের সঙ্গে আর এক ধর্মের তুলনা করলে দেখতে পাব যে যা কিছু প্রভেদ তা আচার ও বিধির প্রভেদ। তাদের অতিক্রম করে যদি গভীরে প্রবেশ করি তো দেখব যে একই অতলস্পর্শী উৎস থেকে তারা শক্তি সংগ্রহ করছে। খ্রীষ্টানদের খ্রীষ্টের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বাস্তবতাকে হিন্দু অস্বীকার করে না আবার নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ মধ্যপন্থা ধরে চলে যে আশ্বাস পান তাকেও বিদ্রূপ করে না। দিনদুনিয়ার মালিকের কাছে মুসলমানদের স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকারের বর্ণনাকে হিন্দুরা অস্বীকার করে না। এই মৌলিক ঐক্যবোধ থাকলে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের সাধারণ ভিত্তিতে খানিকটা সহযোগিতা সম্ভব হবে। এমন কি সাম্প্রদায়িক ধর্মবাদেও বিস্তৃততর সমতা এখন সম্ভাব্য। জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের মত, যখন বড় বড় ধর্মগুলির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তখন অন্য মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করা দুরূহ ছিল বলে তাদের জন্ম ও বৃদ্ধি পৃথিবীর সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে হয়েছিল। কিন্তু এখন বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের কল্যাণে একটা সর্বজাগতিক সংস্কৃতি দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছে। সমস্ত ধর্মই নূতন ভঙ্গীতে

সৌরাঃ শৈবাশ্চ গাণেশঃ বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ
মামেব প্রাপ্নুবম্ তীহ বর্ষপাস্ সাগরং যথা।"

১ অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট, উকারাস্তু মহেশ্বরঃ, মকারে নোচ্যতে ব্রহ্ম প্রণবেন ত্রয়ো মতঃ।

প্রচার করতে আরম্ভ করেছে এবং ফলে তারা পরস্পরের খুবই কাছাকাছি চলে আসছে। অসমর্থনীয় প্রত্যয়গুলো অস্বীকার না করে একপাশে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। আর ধর্মের মধ্যে যে সর্বজনীন উপাদান সর্ববাদিসম্মত তার উপরেই জোর দেওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ পদ্ধতি আরও দ্রুততর হবে এবং ক্রমশঃ ধর্মসমন্বয় থেকে এক সর্বজাগতিক ধর্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে।

পরধর্মসহিষ্ণুতা হিন্দুদের একটা স্বীকৃত সিদ্ধান্ত। অশোক এবং তার উত্তরাধিকারী দশরথ নাস্তিক আজীবকদেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। মনু আমাদের ধর্মদ্রোহীদের আচরণেরও সম্মান করতে বলেছেন।[১] যাজ্ঞবল্ক্য ধর্মদ্রোহীদের আচারকে স্বীকার করেছেন।[২] সংক্ষেপে সমস্ত আস্তিক ও নাস্তিকদের রক্ষা করার কর্তব্য দেওয়া হয়েছিল শাসকদের উপর। মুসলিম ঐতিহাসিক কাফি খাঁ লিখেছেন, "তিনি (শিবজী) নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে তাঁর অনুচররা যখন লুট করতে যাবে তখন যেন কোন মসজিদ, ধর্মগ্রন্থ বা স্ত্রীজাতীর উপর হস্তক্ষেপ না করে। কোরাণ হাতে পড়লে তিনি তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে তাঁর মুসলমান অনুচরদের দিয়ে দিতেন। যদি কোন হিন্দু বা মুসলমান উপজাতির স্ত্রীলোক তাঁর লোকদের হাতে বন্দী হ'ত আর তাঁদের কোন বন্ধুবান্ধবের খোঁজ পাওয়া না যেত তো তিনি তাদের তত্ত্বাবধান করতেন, যতদিন না তাদের মুক্তি ক্রয় করবার জন্য কোন আত্মীয় হাজির হ'ত।[৩]

ব্যক্তির প্রকৃতি

ঐতিহাসিক ধর্মবিশ্বাস ও একমুখী ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে ব্যক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে মৌলিক প্রভেদ আছে। ধর্মের শিক্ষা হ'ল যে মানুষের মধ্যে ভগবান আছেন, এবং ভালমন্দ বেছে নেবার ক্ষমতা মানুষের আছে এবং এই ক্ষমতা থাকার জন্যই সে পশু থেকে পৃথক আর সেইজন্যই মনুষ্যজীবন রক্ষা করা পবিত্র কর্তব্য। স্পন্দিত বক্ষ, খণ্ডিত ইচ্ছা, বিপুল মর্যাদা বোধ ও অভাবিত দুঃখের অধিকারী ব্যক্তিমানুষই জীবনের আসল একক। এই মানুষের উপর বিশ্বাস, তার নিজেকে পূর্ণাঙ্গ করার, নিজেকে শাসন করে আত্মশুদ্ধি করা যেতে পারে এমন সমাজ গঠন করার অধিকার ও কর্তব্য স্বীকৃতির প্রকাশই হল গণতন্ত্র। প্রচলিত ধর্মে মানুষ মাত্রকেই পবিত্র সত্তা বলে মনে করা হয় কিন্তু মার্কসের কাছে মানুষ শুধু "সামাজিক সম্পর্কের একটা সমষ্টি।" তিনি বলেন, "মনুষ্যত্ব ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বর্তমান কোন

১ চতুর্থ, ৬১

২ দ্বিতীয়, ১৯২

৩ শিবাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে এই রকম উক্তি যে লিপিবদ্ধ হয়েছে "এদিন (১৬৮০ সালের ৫ই এপ্রিল) কাফেরটা নরকে গেল," এ তারই সাক্ষ্য। সম্প্রতি হায়দ্রাবাদের নিজামের উল্লেখযোগ্য ঘোষণা এই ভাবের সঙ্গে সুসঙ্গত। "আমার রাজত্বে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোক বাস করে আর তাদের পূজার স্থানকে রক্ষা করা বহুদিন থেকে আমার রাজ্যের সংবিধানের অন্তর্গত।"

বিমূর্ত গুণ নয়, আসলে মনুষ্যত্ব সামাজিক সম্পর্কের সংগ্রহ মাত্র।[১] সমাজই আসল, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আপাত প্রতীয়মান অর্থাৎ মায়া মাত্র। হিটলার বলেন, "ব্যক্তিমানুষের আত্মার অনন্ত সম্ভাবনা ও স্বকীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয় মতবাদের বিরুদ্ধে মানবসত্তার ব্যক্তিগত তুচ্ছতা ও শূন্যতা এবং জাতির দৃশ্যতঃ অমরতার মধ্যে তার অস্তিত্বের স্থায়িত্বের ত্রাণকারী মতবাদ হিমানী সদৃশ স্বচ্ছতার সঙ্গে আমি দাঁড় করাচ্ছি।"[২] হিটলার তাঁর মাইন ক্যাম্ফ পুস্তকে লিখেছেন, "ব্যক্তিমাত্রের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদার অধিকার আছে এ মতবাদ থেকে বিনাশ ছাড়া আর কিছু আসতে পারে না।" হিটলারের মতে সমাজতন্ত্রের মূল সূত্র হ'ল সমস্ত ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের প্রাধান্য স্থাপন এবং দল দ্বারা রাষ্ট্রের চরম নিয়ন্ত্রণ। তিনি বলেন, "এমন কোন মুক্ত স্থান বা সনদ থাকবে না যেখানে বা যার জোরে ব্যক্তি শুধু নিজের অধিকারে থাকবে, এই হ'ল সমাজতন্ত্র—উৎপাদনী উপায়ের বেসরকারী দখল ইত্যাদি তুচ্ছ জিনিস নয়। সে সবের কি দাম যদি আমি সকলকে একই অনতিক্রম্য শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে পারি? তাদের জমি, কারখানা যত ইচ্ছা থাকুক। চূড়ান্ত ব্যাপার হ'ল যে রাষ্ট্র দলের মাধ্যমে সকলের উপরে, তারা মালিকই হোক বা মজুরই হোক। ব্যাঙ্ক বা কারখানাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার দরকার কি? আমরা মানুষকে রাষ্ট্রায়ত্ত করি:"[৩] মানুষ থেকে তার নিজস্ব ইতিহাস, তার নিয়তি, তার অন্তরের অতীত সব বের করে দিয়ে শূন্য করা হবে। তাকে ধরা হচ্ছে একটা লক্ষ্যহীন, চপল, বিচারশক্তিবিহীন প্রাণী হিসাবে; স্বকীয় মন বা ইচ্ছাবর্জিত তাকে যারা নিজেদের তাদের শাসক স্থানে নির্বাচিত করেছে, তাবা পশুর মত তাড়িত করবে বা মোমের মত ছাঁচে ফেলে গড়বে। আমাদের স্বকীয়তার অধিকার যদি স্বাতন্ত্র্য হয় তো সেই স্বাতন্ত্র্য হরণ করার এই আগ্রহ থেকেই মানুষের পতন বোঝা যায়। যূথের কাছে মানবাত্মার বশ্যতায় আমাদের যুক্তি ক্ষমতাবান পশুজাতিতে পরিণত করেছে। কেননা পশুজগতে জাতির কাছে এককের দাম সামান্য।

বিবেকের স্বাধীনতা রূপ স্বাভাবিক অধিকারকে "উদারনীতিক মায়া" বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই মায়ার পিছনে ধনিকতন্ত্র আশ্রয় পায়। মনুষ্যত্বের সামাজিক দিকের সঙ্গেই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সম্পর্ক। ব্যক্তি যে সমাজে বাস করে তার গঠন ভাল না হলে তার অন্তর্গত কোনব্যক্তিই ভাল হতে পারে না। আমরা ব্যক্তি-মানুষকে না বদলালে সমাজকে বদলাতে পারব না, ধর্মপ্রাণ মানুষদের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে মার্কসের মত হ'ল, সমাজ না বদলালে মানুষও বদলাবে না।

আমরা যে জগতে বাস করি সেখানে যন্ত্রের ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেরই প্রাধান্য, মানুষের স্বভাবের যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই বেশী গ্রাহ্য। মনঃসমীক্ষণ মানুষকে অবচেতন আবেগসমূহের অসহায় ক্রীতদাস বলে মনে করে, চিকিৎসকরা নাকি তাদের আমূল পরিবর্তন করতে পারবেন। চেষ্টিতবাদ (behaviourism) মনুষ্য শিশুর মনকে

১ ফয়েরবাখের উপর ষষ্ঠ থিসিস। ২ হেরমান রৌসনিং, Hitler Speaks (1939) p. 222-3। ৩ রৌসনিং, Voice of Destruction.

একেবারে শূন্য ফলক বলে মনে করে, সেখানে নাকি আমরা যা খুশী লিখতে পারি। মানুষের দুষ্ট বুদ্ধি নাকি অসুস্থ গ্রন্থি ও অজ্ঞ অভ্যাস থেকে উদ্ভূত। মার্কসবাদী বিশ্বাস করে যে আত্মা সম্পূর্ণভাবে অবস্থার সৃষ্টি, বিশেষ করে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার। তার মনন, মূল্যায়ন ও মীমাংসা তার স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া নয়, সেগুলি যে সামাজিক পরিবেশে সে থাকতে বাধ্য হয়েছে তারই মনস্তাত্ত্বিক উপজাত সামগ্রী। মার্কস্ লিখেছিলেন: "মানুষের চেতনা তার অস্তিত্বকে নির্ধারিত করে না, অপর পক্ষে তার সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে নির্ধারিত করে।" তাঁর অনুসারীরা এই মতকে অনমনীয় নিয়তিবাদে পর্যবসিত করেছে এবং বলে যে চেতনা একটি উপঘটনা মাত্র। ইতিহাসের অমোঘ বিধানে যখন অবস্থার পরিবর্তন হবে তখন ব্যক্তিও বদলাবে। মানুষের ব্যবহার সামাজিক উপপত্তি দিয়েই নির্ধারিত। স্পিনোজা বলেছিলেন যে শূন্যে পড়ন্ত প্রস্তরখণ্ড যদি চিন্তা করতে পারত তো হয়ত কল্পনা করত যে সে তার নিজের পথ স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে, কেননা বহিরস্থ হেতুগুলি তার অজানা। যদি তাই হয়ও তো আমাদের ব্যবহারের নৈসর্গিক কারণের অজ্ঞতা থেকে আমাদের মনে হতে পারে যে আমরা ঠিক পড়ন্ত প্রস্তরখণ্ড নই। অবিচলিত নৈসর্গিক প্রক্রিয়ার ফলেই সব কিছু ঘটে। মানুষ এক নৈসর্গিক বস্তু, যে সব পরিস্থিতিতে বস্তু পড়ে বা গাছ পড়ে বা গ্রহরা কক্ষপথে আবর্তন করে তাদের নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা যেমন অমোঘ, মানুষের পছন্দ অপছন্দও তেমনি অমোঘ নিয়ন্ত্রণের অধীন। আসলে আর্থিক স্বার্থসঞ্জাত প্রক্রিয়ার কারণটাকে বিরোধী সম্প্রদায়ের ভাববাদীরা নানা যুক্তি দিয়ে সুসঙ্গত বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। ফলে মানুষের ক্রিয়াকে অন্ধ ও স্বয়ংক্রিয় বলে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে।

সমসাময়িক ঘটনা দেখলে মনে হয় যে আমরা জাগতিক শক্তির অসহায় পাত্র, এবং সেসব শক্তি তাদের পূর্বনির্দিষ্ট পরিণতির দিকেই চলেছে। আমরা যা কল্পনা করি তা থেকে আমাদের স্বাধীনতা অনেক অনেক কম। এই সম্মোহিত জগতে আমাদের অধিকাংশই ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য হয়। ইচ্ছাকে প্রয়োগ করতে করতে শ্রান্ত হয়ে আমরা আনন্দের সঙ্গে অদৃষ্টকে মেনে নিই। জগৎ বেনামী হয়ে পড়েছে, আর ব্যক্তি তার মধ্যে হারিয়ে গেছে। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোথায় আমাদের শক্তির বিকাশ ও বুদ্ধিকে শাণিত করার শিক্ষা দেবে, তা নয়, তার বদলে আমাদের অনুমোদিত ছাঁচে ফেলে, কতকগুলি তথ্য ভরে দিয়ে দেশভক্তি, জাতীয়তা ও ধর্মের উদ্দীপনাসমূহের যথাযথ সাড়া দিতে শেখাচ্ছে। আমরা সার্কাসের শিক্ষিত পশুর মত, পুতুলনাচের সক্রিয় পুতুলের মত আচরণ করছি। আত্মা আবিষ্ট আর মুখ বৈশিষ্ট্যহীন হয়ে পড়ছে। যূথবদ্ধ চিন্তা ঠিক চিন্তা নয়, সহজাত প্রবৃত্তির মত তার ক্রিয়া। আমরা সকল সংস্পর্শবর্জিত সাধারণ মানুষ হয়ে পড়ি, সমাজ রাষ্ট্র আচার আইন ও ব্যক্তি সম্বন্ধে কতকগুলি বাঁধা বুলি কপচে যাই। মানুষের সাহসিকতার কথা আমাদের মাথায়ই আসে না। অপরিণত-মনা প্রাণী হিসাবে আমরা গড়ে উঠি; যে কোন রকম উত্তেজনায় আমাদের লোভ থাকে, অস্পষ্ট অসন্তোষে মন ভরে থাকে, কোন কিছুর উপর দোষ চাপিয়ে তাকে ঘৃণা করার সর্বদা আগ্রহ থাকে। স্বেচ্ছায় মানুষের জীবনকে দীনতায় ভরে রাখা

হয়। পারিবারিক স্নেহ, আয়াস প্রীতি, জ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি নাকি মানসিক দাসত্ব, অ্যাপেন্ডিকসের মত বনমানুষীয় যুগের স্মৃতিবাহক খর্বীকৃত উপাঙ্গ আর ওসব থেকে আমাদের মুক্তিই কাম্য। দরকার হলে আমাদের পিতা-মাতার উপরও পশুবল প্রয়োগ করতে দ্বিধা না করার উপদেশ অনবরত শেখানো হচ্ছে। ইতিহাসের নিয়তি ও তার প্রতিরোধের চেষ্টায় ব্যর্থতা ও মানুষের অকিঞ্চিৎকরতা এইসব এখনকার শ্রদ্ধেয় মত। আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করি না, ইতিহাসই আমাদেব গড়ে। নেতৃবন্দ উত্তেজনা, ইঙ্গিত প্রভৃতি বর্তমান যুগের সমস্ত রকম বাধ্যতাকারী প্রণালী প্রয়োগ কবে জনতাকে বশে রাখেন। সাধারণভাবে লোকে অনুভব কবে যে পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টো দিকে গিয়ে কোনও লাভ নেই, কেননা এসব আন্দোলন পরিস্থিতির সুযৌক্তিক পরিণতি, আর অনিবার্য ঘটনাস্রোতের কাছে আমাদের মাথা নত করতেই হবে। আগেকার নিয়তিবাদকেই লাগসই কাপড়চোপড়ে সাজিয়ে বর্তমান যুগের প্রচলিত পদ্ধতির সাহায্যে প্রচার কবা হচ্ছে। ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা আসলে নৈসর্গিক ঘটনাব উপর মানুষের বুদ্ধিব প্রাধান্য প্রকাশ করে, কিন্তু সাধারণ মানুষের উপর তার প্রভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে উল্টো, কেননা তাদেব উপর যন্ত্রের প্রাধান্যই বেশী। মানুষের চেতনাই যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে, মানবাত্মার নূতন নূতন স্বয়ংক্রিয়তা জন্ম নিচ্ছে। কোন রকম উচ্চ আদর্শ সামনে না রেখেই যে আমাদের অধিকাংশ জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি তাই নয়, আমরা উচ্চ আদর্শ সামনে রাখতে চাই না। দিনগত পাপক্ষয় করে জলের উপর বৃষ্টিবিন্দুজাত বুদ্বুদের মত লোপ পেতেই চাই। জীবনে শুধু নিষ্ফল ব্যস্ততা ও অন্তহীন বক্তৃতা। বেশীর ভাগ লোকই পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত অনুভব করছে যে তারা সম্পূর্ণ নিরর্থক জগতে নিদারুণ তুচ্ছতার সঙ্গে জীবনযন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে।

এই কি আমাদের স্বাধীনতার পবিত্র উত্তরাধিকার? স্বাধীনতা কথাটা সহজে ব্যবহার করা যায় কিন্তু তার সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। বর্তমানের যুযুধান জাতিরা ঘোষণা করেছে যে তাবা শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে তারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্য অহিংস সংগ্রাম চালাচ্ছে। শ্রমিকেরা বিশ্বাস করে যে যখন তারা বেশী মাইনে চায়, মালিকানার অংশ চায়, মদ্যপান বর্জন চায় বা মন্দিরে প্রবেশের অধিকার চায় তখন তারা স্বাধীনতার জন্যই যুদ্ধ করছে। স্বাধীনতা যেন এক রকমের হোল্ড্-অল তার মধ্যে যা হয় পুরে দিলেই হ'ল। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা বলতে অন্য লোকের বশ্যতা ও প্রাধান্য থেকে মুক্তি বোঝায়। সাংবিধানিক স্বাধীনতা হ'ল কোন শ্রেণী বা একনায়কের স্বৈরাচার থেকে নিস্তার; শ্রেণী-সুবিধা মানব-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অপরাধ। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হ'ল দারিদ্র্যের সঙ্কীর্ণতা ও আর্থিক চাপ থেকে মুক্তি। আইনের স্বাধীনতা হ'ল আইনের উপর নির্ভরতা। যেসব আইন আমাদের সংযত ও রক্ষা করে তারা আমাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত, কাজেই যতদিন সে সব প্রত্যাহৃত না হয়, ততদিন সমাজের ছোট বড় সকলেরই তা মেনে চলা উচিত। আইন ছিল যে "কোন স্বাধীন লোককে ধরা বা বন্দী করা হবে

না, তার অঙ্গহানি বা তাকে আইনবহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হবে না, তাকে নির্বাসিত বা বিনষ্ট করা হবে না।" দেহ বিক্রয় থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতা। তারপর সামাজিক স্বাধীনতা আছে। কিন্তু এসবই হ'ল পথ, লক্ষ্যবস্তু নয়; মানবাত্মার গভীরতম শক্তিকে জাগ্রত করতে সহায়তা করার অত্যাবশ্যক উপায় মাত্র। সামাজিক সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তির আত্মিক মুক্তিলাভ, মানুষের সৃজনীশক্তির বিকাশ, তাকে পীড়াদায়ক আইনকানুন ও আচার-ব্যবহারের নিগড় থেকে মুক্ত করে ইচ্ছামত ভাবতে, অনুভব করতে ও ভালবাসতে সাহায্য করা। এমন অবস্থা হতে পারে যে ন্যায্য আর্থিক ব্যবস্থার জন্য আমাদের অধিকার ও সম্পত্তি ত্যাগ করার আহ্বান আসবে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার জন্য আমাদের জাতীয় স্বাধীনতাকে সংযত করতে হতে পারে, কিন্তু আত্মিক স্বাধীনতা চরম ও পরম বস্তু, তাকে ছাড়া মানে আত্মার বিনাশ। মহাভারতে আছে আত্মার জন্য পৃথিবী বর্জন করা যায় "আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ"[১] "সারা জগৎ পেয়েও আত্মা যদি হারাতে হয় তো মানুষের লাভ কি?"[২] সক্রেটিসের মধ্যে স্বাধীনতা-প্রার্থী আত্মার চরম উদাহরণ পাই। তিনি তাকে মণি ও সোনার থেকে বেশী মূল্য দিয়ে গেছেন। প্রত্যক্ষ ও আবেগকম্পিত-কণ্ঠে সক্রেটিস বলেছেন, "আমার সত্যানুসন্ধান পরিত্যাগ করার বদলে

---

১ ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ। মহাভারত ১, ১১৫, ৩৬
(পরিবারের জন্য একজনকে ত্যাগ করা যায়, গ্রামের জন্য একটি পরিবার ত্যাগ করা যায়, জনপদের জন্য গ্রামকে ত্যাগ করা যায়, কিন্তু আত্মার জন্য পৃথিবী ত্যাগ করা যায়) সভাপর্ব ৬১, ১১ ও দ্রষ্টব্য।

২ But there is yet a liberty unsung
By poets and by senators unpraised,
Which monarch cannot grant nor all the powers
Of earth and hell confederate take away;
A liberty which persecution, fraud,
Oppression, prison, have no power to bind.
Which who so tastes can be enslaved no more.
'Tis liberty of heart, derived from Heaven,
Bought with his blood, who gave it to mankind,
And sealed with the same token. It is held
By charter, and that charter sanctioned sure
By the unimpeachable and awful oath
And promise of a God. His other gifts
All bear the royal stamp that speaks them his,
And are august, but this transcend them all.

Cowper, The Task, V.

যদি আমাকে অব্যাহতি দেবার প্রস্তাব থাকে তো আমি বলব, হে আথেন্সবাসীরা আমি আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি কিন্তু আমাকে ঈশ্বরের নির্দেশে চলতে হবে, তিনিই আমাকে কাজ দেখিয়ে দিয়েছেন, আপনারা নয় এবং যতদিন আমার শক্তি ও প্রাণ থাকবে ততদিন আমার দার্শনিকের পেশা পরিত্যাগ করব না। আমার বর্তমান অভ্যাসমত যার সঙ্গে দেখা হবে তাকেই ডেকে ডেকে বলব 'জ্ঞান, সত্য ও আত্মিক উন্নতির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ধনমানের কাছে অন্তর সমর্পণ করতে তোমাদের লজ্জা করে না? মৃত্যুকে আমি জানি না, হয়ত ভাল জিনিসও হতে পারে আর আমি তার জন্য ভীত নই। কিন্তু আমি জানি যে কারুর নির্দিষ্ট কর্ম পরিত্যাগ করা খারাপ। সেটা ভাল হতেও পারে (মৃত্যু) তা আমার জ্ঞানতঃ যা মন্দ (কর্মত্যাগ) তার থেকে শ্রেয়ঃ।"[১]

সংঘবদ্ধ সমাজে কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পারে না। বেশী মূল্যের স্বাধীনতার জন্য কম মূল্যের স্বাধীনতা বর্জন করাই হ'ল সভ্যতা। মন ও আত্মার মুক্তিই হ'ল সর্বোচ্চ স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা কারুর ক্ষতি না করে সকলের মঙ্গলের জন্য ভোগ করা যায়। ব্যক্তির দায়িত্ব সম্বলিত জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই রাষ্ট্র। ব্যক্তিকে নিয়ে এবং ব্যক্তির জন্যই তাব অস্তিত্ব। ব্যক্তির মধ্যেই জীবনের প্রকাশ। ব্যক্তিই পৃথিবীর কেন্দ্র। তার কাছেই সত্য প্রকাশিত হয়। সে শেখে ও কষ্ট পায়, আনন্দ ও দুঃখ, ক্ষমা ও ঘৃণার সে-ই আধার। বিজয়ের পুলক শিহরণ ও তার ব্যর্থতার বিপুল বেদনাও তার। সমস্ত কম্পন ও শিহরণ নিয়ে সম্পূর্ণ জীবন যাপন করার অধিকার তার।[২] খেয়ালী ও একগুঁয়ে হবার, গোঁড়ামি ও গতানুগতিকতা বর্জন করার সুযোগ চাই। অস্বস্তি বোধ করে এমন লোকের দ্বারাই জগতের সমস্ত প্রগতি সাধিত হয়েছে। সভ্যতার পিছনে পড়ে থাকা, মনুষ্যত্বের ধ্বংসাবশেষ চোর-ছ্যাঁচড়েরও নিজস্ব সত্তা আছে, তার বিশেষ বিশেষ আগ্রহ ও গুণ আছে।[৩] তাদের স্বভাব দুর্বোধ্য হলেও সুযোগ সুবিধা পেলে তাদেব মধ্যেও সৎপ্রবৃত্তি জাগ্রত করা যায়। রাষ্ট্রের কর্তব্য হল এমন ব্যবস্থা করা যাতে মানুষের চোখে মনুষ্যত্বের স্বীকৃতির আলো না কমে আসে। প্রত্যেক মানবাত্মার শক্তি ও মর্যাদা আয়ত্ত করা চাই, তার সৎপ্রবৃত্তি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্নেহময় করুণা দেখানোর সুযোগ চাই, কেউ কারুর মত নয়, যদিও প্রত্যেকেরই তার নিজের মত করে সম্পূর্ণতার প্রয়াসী। কোনও কারণে যদি আমরা এই মৌলিক স্বাধীনতাকে খর্ব করি তো বাকী সমস্ত স্বাধীনতাই উবে যাবে।[৪] মানবাত্মার অখণ্ড পবিত্রতা

---

১ Bury. A History of Freedom of Thought (১৯১৩)

২ লোকে একাই জন্মায়, একাই মরে, একাই কর্মফল ভোগ করে (একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে। একোহনুভুংক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্ ॥)

৩ ব্রহ্মণই ক্রীতদাস, ব্রহ্মণই পাপী। (ব্রহ্মদাসঃ ব্রহ্মাকি তবাঃ)

৪ বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন—"যে সামান্য সাময়িক নিরাপত্তার জন্য স্বাধীনতার সার বর্জন করে সে স্বাধীনতারও যোগ্য নয়, নিরাপত্তারও যোগ্য নয়।"

মানব মনের স্বাধীনতা রক্ষাই রাষ্ট্রের অস্তিত্বের একমাত্র কারণ।[১] আমাদের সকলকে জমিয়ে এক লোক করা যায় না, যদিও আমাদের তাড়িয়ে একই জনতায় ভিড়িয়ে দেওয়া যায়। আমরা আলাদা জন্মেছি, আলাদা মরব এবং আমাদের জীবনের সারাংশে আমরা নিঃসঙ্গ। ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর ধর্ম রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

এই কথা স্বীকার করার জন্যই বহিরাক্রমণকারীরা ভারতে অপেক্ষাকৃত সহজেই নিজেদের স্থাপিত করতে পেরেছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ লোকের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে হস্তক্ষেপ করা না হয়েছে, যতদিন পর্যন্ত রূপকার দার্শনিক ও চিন্তানায়করা সত্যের সন্ধান ও রূপ সৃষ্টি করার অব্যাহত স্বাধীনতা পেয়েছে আর সাধারণ লোকেরা যতদিন দেহ মন ও আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম আচরণ করতে পেরেছে, গার্হস্থ্য শ্লীলতা বজায় রাখতে পেরেছে, সরল স্নেহ, অবিমিশ্র আনুগত্য, গভীর ভক্তি প্রভৃতি মনুষ্যজীবনের সব থেকে পবিত্র ও ঘনিষ্ঠ অংশকে উপভোগ করতে পেরেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব কার তা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় নি। সামাজিক ঔচিত্যবোধ দ্বারা আচরণ নিয়ন্ত্রিত হলেও চিন্তা সর্বদা স্বাধীন ছিল।[২]

সাংসারিক ঐশ্বর্য দিয়ে মানসিক শান্তি পাওয়া যায়, ঐহিক সুখ-সুবিধা দিয়ে মানুষের অন্তর জয় করা যায়, এই বিশ্বাস বর্তমান জীবনের একটা ভ্রান্তি। ধরে নেওয়া হয় যে প্রত্যেকের ঐহিক অভাব যদি সম্পূর্ণভাবে মিটে যায়, তাহলেই তার স্বর্গের ও পরম মূল্যের বাসনাও লোপ পাবে। কিন্তু জীবনের চেয়ে অধিক মূল্যবান কোন ঐহিক সুখ-সুবিধা আছে কি, মৃত্যুর থেকে কোন ভীষণতর ঐহিক সঙ্কট? স্বার্থের থেকে প্রবৃত্তি ও আদর্শ দিয়ে আমরা বেশী চালিত হই। জীবন শুধু আর্থিক মূল্যে হিসাব করা যায় না। আমরা মানুষ শুধু উৎপাদক বা খাদক, শ্রমিক বা খরিদ্দার নই। পৃথিবী যদিও ধনধান্যে পূর্ণ স্বর্গরাজ্য হয়, আমাদের সবাইয়ের যদি সস্তায় মোটর গাড়ি ও রেডিও থাকেও, তাহলেই মানসিক শান্তি বা আসল সুখ আসবে না। যে সব নরনারীর জড় সভ্যতার সমস্ত প্রকার আরাম ও সুবিধা আয়ত্তে আছে তারাও নিজেদের ব্যর্থ মনে করছে—যেন কিছু থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। মানুষের বাঁচবার উদ্দেশ্য বর্তমান আরাম নয়, আত্মার জীবন, নৈর্ব্যক্তিক লক্ষ্যের সন্ধান, আত্মরতি, আত্মক্রীড়া। আপস্তম্ব ঘোষণা করেছেন যে আত্মার অধিকারের উপরে আর কিছু নেই।[৩] শাসনযন্ত্র দ্বারা যে মন চূর্ণ হয় নি, অন্ধকারের শক্তিদ্বারা দৈব আলোক যেখানে চাপা পড়ে নি সেইখানেই মনুষ্যত্বের আশা।

---

১ স্পিনোৎসা বলেন,—"ভয় দেখিয়ে শাসন ও নিবন্ত করা সমাজের চরম লক্ষ্য নয়। বরং তাকে ভয়মুক্ত করে সকল রকম সম্ভাব্য নিরাপত্তায় বাস করতে দেওয়া এবং নির্ভীক চিন্তা করবার উপায় করে দেওয়া রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। সরকারের কর্তব্য হল স্বাধীনতা দেওয়া।" Theologico-political Treatise.

২ বিচারঃ স্বতন্ত্রঃ আচারঃ সমাজসম্বরতন্ত্রঃ।

৩ আত্মলাভান ন পরং বিদ্যতে। ধর্মসূত্র, ১. ৭. ২

বাহিরের আর অন্তরের সুখ যেন আমরা গুলিয়ে না ফেলি। দৈব যদি অনুকূল হয়, তো আমরা দীপ্ত চোখে পৃথিবীর শ্রদ্ধা প্রশংসা ও ভালবাসা পেয়ে ধন্য হয়ে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে দিই। আমরা আদুরে ও খেয়ালী বালকদের মত মনে করি যে যা আছে তার আর অন্য রূপ সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের চিন্তা যদি সৎ হয় তো আমরা বুঝতে পারি, পৃথিবী আমাদের কি ভাবছে তাতে কিছু যায় আসে না, আমরা নিজেদের সম্বন্ধে কি ভাবছি সেইটাই আসল কথা। সদাচার, মার্জিত রুচি, রূপ এই হ'ল সুখের আধার, কুশ্রীতা, ইতরতা, খলতাই হ'ল অসুখের কারণ। সবল জীবন, সামান্য সৌহার্দ্য, সামান্য সুখ, যার সাধনে নিজেকে সমর্পণ করতে পারি এমন একটা উদ্দেশ্য, এসব আমরা সকলেই চাই। আত্মিক স্বাধীনতার ধ্বংসাবশেষের উপর যে সমাজের সংগঠন তা নীতিবর্জিত। সম্পত্তি বা সমাজের বিরুদ্ধে পাপের ক্ষমা আছে কিন্তু পরমাত্মার বিরুদ্ধে পাপের ক্ষমা নেই কেননা তাতে আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর আঘাত করি।

মোটামুটি যেরকম দেহ ও মস্তিষ্ক নিয়ে মানুষ এখন চলাফেরা করছে, তাই নিয়েই সে সহস্র সহস্র বছর কাটিয়েছে। জঙ্গলে, গুহায় রাত্রির ও বনের আতঙ্কে, অসুর ও ডাইনীকে খুশী করে, কুস্তিগীরের খেলা দেখে, ধর্মদ্রোহীর উৎপীড়ন ও বিচারের অত্যাচার উপভোগ করতে করতে বহুদিন কেটে গেছে। বহু শতাব্দীর নিষ্ঠুরতার ও বর্বরতার শেষে মানবসভ্যতার জন্ম, তার বয়স অল্প। মনুষ্যত্ব ও সংস্কৃতি নৈসর্গিক বস্তু নয়, ওকে চিন্তার বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বারা কর্ষণ করতে হয়। সুরুচি ও ঐতিহ্য সংস্কৃতি থেকে উৎপন্ন হয়। জনতার স্তরে সামাজিক সংস্থাকে নামিয়ে না এনে জনতাকেই আসল সংস্কৃতির স্তরে তোলা উচিত। বিশ্বব্যাপী সাম্যের অর্থ সকলকে সমানভাবে ইতর করা নয়। গণমনের স্তরের নিম্নতার জন্যই স্বৈরাচার বৃদ্ধি পায়।[১]

জীবন ও সত্য সম্বন্ধে ধারণা থেকেই সভ্য মানুষকে বর্বর থেকে পৃথক করা যায়। সভ্য মানুষ সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য ও যুক্তি শান্তভাবে বিবেচনা করে মীমাংসায় উপনীত হয়, কিন্তু বর্বরেরা উত্তেজনা, কুসংস্কার ও তাৎক্ষণিক বাঁধা বুলি দিয়ে চালিত হয়। গণপ্রচার হৃদয়াবেগকে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যক্তিগত আহ্বানে বুদ্ধির সাড়া মেলে। অসন্তুষ্ট ও হতাশ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও দুঃসাহসী, অতিশয় প্রাণবন্ত অথচ হিস্টিরিয়া ও ইঙ্গিতের প্রভাবের অতিমাত্রায় দাস দায়িত্বজ্ঞানহীন যুবকরা ঐতিহ্যকে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা রক্ষা করার উপায় বলে উড়িয়ে দেয় এবং তাদের অজানা ভবিষ্যৎ স্থাপনা করবার জন্য

১ প্লেটো তাঁর রিপাবলিক পুস্তকের অষ্টম খণ্ডে বলছেন, "গণতন্ত্র থেকেই স্বৈরাচার জন্মায়, অত্যন্ত স্বাধীন সমাজ থেকে নিষ্ঠুরতম ও সর্বাত্মক দাস প্রথার সৃষ্টি।" নীটসে বলেন, "বর্তমান জীবনের অবস্থায় সকল লোককে মধ্যবর্তী স্তরে নামিয়ে আনা হয়। পরিশ্রমী ও ব্যবহারযোগ্য যূথ জানোয়ারের ধরনের মানুষ তৈরী হয়, এদের সব রকম কাজে লাগানো চলে। এর মধ্যে এক-আধজন বিপজ্জনক ও চিত্তাকর্ষক ব্যতিক্রম জন্মলাভ করতে পারে। আমার বিশ্বাস গণতান্ত্রিক ইউরোপ সর্বরকমের স্বৈরাচারীর জন্মভূমি ও শিক্ষাক্ষেত্র হয়ে উঠবে।"

বর্তমানকে বিলুপ্ত করতে প্রস্তুত থাকে। নৈতিক সঙ্গতির সংগঠনের অভাবে পৃথিবী অনাসৃষ্টিতে ভরে যায়।

ভারতীয় সংস্কৃতির নবযৌবন লাভের ক্ষমতা আছে, সে পরম্পরাবিচ্ছিন্ন না করেও মৌলিক আলোড়ন ঘটাতে পারে। কতকটা মন্থর গতি হলেও ভারতবাসীদের যৌবনসুলভ শক্তি ও সজীবতা আছে এবং সেইজন্য তারা তাদের সংস্কৃতি বজায় রাখতে পেরেছে। বাস্তবতার সংঘাতে তাদের সহজাত প্রবৃত্তি অভ্রান্তভাবে সাড়া দেয়। বহিরঙ্গের অভ্যাসের বাধ্যতামূলক আরোপ না করেও তারা শিক্ষাপদ্ধতি ও মার্জিত আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে মৌলিক পরিবর্তন ঘটাবার ক্ষমতা রাখে। জোর করে আনা পরিবর্তন স্থায়ী হতে পারে যদি পরে তারা স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হয়। সজীব ও সুস্থ ঐতিহ্যপাশ থেকেও মুক্ত হবার সম্বন্ধে গণমনের একটা আগ্রহ আছে। তাদের এই প্রবণতা ও ভাবাবেগে উত্তেজিত হওয়া ও মানসিক আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তার আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টাকে বাধা দিতে হবে। নৈরাজ্য ও স্বৈরাচারকে বর্জন করে চলার এই একমাত্র পথ।

আত্মার স্বাধীনতা অধিগত করতে হলে দৈহিক ও সামাজিক বাধানিষেধ থেকে মুক্তি অত্যাবশ্যক। এ মুক্তির দুরকম ব্যাখ্যা হয়। একটা সামাজিক বাধ্যতা থেকে মুক্তি দেয়, আব একটা যথাযথ আর্থিক ও সামাজিক সম্পর্ক থেকে আমাদের অভাব পূরণ করে ঐহিক বাধ্যতা থেকে মুক্তি দেয়। সৎ জীবনযাপনের জন্য দুটিই প্রয়োজন। এই দুটিকেই যদি পূর্ণাঙ্গ হতে হয় তো সমাজ শুধু যে ব্যক্তি ও উপদলকেই সেই সব বাধ্যতামূলক নিয়ম থেকে রক্ষা করবে তাই নয়, যে সব শ্রেয়বোধ বাধ্যতামূলক ব্যবস্থায় ব্যাহত হয় তাদের আয়ত্ত করার সুযোগও দেবে। মুক্তিকে নেতিবাচক ভাবে বাধ্যতামূলক নিয়মের অভাব বলা চলে, কিন্তু আসলে মুক্তি সৎ জীবন লাভের উপায়। আত্মার স্বাধীনতা থেকেই আনুষ্ঠানিক সংগঠন ও পুনর্গঠন জন্মায় এবং আর তা থেকেই আমাদের জীবন ও সভ্যতা অবিরাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে পারছে। মানুষের অজেয় আত্মার জীবন, তার আকার ও প্রকাশের অনন্ত বৈচিত্র্য, এই হ'ল মানবজাতির ইতিহাস। কত বিভিন্ন উপায়ে মানুষ তার প্রয়াস, দুঃসাহস, উচ্চাকাঙ্ক্ষা সিদ্ধি সমেত নিজেকে ও নিজের সফলতা ও ব্যর্থতাকে ব্যক্ত করছে। এ সবের মধ্যেই মানুষের সৃজনধর্মী আত্মা আশা করছে, সংগ্রাম করছে, বিফল হচ্ছে, কিন্তু মোটের উপর জয়ী হচ্ছে, অগ্রসর হচ্ছে, কখনও পেছু হটছে না, সর্বদা আগের দিকে যাচ্ছে, এই মুক্ত আত্মাই হ'ল মানব ইতিহাসের মর্ম।

ব্যক্তি তার কাণ্ডজ্ঞান ও বিবেক স্নায়ুপীড়াগ্রস্ত যূথের কাছে বিসর্জন দেয় নি বলেই মানুষের প্রগতি সম্ভব হয়েছে। প্রতিরোধই হ'ল জীবনের লক্ষণ, স্রোতের বিরুদ্ধে মাটিতে পা ডুবিয়ে শক্ত হয়ে থাকা।[১] বর্তমান যুগের বিশৃঙ্খলার গভীরতম হেতুর মধ্যে একটি হ'ল ভেসে যেতে অস্বীকার করে এমন নরনারীর অভাব। অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষরা নূতন ভাবের সৃষ্টি করে বলেই সব

১ Whitehead : "বিশ্বজগতের পুনরাবৃত্তিকারী যন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণই জীবন।" Adventures of Ideas (1934) P. 102

রকম প্রগতি সম্ভব হয়। স্বাধীন মেধা না থাকলে শেক্‌সপীয়র বা গ্যয়টে, নিউটন বা ফ্যারাডে, পাস্তুর বা লিস্টার কারুরই উদ্ভব হতে পারত না। মুক্তিপ্রাপ্ত লোকেই যন্ত্রের উদ্ভাবনা করেছে, তা থেকেই ধনিকতন্ত্র ও বর্তমান রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্ভব হয়েছে, তারাই মানুষের কঠোর শ্রমের লাঘব করে নূতন ধরনের সামাজিক ব্যবস্থার সূচনা দিচ্ছে। কোন সমাজের মূল্য নিরূপণ করতে হলে সে কতখানি শৃঙ্খলা ও নিপুণতা বজায় রাখতে পেরেছে সেটা বড় কথা নয়, তার মধ্যে কতখানি চিন্তার ও প্রকাশের স্বাধীনতা বজায় আছে, সে নৈতিক সিদ্ধান্তকে কতখানি উৎসাহিত করে, তার সদস্যদের মেধা ও শুভ বুদ্ধি কতখানি বিকশিত করতে সাহায্য করে, সেই সবই হ'ল আসল নির্ণায়ক।

যদিও কার্ল মার্ক্স্‌ বিশ্বাস করেন না যে ব্যক্তিদের নির্ধারিত ইচ্ছার দ্বারা ইতিহাসের ধারা পরিবর্তিত হতে পারে, যদিও তিনি জানেন যে ইতিহাস থেকে ধনিকতন্ত্রের বিলোপ ঘটবে, উৎপীড়িত লোকদের বিদ্রোহ দ্বারা নয়, ইতিহাসের অমোঘ বিধানেই, তবু তিনিও আমাদের কাছে যুক্তিরই দোহাই দেন। প্রকৃতি ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্দৃষ্টিই আমাদের সঠিক পথের সন্ধান দেবে। ঐতিহাসিক পদ্ধতির মানে বোঝা এবং তার সেই উদ্দেশ্যকে সার্থক করার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করাই হল নাকি মানুষের নিয়তি। চরম উদ্দেশ্যের যন্ত্র হওয়াই আমাদের জীবনের সার্থকতা। প্রগতিশীল শ্রেণীর সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে তাদের দ্বারাই চালিত হতে হবে। শ্রেণীসংগ্রামে প্রোলিটেরিয়েটদের জয় অবশ্যম্ভাবী, তবু আমাদের তার পথ সুগম করতে হবে, আমাদের সাহস ও নিষ্ঠা দিয়ে পরিবর্তনটা কম যন্ত্রণাদায়ক করতে হবে। ব্যক্তিমনই সমষ্টির প্রকৃতি বুঝতে পারে। এইসব চিন্তাপদ্ধতিতে আত্মা সামাজিক সমষ্টির মধ্যে অচেতন নিমজ্জন থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে নেয়। ব্যক্তিকে সামাজিক সমগ্রতার মধ্যে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া সম্ভব নয়।

আবার, জিজ্ঞাসা করতে হয় ব্যক্তির যদি আসলে অস্তিত্বই না থাকে তো তাকে বিপ্লবীর আচরণ করতে আহ্বান জানাই কি করে? সমস্ত প্রবণতাই যদি লৌহকঠিন বাধ্যতার তাগিদে অবশ্যম্ভাবী লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয় তো আমাদের আবার তার জন্য ক্রিয়া করতে বলা কেন? মার্ক্স যখন আমাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এইসব প্রগতিকে সুগম করতে বলেন, তখন তিনি ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে নিচ্ছেন। তিনি যখন আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য সক্রিয় হতে বলেন, তখন অমোঘ নিয়তির অসহায় আসামী হিসাবে আমাদের দেখেন না, একটা মহৎ কার্যে দায়িত্বপূর্ণ অংশীদার হিসাবেই দেখেন। সমাজবাদের মধ্যে কিছুই অনিবার্য নয়। তা যদি হত তো একটা সামাজিক তত্ত্ব ও সমাজবাদী দলের প্রয়োজনই হত না। বিপুল প্রচার, তূর্যনিনাদ, সুউচ্চ আহ্বানধ্বনি, পুস্তিকা আর কুতর্ক, এসব থেকেই বোঝা যায় যে মানুষ আপনা থেকে সাড়া দেয় না। সামাজিক অভিব্যক্তিতে সমাজতন্ত্র পরবর্তী সোপান হিসাবে অনিবার্য এ বিশ্বাস যদি সত্য হয় তো এত নিরলস সক্রিয়তা নিষ্প্রয়োজন। তাদের মন্ত্রে দীক্ষা দেবার জন্য এসব একান্ত প্রয়োজন। আমাদের অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রক চেতনাকে প্রভাবান্বিত করাই হল এই সব তীব্র প্রচারের উদ্দেশ্য।

সমভোগবাদ আমাদের সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত করবে এই রকম সমালোচনার জবাবে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বলছে—"যে সংস্কৃতির জন্য এত শোক করা হচ্ছে, অধিকাংশ লোকের কাছে তার দাম হল যন্ত্রের মত চলবার একটা শিক্ষা"। মার্কস একথা ভাবেন না যে ব্যক্তি একটা যন্ত্র মাত্র বা মানুষের চেষ্টা ছাড়াই সামাজিক সত্যযুগ ফিরে আসবে। ধনিকতন্ত্র মজুরদের মনুষ্যত্ব নষ্ট করছে বলে মার্কস যখন অভিযোগ করেন, বা যে অন্যায় ব্যবস্থায় শ্রমিককে ক্রীতদাস বা ভারবাহী পশুর থেকেও অধম বলে মনে করা হয়, সেই ব্যবস্থাকে যে ধর্ম সমর্থন করে ও পবিত্র বলে চালাতে চায়, মার্কস যখন তার নিন্দা করেন তখন তিনি ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের উপরই জোর দিচ্ছেন। নিজের অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের যোগাড় করার অধিকার থেকে কোন মানুষকে বঞ্চিত করা যায় না। অর্থনৈতিক ব্যক্তিত্ববাদ যখন এরকম সমাজ স্থাপন করতে সক্ষম হয় নি, মার্কস অবাধ নীতির যে নিন্দা করেছেন তা যথার্থ। কিন্তু আংশিক সত্যকে সমগ্র সত্যের পর্যায়ে তোলা যায় না। একবার ঐহিক অভাবগুলো পূরণ হয়ে গেলে ব্যক্তিকে চিন্তা করবার, চিন্তা প্রকাশ করার, স্বাধীনভাবে সত্যের সন্ধান করারও যদি বাসনা হয় তো সৌন্দর্য সৃষ্টি করবার সুযোগ দিতে হবে। কতক জিনিস আছে যা না হলে আমরা বাঁচতে পারি না, আর কতক জিনিস আছে যা না হলে আমাদের বাঁচতে ইচ্ছা করে না। যে গণতন্ত্র সভ্যতার দাবী করে তার ভিত্তি হবে "জানবার ও বলবার স্বাধীনতা, সমস্ত স্বাধীনতার চেয়ে বড়, বিবেকের নির্দেশে স্বাধীনভাবে তর্ক করবার অধিকার"। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এই প্রস্তাবই ব্যাখ্যা করলেন যখন তিনি ঘোষণা করেন যে, ভবিষ্যতের গতিশীল ব্যবস্থার লক্ষ্য হবে প্রকাশ করা ও পূজা করবার স্বাধীনতা, অভাব ও ভয় থেকে মুক্তির প্রতিষ্ঠা করা ও তাকে অব্যাহতভাবে রক্ষা করার দায়িত্ব নেওয়া।[১] সমাজে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যে রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্যই স্বাধীনতা। তার একমাত্র সীমা অন্য সব লোকের বা রাষ্ট্রের সেই পরিমাণ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারের স্বীকৃতি। এইরূপ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য যদি না থাকে তো আমরা মৃতের সামিল।

জাতি বা রাষ্ট্রের মধ্যে শাশ্বত বলে কিছু নেই, ওদের হ্রাসবৃদ্ধি আছে। কিন্তু সামান্যতম ব্যক্তির মধ্যেও এমন অনির্বাণ শিক্ষা আছে যাকে প্রবলতম সাম্রাজ্যও নির্বাপিত করতে পারে না। একই জীবনে বদ্ধ হলেও আমরা ঈশ্বরের অংশ,

১ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে বাণীতে বলেছেন: "সুস্থ এবং সবল গণতন্ত্রের ভিত্তি কোথায় সে সম্বন্ধে কোন রহস্য নেই। রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক ব্যবস্থাসমূহের কাছে আমাদের লোকেদের যা মৌলিক দাবী তা খুব সরল। সেগুলি হল যুবক ও অন্যদের সমান সুযোগ, কর্মক্ষম লোকদের কাজ, যাদের প্রয়োজন তাদের রক্ষা করব, অল্পসংখ্যকদের বিশেষ সুবিধার অবসান, সকলের নাগরিক অধিকার রক্ষা, অধিকসংখ্যক লোকের বৈজ্ঞানিক প্রগতির লাভে অংশগ্রহণ করা এবং ক্রমাগত জীবনমানের উন্নয়ন। এ কোন দূরে স্বর্গরাজ্যের আভাস নয়, আমাদের সময়ে ও আমাদের পুরুষে আয়ত্ত করার মত এক সংসারের ভিত্তি।" ৬ই জানুয়ারী ১৯৪১।

অমৃতস্য পুত্রাঃ[১], এই অন্ধকার দিনে আমরা অতীত যুগের বরেণ্যদের শৌর্য ও মহান্ বাণী দিয়ে আমাদের মনে জোর আনব। মনে হতে পারে আমরা পরাজয়ের যুগে বাস করছি, কিন্তু পরাজয়েও বাসনার তীব্রতা ও মর্যাদার স্থান আছে। আত্মার স্থায়ী প্রাধান্যের উপর বিশ্বাসের আলোতে মৃত্যুযাত্রার অন্ধকারেও মানুষ অবিচলিত পদক্ষেপে চলতে পারে।

সভ্যতাকে যদি বাঁচতে হয় তো আমাদের একথা ধরে নিতেই হবে যে, শক্তি যশ বল ধন বা মর্যাদার মধ্যে সভ্যতার মর্মবাণী নিহিত নেই, মানুষের মনের স্বাধীন ক্রিয়া এবং নৈতিকতার বিকাশ, সুরুচির চর্চা ও জীবনদর্শনে নিপুণতা লাভই সভ্যতার মূল কথা। মার্কস ধর্মকে সামাজিক সমুৎপাদ বলে নিন্দা করেছেন। তার মতে সামাজিক ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করার জন্য ধর্মের সৃষ্টি। জন্ম, মৃত্যু, প্রেমের মত কতকগুলি অবধারিত মানব অভিজ্ঞতা একান্তই ব্যক্তিগত। আর্থিক ন্যায়ব্যবস্থার সম্পূর্ণতম আকারে, পার্থিক স্বর্গরাজ্যেও মানুষের গভীরতম শোকের উৎস থেকেই যাবে। উৎপাদনের ব্যবস্থাগুলির সামাজিক অধিকার ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকলেই স্বার্থপরতা, নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি মানবমনের পীড়ার শেষ হবে না। সামাজিক ব্যবস্থায় নয়, মানব স্বভাবের অনুপপত্তির ক্ষতিপূরণ হিসাবে ধর্মের মূল্য মার্কসও নিশ্চয় অস্বীকার করবেন না। আমাদের সমাজের সাংপ্রাবিক ক্ষয়ের বিরুদ্ধে শুধু সামাজিক বিপ্লব পেরে উঠবে না। জীবনকে মনুষ্যত্বহীন করা থেকে সামাজিক বিপ্লব আমাদের বাঁচাতে পারবে না।

ধ্যান বনাম ক্রিয়া

আমরা মেনে নিই যে প্রত্যেক ব্যক্তির একটা আবশ্যকীয় নিজস্ব অংশ আছে, যখন সে নিজেকে সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, তখনও ধরাছোঁয়ার বাহিরে কিছু থেকে যায়, হয়ত একাকী না বলা স্বপ্ন, হয়ত অখণ্ডিত নীরবতা। আমরা যা বলি বা করি এমন কি যে নির্জনতার মধ্যে আসল আমির বাস তখন যা চিন্তা করি তারও সীমার বাইরে কিছু আছে, কাজেই আমাদের জীবনের এই অংশের প্রসঙ্গে কিছু কর্মও আছে। সমাজে আমরা সক্রিয় কিন্তু আশার নিঃসঙ্গ ও অস্তিত্বের উদ্দীপনা থেকে আত্মচিন্তার নীরবতায় ক্ষণে ক্ষণে ধ্যানমগ্ন। ভেতরের দিকে দৃষ্টি পড়লে বাহিরের ঘটনা, জীবনের উত্তেজনার দিকে আর নজর থাকে না, আমরা অন্তরের রহস্যেই ডুবে যাই। উপনিষদ বলে, "অহম্ জন্মালেই ইন্দ্রিয় সকল বহির্মুখী হয়, ভিতরের আমির দিকে দৃষ্টি পড়ে না। অনন্ত জীবনকামী তত্ত্বজ্ঞানীরা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ভেতরের আমিকে দেখেন।"[২] আত্মিক অন্তর্দৃষ্টির পথ হল আন্তরিক ধ্যান।[৩]

---

১ দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্ত যো জীবঃ স সদাশিবঃ।

২ কঠোপনিষদ, দ্বিতীয়, ৪

৩ প্লটিনাস লিখছেন, "কিন্তু কি করব? কোন্ পথে যাব? যেখানে সকলের নজর যায়, এমন কি অশুচি লোকেরও, তার সীমার বাইরে যেন মন্ত্রপূত মন্দিরে যে অগম্য সৌন্দর্যের

পাস্কাল বলেছিলেন যে, মানুষের একটা ঘরে স্থির হয়ে বসার অক্ষমতা থেকেই জীবনের যত কিছু অমঙ্গলের সৃষ্টি। আমরা যদি শুধু একটু চুপ করে বসে থাকতে শিখি তো কি করলে সব চেয়ে ভাল হয় তা জানতে পারব। যে সব মহৎ সাধনা মানভজাতির গর্বের বিষয় তারা সেই সব লোকের কীর্তি যাঁরা চুপ করে বসে অনুফলনের তত্ত্ব বা গ্রহনক্ষত্রের গতির কথা চিন্তা করছেন। এই ধ্যানী লোকেরা, এই অলস অজানা লোকেরা যে সব অকেজো লোক আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলতে গিয়ে কূপে পড়ে যায় তারাই আমাদের আরাম ও সুখের জন্য সমস্ত উদ্ভাবনার জনক।

ধর্ম যখন ধ্যানস্থ হবার নির্দেশ দেয়, তখন এই কথাই বলে যে মানবজীবনে এমন কতকগুলি অন্তরতম পবিত্রভূমি আছে যাকে রক্ষণ করতেই হবে। ঐহিক রামরাজ্যের সৃষ্টিই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। একটি উচ্চতর ও তীব্রতর চেতনা আয়ত্ত করাই আসল লক্ষ্য। শিব, বুদ্ধ এবং আরও শত শত সাধু-সন্তদের ছবি থেকে প্লেটো ও আরিস্টটলের ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হয় যে মানুষের চরম লক্ষ্য হল ধ্যান, বোঝবার জন্য স্বাধীনতা ও শান্তি।

মার্কস্ দার্শনিক ভাববাদের সঙ্গে ধর্মকে অভিন্ন মনে করে বলেছেন, "এতদিন পর্যন্ত দার্শনিকরা জগতের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আসল কাজ হল জগৎকে বদলে দেওয়া।"[১] মার্কসের অনুগামীরা এই মতের এই ব্যাখ্যা করেন যে

বাস তার দর্শন কি করে পাব? আমরা সেই প্রিয় পিতৃভূমিতে পালিয়ে যাই। কোন্ দিকে চলব? কি ভাবে পালাব? পায়ে চলার যাত্রা এ নয়, পায়ে চলে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাওয়া যায়। এসব ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে। কাজেই তোমাকে চোখ বুজে অন্য রকমের দৃষ্টি ব্যবহার করতে হবে, যে দৃষ্টিতে সকলের জন্মগত অধিকার আছে, যদিও কম লোকেই তা ব্যবহার করে।

নিজের ভেতর ডুবে যাও আর দেখ—প্রতিমা-নির্মাতা যেমন করে দেখে প্রতিমাটি সুন্দর হয়েছে কিনা। সে এখানে একটু কেটে দেয়, ওখানে একটু ঘষে দেয়, কোন রেখা একটু হাল্কা করে, কোন রেখা আরও ফুটিয়ে দেয়, শেষে তার কাজের উপর সুন্দর একখানি মুখ ফুটে ওঠে। তুমিও তাই কর, যা কিছু বাহুল্য তা বাদ দাও, বাঁকাকে সোজা কর, যেখানে ছায়া পড়েছে, সেখানে আলো দাও, যতক্ষণ না সমস্তটা এক সৌন্দর্যে বিভাসিত হয় ততক্ষণ খাটো, অকলঙ্ক মন্দিরে যতক্ষণ না নিখুঁত শিবসুন্দরকে দেখতে পাবে ততক্ষণ প্রতিমার উপর ছেনি চালানো বন্ধ কোরো না।

সেই একমাত্র দৃষ্টি যাতে মহান্ সৌন্দর্য ধরা পড়ে। যে চোখে তা দেখা যায় সে যদি পাপাচার, অপবিত্রতা বা দুর্বলতায় নিষ্প্রভ হয়ে যায়, তাহলে কিছুই দেখা যাবে না। যে দৃশ্য দেখতে হবে তার সঙ্গে কিছু সাদৃশ্যও আছে, কিছু সঙ্গতি আছে এমন চোখ চাই। সূর্যসদৃশ জ্যোতি না থাকলে সূর্য কখনও দেখা যায় নি এবং যে আত্মা নিজে সুন্দর নয় সে আদিম সৌন্দর্যের আবির্ভাব দেখতে পাবে না।" Alfred Noyes, *The Last Man* (1940) Pages 150-51.

১ ফয়েরবাকের বিরুদ্ধে একাদশ প্রস্তাব।

ও থেকে নাকি জীবন থেকে দর্শনের, তত্ত্ব থেকে প্রয়োগের অসঙ্গতি বোঝা যায়। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি থেকে যে দিব্যানন্দের সৃষ্টি তার বদলে মার্ক্স কর্মকে উপস্থাপিত করেছেন। তত্ত্বজগতের ধ্যান করতে গিয়ে নিজেদের হারিয়ে না ফেলে, বাস্তব ও ঐতিহাসিক অস্তিত্বের জগতে কাজ করা যাক্। ফয়েরবাক সম্বন্ধে অষ্টম প্রস্তাবে মার্ক্স বলেছেন, "যে সব তত্ত্ব অতীন্দ্রিয়তার দিকে আকর্ষণ করে তাদের সকল রহস্যেরই পূরণ হয় মানুষের কর্মে ও সেই কর্মের ব্যাখ্যার মধ্যে।"

তাছাড়া, ধর্ম মানুষের জীবনের শ্রেয়োবোধ লণ্ডভণ্ড করে দেয়। প্রকৃতির সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী ইহলোকের দৃশ্যজগতে যে সকল জিনিসকে শ্রেয় মনে হয়, সুখ ও শক্তি, ধন ও যশ, তারা সবই ধর্মের কাছে তুচ্ছ। আর যাদের সাধারণতঃ তাচ্ছিল্য করা হয়, যাকে নীট্‌সে বলেছেন দাস মনোভাব, যথা বাধ্যতা ও বিনয়, দীনতা ও ত্যাগ, এরাই পরলোকের সুখ-সুবিধা পাবার নিশ্চিত পথ বলে ধর্মের কাছে সম্মানিত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব জগতের দিক থেকে ধর্মীয় প্রত্যাদেশের ফলে কল্পিত জগতের দিকে মনকে আকৃষ্ট করা হয়। পার্থিব অবস্থার উন্নতিতে চেষ্টিত লোককে উন্নাসিক ও বিষয়াক্ত বলা হয়।

মার্ক্স ভাল করেই জানেন যে খ্রীষ্টধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম দরিদ্রের ও নিপীড়িতের উন্নততর জীবনযাপনের আগ্রহকে কাজে লাগায়। এ জীবনের অন্যায়ই যদি শেষ কথা হয় তো জীবন অর্থহীন। কাজেই ঈশ্বরের রাজত্বের কল্পনা, যেখানে দীন ও পীড়িত লোক মৃত্যুর পর ধনী ও আয়েসী লোকের থেকে সহজে পৌঁছতে পারবে। মরণোত্তর সুবিচারে বিশ্বাসই এ জগতের জীবনে অর্থ আনে। অতএব তিনি বলেছেন, "ধর্ম উৎপীড়িতের ক্রন্দন, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়, প্রাণহীন পরিবেশের প্রাণকেন্দ্র, এক কথায় দরিদ্রের আফিম।"[১] মার্ক্স বলেন, "বিকৃত সভ্যতার ভিত্তিস্তম্ভ হল ঈশ্বরের ধারণা। কাল্পনিক সুখের আশ্বাসদায়ী ধর্মকে দমন করলে তবেই আসল সুখের দাবীকে স্বীকার করা যাবে।"[২] এঙ্গেল্‌স্ বলেন, "ধর্মের প্রথম কথাটিই মিথ্যা।" লেনিন লিখেছেন, "ধর্ম আত্মিক উৎপীড়নের এক রূপ।" শোষকের সঙ্গে সংগ্রামে শোষিত শ্রেণীর অসহায়তা থেকেই মরণোত্তর মহত্তর জীবনের বিশ্বাসের উৎপত্তি। জীবনভোর কাজ করেও যাদের অভাব মেটে না তাদের ধর্ম দীনতা ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়, স্বর্গীয় পুরস্কারের আশ্বাসে। ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস থাকলে ঐহিক আদর্শের উপর আকর্ষণ কমে যায়।

এই সব মন্তব্য ধর্ম, বোধ বা করুণার মর্ম বর্জিত নয়। পৃথিবীতে যারা বঞ্চিত তারা পরলোকে দৈহিক সুখ-সুবিধার কথা ভাববে না কেন? যান্ত্রিক উৎপাদনের প্রয়োগকৌশলে জগতে সকলের পক্ষেই উন্নততর জীবনযাপন সম্ভব হয়েছে। আজ যদি প্রতিষ্ঠিত ধর্মের মোহ কমে যায়, তাহলে সহায়-সম্পত্তিহীন বঞ্চিত লোকেরা ধনিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, কেননা তারা অন্য মানুষদের কল্যাণ সম্বন্ধে দায়িত্বহীন, সব চেয়ে সস্তায় তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে কাজ

---

১ I. M. Murray-এর ইংরাজী অনুবাদ "The Defence of Democracy" (১৯৩৮) ৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২ Nouveau Parti, 1884

ফ্রেলে জঞ্জালের গাদায় ফেলে দেয়। ধর্ম মানবসৌভ্রাত্রের প্রতিষ্ঠা না করে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করতে বলে কেন? ধর্মীয় কল্পনার প্রভৃত প্রয়াসের দ্বারা মার্কস দেখেছেন ও অনুভব করেছেন যে মানবসমাজ একটা সজীব সমগ্র সত্তা এবং তিনি অতিপ্রাকৃতিক পারলৌকিক ধর্মকে বাধাদানের চেষ্টা করেছেন। যেসব অনুষ্ঠান, ভাব ও প্রণালী দিয়ে জনসাধারণকে ভুলিয়ে দাস করে রাখা হয়েছে, ধনিকতন্ত্রের বিলোপের সঙ্গে তাদের বিলোপের সম্পর্ক যুক্তিযুক্ত।

ভাব যে ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত করে এ প্রস্তাব মার্কস্ অগ্রাহ্য করছেন। শুধু চিন্তায় অবশ্যই ইতিহাস সৃষ্টি হয় না, চিন্তাকে ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করতে হয়। চিন্তার বিষয় সমাজ হতে পারে, কিন্তু চিন্তা সমাজ দ্বারা উৎপন্ন নয়। সে শুধু নিঃস্বার্থ মননের ফল হতে পারে। যে সব বড় বড় ভাবের প্রভাবে পৃথিবী পরিবর্তিত হয় ও চরিত্রের উন্নতি সাধিত হয়, তারা খুব কম সময়েই সক্রিয় জনসেবকদের মাথা থেকে বেরোয়। কবি ও ভাবুক, রূপকার ও ধর্মগুরুদের কাছেই সেসব আমরা পাই। নির্জন ধ্যানেই সেসব ধারণা আসে এবং তার জন্য মনের যে মুক্তি ও আত্মসম্পূর্ণতা প্রয়োজন, লোকজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা জড়িত সক্রিয় কর্মীদের তা পাওয়ার আশা নেই বললেই চলে।

চিন্তাই কর্মের সার। বাইবেলে আছে গোড়ায় শব্দ ছিল, শব্দই রূপ নিল। দর্শন ইতিহাস হয়, সংস্কৃতি সভ্যতা হয়ে যায়। গ্রীস সভ্যতার সংগঠনে প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌লের দান যথেষ্ট। ইংলণ্ডের ১৬৪২ সালের অন্তর্যুদ্ধে হব্‌স প্রেরণা যুগিয়েছে, ১৬৮৮ সালের বিপ্লব লকের কাছে সমান ঋণী। ভলটেয়ার, রুশো ও এনসাইক্লোপিডিয়া লেখকদের দার্শনিক তত্ত্ব থেকে ফরাসী বিপ্লব উদ্ভূত। দার্শনিক সংস্কারক বেন্থাম ও মিলই ঊনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক কর্মসূচীর প্রেরণা দেয়। মার্কস নিজেই ঐতিহাসিক প্রণালীর ব্যাখ্যা দিয়েছেন আর সব ব্যাখ্যাই তো পৃথিবীর পরিবর্তন করবার উদ্দেশ্যে। আদর্শ দ্বারাই জীবন চালিত হয় আর সব বৈপ্লবিক আন্দোলনের পশ্চাতেই দর্শন আছে। আমরা যা তা আমাদের চিন্তারই ফল। দার্শনিকরাই ভবিষ্যতের স্রষ্টা। দার্শনিকদের জীবনের ব্যাখ্যা দেওয়াই শুধু কাজ নয়, তার উপর আলোকপাত ও পথ দেখানোও তার কাজ।[১] ধ্যান ও জীবন পৃথক বটে কিন্তু পরস্পরবিরোধী নয়, তারা সহঅবস্থান করতে পারে।[২] তারা পরস্পরের সঙ্গে জড়িত, একসঙ্গেই তাদের কাজ। আবার

---

১ চেস্টারটন: 'কতক লোক আছে—আমি তাদের মধ্যে একজন—যাদের ধারণা যে মানুষের পক্ষে সব চেয়ে দরকারী ও কাজের কথা হল তার বিশ্ব সম্বন্ধে মতামত। আমাদের মনে হয় যে ভাড়াটের আয়ের অংক বাড়ীউলির জানা দরকার, কিন্তু তার চেয়েও বেশী দরকার তার দার্শনিক মতামত জানা। সেনানায়কের পক্ষে শত্রুর সংখ্যা জানা যতটা প্রয়োজন, ততটাই প্রয়োজন তার দার্শনিক মনোভাব জানা। মহাজগৎ কিভাবে জড়কে প্রভাবান্বিত করে সেটা প্রশ্ন নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্য কিছু তাকে প্রভাবান্বিত করে কিনা তাই হল আসল কথা।"

২ Croce: "দুটো বিশিষ্ট ধারণাই পরস্পরকে এক করে যদিও তারা স্বতন্ত্র, কিন্তু দুটো বিরোধী ধারণা একসঙ্গে থাকতে পারে না।

—Philosophy of Hegel, ইংরাজী অনুবাদ (১৯১৫)

আমরা নিজেদের না বদলাতে পারলে সামাজিক ব্যবস্থা বদলানো যাবে না। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার ভালমন্দ যাদের নিয়ে সমাজ তাদের চরিত্রের উপর নির্ভর করে। এর চেয়ে সার্থক সামাজিক ব্যবস্থার জন্য দরকার ভিন্ন গুণবিশিষ্ট লোকের। জীবনের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন করতে হলে আমাদের পুনর্জন্ম নিতে হবে। ধর্মকে আমল দিই নি বলেই তার বিফলতা। ধর্মের প্রধান লক্ষ্য হল মানুষের পুনর্গঠন। জেদ, অহমিকা, শুধু নিজের স্বার্থ দিয়ে চালিত হওয়া, নিজের লাভের খালি চিন্তা করা, অন্যের সুবিধা বিসর্জন দিয়ে নিজের কোলে ঝোল টানা এই হল সকল ব্যর্থতার উৎস। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় হল স্বার্থত্যাগ, সৌভ্রাত্র ও সহযোগিতা। স্বার্থত্যাগের উপদেশ কটা লোক মেনেছে বা মানতে চেষ্টা করেছে? দু-একজনের যদিও সেদিকে চেষ্টা থাকে, তবুও খুব বেশী সংখ্যক লোকের স্বার্থপরতার কথা কি বলব? আমাদের বাঁচার পক্ষে অনেক কিছু জানাই যথেষ্ট নয়। আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মোৎসর্গ মূলক কঠোর সাধনা প্রয়োজন। মানুষের মধ্যে আলো ও আঁধার, জ্ঞান ও অজ্ঞতা দুইই যুগপৎ আছে। তার মধ্যে ভগবান নিজেকে রক্তমাংসে আবৃত করেছেন। আসল সত্তা ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রয়োজনে নিজেকে সীমায়িত করেছে। নিঃসঙ্গ ব্যক্তিগত জীবন যাপন করা আর ঐক্য ও বিশ্বজনীনতা লাভ করা, আমাদের মধ্যে এই দুই প্রবণতার মধ্যে বিসংবাদ আছে। এ দুয়েব সমন্বয়ই আমাদের সমস্যা এবং এর জন্য কাঠিন্য, যন্ত্রণা, রক্তপাত ও অশ্রুপাত প্রয়োজন।[১] চিন্তাশীল 'মিস্টিক'রা পৃথিবীকে নিদ্রা ও স্বপ্ন দিযে মোহগ্রস্ত করতে চান না। তাঁরা সংঘর্ষের উপর নয়, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থার অনেক সময় তাঁরা উদ্যমী। বিষয়মগ্ন ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক সময় তাঁরা আরও স্বচ্ছতা ও তীব্র সাংগঠনিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেন। যে সব ধর্মগুরু পরম্পরা ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁরা শিক্ষা ও রোগীর সেবা প্রভৃতি ব্যবহারিক কাজের উপরও সুস্থ প্রভাব বিস্তার করেছেন, তাঁদের মহান ঐতিহ্য লক্ষ্য করুন।

মার্কস যে ধর্মকে পারলৌকিক ব্যাপার বলে নিন্দা করেছেন, সে ধর্মকে শুধু একপেশে ভাবে দেখেছেন বলেই। যদিও ধর্মের আসল জীবন অনন্তের সঙ্গে গ্রথিত, তবুও পার্থিব ও অনিত্য ব্যবস্থায় অঙ্গীভূত আমরা আমাদের দায়িত্বস্খালন করতে পারি না। আমরা আত্মা, কিন্তু দেহমণ্ডিত আত্মা। কাজেই দেহের শর্ত আমাদের পালন করতে হবে। দেহযন্ত্রেই পৃথিবীকে জানতে পারি ও ভোগ করি,

---

১ সেণ্ট পল: "দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্বকে এক ব্যক্তি করলেই তবে শান্তি; এবং দুই ভাগকেই ক্রশ দিয়ে ভগবানের কাছে এক সমন্বয় করা এবং নিজের মধ্যের শত্রুকে বিনাশ করে এক দেহ হওয়া"। Ephesians ii, 15-16, Marginal Reading.

সিসেরো: "মানুষের মনের স্বাভাবিক গঠন হল দ্বিধা। এক অংশ ক্ষুধা, গ্রীকেরা যাকে horme (ঝোঁক) বলেছে। এ শুধু মানুষকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে; আর এক অংশ হল বিচারশক্তি, যার দ্বারা আমরা শিক্ষা পাই, কি করতে হবে আর হবে না বুঝতে পারি, অতএব বিচারশক্তি যথাযোগ্যভাবে আদেশ করে, ক্ষুধা মান্য করে।" De officis Lib I, ch 28.

কাজেই দেহকে ব্যর্থ করলে চলবে না। স্বর্গে যেতে হলে ইন্দ্রিয়কে নিস্তেজ করা বা হৃদয়াবেগকে অস্বীকার করার প্রয়োজনই নেই। দৈহিক সুখ এবং পবিত্র লক্ষ্য যজুর্বেদে আছে, "আমরা শতায়ুঃ হই, আমাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, কথনশক্তি অক্ষুণ্ণ থাক, জীবন পরবশ না হোক্। এ রকম জীবন নিয়ে যেন একশ বছরের বেশীও বাঁচি"।[১] দেহ অনন্তের ছদ্মবেশই নয়, তাঁর লীলার আবশ্যকীয় যন্ত্র।

আমাদের জীবনে অবশ্যমান্য আচরণবিধি যে শাশ্বত সত্য থেকে পেয়েছি তাকে পৃথিবীতে সামাজিক ও অনিত্য আকারেও আয়ত্ত করতে হবে। প্রত্যেক ধর্মেরই একটা নৈতিক ও সামাজিক প্রকাশ আছে। প্রেম ও পবিত্রতার চির সহ-অবস্থান। মানুষ সমাজের মধ্যেই জন্মায়। তার জীবন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কসমূহে শৃঙ্খলিত, এমন সব আকর্ষণ বিকর্ষণ তার চারপাশে আছে, যা থেকে মোটে বেরুনো সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। অ্যারিস্টটল বলেছেন, "যে সমাজে বাস করতে পারে না, অথবা এত স্বয়ংসম্পূর্ণ যে সমাজের প্রয়োজন বোধ করে না, সে হয় দেবতা নয় পশু।"[২] সমাজে তার কোন স্থান নেই। সামাজিক বন্ধন ব্যক্তির শক্তি ও সুবিধাকে বাড়ায়, স্বাধীনতাকে বিস্তৃততর করে।

হিন্দুমত পার্থিব ও অনিত্য ব্যাপারকে অবহেলা করে না। জীবনের চারটি পুরুষার্থ সেখানে স্বীকৃত: ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ। যে মতবাদে জীবনের চারটি স্তর স্বীকৃত হয়েছে তাতে সামাজিক কর্তব্যের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। সন্ন্যাসীও জাগতিক সম্প্রদায়ের সেবা করতে পারে। পৃথিবীতে ধ্যানের সঙ্গে কর্মেরও প্রয়োজনীয়তা মানা হয়। ঈশ-উপনিষদের মতে নিজেকে পরিপূর্ণ করতে হলে সাধককে ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্ম দুইয়েতেই যুগপৎ সিদ্ধিলাভ করতে হবে। ধর্ম দ্বারা সে মৃত্যুকে অতিক্রম করে, জ্ঞান দ্বারা অমরত্ব লাভ করে। সেবাকার্যে উৎসর্গীকৃত জীবন চাই। "আমার জীবন উৎসর্গীকৃত হোক, আমার প্রাণ, চক্ষু, মেধা, আত্ম-সেবায় নিয়োজিত হোক, আমার বেদজ্ঞান, বোধ, সম্পদ ও জ্ঞান সেবায় নিয়োজিত হোক্। যজ্ঞের ইচ্ছাই যজ্ঞে বলি যাক্।"[৩]

ভগবদ্‌গীতা ঘোষণা করেছে: "ঈশ্বরাসক্ত জীব জগৎকে বিচলিত করে না, জগৎও তাকে বিচলিত করে না।"[৪] তার শিক্ষা হল যে প্রেম সর্বত্যাগী ও পলায়ন-বিমুখ, সেই অকল্যাণকে জয় করতে পারে, মানুষকে মুক্তি দিতে পারে।[৫] কর্তব্য-

---

১ পশ্যেম শরদঃ শতম্, জীবেম শরদঃ শতম্, শৃণুয়াম শরদঃ শতম্, প্রব্রবাম শরদঃ শতম্, অদীনাস্যাম শরদঃ শতম্, ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ। II, 36, 24

২ Politis I, i, Mac Iver: "সামাজিক সম্বন্ধ কোনরকমে নয়, একেবারে ভিতরের বস্তু…তারা ব্যক্তিত্বকে জড়াবার জাল নয়। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বেরই লীলা, ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ করতে হলে তাকেও সম্পূর্ণ করতে হবে। Community P. 95.

৩ আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্, প্রাণোযজ্ঞেন কল্পতাম্, চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্, শ্রোত্রম্ যজ্ঞেন কল্পতাম্, মনোযজ্ঞেন কল্পতাম্, আত্মাযজ্ঞেন কল্পতাম্, ব্রহ্মাযজ্ঞেন কল্পতাম্, জ্যোতির্যজ্ঞেন কল্পতাম্, স্বর্যজ্ঞেন কল্পতাম্, পৃষ্ঠং যজ্ঞেন কল্পতাম্, যজ্ঞোযজ্ঞেন কল্পতাম্।—ii

৪ দ্বাদশ, ১৫

৫ If I can live

পালনের সমস্যা নিয়ে গ্রন্থখানি আরম্ভ। গ্রন্থখানিতে যুদ্ধক্ষেত্রে কথোপকথন সন্নিবেশিত হয়েছে। দুই সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্রে রণসজ্জায় সজ্জিত।। অর্জুন শত্রুশ্রেণীতে আত্মীয়স্বজন ও মান্যলোকদের দেখে রথে বসে পড়লেন আর যুদ্ধ করতে অস্বীকার করলেন। তিনি নিজের আত্মীয়দের মারবেন কেন? যোদ্ধার কর্তব্য সম্বন্ধে এই সমস্যার যদি সমাধান হয়ে থাকে তো অন্য সমস্যারও সেই ভাবে সমাধান হতে পারে। যুদ্ধ ভাল কি মন্দ, গীতার সমস্যা তা নয়। শান্তির সাধনও যেমনই হোক নিজের কর্তব্যসাধনের মধ্য দিয়ে অখণ্ডতা লাভ করাই গীতার সমস্যা। কৃষ্ণ বললেন, "জনক এবং অন্যেরা কর্মের মধ্য দিয়ে সিদ্ধিলাভ করেন। পৃথিবীর কল্যাণের জন্য তোমার কর্মও করা উচিত, অজ্ঞ লোকেরা যেমন কর্মে আসক্তি নিয়ে কাজ করেন, তেমনি জ্ঞানী লোকেরা অনাসক্ত হয়ে লোককল্যাণের জন্য কাজ করবেন।[১] আবার শুধু কর্ম থেকে বিরত থেকেই কর্মমুক্ত হওয়া যায় না, আর কর্ম করতে অস্বীকার করলেই সিদ্ধি পাওয়া যায় না।[২] যিনি ক্রিয়ার মধ্যে কর্ম দেখেন না আবার নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেও কর্ম দেখেন তিনিই মরজগতে যোদ্ধা, শাস্ত্রানুসারে তিনিই পরিপূর্ণ কর্মের কতা। কর্মফলে অনাসক্ত, সর্বদা সন্তুষ্ট, বন্ধনহীন এমন পুরুষ সর্বদা কর্মে নিযুক্ত থেকেও কর্মে নির্লিপ্ত।" "তোমার সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে, পরমাত্মায় মন নিবিষ্ট করে, বাসনা ও চিন্তাবিহীন হয়ে নিরুদ্বেগ চিত্তে যুদ্ধে যোগদান কর।" বৈরাগ্যযোগ কোন সমাধানই নয়, কেননা মানুষ ইচ্ছুক থাক বা না থাক তাকে কর্ম করতেই হবে। কর্মের কৌশলই যোগ।" "যিনি আমার কাজ করেন, আমাতে নিষ্ঠা রাখেন, আমার ভক্ত, সকল প্রকারে নিরাসক্ত, সব লোকের প্রতিই বৈরীভাবহীন, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।"[৪] বাহিরের ফলের জন্য কর্ম নয়, কর্ম আন্তরিক বিকাশের জন্য। কামনাহীনতাই কর্মযোগ। এমন কি সমাজকল্যাণে কার্যও কর্মযোগ নয় কিন্তু সে প্রাথমিক সাধনা হিসাবে কার্যকরী। "বুদ্ধিমান লোক ইহজগতেই সুকৃতি দুষ্কৃতি উভয়েই ত্যাগ করে যান।"[৫] আধ্যাত্মিক গুণ না

To make some pale face brighter and to give
A second lustre to some tear-dimmed eye,
Or even to impart
One throb of comfort to an aching heart
Or cheer some wayworn soul in passing by :
If I can lend
A strong hand to the fallen or defend
The right against a single envious strain.
My life though bare
Perhaps, of much that seemeth dear and fair
To us of earth, will not have been in vain.
The purest joy,
Most near to heaven, and far from earth's alloy
Is bidding clouds give way to sun and shine,
And 'twill be well,
If on that day of days the angels tell
Of me, "She did her best for one of Thine"—H. H. Jackson.

১ ৩য়, ২৫ ২ ৩য়, ৪ ৩ ২য়, ৫০ ৪ ১১শ, ৫৫ ৫ ২য়, ৫০

থাকলে শুধু আধ্যাত্মিক ভড়ং কোন কাজের নয়। যাঁরা সংসারের বাইরে থেকে ভগবদ-শক্তির যন্ত্র হিসাবে কাজ করেন, তাঁরাই মহৎ কর্ম করেন। কি করছি আর কেমন করে করছি এসব না বুঝে ছুটোছুটি করা নিরর্থক অঙ্গ সঞ্চালন মাত্র। আমরা যখন অনন্তের চেতনা লাভ করি, তখনই আমরা বুঝতে পারি আসল কর্মকে। জগৎ অস্থির ক্রিয়ার দ্বারা তৈরী হয় নি, শান্তি ও নিস্তব্ধতার মধ্যেই তার উৎপত্তি। উপনিষদ ও বৌদ্ধ-ধর্ম নির্দেশিত মুক্তির পথ শুধু তত্ত্বজ্ঞানী ও তপস্বীদের জন্য। গীতা কর্মবন্ধ জীবকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে, কিরকম কাজ মুক্তিলাভে সহায়তা করে তাই দেখিয়ে দিয়ে। কর্মত্যাগ, জ্ঞান ও সন্ন্যাসের পুরানো পথের জায়গায় গীতা "নিরাসক্ত কর্ম" বসিয়েছেন। মানুষ ও বস্তুকে বর্জন করে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করা যায় না। আধ্যাত্মিক জীবন একটি অনির্বাণ শিখা যা অহমিকা ও বন্ধন ভস্ম করে সর্বত্র সঞ্চারিত হয়। গৌরব তপস্বীর নয়, তেজ ও শক্তিদীপ্ত নবকলেবরধারী জীবেরই।

সক্রেটিসের পরিণতি প্লেটোর দর্শনকে এক বিশিষ্ট খাতে প্রবাহিত করেছিল। এই রকম মহৎ ন্যায়বান লোকের যদি এই পরিণতি হয়, তো সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কিছু লাভ আছে কি? যে জগতে ন্যায় নেই, আদর্শ নেই, কল্যাণ নেই, সত্য নেই, সে জগৎ থেকে বিমুখ হয়ে প্লেটো ভাবের রাজ্যে, অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে পরমানন্দকে খুঁজতে গেলেন। তাঁর মধ্যে যে গ্রীক সত্তা ছিল তা এই ভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল ও তিনি দার্শনিকদেরও রাষ্ট্রনীতিতে অংশ নিতে বললেন।[১]

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে, গ্রীকদের মধ্যেই এই ধারণা জন্মালো যে শাসকদের জনসেবক হওয়া উচিত। কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে তাদের ঐশ্বর্যের ধারণা বর্জন করতে হবে, আড়ম্বরহীন, বাহুল্যবর্জিত জীবন যাপন করতে হবে ও বিশেষ শিক্ষালাভ করতে হবে। এই শিক্ষাক্ষেত্রেরই নাম হল আকাডেমি। গ্রীকেরা তখন যা জানত তার থেকেও বেশী ব্যবহারিক প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে প্রতিষ্ঠান কল্পিত হয়েছিল, তা যদি আজ অকেজো জীবনের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রযুক্ত হয় তো, তা মানুষের প্রকৃতির ব্যঙ্গাত্মকতাই প্রমাণ করে।

---

১ এক শ্রেণীর দার্শনিকদের সম্বন্ধে প্লেটো বলেছেন, "এ রকম লোককে তুলনা করা যায় একপাল বন্য জন্তুর মধ্যে এক মানুষের সঙ্গে—যে তাদের হিংসাকার্যে সহযোগিতা করবে না কিন্তু একা তাদের হিংস্র চরিত্রকে প্রশমিতও করতে পারবে না এবং কাজেই সে তার বন্ধুদেরও কোন কাজে আসবে না, রাষ্ট্রেরও কল্যাণে আসবে না দেখে, কারুর কোন উপকার না করে শুধু শুধু নিজের জীবন বিপন্ন করার থেকে সে চুপচাপ থাকবে এবং নিজের পথ দেখবে। আঁধি ও তুষারঝড়ের সময় লোক যেমন এক পাঁচিলের আড়ালে আশ্রয় নেয়, তার অবস্থা সেইরকম। অন্য সব লোককে দুষ্টপ্রকৃতি দেখে সে যদি তার নিজের জীবন যাপন করতে কোন মন্দ বা অন্যায় কাজ করতে বাধ্য না হয় তাহলেই সে খুশি এবং উজ্জ্বল আশা নিয়ে শান্তি ও শুভেচ্ছার মধ্যে বিদায় নেয়।

"তিনি বললেন যে হাঁ, তিনি বিদায় নেবার আগে ভাল কাজই করে গেলেন।

"বড় কাজ বটে তবে সবচেয়ে বড় কাজ নয় যদি না রাষ্ট্র তাঁর যোগ্য হয়। যথাযোগ্য রাষ্ট্র হলে, তিনি আরও উন্নত হবেন ও নিজেকে ও দেশকে ত্রাণ করতে পারেন।" Republic 496.

দুর্ভাগ্যক্রমে খ্রীষ্টীয় নীতি কখনই সাংসারিক কর্মপন্থার নির্দেশ দেয় নি।[1] প্রাচীন খ্রীষ্টীয় সংঘ ঐহিক জীবনকে নবজন্ম গ্রহণ করার মুখে স্বল্পস্থায়ী প্রতীক্ষা বলে ধরেছিলেন, "তখন যারা বেঁচে আছি ও থাকব তারা মেঘের মধ্যে মিলিয়ে যাব।"[2] মধ্যযুগ পৃথিবীকে অশ্রু উপত্যকা বলে চিত্রিত করেছে, প্রত্যেককে তার মধ্য দিয়ে বিচারের উপত্যকায় যেতে হবে। একমাত্র মঠে বা তপস্বীর আশ্রমে খ্রীষ্টীয় জীবনযাপন করা সম্ভব।[3] গোঁড়া প্রোটেস্টান্টদের সাধারণ সাংসারিক

১ এই ভুবনকে যে ভালবাসে, তার সজীব বৈচিত্র্যে যে আকৃষ্ট হয়, খ্রীষ্টধর্মে তার জন্য কোন বাণী নেই। তাবা বলেন "এক সময়ে একই জগতের কথা ভাবতে হবে।" গিফোর্ড বক্তৃতায় অধ্যাপক ডবিউ ম্যাক্‌নীল ডিক্সন এই প্রশ্ন তোলেন, "নরনারীর প্রেম সম্বন্ধে খ্রীষ্টধর্ম কি বলেন।" উত্তর দেন, "একটি কথাও নয় বরং অপমানকর কথা। প্রাচীন গুরুরা স্ত্রীজাতি বা প্রণয়কে ভাল চক্ষে দেখেন নি। তাঁরা চির কৌমার্যের জয়গান করেছেন। ক্রাইসোস্টম নারীদের "মনোহর সর্বনাশ" বলে বর্ণনা করেছেন আর সেন্ট পল বিবাহ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা তো আমরা সবাই জানি। আবার এ বিষয়ে কবি ও রূপকার, বলতে গেলে সমস্ত মনুষ্যজাতি অন্য সব বিষয়ের থেকে বেশী মনোযোগ দেন। যৌনপ্রবৃত্তি জীবনের একেবারে মূলে এবং অন্য সমস্ত প্রবৃত্তির চেয়ে শক্তিশালী। স্টেন্‌ডাল বলেছেন যে "সমস্ত আন্তরিক প্রকাশই সুন্দর। নরনারীর সম্পর্ক জগতের প্রতিটি সাহিত্যে সমস্ত মহৎ কাহিনীর বিষয়বস্তু যুগিয়েছে, জীবনের সমস্ত আনন্দ ও বেদনার অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশীর উৎসও সমস্ত কাজ-কর্মের মধ্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। ওই থেকেই পারিবারিক বন্ধনের সৃষ্টি, সে বন্ধন দেহে শিরার মত মনুষ্যের সত্তায় সর্বব্যাপী, আমাদের জীবনের প্রতিটি দিনে এবং আমাদের আচরণের প্রতি দিকে তার সম্পর্ক। অপরাধ, বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মাহুতি, বীরত্ব ইত্যাদি যা সমাজের চিন্তার ও আলোচনার চিরন্তন বিষয় তাদের সকলেরই সৃষ্টি ঐ সম্পর্ক থেকে। অন্তহীন নৈতিক আকারযুক্ত এই মহান বিষয়ে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে 'অদ্ভুত নীরবতা।" (১৯৩৭, পৃঃ ৩৮-৩৯)। তিনি বলে চলেছেন, "প্রাণীজগৎ সম্বন্ধেও একই রকমের নীরবতা। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে তাদের কোন মর্যাদা নেই। মহাপতনে তাদের অংশ নেই, তাদের পাপও নেই, করুণার বা মার্জনারও প্রয়োজন নেই, পরলোকেও কোন স্থান নেই। আমরা শুনি মৃত্যু নাকি পাপের ফল, অথচ প্রাণীজগৎ পাপের ভাগী না হয়েও মৃত্যুর অংশীদার। তাদের কোন অধিকারও নেই, আর তাদের প্রতি আমাদের কোন কর্তব্যও নেই। মনে হয় আমরা যেন তাদের সঙ্গে যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারি। (ঐ পৃঃ ৩৯) স্বর্গে আমাদের চাকর, পাখী, কুকুর বা ঘোড়াদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।"

২ ফতেপুর সিক্রির এক মসজিদের খিলানের একদিকে যীশুর বলে কথিত বাণী এই কথাটি খোদাই করা আছে, "পৃথিবী একটি পুল, ওর উপর দিয়ে চলে যাও, কিন্তু ওর ওপর বাড়ি তৈরি করো না। পৃথিবী এক ঘণ্টা কাল স্থায়ী, সেটা সাধনভজনে কাটিয়ে দাও।"

৩ লুথার বলেছেন, যখন তোমার উপর অন্যায় অত্যাচার হবে তখন ভেবো যে জগতের হালই ওই। এখানে ভাল কিছু আশা করতে পার না। নেকড়েদের মধ্যে বাস করলে তাদের মতই ডাকতে হবে। আমরা সবাই এক সরাইয়ের বাসিন্দা, তার মালিক হল শয়তান আর মালিকানী হল পৃথিবী, আর যত রকম খারাপ বাসনা হল তাদের চাকরবাকর, আর তারা সবাই সুসমাচারের চিরস্থায়ী শত্রু। (Quoted in Troeltsch, The Social Teaching of Christianity).

লোককে খ্রীষ্টীয় পদ্ধতিতে জীবনযাপন করতে বাধ্য করার প্রচেষ্টা সফল হয় নি। আমাদের অনেকেরই জীবনের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এক বিধি মুখে মানা আর কাজে অন্য বিধির অনুসরণ করা। খ্রীষ্টধর্ম সংসারের সঙ্গে আপোস করে নেয়। অনেক সময় যীশুর বাণী "সম্রাটের বস্তু সম্রাটকে দাও, ঈশ্বরের বস্তু ঈশ্বরকে দাও"-র ব্যাখ্যা হয় যে দু'রকম মান গ্রহণ করা শাস্ত্রসম্মত। ধর্ম ও রাষ্ট্র দুই ভিন্ন রাজ্য, মধ্যে অনেক তফাৎ আর এর প্রত্যেকের নিজের চিন্তা, অনুভূতি ও আচরণের মান নির্দিষ্ট আছে। যে জগতে অভিশপ্ত লোকেরা বাস করে এবং তাদের ভ্রষ্ট সামাজিক সম্পদ ভোগ করে তার সঙ্গে ঈশ্বরের রাজত্বের কোন সম্পর্ক নেই। ধার্মিক লোক তাকে কোন রকমে সহ্য করতে পারে। কিন্তু যেহেতু সে পৃথিবীতে অতিথি মাত্র, সে তার সঙ্গে ঘনিষ্ট হতে চায় না, পাছে পৃথিবীর ময়লা তার গায়ে লাগে। কিন্তু এরকম ভাব ঠিক নয়। সম্রাটের বস্তুকে ভগবানের বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত করতে হবে। পারমার্থিক জীবন দিয়ে পার্থিব জীবনকে আপ্লুত করতে হবে। আত্মিক রুগ্নতার ধর্ম ঘুমের ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হতে পাবে না। ধর্ম সামাজিক প্রগতিকে গতিদান করে। অন্তরের শৃঙ্খলার উপর বিশ্বাস না থাকলে বাইরের শৃঙ্খলাকে স্থায়ী করতে পারব না। ধর্মকে এতখানি তুরীয় করে তুললে চলবে না যে জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ থাকবে না। যে সব মুহূর্তে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি খোলে তখন আমরা মানুষের চরম লক্ষ্য অনুধাবন করতে পারি এবং তখন নিশ্চিত বুঝতে পারি যে তা সফল হবে। এমন সব ঘটনা যদি ঘটেও যে বিশ্বের এইসব উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার মত দেখায়, তবু আমাদের হতাশ হওয়া চলবে না। সর্বোচ্চ লক্ষ্যের উপর যার নজর আছে, সে তাকে সিদ্ধ করার চেষ্টা করে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে আমাদের কর্তব্য হবে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। যাঁরা ধর্মস্থাপনা করেছেন তাঁরা তৎকালীন সমাজব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। তাঁরা শান্তি ব্যাহত করেছিলেন। বিশ্ব তাঁদের সমর্থন করবেই এই বিশ্বাসে তাঁরা পার্থিব শক্তির অধিকারীদের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তার জন্য কষ্টভোগও পেয়েছিলেন। কষ্টভোগ ও আত্মোৎসর্গ থেকেই সমস্ত মহৎ কাজের উৎপত্তি।[১] আমরা যদি পৃথিবীর মধ্যে হারিয়ে যাই তো মৌলিক কিছু করতে পারব না, সমাজকে বা মানুষের স্বভাবকে নূতন ছাঁচে ঢালতে পারব না, অজানা দেশের সন্ধানে অভিযান করতে পারব না। সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে আমাদের মতামত হবে নিষ্প্রাণ ও যান্ত্রিক। সত্যকার ধার্মিক মানবিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়। হেগেলীয় ভাববাদ সমসাময়িক জার্মানীতে ধর্মের স্থান গ্রহণ করেছিল। ওতে প্রুশীয় রাষ্ট্রকে ভগবানের রাজ্যের সঙ্গে অভিন্ন বলে দাবি করা হয়েছিল। যে রাজত্ব অনন্ত ও অসীম তাকে কোন পার্থিব রাষ্ট্রের অধীন বলে মনে

১ অস্কারওয়াইল্ড বলেছেন: "দুঃখ দিয়ে পৃথিবী গড়া, শিশুই হোক বা নক্ষত্রই হোক তার জন্মের সঙ্গে বেদনা জড়িত।"—De Profundis.

বর্তমান জাপানের একজন সন্ত্রী মৃত্যুদণ্ডে প্রাণ দেবার মুখে দু লাইন সারগর্ভ চীনা কবিতা উচ্চারণ করেছিলেন: "স্ফটিক হয়ে ভঙ্গুর হওয়া ভাল, বাড়ির উপরকার টালির মত অক্ষত থেকে কোন লাভ নেই।"

করলে ঈশ্বরের রাজত্বের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। গীজো ইউরোপীয় সভ্যতাকে অন্য সব সভ্যতার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, ইউরোপে কোনো নীতি, ভাব, গোষ্ঠী বা শ্রেণী পরম আকার ধারণ করে স্থায়ী হয় নি, এইজন্যেই ইউরোপের প্রগতি।

আমাদের মন যদি শুদ্ধ থাকে, প্রেম যদি গভীর হয়, তো যে মহান্ ধারণাকে আমরা ভগবান বলি তার প্রতি বিশ্বাস রেখেও আমরা পৃথিবীতে কাজ করতে পারি। ঋষিতুল্য লোকেরা পৃথিবীর দুঃখে বেদনা বোধ করেন এবং জীবনের বোঝা অনুভব করেন। তাঁদের ভক্তি কোন বিশেষ দেশের প্রতি নয়, দেশকে অতিক্রম করে সারা জগতের প্রতি। তাই তাঁদের কাছে যুদ্ধ হল মনুষ্যত্বের দ্বিধাকরণ ও সম্পূর্ণ বিশ্রী ব্যাপার, কেননা প্রীতি ও করুণাই হল সর্বসৌন্দর্যের সার। আমরা যে জীবনধারণের পরম সুযোগ পেয়েছি, তাকে এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যাতে বিশ্বের সৃজনীশক্তি আমাদের মধ্যে সজীব হয়ে ওঠে, আমাদের রক্তমাংসে আকার নেয়, আমাদের চেতনার মধ্যে সার্থক হয় এবং পরিবেশের উপর বিজয়ী হতে পারে।

ধর্মজীবনের বিকাশে বুদ্ধি ও আবেগসঞ্জাত মননকে গভীরতা দানের জন্য ব্যবহারিক ক্রিয়ার বিরতি প্রয়োজন হয়। ধর্মজীবনের ছন্দই হল ছেড়ে যাওয়া আবার ফিরে আসা, চিন্তা ও ধ্যানের প্রয়োজনের গভীরে ডুবে যাওয়া আবার সামাজিক জীবনে ফিরে আসা। নির্জন প্রয়াণ দুরকমের হয়, বুদ্ধিসঞ্জাত যা থেকে দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের জন্ম হয়, আর আবেগসঞ্জাত যা থেকে রূপ কলা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির জন্ম হয়। তারা ধর্মীয় জীবনের অখণ্ড অংশ, ব্যক্তির ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ক্রিয়া নয়। যখন আমাদের ব্যর্থতায় গ্রাস করে, আমাদের শক্তি নির্জীব হয়ে আসে, আমাদের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে, আমাদের স্নায়ুচ্যুতি ঘটবার উপক্রম হয়, তখন আমাদের প্রার্থনা ও ধ্যান করা উচিত। যীশু যে নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন তা শক্তি সংগ্রহের জন্যই। পাহাড়ের উপর গিয়ে এবং অলিভ পাহাড়ের বাগানে তিনি যে রাত্রিকালে প্রার্থনা করতেন সে শুধু শক্তি সঞ্চয়ের জন্য। যারা ঈশ্বরের অপেক্ষায় থাকবে তাদের শক্তি নব উজ্জীবিত হবে। "নীরবতায় ও প্রত্যয়েই তোমার বল।" ম্যাডাম গুইয়োঁর (Guyon) ভাষায় সেগুলি "ঐশ্বরিক সৃজনকাল"। আমরা সমস্ত উৎসর্গীকৃত জীবনেই এই দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করি। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে থেকে নীরবতায় ও চিন্তায়, ঝড় থেকে স্তব্ধতায়, সংঘর্ষ থেকে শান্তিতে এবং সর্বত্রই নির্জনতায় যে নব উন্মেষ হয় তাই ঝঞ্ঝার সময়ে পথ দেখায়। তত্ত্বজ্ঞানীরা তাঁদের স্বপ্নকে বাস্তবতায় ভূষিত করেন। আত্মজয়ই হল তাঁদের সাধনা, নিজেকে এড়িয়ে যাওয়া নয়। ঔদাসীন্য নয়, সুস্থিতিই গৌরবের। সংঘাত-বিক্ষুব্ধ জগৎকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই ত্রাণ করতে হবে।

ব্যক্তির দিক ও সমাজের দিক দুটোই অপরিহার্য। সমাজের মধ্যে বা তার অন্তর্বর্তী অসংখ্য গোষ্ঠীর মধ্যে, কোনটাতেই ব্যক্তি নিজেকে বিলুপ্ত করতে রাজী হবে না। উদ্যমশীল ব্যক্তির শক্তি থেকেই সমাজের শক্তির উদ্ভব। ব্যক্তিত্ব হারালে সবই নষ্ট হবে। আধুনিক মানুষকে নিজের সামাজিক চেতনা বা বিবেক বর্জন

না করেও, সামাজিক স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার দীক্ষা নেওয়ার মত যথেষ্ট উৎসাহ নিজের মধ্যেই আবিষ্কার করতে হবে।[১]

শুধু ধ্যান-ধারণা বা দিব্যোন্মত্ততার মধ্যেই ধর্মের লক্ষ্য নয়, জীবনস্রোতের সঙ্গে অভিন্নতা এবং তৎসংশ্লিষ্ট সৃজনীমূলক প্রগতিতে অংশ নেওয়াই আবশ্যকীয়। ধার্মিক লোক তার জড়প্রকৃতি ও সামাজিক অবস্থার সীমাকে অতিক্রম করে সৃজনকারী লক্ষ্যকে বিস্তৃত করে। ধর্ম গতিশীল, অসামান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে সৃষ্টির আবেগে নব প্রচেষ্টার রূপে মনুষ্যত্বকে উচ্চস্তরে নেওয়ার প্রয়াস। সামাজিক স্তব্ধতাকে অতীন্দ্রিয় ভাবের ফল বলে যদি নিন্দা করা হয় তো আর্থিক ব্যাপারেও অদৃষ্টের উপর দোষ চাপানো সমান নিন্দনীয়। মার্কসের প্রধান উদ্দেশ্য হল সমষ্টির ভাবরাজ্যে উন্নয়নে আমাদের দীক্ষিত করা। মানুষের আত্মাকে মুক্ত করে যে একমাত্র আন্তরিক উপায়ে পৃথিবীকে উন্নত করা যায়, তা করা সম্ভব হবে।

নববিধান

ধর্মের যথাযথ ধারণা ও আচরণ থেকেই শান্তিপূর্ণ বিপ্লব ও অভিপ্রেত নববিধান সম্ভব হবে। একজন আধুনিক কবির ভাষায় সেটা হবে "গভীরতম ঐতিহ্যের খাতিরে অকল্যাণ দূর করা"। মানুষ এখনও ইতিহাসের প্রারম্ভে, শেষে নয়। যে জগৎ এখনও ভাল করে জন্মায় নি, প্রেম ও করুণা, সত্য ও সৃজনধর্মিতার সেই জগৎ গঠন করার সংগ্রাম এখনও অব্যাহত গতিতে চলেছে।

আমাদের ধর্মনায়করা ঘোষণা করেন যে তাঁরা ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত আছেন। অবশ্য এরকম ঘোষণা যে তাঁরা এই প্রথম করলেন তা নয়। তাঁরা বলেন যে এ যুদ্ধে জয়লাভ করে নাৎসীবাদকে ধ্বংস যদি না করতে পারি তো পৃথিবী আবার নতুন করে অন্ধকার যুগে ফিরে যাবে, সেখানে কতকগুলো গুণ্ডা বিজ্ঞানের শক্তি অপব্যবহার করে কোটি কোটি লোককে দারিদ্র্য ও অজ্ঞতায় ডুবিয়ে দেবে। তারা বলেন যে হিটলারের জয় হলে প্রাচীন অন্ধকারের মধ্য থেকে যা উৎক্ষিপ্ত হবে, বর্বরতায় যা পুনরভ্যুদয় হবে, তাতে মানুষের স্থিতিশীল ও সুবদ্ধ সমাজের দিকে শ্রমসাধ্য অগ্রগতি ব্যাহত হবে বা বিপরীত গতি নেবে। এ যুদ্ধ যে খ্রীষ্টীয় সভ্যতা ও পৌত্তলিক বর্বরতার মধ্যে, গণতন্ত্র ও স্বৈরাচারের মধ্যে তা আমাদের জানানো হয়েছে। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখলে বোঝা যাবে যে উল্লিখিত বিষয়গুলির বৈপরীত্য খুব স্পষ্ট নয়। বর্তমান ব্যবস্থাকে খ্রীষ্টানও বলা চলে না, সভ্যও বলা চলে না, এমন কি যথার্থ গণতান্ত্রিকও বলা চলে না। জঙ্গী মনোভাব আমাদের গর্বের বিষয় নয়, কিন্তু তা প্রত্যেক জাতির মধ্যেই আছে এবং তাদের অপরাধের কৈফিয়ৎ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যে সম্পদ ও সুবিধা থেকে মহা ঐশ্বর্যের সৃষ্টি হয়েছে তাই থেকেই ভয়ঙ্কর দারিদ্র্যেরও সৃষ্টি হয়েছে। দারিদ্র্য

---

১ আকুইনাসের দুটি আপাত-বিপরীত বচন আসলে পরস্পরের পরিপূরক। প্রথমটি "সমগ্রের খণ্ড যেমন অংশ, ব্যক্তিও তেমনি সম্প্রদায়ের অংশ" আর দ্বিতীয়টি "মানুষ তার সমগ্র নিজস্বতার ক্ষেত্রে বা সমস্ত সম্পদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সম্প্রদায়ের অধীন নয়"।

সব জাতির মধ্যেই আছে এবং দারিদ্র্য অন্যায়। জাতীয় অসাম্যেই বর্তমান সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি। লোকেদের আমরা সম্পত্তি বলে বিবেচনা করতে শিখেছি, আর সম্পত্তি থাকলেই বিবাদ। জাতিদের এক জাগতিক সম্প্রদায়ের সম্ভাব্য সদস্য বলে না ধরে তাদের পরস্পর যুধ্যমান যান্ত্রিক শক্তি বলে ধরা হচ্ছে এবং এই শক্তির সাম্য রক্ষা করার উদ্বেগ থেকে জাতীয় নীতি তৈরী হচ্ছে। আমরা যাকে খ্রীষ্টীয় সভ্যতার গণতন্ত্র বলি তার মধ্যে যতদিন এই সব অনাচার চলবে ততদিন নাৎসীবাদ ধ্বংস হলেও স্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। ১৯১৮ সালের সামরিক বিজয়ই প্রমাণ করে যে ওপথে চরম সাফল্য লাভ করা যায় না। আমাদের গণতন্ত্রে বিশ্বাস যদি যথেষ্ট সক্রিয় হত তাহলে বর্তমান যুদ্ধ নিবারণ করা যেতে পারত। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে বিজয়ী শক্তিরা স্ট্রেসম্যানের জার্মান গণতন্ত্রকে ভিতরে ভিতরে সারশূন্য করে নিয়ন্ত্রীকরণ সম্মেলনের প্রয়াসকে বাধা দিতে থাকে। লীগ অঙ্গীকারের সামগ্রিক নিরাপত্তাকে নির্বীর্য করে, আর চীনে, আবিসিনিয়ায় ও স্পেনে সামরিক আগ্রাসকে মেনে নিয়ে মিউনিকে পরিণতি লাভ করে। আর. এইচ. ব্রুস লকহার্টের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে স্ট্রেসম্যান ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মত স্পষ্টভাবে যুদ্ধের সম্ভাবনা বিবৃত করেন। তিনি পাশ্চাত্ত্য শক্তি বিশেষ করে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে নালিশ জানান। তিনি তাঁর ইংরাজ অতিথিকে জানান যে জার্মানীর শতকরা আশীজনের সমর্থন তিনি লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর দেশকে লীগ অব নেশনসের সামিল করেন। তিনি লোকার্ণো সন্ধি স্বাক্ষর করেন। তিনি ক্রমাগত দিয়েই গেছেন, তাতেই তাঁর দেশের লোক তাঁর বিরুদ্ধে যায়। "তোমরা যদি কোন একটা বিষয়ে আমাকে কিছু সুবিধা দিতে, তাহলেও আমি দেশের লোকের সমর্থন পেতে পারতুম, এখনও পারি। কিন্তু তোমরা কিছুই দিলে না, যা নগণ্য কিছু দিয়েছ তাও এত দেরি করে যে তার কোন দামই রইল না। এখন পশুশক্তি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ভবিষ্যৎ এখন নূতন পুরুষের লোকেদের হাতে এবং যে জার্মান তরুণদের নূতন ইউরোপ ও শান্তির পথে দীক্ষিত করা যেত, তারা আমাদের দুই পক্ষেরই হাতছাড়া হয়ে গেছে। এ আমার ব্যর্থতা ও তোমাদের অপরাধ।"[১]

যে ব্যবস্থার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, মানুষ তার থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। আমরা যদি আবার সেই পুরানো বন্দোবস্তের পুনপ্রতিষ্ঠা করি, মানুষের জীবনকে সুবিন্যস্ত করতে নূতন ভিত্তি যদি না আবিষ্কার করতে পারি, তাহলে যুদ্ধ

১ ১৯৪১ সালের ২৯শে মার্চের সংখ্যা New Statesman and Nationএ John Middleton Murray বলেছেন: "ইউরোপের বর্তমান অবস্থার জন্য আমরা ইংরেজরা সব চেয়ে বেশী দায়ী। অস্ত্রাবিরতির পর জার্মানীকে খাদ্যহীন করা আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব; সন্ধিশর্তের জন্য আমরা দায়ী। তাতে জার্মানীকে যুদ্ধ অপরাধের জন্য অন্যায় করে দায়িত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়, অথচ রাশিয়ার দায়িত্বও কিছু কম ছিল না। প্রধানতঃ আমাদের অবিচার, যে নৈতিক ও মানবিক আদর্শকে পবিত্র বলে আমরা ঘোষণা করি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা থেকেই আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন বর্বরতার উৎপত্তি হয়েছে, তাদের সঙ্গে বোঝাবুঝির চেষ্টা আজ বিফল হবে।" Defence of Democracy (1939) পৃ: ২৪৮-৭

করা বৃথাই হবে। আধুনিক জগৎ অতিমাত্রায় বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক, তার জন্য নূতন ধরনের আচরণ দরকার। তাকে চালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে, তাতে মনুষ্যত্ব আরোপ করতে হলে মন ও হৃদয়ে নূতন ভঙ্গীর দরকার। আমাদের সকল মানুষের জন্য জীবনের নূতন পন্থা দরকার, দলীয় ইস্তাহার দিয়ে তার অভাব মিটবে না। এখানে ওখানে সামান্য জোড়াতালি দিয়ে চলবে না, মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নূতন ধারণা দরকার।

স্থানীয় ও অস্থায়ী প্রশ্ন বাদ দিলে, মানবসৌভ্রাত্রকে ব্যবহারিক ভিত্তিতে আয়ত্ত করার বিরুদ্ধে যে জড়বাদী শক্তি কাজ করছে, আর তার স্বপক্ষে যে সব অস্পষ্ট আত্মিক শক্তি লিপ্ত আছে, এদের মধ্যেই নিকট ভবিষ্যতের সমস্যা সীমাবদ্ধ। গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র উভয়ের মধ্যেই জড়বাদের প্রবল প্রতিপত্তি, এমন কি মন্দির ও গীর্জায়, অফিসে ও বাজারেও তারই প্রভাব।

কি জীবনদর্শন নিয়ে আমরা যুদ্ধ করছি ? ব্রিটেন, রাশিয়া ও আমেরিকা জয়লাভ সম্পূর্ণ করার পর কি ধরনের জাতিসম্প্রদায় গড়বে ? সরকারের লক্ষ্যও কি ভাবে প্রসারিত করবে ? বন্দুক, ট্যাঙ্ক, বিমান ও মানোয়ারী জাহাজ দিয়ে শত্রুকে হারাতে পারলেই আমরা স্থায়ী শান্তি পাব না। প্রত্যেক মানুষের তার নিরীক্ষা করার অধিকার আছে, এ মানুষের কাছে স্পষ্ট হওয়া চাই। গণতন্ত্রকে আধ্যাত্মিক রূপ দিলে সমাজের আমূল পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আমরা যদি জীবনে নূতন অর্থ ও সৌন্দর্য আনতে চাই তো সেইরকম আধ্যাত্মিক শক্তির প্রস্রবণ দরকার যেমনটি বহুদিন আগে মিশরে ও ভারতে এবং পরে গ্রীসে ঘটেছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পর জাপানে ও চীনে এবং মধ্যযুগের যে দুই শতাব্দী ধরে উত্তর ইউরোপে মিস্টিক ধর্ম প্রবল ছিল, সেখানেও এই রকম ব্যাপার হয়েছিল। একটি বিশ্বাসের স্থান আর একটি বিশ্বাসই নিতে পারে।

আমরা সকলেই আশা প্রকাশ করছি যে এ রকমটি আর ঘটবে না। ১৮১৪ সালে নেপোলিয়নের সময়ও এই কথাই শোনা গিয়েছিল। ১৯১৪ সালে কাইজারের বিপক্ষে বিতৃষ্ণা প্রবেশ করেও বলেছিলুম "আর নয়"। এখন আবার শ্রোতাদের হাততালির মধ্যে সেই কথারই পুনরুক্তি করছি। প্রত্যেকবারেই আমরা তোতাপাখীর মত বলে যাচ্ছি যে আমরা সভ্যতার জন্য যুদ্ধ, মানবতার জন্য যুদ্ধ করছি। তরুণদের চিন্তায় এই ভ্রান্তি মিশোনো হচ্ছে যে যুদ্ধজয় হলেই নূতন জীবন ও যুদ্ধবর্জিত পৃথিবীর পত্তন হবে, তাদের রক্তদান বৃথা যাবে না। এখনও পর্যন্ত সে রকম কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। বুদ্ধিমান ও বিবেকী নরনারী যদি পৃথিবীর ভার না গ্রহণ করে তো ভবিষ্যৎ ভাল হওয়ার কোন নিশ্চয়তা থাকবে না, আমাদের পুত্র-পৌত্ররা তাদের সময়ে আবার অগ্নিশিখা, মৃত্যু ও বিনাশের সম্মুখীন হবে—এ উদ্বেগ থেকেই যাবে। ১৯১৮-৩৯ সালের ঘটনার যে পুনরাবৃত্তি হবে না তার নিশ্চয়তা কোথায় ? যতদিন পর্যন্ত আমরা গ্রীকদের নাগর রাষ্ট্র, ইহুদীদের অসামান্য জাতি ও বর্তমান ইউরোপের জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের ঐতিহ্যকে মান্য করে চলব, ততদিন যুদ্ধকে বর্জন করা যাবে না। মনুষ্যজাতি এক। তারা বালুকণার মত পৃথক নয়। আমরা জৈবভাবে সজীব একতায় আবদ্ধ, তাতে শুধু প্রেমভাবই শক্তিসঞ্চার করতে পারে।

মেজাজ ও ঐতিহ্যের তফাৎ আছে নিশ্চয়ই কিন্তু এই বৈচিত্র্যে সমগ্রের সৌন্দর্য আরও সমৃদ্ধ হয়। মনুষ্যজাতির একত্বের ধারণা যদি অস্পষ্ট হয়ে থাকে, নৈতিক বিধিগুলির অভিন্নতা সম্বন্ধে আমাদের চেতনা যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে আমাদের স্বভাবই ভ্রষ্ট হয়েছে। জাতিরা মানুষের ঐতিহাসিক স্রোতকে আকার দেবার জন্য গোষ্ঠীগত জীবনের রূপমাত্র, তার মধ্যে চরম কিছুই নেই। পরাধীন জাতিদের স্বাধীনতার দাবি বোধগম্য। এক জাতির আর এক জাতির উপর আধিপত্য অধীন জাতির আত্মমর্যাদার সঙ্গে অসঙ্গত, কাজেই পৃথিবীর শান্তি ও কল্যাণের সঙ্গেও তার সঙ্গতি নেই। তাছাড়া জাতীয়তাবোধ নির্বিচারে সকল মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে থাকে না। ইউরোপীয়দের মধ্যেই তা প্রবল এবং ধর্মসংস্কারের পরবর্তী চার শতকের মধ্যে তার উৎপত্তি। আবার জাতীয়তা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব অচ্ছেদ্য নয়, তাদের সহজেই তফাৎ করা যায়। যদি প্রত্যেক জাতির নিজের ইচ্ছার উপর সার্বভৌম অধিকার থাকে, প্রতি জাতি যদি তার লক্ষ্যের চরম নির্ণায়ক হয়, তার নিজের গড়া বিধিনিষেধের বাড়া যদি আর কিছু সে না মানে, তাহলে তার নিজশক্তির কথা স্বতঃই মনে হবে এবং সে সমস্ত কিছু সরিয়ে রেখে শক্তিসংগ্রহে মনোনিবেশ করবে। যে কোন মানবসমাজ দৃঢ়তার অনুভূতি দিয়ে অনুপ্রাণিত হলেই জাতিতে পরিণত হয়। এ অনুভূতির পিছনে এক জাতি, ভাষা, ধর্ম, ইতিহাস, ভূগোল বা অর্থনীতিঘটিত কারণ থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। একটা জাতির মধ্যে সুস্থির স্থায়ী বা নির্দিষ্ট কিছুই নেই। কেউ ঐতিহ্য দিয়ে রূপায়িত, কেউ ঐতিহ্য ব্যতিরেকেই গঠিত, ভাষা কারুর ভিত্তি, কারুর নয়। সাধারণ ইতিহাসের ঐতিহ্যের ফল দিয়ে জাতিগুলি গড়া। ইতিহাস মূল্যের পর্যায়ে পড়ে। থুসিদাইদ্‌স বলেছেনঃ "এ চিরকালের সম্পদ"। শ্রেয় সম্বন্ধে অভিন্ন অভিজ্ঞতা না থাকলে ইতিহাস থাকে না। কিন্তু মনুষ্যসমাজের সমৃদ্ধতর ও পূর্ণতর জীবনের পক্ষে স্বতন্ত্র জাতি অপরিহার্য, কেননা তা থেকে সাংস্কৃতিক বিকাশ উৎসাহিত হয়।

"প্রতিবেশীদের সঙ্গে এমন সাদৃশ্য থাকা চাই যা বোধগম্য হয়, এতটা বিভিন্নতা থাকা চাই যা মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং এমন মহৎ কিছু থাকা চাই যা শ্রদ্ধার্হ।"[১] জাতীয় সমাজের নৈতিক সার্থকতা যুক্তিযুক্ত। জাতিরা ব্যক্তি ও মানবজাতির মধ্যে মধ্যবর্তী স্তর হিসাবে স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয়।

এখন আমরা সভ্যতার মিলনের যুগে বাস করছি। এই শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য পৃথিবীর লোকেরা সমুদ্র, নদী ও পাহাড় দিয়ে পৃথকীকৃত স্থানে বাস করত, কাজেই এক এক স্থানের লোকেরা তাদের নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র ভাবে জীবনযাপন করত। সেখানে সভ্যতার বিকাশের জন্য জমির প্রতি ভালবাসা দেশভক্তির আকারে আর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি ভালবাসা উগ্র জাতীয়তারূপে স্বভাবতঃই প্রয়োজন ছিল। প্রারম্ভিক আর্থিক বিকাশও বিদেশীদের প্রতি বৈরীভাবে উৎসাহ দিত, মনে হত এমনি করে আত্মরক্ষা করা যাবে। আজ কিন্তু বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনা সমস্ত পৃথিবীকে কাছাকাছি এনে ফেলেছে। আমাদের

---

১ A. N. Whitehead, Science and the Modern World (1928)

জ্ঞান, আমাদের চিন্তাধারা, বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী, আমাদের সকল অমূল্য সম্পদ সব জাতির কাছ থেকে পাচ্ছি। এসব ঐক্যের সৃষ্টি না করুক, ঐক্য সৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি করছে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশ ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছে বলেই লোকেদের মধ্যে সহিষ্ণুতা ও সৌভ্রাত্রের বৃদ্ধি দরকার। আমাদের সবাইকে এক মানব পরিবারের লোক বলে ভাবতে হবে আর নিজের জাতির প্রতি আনুগত্য বর্জন না করেও তার পরিপূরক হিসাবে একটা প্রবল জাগতিক আনুগত্যে অংশগ্রহণ করতে হবে। আমরা ধীরে ধীরে একই সভ্যতার অঙ্গ হয়ে যাচ্ছি, কাজেই আমাদের অপবাধ নিজেদের গৃহকেই ব্যথিত করছে, আমাদের যুদ্ধগুলি ঘরোয়া যুদ্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা যখন চীনে জ্বলন্ত বিভীষিকা, ইথিয়োপীয়দের সহায়হীনতা, স্পেনে ফ্যাসিস্ট ও কমিউনিস্টদেব মধ্যে অসমান সংঘর্ষের দিকে চোখ বুজিয়ে ছিলুম, যখন আমরা দুর্বল নির্দোষকে বর্জন করে সবল অপরাধীর সাহায্য কবে নিজেদের ঝামেলার হাত থেকে এড়াতে চেয়েছিলুম তখন আমরা মানবজাতির ঐক্যের মহৎ আদর্শের প্রতি আনুগত্যের অভাব দেখিয়েছি। কিন্তু নীতিগতভাবে গণতন্ত্রে কোন জাতিকে আইন বহির্ভূত বা মনুষ্যেতেব বলে ভাববার কোন যৌক্তিকতা নেই। সমাজের যে নববিধান জন্মের বেদনা ভোগ করছে তার সঙ্গে জ্ঞানীলোক নিজেদের অভিন্ন করে দেখবে। মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন প্রার্থনার বিষয়ও বটে, আবার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিও বটে।[১]

নবীন আদর্শকে রূপ দিতে হলে আদর্শের হস্তপদ—শিল্প ব্যবসায়কে নূতন ভাবে গড়ে তাব দিক পরিবর্তন কবে আমাদের অভ্যাস ও আচরণকেও ঢেলে সাজাতে হবে। আইন ও প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে নব জীবনকে প্রকট কবতে হবে। সামগ্রিক নিরাপত্তাব জন্য রাষ্ট্রসমূহেব স্বাতন্ত্র্য ও সার্বভৌমত্বকে সীমায়িত করতে হবে। জাতীয় রাষ্টসমূহেব হাতে যে বিপুল ও বৃদ্ধিশীল সম্পদ ও শক্তি আছে তাব আন্তর্জাতীয় ও যথাযথ নিয়ন্ত্রণ দরকাব। এই যুদ্ধের একটা আবিষ্কার হল যে কোন জাতি তাব স্বাধীন সার্বভৌমত্ব বজায রাখতে পাবে না। বিপুল শক্তির অধিকাবী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকেও আমেরিকাব যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার প্রয়োজন হয়েছে। অতিশিল্পোন্নত জাতিদের কাছে ছোট জাতিরা দাঁড়াতে পারে না। স্বেচ্ছায় হোক বা বাইবেব চাপে হোক, জাতিদের স্থায়ী রাষ্ট্রীয় এবং আর্থিক জোটেব মধ্যে আসতেই হবে।

যুদ্ধোত্তর জগতের সংগঠন সম্বন্ধে নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা চলছে। কেউ চাইছেন গণতন্ত্রগুলির সম্মেলন, কেউ তিনটি গোষ্ঠীর কথা ভাবছেন "ইঙ্গ-আমেরিকান, ইউরোপীয এবং এসীয।" আমাদের আদর্শ হবে সর্বজাগতিক রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। আঞ্চলিক সংঘের চেয়ে বড় সমাজের কাছেই শান্তির স্থায়িত্বের আশা বেশী। আমাদের প্রকল্পগুলি খণ্ডিত বা দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে নির্ভীক ও সর্বসমন্বিত হওয়া উচিত। মিলটন বলেছিলেন, "জাতিদের কি

১ সংস্কৃত শ্লোকে আছে, বিশ্বমাতাই আমার মাতা ঈশ্বরই আমাব পিতা, সমস্ত মানুষ আমাব ভাই, ত্রিভুবন আমার স্বদেশ।

মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ
ভ্রাতরো মনুজাঃ সবে স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।

করে বাঁচতে হবে তার শিক্ষকতা করার নজীর যেন ইংলণ্ড ভুলে না যায়।" সভ্যতার স্থায়িত্বের জন্য আন্তর্জাতিক অংশীদারী ও রাষ্ট্রীয় মিলনের দিকে প্রগতি অপরিহার্য শর্ত, আর ব্রিটেন রাশিয়া ও আমেরিকাকেই স্বাধীন লোকের জাগতিক সম্প্রদায় গঠনের নেতৃত্বগ্রহণ রাখতে হবে। চার্চিল-রুজভেল্ট ঘোষণা শান্তিব্যবস্থায় সাধারণ নীতি নির্দিষ্ট করেছে।[১]

স্থায়ী শান্তি স্থাপনের পক্ষে পরিস্থিতি অনুকূল। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে কোন জাতি তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার উপর আক্রমণ চালাবে না। স্থিতাবস্থা বলপূর্বক বিঘ্নিত করবার চেষ্টাকে বাধা দিলেই শুধু চলবে না। সাধারণ কল্যাণের জন্য পরিবর্তন শান্তিপূর্বক পদ্ধতিতে ঘটাবার কার্যকরী ব্যবস্থা থাকা চাই। যুদ্ধের শেষে প্রতিহিংসা বা জাতিগত আগ্রাস প্রভৃতির জনপ্রিয় দাবি ঠেকিয়ে রাখা হয়ত সহজ হবে না। গ্রীকেরা খুব সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, তারা হয়ত আলবেনিয়ার কিছু অংশ দাবি করে বসবে। সোভিয়েৎ রাষ্ট্র হয়ত নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে ফিনল্যাণ্ড ও বলকান রাষ্ট্রসমূহের কাছে ভূমি দাবি করতে পারে। ব্রিটেন এশিয়ায় বা আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদী হাত বাড়াবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? চীন জাপান বা ব্রিটেনের কাছে যে সব অংশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে বা ইতালী ইথিয়োপিয়ার কাছে যে সব ভূমি কেড়ে নিয়েছে সে সব প্রত্যর্পণের অনেক সমস্যা জড়িত!

দ্বিতীয় শর্তটি নীতিগত ভাবে অনিন্দনীয়। অক্ষশক্তির আক্রমণে যে সব লোক তাদের স্বাধীনতা হারিয়েছে তাদের পক্ষে স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারই যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য। মানুষের স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত ইচ্ছাই যদি সমস্ত পরিবর্তনের নিয়ামক হয় তো তাদেরও নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকা চাই। এ নীতি শুধু ইউরোপে নাৎসীরা যে সব দেশ দখল করেছে, তা ছাড়া জাপানীরা এশিয়ায় যে সব

---

১ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ও যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল একত্র হয়ে তাদের দেশের জাতীয় নীতির মধ্যে কতকগুলি অভিন্ন নীতি পেয়েছেন এবং তার উপরেই পৃথিবীর উন্নততর ভবিষ্যতের আভাস পেয়ে সেগুলি প্রকাশ করা সমীচীন মনে করেন। প্রথম: তাঁদের দেশের কোন আগ্রাসী বাসনা নেই ভূমি সম্বন্ধেই হোক বা অন্য প্রকারেই হোক।

দ্বিতীয়: তাঁরা কোন দেশ সম্বন্ধীয় পরিবর্তন চান না, যে পরিবর্তন ঐ দেশের অধিবাসীদের স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত ইচ্ছানুযায়ী নয়।

তৃতীয়: তাঁরা সমস্ত লোকের কি রকম সরকারের অধীনে তারা বাস করবে তা ঠিক করার অধিকারকে শ্রদ্ধা করবেন এবং যেসব লোকের স্বাধীনতা বলপূর্বক হরণ করা হয়েছে, তাদের স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমত্ব ফিরে পাওয়াই তাঁদের ইচ্ছা।

চতুর্থ: ছোট বড়, জয়ী বা পরাজিত সমস্ত রাষ্ট্রই যাতে তাদের আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল ও ব্যবসায়ের অংশ পান তার জন্য তাঁরা তাঁদের বর্তমান দায়িত্ব সাপেক্ষে চেষ্টিত হবেন।

পঞ্চম: আর্থিক ক্ষেত্রে সমস্ত জাতিদের পূর্ণ সহযোগিতা তাঁরা দেখতে চান যাতে সকলেই উন্নত শ্রমিকমান, আর্থিক প্রগতি ও সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারী হতে পারে।

দেশ দখল করেছে, সেখানেও প্রযোজ্য হওয়া চাই। বার্মা, মালয় ও ওলন্দাজ শাসিত পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কি হবে? অস্ট্রিয়াকে জার্মান যোগরক্ষা করার বা না করার স্বাধীনতা দেওয়া হবে কি? তাদের কি জাতি হিসাবে নিজেদের পথ নিজেদের বেছে নেবার অধিকার দেওয়া হবে?

অবশ্যই অন্য জাতিদের ক্ষতি না হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয়তাবাদের উপর চীনা ঐক্য প্রতিষ্ঠিত, ভারতেও জাতীয়তাবাদই নীতি হিসাবে প্রবল। জাতীয় বা ধর্মীয় দলকে জাতির ঐক্য ক্ষুণ্ণ করতে দেওয়া চলে না, কেননা তাহলে জাতিসমূহ এমন টুকরো টুকরো হয়ে যাবে যে তাদের আর সামলানো যাবে না। একটি জাতির আভ্যন্তরীণ অসুবিধা বা অচল অবস্থায় উচ্চতম নৈতিক অধিকারযুক্ত এক আন্তর্জাতিক সংস্থাকে প্রতিদ্বন্দ্বী দাবিগুলির সুবিচার করতে হবে, এবং তার রায় সবাইকে মেনে নিতে হবে।

তৃতীয় ধারা অনুসারে শাসনতন্ত্রের আকারকে বিঘ্নিত করা চলবে না। এমন কি সোভিয়েৎ রাশিয়াও পৃথিবীময় বিপ্লবের প্রকল্প বর্জন করেছে। ট্রটস্কির উপর স্তালিনের জয় স্থায়ী জাগতিক বিপ্লবের উপর এক দেশে সমাজবাদের নীতির জয়। যুদ্ধের সময় স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে স্তালিন ধনিকতান্ত্রিক দেশদের সঙ্গে সৌহার্দ্যমূলক সহযোগিতায় বিশ্বাসী। বলশেভিজম্ জাতে উঠেছে। পেশাদার বিপ্লবীরা এখন আর রাশিয়ায় নেই, বিদেশে চলে গেছে।[১] সোভিয়েৎ রাশিয়া আর সমাজবাদের সীমানা বাড়াতে বদ্ধপরিকর নয়। "লোকেরা যে রকম সরকার চায় সেই রকম সরকারের অধীনে বাস করার স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা" যদি আমরা করি তা হলে যেখানে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া আমাদের নিজেদের হাতে সেখানে সেটা দিয়ে আমাদের আন্তরিকতা প্রমাণ করা উচিত। "বিদেশী শাসকের অসহনীয় হীনতা" শুধু যে ইউরোপেই লোপ করতে হবে তা নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই সেই নীতি খাটাতে হবে। ভারতে জাতি হিসাবে তার পরিণতির চেতনা ব্রিটেনই এনেছে। কিন্তু যখন

ষষ্ঠ : নাৎসী স্বৈরাচারের সম্পূর্ণ বিনাশের পর তাঁরা এমন শান্তি স্থাপনার আশা করেন যাতে সকল জাতিই তাদের নিজের সীমানার মধ্যে নিরাপদে বাস করতে পারে এবং সব দেশের সব লোকই ভয় এবং অভাবমুক্ত হয়ে বাস করার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারে।

সপ্তম : এরকম শান্তির কালে সমস্ত লোকই বিনা বাধায় সমুদ্রপথে বিচরণ করতে পারবে।

অষ্টম : তাঁরা বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীর সকল জাতিই বাস্তব এবং আধ্যাত্মিক কারণে শক্তির ব্যবহার বর্জন করবে। যেহেতু যে সব জাতিরা দেশের সীমার বাইরে অন্য দেশ সম্বন্ধে আগ্রাসী মনোভাব পোষণ করেন, তাঁরা যতদিন স্থল, নৌ ও বিমানে বহুতত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকবেন ততদিন স্থায়ী শান্তিরক্ষা করা সম্ভব নয়। সেই হেতু ব্যাপক ও স্থায়ী সাধারণ নিরাপত্তার স্থাপনসাপেক্ষে এই সব জাতির নিরস্ত্রীকরণ অপরিহার্য। শান্তিপ্রিয় লোকেদের অস্ত্রসজ্জার দুর্বহ বোঝার কিছু লাঘব করার জন্য সর্ববিধ বাস্তব ব্যবস্থাকে উৎসাহ দেবেন ও সহায়তা করবেন।

১ লন্ডনে মিত্রশক্তিবর্গের দ্বিতীয় সম্মেলনে লন্ডনের সোভিয়েৎ রাষ্ট্রদূত মিঃ মেস্কি ঘোষণা করেন : "সোভিয়েৎ রাষ্ট্র প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা ও ভৌমিক অখণ্ডতা রক্ষা করার অধিকার স্বীকার করেন। তাদের নিজেদের সামাজিক সংগঠন এবং আর্থিক সমৃদ্ধির উন্নতিকল্পে যে রকম শাসনব্যবস্থা প্রয়োজন তা নির্বাচন করার অধিকারকেও তাঁরা সমর্থন করেন।"

সমস্ত জাতির আত্মকর্তৃত্বের কথা ঘোষণা করছি, তখন গণতন্ত্রবিরোধী কর্তৃত্বের মাধ্যমে তার নির্বাচিত নেতাদের কারাবন্দী করে, বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগ করে ভারতকে শাসন করে যাওয়া আমরা কতখানি পর্যন্ত আত্মবঞ্চনা করে যেতে পারি তারই প্রমাণ। চার্চিল-রুজভেল্ট ঘোষণা কিভাবে ভারতবর্ষে প্রযুক্ত হবে, সে সম্বন্ধে মিঃ চার্চিল বলেছেন : "August ১৯৪০ সালের ঘোষণায় ভারতকে আমাদের মত ব্রিটিশ কমনওয়েলথের স্বাধীন ও সমান অংশীদার হওয়াতে সাহায্য করার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অবশ্য তার মধ্যে আমাদের ভারতের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্কজাত যে সমস্ত বাধ্যবাধকতা আছে, এবং ভারতের নানা রকমের ধর্ম, জাতি ও প্রতিষ্ঠান সমূহের কাছে আমাদের যে দায়িত্ব আছে সেগুলি বিবেচনা করতে হবে।" ভারতে ব্রিটিশ শাসন বজায় রাখার জন্য এই সব ঐতিহাসিক দায়িত্বগুলির দোহাই দেওয়া হবে। অধীন লোকেদের আত্মকর্তৃত্বের অধিকার নেই। ভারত, বর্মা বা পৃথিবীর অন্যান্য অশ্বেত জাতিদের সম্বন্ধে ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্তন এই যুদ্ধ থেকে আসে নি।[১] মিঃ চার্চিল যখন এই সনদ নিয়ে দেশে ফিরলেন তখন তিনি তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করলেন যে তৃতীয় শর্ত দিয়ে ভারত বা বর্মায় ব্রিটিশ নীতির কোন পরিবর্তন হবে না। তিনি বললেন : "ভারত, বর্মা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে সাংবিধানিক শাসনতন্ত্রের খোলস সম্বন্ধে যে সব নীতি এর আগে নানা সময়ে ঘোষণা করা হয়েছে, তার কোন হেরফের করাও সনদের উদ্দেশ্য নয়।" ওর মৌলিক উদ্দেশ্য হল যে সব ইউরোপীয় জাতি ও রাষ্ট্র নাৎসীদের কাছে স্বাধীনতা হারিয়েছে তাদের জাতীয়জীবন, স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমত্বের পুনরুদ্ধার করা। এশীয় লোকেদের রাষ্ট্রনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা অগ্রাহ্য করে চার্চিল হিটলারের মহত্তর জাতিবাদই মেনে নিচ্ছেন। ১৯৪২ সালের ১০ই নভেম্বর লর্ড মেয়রের ভোজসভায় তিনি জোর গলায় ঘোষণা করেন, "পাছে কোন দিকে কোন ভুল বোঝাবুঝি হয় তাই বলছি যে আমাদের যা আছে তা রক্ষা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গুটিয়ে আনার জন্য ব্রিটিশ রাজার প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করি নি।" অথচ আমরা শুনতে পাচ্ছি যে সাম্রাজ্যবাদের দিন গত হয়ে গেছে। ভারতের ঐক্য ও স্বাধীনতার সমস্যাকে যথাযথভাবে প্রণিধান না করার জন্য ভারতের অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। শক্তিমান জাতিদের গৃহীত নীতি যদি সমস্ত জগতের সাধারণ উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয় তাহলে নেতাদের ঘোষণার মূল্য কি? মিঃ চার্চিলের আব্রাহাম লিঙ্কনের সেই জ্ঞানগর্ভ কথাগুলি স্মরণ করা দরকার : "আমি যেমন দাস হতে চাই না, তেমনি প্রভু হতে চাওয়াও আমার উচিত নয়। যিনি এ মত গ্রহণ না করেন, তিনি গণতন্ত্রী নন।" ব্রিটিশ রাজপুরুষরা নূতন জগতের কথা বলেন কিন্তু তার

১ Political quarterly (April-June 1942) নামক পত্রিকায় একজন লেখক মালয়ের পতন সম্বন্ধে বলেছেন : "আসলে ইংরাজ-ভাবাভাবী লোকদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য, অশ্বেত জাতিদের সম্বন্ধে সহজাত অবিশ্বাস ও বিতৃষ্ণার ভাব দুর্ভাগ্যক্রমে খুব বেশী রকম চোখে পড়ে এবং এ সমস্যা শুধু 'ব্লিম্পদের (Blimp) মধ্যে বা 'শাসক সম্প্রদায়ে' সীমাবদ্ধ বলে ভাবলে সমস্যাটার খুব ভুল ধারণা করা হবে।" (১০৫ পৃঃ) "জাপানীরা যে মালয় জয় করতে পেরেছে তার জন্য ব্রিটিশ সরকারের অ-ইউরোপীয় জাতিদের সম্বন্ধে নীতির ত্রুটি বা অভাবই অনেকটা দায়ী।" (১০৬ পৃঃ)

সৃষ্টির জন্য পুরাতন প্রথা বর্জন করতে চান না। তা হয় না। তাঁরা যদি যুদ্ধে জিতে আবার পুরানো ব্যবস্থায় ফিরে যেতে চান তা হলে এই "ধর্মযুদ্ধ" হত্যা-উৎসব ও ঘৃণা ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁর ঐতিহাসিক ঘোষণায় বলেছেন, "একনায়কদের প্রভুজাতি সম্বন্ধীয় ধুয়া সম্পূর্ণ নিরর্থক বলে ধরা পড়বে এ আমরা বিশ্বাস করি। এমন কোন জাতি থাকতে পারে না বা থাকবে না যা আর একটি জাতির উপর প্রভুত্ব করার যোগ্য।" অথচ তাঁর দেশেও এক কোটি বিশ লক্ষ নিগ্রো জাতি-বৈষম্যের জন্য দেশের জীবনে কোন সক্রিয় অংশ নিতে পারে না। তাদের বিরুদ্ধে যে সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় তা থেকে বোঝা যায় যে তাদের যে স্বাধীনতা ও সাম্যের জন্য যুদ্ধ কবতে বলা হচ্ছে, তা তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অশ্বেতকায় লোকেদের সঙ্গে ব্যবহার, তাদের বিরুদ্ধে সামাজিক বৈষম্য, তাদের প্রতিরক্ষা সম্বন্ধীয় শিল্প ও শ্রমিক সংঘ থেকে বহিষ্কার থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে আমেরিকা গণতন্ত্র ও জাতিসাম্যের দ্বিধাহীন সমর্থক নয়। আবার যে আইন অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্র গঠিত হয় তাতে দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের অধিকাংশকেই রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সদর দপ্তরের প্রত্যক্ষ শাসিত রাজ্য কেনিয়ার মত দেশে জাতিমূলক অন্যায় বেড়েই যাচ্ছে। এক ক্ষুদ্র উপনিবেশকারী জাতি এমন নিরঙ্কুশ শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছে যে নাৎসীরাও তার চেয়ে বেশী কিছু চায় না, যদিও ব্যাপাবটা অত স্পষ্টভাবে প্রকট নয়।

জমি, শ্রম ও কর সম্বন্ধীয় আইনকানুন ও তার প্রয়োগে প্রতিষ্ঠানগুলির এমন ব্যবস্থা যে আফ্রিকানরা স্বাধীন আর্থিক সুযোগ পায় না, তাদের ইউরোপীয়দের প্রতিষ্ঠানে বিনা বেতনে খাটা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না, কাজেই তাদের সর্বদা পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠদের রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় সুযোগ-সুবিধা প্রশাসনিক ব্যবস্থা দ্বারা সুরক্ষিত। অন্য জাতিদের ইতর বলে তাচ্ছিল্য করা এক জিনিস, কিন্তু মুখে তাদের সমান বলে মেনে নিযে কার্যতঃ তাদের হেয় করা আরও খারাপ।[১] প্রথমটার মধ্যে সততা ও স্পষ্টবাদিতা আছে, আর দ্বিতীয়টার মধ্যে অনুকম্পার সঙ্গে ঘৃণা মিশ্রিত, কাজেই আরও বিপজ্জনক। জাতিপুঞ্জের শর্তাবলীর মধ্যে জাতিসমূহের সাম্য নীতিগতভাবে স্বীকৃতির প্রস্তাব যখন জাপান উত্থাপন করে তখন প্রেসিডেণ্ট উইলসন তার বিরোধিতা করেন এবং ইংরেজরা তাঁর বিরোধিতার সমর্থন করেন। মিঃ অ্যাটলি অবশ্য জোর দিয়ে বলেছেন যে, আগের দিন তিনি যে সব নীতি ঘোষণা করেছেন তা পৃথিবীর সকল জাতির সম্বন্ধেই খাটবে।[২] অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটব্রিটেন চীনে যে

১ Jacques Maritain বলেন: "খৃষ্টানদের মধ্যে জাতিবৈষম্যের ভাব খৃষ্টধর্মের নীতিবিরুদ্ধ এবং খৃষ্টধর্মের প্রসারের পক্ষে ওর চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছুই হতে পারে না··· অথচ খৃষ্টজগতে ও জিনিসটা বহুদূরপ্রসারী।"

২ লণ্ডনের পশ্চিম আফ্রিকার ছাত্রদের দ্বারা তাঁর সম্মানে আয়োজিত এক সম্মেলনে মিঃ অ্যাটলী বলেছেন: "এ দেশের সরকার যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সকল ঘোষণা করেছেন, তার মধ্যে এমন

রাষ্ট্রোত্তর অধিকার ভোগ করে আসছিলেন তা ত্যাগ করা খুবই বড় কথা এবং এর পর যুক্তরাষ্ট্রে এসিয়াবাসীদের নাগরিকত্ব লাভের পক্ষে যে সব বাধা আছে, সেগুলি যদি দূর হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র যে জাতিবৈষম্যমুক্ত তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

অতীতের রাজ্যজয়ে খণ্ডিত এবং বর্তমানে শক্তির ভিত্তিতে পরিচালিত পৃথিবীতে যুদ্ধ অনিবার্য। যুদ্ধে জীবনদান যদি বৃথা না হয়, যুদ্ধের শেষে শান্তি থেকে যদি বিরোধের ও প্রতিহিংসার মনোভাবের না উদ্ভব হয়, মানুষের মনে যদি ঘৃণা ও হতাশার সৃষ্টি না হয়, অধীন জাতিগুলি যদি বন্ধনে পীড়িত না হয়, তাহলে অতীতের অন্যায়ের প্রতিকার করতে হবে, সমস্ত জাতির স্বাধীনতা ও অস্তিত্বের রক্ষার ভার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে নিতে হবে। বর্তমান ব্যবস্থা সামান্য কয়েক ব্যক্তি ও জাতিকে সুবিধা দান করে এবং এইগুলি বজায় রাখাই যদি বিজয়লাভের একমাত্র ফল হয় তো তাকে লোভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা মেটাতে পশুশক্তির প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না। সভ্য জগতের বিবেক দাবি করে যে, সমস্ত উপনিবেশ ও অধীন দেশের সমস্যা ন্যায় ও নিরাসক্তির দৃষ্টিতে পুনর্বিচার করা হোক।

আবার লোকেদের নিজের দেশের সংবিধান নির্ধারণ করার অধিকার থাকবে কিন্তু ভবিষ্যৎ জগতে জাতিরা তাদের নিজেদের কাজ সম্বন্ধে নিজেরাই বিচারক হতে পারবে না। সর্বব্যাপী নিরাপত্তার যে কোন ব্যবস্থাই জাতিদের সমরসজ্জা বৃদ্ধি ও অন্য জাতিদের সম্বন্ধে অধিকারের সঙ্কোচ ঘটাবে। যে অবস্থায় "অভাব ও ভীতি থেকে মুক্তি" পাওয়া যাবে তা সকল জাতির জন্যই ব্যবস্থা করতে হবে। এই অবস্থাকে শুধু আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলা ঠিক হবে না। জানবার ও প্রকাশ করার স্বাধীনতা, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, মিলিত হবার স্বাধীনতা ও জাতিভিত্তিক অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ প্রভৃতি প্রাথমিক মানব অধিকারকে বিধিবদ্ধ করা এবং সেই সব বিধি মান্য কবার জন্য এক আন্তর্জাতিক প্রশাসন ব্যবস্থা প্রয়োজন। যদি "বড় ছোট, জয়ী বা পরাজিত" সমস্ত জাতিরই সমান অধিকাব স্বীকার করতে হয় তো সে শুধু আর্থিক ক্ষেত্রে বিস্তৃত ক্ষমতা ও দায়িত্বযুক্ত কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দ্বারাই হতে পারে। ব্যবসা সংক্রান্ত যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। মিঃ চার্চিল বলেছেন : "১৯১৭ সালে ধারণা ছিল যে জার্মান ব্যবসায়কে নানাপ্রকার বাধা সৃষ্টি করে একেবারে ধ্বংস করে দিতে হবে, এখন সে ধারণা আর নেই, আমরা জগতের স্বার্থে এবং আমাদের দুই দেশের (ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র) স্বার্থে চাই না যে কোন বড় জাতি সমৃদ্ধিহীন হোক কিংবা তাদের স্বকীয় শ্রম ও প্রয়াসের দ্বারা ভদ্রভাবে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহের উপায় থেকে বঞ্চিত

কোন কথা পাওয়া যাবে না যাতে এরকম ইঙ্গিত আছে যে, আমাদের ঈপ্সিত স্বাধীনতা ও সামাজিক নিরাপত্তা মানবজগতের কোন জাতির পক্ষে খাটবে না।· শ্রমিক দল শ্বেত জাতিরা অশ্বেত জাতিদের উপর যে অন্যায় করেছে তার সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ আছে। উপনিবেশ সমূহের অধিবাসীরা আমাদের থেকে নিম্নস্তরের, তারা শুধু অন্য জাতিদের সেবা করবে ও তাদের কল্যাণার্থে উৎপাদন করবে এ ধারণার অবসান হয়ে যে ন্যায্যতর ও মহত্তর ধারণার বিকাশ হচ্ছে এ দেখে আমরা খুবই আনন্দিত।"

হোক।[৭৯] পঞ্চম শর্তে যারা সেই নীতি গ্রহণ করবে তাদের একটা অর্থনৈতিক কমনওয়েলথ গঠনের আভাস পাওয়া যায়। তার উদ্দেশ্য হল বর্তমান আর্থিক নৈরাজ্যের মধ্যে শৃংখলা আনা। আর্থিক ক্ষেত্রে অনুন্নত জাতিদের স্বার্থও সেখানে বিবেচিত হবে। আর্থিক সাম্রাজ্যবাদকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। প্রবলের দুর্ব্যবহার থেকে দুর্বলকে বাঁচাতে হবে।

পরের ধারাতে বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে সমষ্টিগত নিরাপত্তার কথা আছে। তার পরের ধারাতে সমুদ্র-পথযাত্রা নির্বিঘ্ন করার আশ্বাস আছে আর অন্তিম ধারাটিতে জাতীয় নীতি থেকে শক্তিপ্রয়োগের পন্থাটিকে বর্জন করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কোন জাতিকে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আগ্রাসী যুদ্ধ করার মত শক্তিসঞ্চার করতে দেওয়া হবে না। একে কার্যকরী করতে হলে অনেক রকম ব্যবস্থা করতে হবে। সম্মেলনপদ্ধতি, আর্থিক, সামাজিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে গঠনমূলক ক্রিয়া, আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার ব্যবস্থা, বর্তমানে যে সব বিশেষ অধিকার ভোগ করা হচ্ছে তার পরিবর্তনের জন্য সালিশীর ব্যবস্থা, সর্বব্যাপী নিরস্ত্রীকরণ, এবং আক্রমণের বিরুদ্ধে সমষ্টিগতভাবে দাঁড়াবার সার্থক প্রস্তুতি সবই দরকার হবে। যুদ্ধোত্তর কালটা হবে পৃথিবীর পক্ষে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সময় এবং আরোগ্যলাভের উপায়গুলিকে বিজয়ী জাতিদের যথার্থ ভাবে ব্যবহার করা উচিত।

নব্য সভ্যতা যে মৌলিক নীতিগুলিকে অঙ্গীভূত করবে তা গ্রেটব্রিটেনের ধর্মগুরুগণ ক্যান্টারবেরির ও ইয়র্কের আর্চবিশপ, ফ্রিচার্চ ফেডারেল কাউন্সিলের মডারেটর, গ্রেটব্রিটেনে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান ওয়েস্টমিনিস্টারের আর্চবিশপ টাইমস্ পত্রিকায় একখানি পত্র লিখে জানিয়েছেন। বিষয়গুলি নিম্নরূপ ঃ—

(১) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকার।

(২) নিরস্ত্রীকরণ।

(৩) আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলিকে মান্য করার ও প্রয়োজন হলে তাদের পরিমার্জন ও পুনর্বিন্যাস করার অধিকারযুক্ত কোন বিচারকমণ্ডলী।

(৪) জাতির অন্তর্গত জনসাধারণ ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের ন্যায্য দাবীগুলো প্রয়োজনমত পূরণের ব্যবস্থা।

(৫) বিশ্বপ্রেমের দ্বারা শাসক ও শাসিতের পরিচালনা।

এই মৌলিক নীতিগুলির সঙ্গে তারা আরও পাঁচটি ধারা যোগ করেছেন ঃ—

(১) সম্পদের ও সম্পত্তির অতি পার্থক্যের বিলোপ

(২) প্রত্যেক শিশুর সমান শিক্ষালাভের সুযোগ

(৩) সামাজিক একক হিসাবে পরিবারের রক্ষাব্যবস্থা

(৪) মানুষের নিত্যকর্মকে ঈশ্বরের সেবা বলে উপলব্ধির পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

(৫) প্রাকৃতিক সম্পদ সমস্ত মানবজাতির কল্যাণে ও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পুরুষদের প্রয়োজন বিবেচনা করে ব্যবহার করা।

সোভিয়েৎ বিপ্লবের পঞ্চবিংশতিতম বার্ষিক দিবস উপলক্ষে মস্কো সোভিয়েৎকে

উদ্দেশ করে স্তালিন বলেন, "জার্মানী ও ইতালীর জোটের কর্মসূচী এইভাবে ঘোষণা করা যায় ঃ—

জাতি-ঘৃণা, নির্বাচিত জাতির আধিপত্য, অন্য জাতিদের রাজ্য বলপূর্বক গ্রাস, পরাজিত জাতিদের আর্থিক দাসত্ব, তাদের জাতীয় সম্পদ থেকে বঞ্চিতকরণ, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার বিনাশ এবং সর্বত্র হিট্‌লারীতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। আর ইঙ্গ-আমেরিকান-সোভিয়েৎ জোটের কর্মসূচী হল জাতীয় ছুঁৎমার্গ বর্জন, জাতিসমূহের সমান অধিকার স্বীকার ও তাদের রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখা, পরাধীন জাতিদের মুক্তি ও তাদের সার্বভৌম অধিকারের প্রতিষ্ঠা, ক্ষতিগ্রস্ত জাতিদের আর্থিক সাহায্য এবং তাদের সাংসারিক কল্যাণসাধন করার জন্য সহায়তা, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও হিট্‌লারী শাসনের বিলোপ।" জার্মানী ও জাপানের পরাজয়ের পর রাশিয়া শক্তিশালী হবে এবং পৃথিবীর উপর আধিপত্য করার জন্য নয়, জগতের কল্যাণে রাশিয়া, আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের মৈত্রী শান্তির সময়েও বজায় রাখা পৃথিবীর নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন। রাশিয়া ও তার ঘোষিত উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে যদি কোন বন্দোবস্ত হয় তো ভবিষ্যতে আরও বিপজ্জনক বিশ্বযুদ্ধের বীজ বপন করা হবে। জাতিবৈষম্যমুক্ত রাশিয়া এশিয়া ও পৃথিবীর অশ্বেতকায় জাতিদের কাছে আকর্ষণের বস্তু।

বিজয়ের পর যদি ক্ষুধা, ভয় ও ব্যর্থতায় ফিরে যেতে হয় তো যুদ্ধজয়ই যথেষ্ট নয়। এ আলো ও অন্ধকারের মধ্যে সংঘর্ষ, সত্যকারের তপঃসমৃদ্ধ সভ্যতার কীর্তির সঙ্গে অতিকায় একনায়কদের দ্বারা বর্বরতায় প্রত্যাবর্তনের বিরোধ। তারা যদি কৃতকার্য হয় তো মানুষ এমন আসুরিক নিগড়ে আবদ্ধ হবে যে মানবজাতি অবনতির শেষস্তরে পৌঁছে শেষে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

আমরা একটা যুগসন্ধির মধ্যে এসে পড়েছি, পৃথিবীকে আর যুদ্ধপূর্ব ধাঁচে ফেলা যাবে না। যেসব তরুণরা যুদ্ধে জীবন বলি দিচ্ছে তাদের বিশ্বাস যদি নষ্ট না করতে হয়, মানুষের উন্নতির কোন আশা না থাকাতে আবার যদি যুদ্ধের পুনরুক্তি নিবারণ করতে হয় তো পৃথিবীকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থপরতার দুষ্ট প্রভাব থেকে মুক্ত করতেই হবে। স্বকৃত অপরাধের জন্য জাতিদের লজ্জা বোধ করতে হবে। অনুতাপের মধ্য দিয়েই পৃথিবীর অগ্রগতি। সাম্প্রতিক রক্তপাত ও অনাসৃষ্টির মধ্য দিয়ে নূতন ভাল জগৎ আসতে পারে। মনুষ্যসমাজ যদি সজীবভাবে সক্রিয় হতে চায় তো শুধু রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক ব্যবস্থায় চলবে না। মানবসমাজ একটা সজীব সত্তা, শুধু সংস্থা নয়; সজীব পরিবর্ধমান বস্তু। তার মধ্যে আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মানব সম্প্রদায়কে এক বিশ্বব্যাপী আত্মায় বিশ্বাসের ও সৌভ্রাত্রের উপলব্ধির জৈব প্রকাশ হিসাবে ক্রিয়া করতে হবে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এক অমর উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, সীমিত মনের ও খণ্ডিত অহমের মধ্য দিয়ে বিশ্বচেতনার প্রকাশ আছে। সত্যই জয়ী হয়, মিথ্যা কখনই জয়ী হয় না। আমাদের যাই ঘটুক, সত্যের আলো নিভবে না।

নীতিশাস্ত্রের একটা তত্ত্ব আছে যে মানুষের আসল উদ্দেশ্য দায়িত্বযুক্ত স্বাধীনতা লাভ। গণতন্ত্র সেই নীতিরই রাষ্ট্রনৈতিক রূপ। কান্টের বিখ্যাত নীতিবাদ "নিজের মধ্যেই হোক, বা অন্যের মধ্যেই হোক মানুষকে কখনও লক্ষ্য সাধনের উপায় বলে মনে করো না, তাকেই লক্ষ্য বলে সব সময় দেখো"—এইটাই গণতান্ত্রিক বিশ্বাসের মূল কথা। তত্ত্ব হিসাবে গণতন্ত্র নৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত সুতরাং বিশ্বজনীন। জীবনের সীমা ছাড়া তার কোন সীমা নেই। ব্যাস বলেছেন, "সকলে সুখী হোক, সকলে নিরাময় হোক, সকলের উন্নতি হোক্—। কেউ যেন দুঃখ না পায়।"[১] ব্লেক তাঁর কবিতা 'দি ডিভাইন ইমেজ'-এ (**The Divine Image**) শুধু শুধুই লেখেন নি—

> **For all must love the human form,**
> **In Heathen, Turk or Jew ;**
> **Where mercy, peace and pity dwell,**
> **There God is dwelling too.**

(মানুষের রূপকে সকলেরই ভালবাসা উচিত, সে পৌত্তলিকই হোক, তুর্কীই হোক বা ইহুদীই হোক ; যেখানে করুণা, শান্তি ও অনুকম্পা আছে, সেখানে ঈশ্বরও আছেন।)

গণতন্ত্রের লক্ষ্য হল সমগ্র সমাজের স্বার্থরক্ষা করা, কোন শ্রেণীবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের নয়। জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই শুধু তার মনুষ্যত্বের খাতিরেই রাষ্ট্রনৈতিক সমাজে গ্রহণ করা উচিত। সমাজের প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত লোকেরই সমাজের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সমান অংশের অধিকার আছে। আমরা যখন বলি মানুষ মাত্রই সমান, তার অর্থ এই যে সব মানুষই পরম মূল্যের আধার। একথা বললে চলবে না যে আমাদেরই পরম মূল্য আছে আর অন্যদের শুধু আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য উপজাত এবং যান্ত্রিক মূল্য আছে। যান্ত্রিক মূল্যের বিচারে আমরা অসমান। আমাদের সকলের কর্মক্ষমতা সমান নয়, আমরা ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষেত্রে অসমান নিপুণতায় নিজের নিজের কাজ করে চলি। কিন্তু সমাজদেহে সকলেরই স্থান থাকা উচিত। মানুষের সাম্য নিয়ে যে তর্ক তার উদ্ভব এই স্বরূপগত ও যান্ত্রিক মূল্যের পার্থক্য না বুঝতে পারার জন্য। স্বরূপগত মূল্য সকল মানুষেরই সমান কিন্তু ব্যবহারিক বা যান্ত্রিক মূল্যে মানুষে মানুষে তফাৎ। গণতন্ত্র গণশাসন এই অর্থে যে গণ বলতে সমাজের সব লোককেই বোঝায়। সংখ্যালঘিষ্ঠদের উৎপীড়ন ও তাদের মতামতকে অগ্রাহ্য করা গণতন্ত্রবিরোধী। সংখ্যালঘিষ্ঠদের যদি দাবিয়ে রাখা হয়, তাদের মতামত প্রকাশ না করতে দেওয়া হয় তো গণতন্ত্র স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়।

---

১ সর্বে চ সুখিনঃ সন্তু, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তি মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ ভবেৎ

পেরিক্লিস্ খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩১ অব্দে তাঁর "অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত ভাষণে" গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর ধারণার ব্যাখ্যা করেছেনঃ "আমাদের গণতন্ত্র বলা হয় এইজন্য যে আমাদের প্রশাসনের ভিত্তি বহুর উপর, অল্পসংখ্যকের উপর নয়। ঘরোয়া ঝগড়ায় সকল লোকই আইনের চোখে সমান, আর গণমতের কাছে কেউ তার পদমর্যাদার জন্য আদৃত হয় না, হয় তার গুণের জন্য এবং যত দরিদ্রই হোক, যত নীচু স্তরেরই হোক, যত অখ্যাতই হোক, কোন নাগরিকেরই নগরের সেবা করার মত গুণ থাকলে জন-জীবনে অংশগ্রহণে বাধা নেই। সমাজজীবনে যেমন আমাদের স্বাধীনতা, তেমনি ব্যক্তি-জীবনেও আমাদের স্বাধীনতা। তার চেয়েও বড় কথা এই যে আমাদের প্রতিবেশীরা স্ফূর্তিতে থাকলে আমাদের মনে ক্ষোভ হয় না, কিংবা আমরা মুখ ভার করেও থাকি না। মুখ ভার করে থাকাটা অপছন্দর প্রকাশ হিসাবে ক্ষতিকর নয় কিন্তু ভালও লাগে না। আমরা কি ঘরোয়া ব্যাপারে, কি জনসাধারণের ব্যাপারে শিষ্ট আচরণ করার চেষ্টা করি। যাঁদের উপর কর্তৃত্বের ভার আছে তাঁদের আমরা গভীর শ্রদ্ধা করি। তাছাড়া আইনকানুন বিশেষ করে যেসব আইন নিপীড়িতদের কল্যাণের জন্য করা, এবং যে সমস্ত অলিখিত আইনের অমান্য করাকে প্রতিবেশীরা হেয়জ্ঞান করে, এদের উপরও আমাদের গভীর শ্রদ্ধা আছে।"[১] অথচ ঘটনাচক্রে পেরিক্লিস তাঁর নীতি থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছিলেন, এমন কি পরে তাদের অস্বীকার পর্যন্ত করেন। যে বহুসংখ্যক লোকের নাগরিক অধিকার ছিল না যেমন নারী ও ক্রীতদাস, তাদের উপরই আথেনীয় সভ্যতা নির্ভর করে থাকত। যতক্ষণ পর্যন্ত আথেন্সের নাগরিক অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা রাষ্ট্রশাসনে অংশ নেবার সমান সুযোগ পেত এবং আইনের চোখে সমান বলে বিবেচিত হত, পেরিক্লিস ততক্ষণ সন্তুষ্ট ছিলেন।

১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় নিম্নলিখিত উচ্চ ভাবগুলো রয়েছেঃ "আমরা এই সত্যগুলিকে স্বয়ংসিদ্ধ বলে মনে করি যে সকল মানুষকেই সমান করে সৃষ্টি করা হয়েছে, সৃষ্টিকর্তা তাদের কতকগুলি অপ্রতিরোধ্য অধিকার দিয়েছেন, তার মধ্যে জীবন, স্বাধীনতা ও সুখান্বেষণের অধিকার অন্যতম, এইসব অধিকার সংরক্ষণের জন্যই মানুষের প্রশাসন ব্যবস্থার সৃষ্টি, এবং শাসিতদের সম্মতিই প্রশাসকদের ন্যায্য শক্তির উৎস। যখনই কোন শাসনব্যবস্থা এই সব লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তখনই সে শাসনব্যবস্থা লোপ করার বা তার পরিবর্তন করার অধিকার সাধারণ মানুষের আছে। ঐসব নীতির ভিত্তিতে নূতন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করার এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা ও সুখের সর্বোচ্চ সম্ভাবনার জন্য শাসনক্ষমতা ব্যবহারের অধিকারও সাধারণ মানুষের আছে।" আমরা স্রষ্টা সম্বন্ধীয় উল্লেখ ও সমস্ত মানুষকে সমান করে সৃষ্টি করা হয়েছে এই অবৈজ্ঞানিক তথ্যটি যদি বাদ দিই তো ঐ ঘোষণার মধ্যেই গণতান্ত্রিক নীতির অপরিহার্য অংশটি পাই যে সকল লোকেরই স্বাধীন ও সুখী হবার সমান সুযোগ থাকা চাই। সুযোগের সাম্য মানেই জাগতিক সম্পদের উপর অধিকার। এ থেকে বোঝা যায়, যে সমস্ত বস্তুর অভাবে সুখলাভ অসম্ভব, সেই সমস্ত বস্তু নিগ্রো ও নারী সমেত সকল লোককেই দিতে

১ Compton Mackenzie, Pericles (1937) p 311

হবে। আজ পর্যন্ত কোন শাসন ব্যবস্থাই এ নীতি সম্পূর্ণ পালন করতে পারে নি। আথেনিয়ান গণতন্ত্র দাসপ্রথার উপর স্থাপিত ছিল। মধ্যযুগে ভূমিদাস ছিল। বর্তমানেও আমাদের মধ্যে উচ্চশ্রেণী, নিম্নশ্রেণী, ধনী, দরিদ্র রয়েছে। বড় বড় সভ্যতা ক্রীতদাস ও ভূমিদাস প্রথার উপর গড়ে উঠেছিল, এই ঘটনা সত্যই দুঃখবহ। গ্রীস ও রোমে প্রচুর ক্রীতদাস ছিল। মধ্যযুগের ফ্রান্সে ও রেনেসাঁস যুগের ইতালীতে ভূমিদাসেরা শুধু প্রাণধারণের উপযোগী ভাতার বিনিময়ে ভূমিচাষ করতে বাধ্য হত। বর্তমান সভ্যতার পশ্চাৎপটেও রয়েছে দারিদ্র্য, নোংরামি ও কষ্ট।

১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব চিন্তার ধারা বদলে দেয়, এবং বর্তমানে অন্ততঃ নীতিগতভাবে দরিদ্র ও অজ্ঞদের সুখ ও স্বাধীনতায় অধিকার অস্বীকার করা অসম্ভব। ফরাসী বিপ্লব যে তিনটি তত্ত্বকে জনপ্রিয় করেছিল তাদের সম্বন্ধে বেরসিক লোকে মন্তব্য করে, স্বাধীনতা মানে "আমি যা খুশী করতে পারি", সাম্য মানে "তুমি আমার থেকে ভাল নও" আর সৌভ্রাত্র মানে "দরকার হলে তোমার জিনিস আমি নেব।" এইরকম বিকৃত মনোভাবের ফল হয়েছে নৈরাজ্য, বৈশিষ্ট্যহীনতা ও অন্যের ব্যাপারে অন্যের হস্তক্ষেপ।

ব্যক্তি-সম্প্রদায় গঠন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর (১৮৪৮) আদর্শ। ব্যক্তি এমনভাবে পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকবে যে "সমষ্টির স্বাধীন বিকাশের শর্ত হবে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ।" ঐশ্বর্যের যথাযথ বণ্টনের উপর জোর দিয়ে ম্যানিফেস্টো ঠিকই করেছে। অবশ্য কারুর আয় অন্য কারুর আয়ের থেকে বেশী হবে না, এই অর্থে আর্থিক সাম্য প্রয়োজন কিনা, সে অন্য কথা। আর্থিক বিধান এমন হওয়া দরকার যে প্রত্যেক লোক স্বাধীন সুখী জীবনযাপন করার সুযোগ পাবে। কল্যাণময় জীবনের আভাস গণতন্ত্রকে নৈতিক মূল্যে ভূষিত করে, কিন্তু সেই বিমূর্ত মূল্যকে রূপায়িত করতে হবে। ভাবকে বাস্তবে পরিণত করা চাই। যে সজীব সত্যকে আমাদের সকলের জীবনে বাস্তব করে তোলা চাই, সকলের ভোটের অধিকার তার একটা বহিপ্রকাশ মাত্র। রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে মানুষের অধিকার স্বীকার করা। আব সামাজিক গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হল সকল মানুষকে সামাজিক সুবিধাগুলিতে সমান অংশ দেওয়া।

দারিদ্র্য ও কষ্ট যদি স্বেচ্ছায় বরণ করা হয় তবেই তার মহত্ত্ব। যাঁরা বলেন যে দারিদ্র্যই শিল্পীকে সব চেয়ে বেশী প্রেরণা দেয়, তাঁরা দারিদ্র্যের কঠোরতা নিজেরা কখনও ভোগ করেন নি। আমাদের অনেক আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা বিকশিত হবার সুযোগই পায় না যদি আমাদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় বা অতি দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করতে হয়। জনবহুল বাড়িতে ময়লা ও রোগের মধ্যে ক্ষুধায় ও শীতে কষ্ট পেয়ে বাস করতে করতে খানিকটা সহিষ্ণুতা ও হাল ছাড়ার ভাব আয়ত্ত করা যায় কিন্তু কোন সৃজনশক্তিকে সুযোগ দেওয়া যায় না। দারিদ্র্যই রুগ্ন দেহ ও ব্যর্থ জীবনের কারণ। দাসপ্রথার মতই সম্পদের অসাম্য একটা সামাজিক ব্যাধি। অ্যারিস্টটলের মত অনেকখানিই ঠিক যে পূর্ণ জীবনযাপনের জন্য অবধারিত শর্ত হল জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যথেষ্ট প্রাপ্তি। তা না হলে মানুষ স্বাধীন মননে

সক্ষম হবে না।[১] যদিও আর্থিক উন্নতি জীবনের মহৎ লক্ষ্যগুলোর অন্যতম নয় তবু তা মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছবার অপরিহার্য উপায়। ভারতীয় কবি ভর্তৃহরি তাঁর নীতিশতকে দারিদ্র্যজনিত নৈতিক অবনতির সম্বন্ধে বলেছেন, "একই ইন্দ্রিয়সমূহ, একই কর্ম, একই অপ্রতিহত বুদ্ধি, একই বাক্য, কিন্তু অর্থের উষ্ণতা না থাকলে, সেই লোকই মুহূর্তে ভিন্ন লোক হয়ে যায়।"[২] মানুষকে যদি আত্মমর্যাদা বজায় রেখে অবাধে চলতে হয়, উদার স্পষ্টবাদী ও স্বাধীনচেতা থাকতে হয়, তবে আর্থিক সঙ্গতির একটা নিম্নতম মান থাকা দরকার। ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর 'ঘরোয়া কথায়' মিঃ রুজভেল্ট বলেছিলেন, যে গণতন্ত্র জাতির প্রত্যেক লোককে অভাব অনটন থেকে রক্ষা করবে না, সেরকম গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য কাউকে আমি আহ্বান করব না।" যে কোন সুস্থ ও সামাজিক কল্পনার মধ্যে সকলের জন্য প্রত্যেকের দায়িত্ব স্বীকার করতে হবে। পরম্পরাগত ব্যক্তিবাদ ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্বের কথাটা ভাল করে চিন্তা করে নি। আমরা যদি মনে করি যে আমরা যা পাব তা বিনা শর্তে পাব, তার বদলে কিছুই দিতে হবে না, তাহলে খুব ভুল করবো। প্রত্যেকেই যদি প্রত্যেকের সম্বন্ধে দায়িত্বের কথা মনে রাখেন তবেই সমাজে অবাধে থাকা চলে। তার বদলে সমাজ আমাদের রক্ষা করে ও আমাদের কর্মপ্রচেষ্টায় সহায়তা করে। মিঃ চার্চিল প্রধানমন্ত্রীত্ব পাবার পর তাঁর পুরাতন স্কুল হ্যারোর ছাত্রদের বলেন, "যখন যুদ্ধে জয় হবে তখন এমন এক সমাজের স্থাপনা আমাদের উদ্দেশ্য হবে যেখানে এতাবৎ যেসব সুযোগ-সুবিধা অল্পসংখ্যক লোক ভোগ করে আসছে সেগুলি জাতির আরও বিস্তৃততর অংশে প্রসারিত হবার উপায় থাকবে।" বর্তমান ব্যবস্থায় এইসব সুযোগ সুবিধা রক্ত, বিবাহ বা স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ এক

---

১ সার আর্থার কুইলার কৌচ বলেন, "গত শতাব্দীর বারোজন বড় কবির মধ্যে নয়জনই বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক। এটা জাতি হিসাবে আমাদের পক্ষে সম্মানজনক নয়। এটা নিশ্চিত যে আমাদের কমনওয়েলথের কোন দোষে দরিদ্র কবি গত দু'শ বছর ধরে নিজের প্রতিভা স্ফুরণের কোন সুযোগই পায় নি, এখনও পাচ্ছে না। আমি গত দশ বৎসরের বেশীর ভাগ সময় ৩২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় লক্ষ্য করে আসছি, সেই অভিজ্ঞতা থেকে জোর করে বলছি যে আমরা গণতন্ত্রের জন্য গর্ব বোধ করি কিন্তু আসলে ইংলন্ডের একটি গরীব শিশুর মানসিক স্বাধীনতা (যা থেকে মহৎ সাহিত্য রচিত হয়) পাবার ততটুকুই সুযোগ আছে যা আথেনিয়ান ক্রীতদাসদের ছিল।"

—On the Art of Writing.

২ তানীন্দ্রিয়ানি সকলানি তদেব কর্ম সা বুদ্ধিরপ্রতিহতা বচনম্ তদেব
অর্থোষ্মনা বিরহিতঃ পুরুষঃ স এব হ্যন্যঃ ক্ষণেণ ভবতীতি বিচিত্রমেতৎ ॥
যস্যাস্তি বিত্তং স নরঃ কুলীনঃ স পণ্ডিতঃ স শ্রুতবান্ স গুণজ্ঞঃ
স এব বক্তা স চ দর্শনীয়ঃ সর্বে গুণা কাঞ্চনম্ আশ্রয়ন্তি ॥

বার্নার্ড শ'এর উক্তি "পৃথিবীতে টাকাই সব চেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু। টাকা থেকেই স্বাস্থ্য, বল, মান, উদারতা এবং রূপ; আর ওর অভাবে রোগ, দুর্বলতা, অপমান, হীনমন্যতা ও কুশ্রীতা। টাকা যে নীচ লোকদের বিনষ্ট করে এবং মহৎ লোকদের মর্যাদা ও শক্তি প্রদান করে, এটা টাকার কম গুণ নয়।"

ক্ষুদ্র শ্রেণীর মধ্যেই সীমায়িত।' কখনও কখনও এক-আধজন টাকার জোরে ঐ গণ্ডীর মধ্যে ঢুকতে পারে।

প্রায় সব দেশেই আর্থিক ব্যাপারে ভয়ঙ্কর সমভাব দেখা যায়। অতি অল্প-সংখ্যক লোক সুখে থাকে, বেশীর ভাগ লোকই অভাব, অধীনতা ও তজ্জনিত দৈহিক ও মানসিক ব্যাধিতে কষ্ট পায়।[১] সমাজের এখনকার সমাজব্যবস্থায় সমান সুযোগের দাবীর অর্থ, সমষ্টিগত উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর যে সব মালিকের সমাজের কাছে কোন দায়িত্ব নেই তাদের অধিকাংশ লোপ করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রবর্তন। মালিকানা থেকেই হুকুম করার শক্তি আসে, তাই থেকেই উচ্চ-নীচের সম্পর্কের উৎপত্তি হয়। শ্রমিকদের পরমুখাপেক্ষী অবস্থার সুযোগ নিয়ে মালিকশ্রেণী তাদের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করেন, ঠিক যেমন প্রাচীনকালে সামন্তশ্রেণী বা ক্রীতদাসদের মালিক অভিজাতদের শক্তির উৎস ছিল ভূমিদাস বা ক্রীতদাসদের উদ্বৃত্ত শ্রম। শান্তির সব চেয়ে বিপদ আসে রাষ্ট্রনীতিতে "টাকার" প্রভাব থেকে। মুনাফার জন্য উৎপাদনের বদলে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। যথোপযুক্ত সমষ্টিগত নির্দেশনায় তার ব্যবস্থা করা যাবে। বার্ধক্যের জন্য পেন্‌সন্‌, স্বাস্থ্য ও বেকারীর জন্য বীমা, ন্যূনতম বেতন ইত্যাদি ধনিকদের ভাঁড়ার থেকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত যে ভিক্ষার দান মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায় তা নিয়ে শ্রমিক ও কৃষকরা আর সন্তুষ্ট থাকবে না। আর্থিক ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য যে সব রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থা গড়ে উঠেছে তাদের যদি ধনিকেরা আক্রমণ করে ধ্বংস করবার চেষ্টা করেন তা'হলে পাল্টা আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। মানব-সংসারের উপর দায়িত্বহীন সম্পদের যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সমভোগবাদ (communism) তারই প্রতিবাদ। যে কোন সমাজের বাঁচবার জন্য পরিবর্তিত অবস্থাব সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা অপরিহার্য অথচ সেই পদ্ধতিই মন্থর হয়ে এসেছে। ইতিহাস যখন ঝড়ের বেগে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন প্রাচীন ব্যবস্থা আঁকড়ে থাকা বৃথা, ওরকম চেষ্টা করলে আমাদের উড়ে যেতে হবে। অসহনীয় অবিচার ও প্রচণ্ড অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা দুর্নীতি। একটা পাখী পাখা ভেঙে যাওয়ার জন্য যদি উড়তে না পারে তো আমরা যতটা অনুকম্পা বোধ করি, জীবন-যুদ্ধে আহত হতভাগ্য মানুষের জন্য সেটুকুও করি না। যাদের সব চেয়ে বেশী রক্ষা করা দরকার, আমাদের আইন ও প্রতিষ্ঠান তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করে না। পূর্বে ক্রীতদাসদের যেমন শক্ত শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা হত, শ্রমিকদের নিগড়ও তেমনি কঠিন।

---

১ ষ্ট্রেট্‌স্কির মত : "পৃথিবীর লোকসংখ্যার শতকরা ছ-ভাগ যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী, কিন্তু তাদেরই হাতে পার্থিব সম্পদের শতকরা চল্লিশ ভাগ"; তবু রুজভেল্ট নিজেই স্বীকার করেছেন যে সেই জাতির এক-তৃতীয়াংশ অপুষ্ট, অর্ধনগ্ন ও মনুষ্যেতর অবস্থায় মধ্যে বাস করতে বাধ্য হয়। Bearle এবং Means তাদের Modern cooperation and private property পুস্তকে বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপন্ন বস্তুর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ফলতঃ দু হাজারেরও কম লোকের করায়ত্ত।

যারা প্রবল ও ধনী তাদের অধিকারের কথা খুব স্পষ্ট করে দেওয়া হয়, কিন্তু দুর্বল ও দরিদ্রের কি অধিকার সে সম্বন্ধে আইন ও প্রতিষ্ঠান উদাসীন। তারা হতভাগ্যের প্রতি নিষ্করুণ ও শিশুদের প্রতি ন্যায়বর্জিত। যে সামাজিক ব্যবস্থার বিশেষত্ব হল সমস্তপ্রকার স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুকে চেপে দেওয়া, স্বপ্নকে উপহাস করা ও সুখ নাশ করা, তার রুদ্ধ প্রাচীরের মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন ও অত্যুৎকৃষ্ট মানব শূন্যতা ও পীড়ন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না।

দুঃখ-দীর্ণ ও উদ্‌ভ্রান্ত মানবজাতির উপর যে শ্রদ্ধার ভাব আমাদের মনে মধ্যে মধ্যে উদয় হয় তাকে উৎসাহিত করার থেকে কল্যাণপ্রসূ বস্তু আমাদের জীবনে কমই আছে। ওর দ্বারা একটা মৌলিক সমাজ-সম্পর্কের চেতনার উদ্ভব হয়। আমাদের গণতন্ত্র যদি সার্থক হয়, তাহলে আমরা এমন সামাজিক বিধানের সৃষ্টি করব যাতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের পেশা ও নিরাপত্তা রক্ষিত হবে, তরুণদের যথাযথ শিক্ষার দ্বারা তাদের বিশেষ ক্ষমতা বিকাশের ব্যবস্থা থাকবে, জীবনের পক্ষে শুধু অবশ্য প্রয়োজনীয়ই নয়, আরামদায়ক বস্তুরও বিস্তৃততর বিতরণের ব্যবস্থা থাকবে ; আর বেকারীর কষ্ট নিবারণের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা ও আত্মবিকাশের স্বাধীনতা থাকবে।

ফরাসী বিপ্লবে যে গণতান্ত্রিক মনোভাব চালু হল তা থেকেই সাম্যের ইচ্ছা প্রবল হল, আবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের সমান মৌলিক ইচ্ছাও সংযুক্ত হল। এইভাবেই গণতন্ত্র জোরদার হতে লাগল আর যারা উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ্‌ শক্তি ও পদের অধিকারী হত তাদেরই যে হিংসা করতে লাগল তাই নয়, যারা নিজেদের উদ্যম ও বুদ্ধির জোরে অপেক্ষাকৃত কম গুণসম্পন্ন লোকেদের থেকে জীবনযুদ্ধে বেশী সার্থকতা লাভ করেছে তাদের উপরেও তারা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। সম্পদ ও শক্তির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ থাকাতে, সম্পদ আক্রমণের লক্ষ্য হল, কোন্‌ সম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া আর কোন্‌টা নিজে অর্জিত সে বিবেচনা আর রইল না। রুশ বিপ্লবের লক্ষ্যও ছিল সম্পদের সুবিধা ও অসাম্যের বিলুপ্তি। সমস্ত কাজই সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় এই কারণে সেখানে সমস্ত রকম কাজের একই পারিশ্রমিক দেওয়ার পরীক্ষা করা হয়েছিল, কিন্তু সে ব্যবস্থা চলে নি। সমভোগবাদী নীতিসূত্র "প্রত্যেকের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে তার শক্তি অনুযায়ী, আর দেওয়া হবে তার প্রয়োজন অনুযায়ী" আসল অর্থে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। তত্ত্বীয় ব্যাপারে উৎসাহী কতিপয় লোক ছাড়া জনসাধারণের কেউই যথেষ্ট প্রয়াস করে নি। যতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রমসাধ্য ও বিভিন্ন মূল্যের কাজের জন্য একই পারিশ্রমিক পাওয়া যেত, ততদিন লোকে অপেক্ষাকৃত সহজ ও আরামের কাজটাই করতে চাইত। ফলে কাজে ঢিলা পড়ত। অতএব ব্যবস্থা বদলাতে হল। এখন শ্রমের কাঠিন্য ও সামাজিক মূল্য হিসাবে মাহিনার তারতম্য সেখানেও স্বীকৃত। এইভাবে অসাম্যের প্রতিষ্ঠা হল। যারা বেশী মাইনে পায় তারা শক্তিও বেশী পায়, মর্যাদাও বেশী পায়। আবার শ্রেণীবৈষম্য দেখা দিচ্ছে। নিপুণ ব্যবস্থাপকদের আমলাতন্ত্র, ক্ষমতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট কারখানার পরিচালকরা শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করে এবং এই ভিতর মহলে ঢোকার জন্য প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। অন্য লোককে

ফেলে এগিয়ে যাবার দুর্বার বাসনা, অন্ধ আবেগ, শঠতা, ইতরতা ইত্যাদি মনুষ্য চরিত্রের সমস্ত দুর্বলতাই প্রশ্রয় পেয়েছে। সেকালের আভিজাত্যের ও ধনিকতন্ত্রের বদলে শক্তিশালী আমলাতন্ত্র আজ অধিষ্ঠিত। রাজা, পার্ষদ, পুরোহিত ও ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যে হিংসা ও ঘৃণার ভাবের উৎপত্তি হয়েছিল এখন তা পরিচালক ও একনায়কদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হচ্ছে। স্বভাবের অসাম্য-প্রবণতা আইন করে লোপ করা যাবে না। প্রত্যেক সমাজেই গুণকর্মজনিত পদমর্যাদার ক্রম আছে। যাঁরা ক্ষমতার অধিকারী তাঁরা সমাজসেবার প্রেরণায় ক্ষমতার ব্যবহার করতে পারেন। শ্রেণীহীন সমাজ অবাস্তব। যে অস্থির শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা এসে পড়েছে তারা যদি সেটা যথাযথ ব্যবহার করে তো নিজের অন্তরের প্রেরণায়ই করবে, বাইরের কোন নিয়ন্ত্রণের প্রভাবে নয়। যাঁরা ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে যদি বিনয়-ভাব জাগ্রত করতে হয়, তাহলে আয়ের সাম্য স্থাপন করলেই হবে না। সৎ শিক্ষা ও ধর্মীয় বিবেকের সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ থেকেই ক্ষমতার গর্ব নষ্ট ও সুবিধার অপপ্রয়োগ নিবৃত্ত হতে পারে। এর জন্য উপর উপর পরিবর্তন করলে চলবে না, মানুষের স্বভাবের মৌলিক পরিবর্তন দরকার। সত্যকার সভ্যতার ধারক হয়ে রাষ্ট্রকে তার নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্বের সম্পূর্ণ নূতন ধারণা সঞ্চারিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি আমরা ধর্মাভ্যাসের উপর নির্ভর করি, তাহলে আমরা নির্বোধ ও ভাবপ্রবণ একথা মনে করার কারণ নেই।

গণতন্ত্র সামাজিক ও আর্থিক ব্যাপারে মৌলিক পরিবর্তন শান্তিপূর্ণ ও অহিংস উপায়ে আনতে চায়। ন্যায়বিচারের দাবী যদি জেদের সঙ্গে উপেক্ষা করা হয় তাহলে যে স্থায়ী বিবাদের সৃষ্টি হয় তার মীমাংসার জন্যই বিপ্লবের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মার্কস্‌বাদীরা জানে যে সম্পত্তির অধিকারকে প্রচণ্ডভাবে সীমায়িত করলে সম্পত্তির অধিকারীরা গণতান্ত্রিক ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার করে না। তাই তারা বলে যে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে অর্থনৈতিক নববিধানের সৃষ্টি অসম্ভব। কোন সামাজিক ব্যবস্থাই তার উত্তরাধিকারীকে বিনা বাধায় জায়গা ছেড়ে দেবে না। ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, সহিংস ক্ষমতা অধিকার ও শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া সামাজিক পরিবর্তন আনা যায় না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত সুসভ্য গণতন্ত্রেও দাসপ্রথার বিলোপ ঘরোয়া যুদ্ধ ছাড়া সম্ভব হয় নি। "প্রত্যেক পুরাতন সমাজ যখন নূতন সমাজকে গর্ভে ধারণ করে, তখন সংগ্রামই ধাত্রীর কাজ করে।" শ্রেণীসংগ্রাম ও সহিংস বিপ্লবই সমাজবাদের রাস্তা পরিষ্কার করতে পারে। কিন্তু গণতন্ত্র-বিরোধিতা হিংসা ও অসহিষ্ণুতার জন্য রুশীয় দাওয়াই কার্যকরী হল না। আইন, কানুন, চুক্তি প্রভৃতির কোন বাধা না মেনে শুধু বলপ্রয়োগের উপর নির্ভর করে রুশ সরকার একনায়কত্বে পর্যবসিত হল। ক্রোধোন্মত্ততা থেকে সহিংস বিপ্লবের উৎপত্তি। অগ্রগতির সহায়ক মহাশক্তির ভূমিকায় শ্রেণীগত ঘৃণা কখনও সফল হতে পারে না। জড়শক্তি নৈতিক যুক্তি নয়। দরিদ্রেরা প্রশাসনিক ক্ষমতা, পরিচালনায় নিপুণতা এবং নিঃস্বার্থ আনুগত্য প্রভৃতি গুণ একচেটে করে বসে আছে আর ধনীরা কল্পনাশক্তির অভাব, স্বার্থপরতা, দুর্নীতি ইত্যাদি সর্বপ্রকার দোষের আকর, এরকম ভাববার কোন কারণ নেই। আসলে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীই স্বরূপতঃ সদৃশ।

তারা উভয়েই সম্পদের সমস্যাটাই সব চেয়ে বড় করে দেখে। ধনতন্ত্রীদের ও সমভোগবাদীদের পার্থক্য হচ্ছে সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে, সেটা ব্যক্তিগত হবে না সমষ্টিগত হবে। আর্থিক দিকটাই যে সর্বপ্রধান এ বিষয়ে তারা একমত।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মন্থর, অপচয়প্রবণ, ভারাক্রান্ত ও সেকেলে বলে সাধারণ লোকের বিশ্বাস। যাঁরা অন্যায়-ভিত্তিক সমাজকে সাম্যের ভিত্তিতে পরিবর্তিত করতে চান তাঁদের মতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে সে কার্য করতে অত্যধিক সময় লাগবে। অতএব আমাদের ডানদিকে প্রতিক্রিয়াশীলদের একনায়কত্ব আর বাঁদিকে সমাজবাদীদের একনায়কত্ব।

আজকের দিনে ভাবরাজ্যের মহৎ সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বুদ্ধির দিক দিয়ে ও নীতির দিক দিয়ে জগৎ অতলস্পর্শী গহ্বরের কানায় এসে দাঁড়িয়েছে। গণতন্ত্র যদি যথেষ্ট শিক্ষিত হয়, তার যদি সকল কল্পনাপ্রসূত ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ও নৈতিক সাহস থাকে তো সে হিংসা ছাড়াও সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে পারে। গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রা নৈসর্গিক বিধি নয়। এটা এমন একটা অভিব্যক্তির প্রণালী নয় যে যেখানেই মানুষ নিজের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন সেখানেই সে আপনা-আপনি প্রতিষ্ঠিত হবে। এই মূল্যবান সম্পদ বুদ্ধিমান লোকে বহুযুগের সংগ্রাম করে লাভ করেছে এবং মানুষ যদি এর মূল্য সম্বন্ধে উদাসীন হয়, তাহলে অন্ধকার যুগের মধ্যে এই সম্পদ নষ্ট হয়ে যাবে। এ হল একটা ভাব, বিধান নয়, এবং একে আমাদের অতি যত্নে রক্ষা করে যেতে হবে, বিশেষ করে যখন যান্ত্রিক সভ্যতার বেগে জনগণকে বশে আনা সহজ হয়ে উঠেছে। গণতান্ত্রিক সংস্থায়, বৈপ্লবিক পদ্ধতি অবস্থার মোকাবিলা করতে পারে। যে আর্থিক ব্যবস্থা শ্রমিকের ব্যক্তিত্বকে অগ্রাহ্য করবে বা অল্পসংখ্যকের মুনাফার জন্য তাকে আত্মনাশী অভাব বা দুষ্ট আলস্যের মধ্যে নিক্ষেপ করবে তার অবসান চাই। যেহেতু আর্থিক সঙ্গতি থাকলে সুযোগ ক্রয় করা যায়, সেইজন্য জগতের অর্থকরী বস্তুগুলির যথাযথ বিতরণ প্রয়োজন। সম্পদ সংগ্রহের উপর বড় রকমের সীমানা নির্দেশ করতে হবে আর সম্পত্তির ব্যাপারে সকলের জন্য প্রত্যেকের দায়িত্ব স্বীকার করতে হবে। স্টক্ মার্কেটে ফাটকাবাজী করে যে সম্পত্তি সংগ্রহ করা হয় এবং কৃষক পরিশ্রম করে জমি চাষ করে যে সম্পত্তি সংগ্রহ করে, তার মধ্যে তফাৎ আছে। শেষের জনের যে অধিকার আছে, আগের জনের তা নেই। ১৯২১ সালে যখন লেনিন "নবীন আর্থিক নীতি" প্রবর্তন করেন, তখন তিনি আর্থিক ব্যাপারে স্বকীয় উদ্যমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হন। কাজের পুরস্কার হিসাবেই আয়ের সার্থকতা, সম্পত্তি থেকে একটা পবিত্র অধিকারের মত তাকে দেখলে চলবে না।

এই যুদ্ধে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সঙ্গে রাশিয়ার মিতালী থেকে সমভোগবাদের প্রকৃতি ও নীতিতে খানিকটা গণতান্ত্রিক প্রভাব দেখা যাবে। অন্ততঃ নীতিগতভাবে সমসাময়িক সমভোগবাদ অধিক প্রকৃতিস্থ এবং গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য বেশী প্রস্তুত। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু এতে বেশী ফল হয় নি এইজন্য যে সমভোগবাদে গণতন্ত্রের স্থান নেই। রুশ বিপ্লবের পরের যুগে সমভোগবাদীরা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধ সমালোচনা শুরু করে। মার্কস নিজে গণতান্ত্রিক নীতির সার্থকতা মেনে নিয়েছিলেন;

মার্কসবাদীদের সামাজিক গণতান্ত্রিক দল বলা হত আর তার উদ্দেশ্য ছিল গণতান্ত্রিক উপায়ে সামাজিক বিপ্লবসাধন। গণতন্ত্রে ভোটাধিকার লাভ করায় শ্রমিকরা রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতায় অংশগ্রহণ করে এবং সত্যকার রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা পায়। সেই ক্ষমতা তারা রাষ্ট্রের কল্যাণকর কার্যাবলী বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে পারে। এইসব প্রয়াস সফল হলে বৈপ্লবিক আগ্রহ কমে যায়। অধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র সম্পত্তির সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারকে যুক্ত না করে তাকে ব্যক্তির অধিকারে এনে দেয়। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বলেছেঃ "শ্রমিক বিপ্লবের প্রথম কাজ হবে শোষিত শ্রেণীকে শাসক শ্রেণীতে পরিণত করা, গণতন্ত্রকে জয় করা।" শোষিত শ্রেণী শাসক শ্রেণীতে পরিণত হলে বিপ্লব রাষ্ট্রনৈতিক দিক দিয়ে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লবের সম্ভাবনা মার্কস স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ "এক সময় শ্রমিকেরা নূতন শ্রমিক সংস্থা গঠনের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য দখল করবে, তারা পুরানো ব্যবস্থার ধারক পুরাতন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে বিদায় করবে···অবশ্য আমি বলতে চাই না যে এই কার্য সব জায়গায় একই উপায়ে সাধিত হবে। আমরা জানি যে বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠান, আচার ব্যবহার ও ঐতিহ্যের কথা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করতে হবে এবং এ কথা অস্বীকার করি না যে যুক্তরাষ্ট্র বা ইংলণ্ডের মত কয়েকটি দেশে শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণ উপায়েই নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে।" গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার না করে বৈপ্লবিক পন্থায় অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। সমভোগবাদকে হিংসা, অধর্ম, স্বৈরাচার ও ব্যক্তিত্ব-বিনাশের সঙ্গে অভিন্ন বলে ধরার প্রয়োজন নেই। সমভোগবাদীরা ধর্মকে আক্রমণ করেছিল এইজন্য যে, ধর্মগুরুরা মূলতঃ সাবধানী ও রক্ষণশীল, এবং পুরানো প্রতিষ্ঠান ও পুরানো অধিকার বজায় রাখার পক্ষপাতী। মার্কসবাদীরা যখন বলে যে রাষ্ট্র "বিশীর্ণ হবে", তখন তারা এই কথা বলতে চায় যে "কোন কোন শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখার জন্য হিংস্র সংস্থা" হিসাবে রাষ্ট্র "শুকিয়ে যাবে"।

রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র যদি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রেরণাযুক্ত অর্থনৈতিক গণতন্ত্রে রূপায়িত করতে হয়, তাহলে সজীব গণতন্ত্রের মূলে যে বিশ্বাস সক্রিয় তার দিকে লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে হবে। লোককে শিক্ষা দিয়ে মানবিক সৌভ্রাত্রের বাস্তবতা, প্রকৃতি এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ করতে হবে। আমাদের নূতন মনস্তত্ত্বের সৃষ্টি করতে হবে। এ তো তত্ত্বীয় শিক্ষার কথা নয়, এতে বুদ্ধির চর্চার চেয়ে হৃদয় ও কল্পনাকে বিকশিত করা বেশী দরকার। আসলে শিক্ষার মাধ্যমে নূতন ভাব ও নৈতিকতা সৃষ্টি করতে হবে। বিপ্লববাদীরা সমস্যাগুলিকে খুব সোজা করে দেখে। পৃথিবীর অমঙ্গল যেন ব্যক্তিগত আত্মার বাহিরের ঘটনা। অমঙ্গল যদি মূর্ত হয়ে উঠে থাকে তো সে মূর্ত হয়েছে অন্য লোক, অণী, অন্য কুল, অন্য সম্প্রদায়, অন্য জাতির মধ্যে। শুধু যন্ত্রটা বদলে দিতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তা ঠিক নয়, যন্ত্র ব্যবহার করার মেজাজটাও বদলাতে হবে। গণতন্ত্রকে মানসিক অবস্থা ও জীবনদর্শন হিসাবে চর্চা করতে হবে। নিজেদের মধ্যে সামাজিক মনোভাব সিদ্ধ করতে পারলে তবেই জাগতিক সৌভ্রাত্রের সৃষ্টি হবে। এখানেই ধর্মের প্রয়োজন।

তৃতীয় ভাষণ

হিন্দুধর্ম

হিন্দ্র সভ্যতা—আধ্যাত্মিক ম্ল্যবোধ—ধর্মের ধারণা
—ধর্মের উৎস—পরিবর্তনের নীতি—ধর্মীয় অন্ষ্ঠান
ও প্রতিষ্ঠান—বর্ণভেদ ও অস্প্শ্যতা—সংস্কার

হিন্দু সভ্যতা

পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে অনেক সভ্যতা বিলম্প্ত হয়েছে, কিংবা পরিবর্তিত হয়ে অন্য সভ্যতার স্রোতে মিশে গেছে, কিন্তু মিশর ও ব্যাবিলোনের সমসাময়িক ভারতীয় সভ্যতা এখনও সক্রিয়। ভারতীয় সভ্যতা শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে বা ধ্বংসের ম্খোম্খি দাঁড়িয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। জীবনের কোন কোন দিক দিয়ে ভারতবর্ষকে ম্ত ম্ল্যের এবং ক্ষয়িষ্ণ্ প্রতিষ্ঠানের দেশ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এখনও আমাদের মধ্যে এমন ক্রান্তিদর্শী ব্যক্তি আছেন যাঁরা অবক্ষয়ের জঞ্জাল সরিয়ে সরল ধ্রব সত্যগ্লিকে প্নঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন। এখানেই ভারতের সজীবতার লক্ষণ। বহ্বিধ বৈচিত্র্যের অন্তহীন ধারার সঙ্গে প্রগতির ধারণাকে য্ক্ত করে দেখতে যাঁরা অভ্যস্ত, তাঁদের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির স্থায়িত্বের একটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কি অত্যদ্ভুত জারক রসে ভারত তার বিজয়ীদের বশ করে নিজের মধ্যে নিঃশেষে মিলিয়ে দিতে পেরেছে? সামাজিক স্থান পরিবর্তন ও বিক্ষোভ এবং রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন, যা অন্যত্র সমাজের চেহারা আগাগোড়া বদলে দিয়েছে, সেই সবের মধ্য দিয়ে গিয়েও কিভাবে ভারত মোটাম্টি একই র্পে বিরাজ করছে? কেন তার বিজয়ীরা অত্যন্ত সীমিতভাবে ছাড়া তার উপর নিজেদের ভাষা, চিন্তা এবং আচার ব্যবহার চালাতে পারে নি? বলপ্রয়োগ বা আক্রমণাত্মক ভঙ্গীর দ্বারা ভারত তার আদর্শ অম্লান রাখে নি। ভারত ও চীনের বর্তমান অবস্থা দেখে কি সেই সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের কথা মনে হয় না যার বিধানে খড়্গদন্ত ব্যাঘ্র বিল্প্তির পথে কিন্তু নিরীহ মেষকুলের ধ্বংসের কোন লক্ষণ নেই?

হিন্দ্ ধর্ম কোন জাতীয় উপাদানের উপর নির্ভরশীল নয়। যদিও এ সভ্যতার ম্লে বৈদিক আর্যদের আধ্যাত্মিক জীবন এবং তার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান, তব্ তারা দ্রাবিড় এবং অন্যান্য আদিবাসীদের সামাজিক জীবনের কাছে এত রকমে ঋণী যে বর্তমান হিন্দ্ধর্মের বৈদিক ও অবৈদিক উপাদান সম্প্র্ণ আলাদা করা কষ্টকর। বৈদিক ও অবৈদিক উপাদানের মিশ্রণক্রিয়া জটিল, স্ক্ষ্ম ও নিরন্তর ক্রিয়াশীল। বিভিন্ন সম্প্রদায় হিন্দ্ধর্ম গ্রহণ করে পারিপার্শ্বিক সমাজের স্তরে নিজেদের উন্নীত করেছে, তার ভাবধারায় নিজেদের মার্জিত করেছে, তার রঙে নিজেদের রাঙিয়েছে, আবার তার প্ষ্টিতে নিজেরাও সহায়তা করছে। হিন্দ্ আদর্শের প্রসারের কথা

রামায়ণ মহাভারতে বলা হয়েছে যদিও এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য উপকথার আড়ালে চাপা পড়েছে। যতদিনে এই প্রসারণ ক্রিয়া ভারতের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করলো ততদিনে বৈদিক সভ্যতার মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়ে গেল। যজ্ঞের মত প্রাচীন অনুষ্ঠান নিন্দিত হতে লাগলো আর নূতন হাওয়ায় আবহাওয়া পরিপূর্ণ হল। এখন যাকে ভারতবর্ষ বলা হয় তার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে হিন্দুধর্ম সীমাবন্ধ ছিল না, প্রাচীনকালে চম্পা, কাম্বোডিয়া, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতিতেও তা প্রচলিত ছিল। হিন্দুধর্মের মধ্যে এমন কিছুই নেই যার জন্য পৃথিবীর প্রত্যন্ততম স্থানেও এর বিস্তৃতি বাধা পেতে পারে। ভারত একটি ঐতিহ্য, একটি ভাব ও একটি আলোর বর্তিকা। তার ভৌগোলিক ও ভাবগত সীমা এক নয়।

হিন্দুত্ব চিন্তা ও সাধনার এমন এক উত্তরাধিকার যা জীবনের গতির সঙ্গেই গতিশীল এবং ভারতের প্রত্যেক জাতির স্পষ্ট ও বিশিষ্ট অবদানে সমৃদ্ধ। হিন্দু সংস্কৃতির একটি অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে, যদিও খুব কাছ থেকে পরীক্ষা করলে এর নানা বর্ণ ও তার বিচিত্র রূপ দেখা যায়। বৈসাদৃশ্যগুলি এখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নি, যদিও যখন থেকে মানুষ চিন্তা করতে শিখেছে তখন থেকে একতার স্বপ্ন নেতাদের কল্পনা অনুপ্রাণিত করেছে। বর্তমান ভারতীয় সমাজের উন্নতি করতে হলে, তার জীবনকে সাম্প্রতিক কালের উপযুক্ত করে তুলতে হলে তার আত্মাকে পুনরাবিষ্কার করতে হবে, উত্তরাধিকারসূত্রে যে সব অনির্বচনীয় আদর্শ আমরা পেয়েছি, যে সব শাশ্বত সম্ভাবনা আমাদের অন্তরের গভীরে নিহিত আছে তাদের বুঝতে হবে। আমাদের মূল্যবোধ বদলায় না, কিন্তু এই বোধের প্রকাশের পদ্ধতির পরিবর্তন হয়। ভারতবর্ষ সমস্ত মূল্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক মূল্যকেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেয়।

আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ

এ জগৎকে যেভাবে দেখছি তা সন্তোষজনক নয় এবং মানুষের স্বভাবও আদর্শস্থানীয় নয়, এই বোধ থেকেই সকল প্রকার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার জন্ম। কিন্তু এই অসম্পূর্ণতা থেকে নিস্তার পাওয়ার চেষ্টা না করে তাকে পূর্ণাঙ্গ করার প্রয়াসের মধ্যেই মানুষের নিয়তি। অজ্ঞতা ও অসম্পূর্ণতা এমন অবরোধকারী পাপ নয় যে তাদের সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে, বরং এরাই আত্মার প্রকাশের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। আমাদের সীমিত চেতনার মাধ্যমেই উন্নততর অসীম সত্তা ও আনন্দের জগতে প্রবেশ করতে হবে। সসীম ও অসীম, অপূর্ণ ও পূর্ণ, এদের বৈপরীত্য নিত্যকালের নয়। এমন কি অদ্বৈত বেদান্তও সত্য ও মায়ার মধ্যে শুধু যে বৈপরীত্যই স্বীকার করেছেন তাই নয়, বলেছেন ব্রহ্ম এখানেও সর্বত্র বিরাজমান, তৎ সৎ। ব্রহ্মজ্ঞানী এই পৃথিবীতে বাস করেন ও কর্ম করেন অথচ শান্তি ও মুক্তির আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হন না। এই পৃথিবীতে যে সৌন্দর্য ও পূর্ণতার আভাস পাই তার জন্য অন্য জগতের দিকে চেয়ে থাকবার দরকার নেই। এই জগৎই মুক্তির আসন।[১]

---

১ মোক্ষায়তে সংসারঃ।

মহাজাগতিক ক্রিয়া একই বস্তুর পুনরাবৃত্তি নয়, বরং এক আদিম চেতনাহীনতা থেকে ক্রমবিকশিত চৈতন্যধারার দিকে অভিযান, ক্রমোন্নতি। এখনও এমন আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা আছে যেখানে আমরা পৌঁছুতে পারি নি। তৈত্তিরীয় উপনিষদ এই অগ্রগতির কথা বলেছে, কিন্তু অপূর্ণ মনবিশিষ্ট মানুষের মধ্যে তা থামে নি—বিজ্ঞান বা মানবিক বুদ্ধি আধ্যাত্মিক বিকাশের শেষ স্তর নয়। সৎ, চিৎ ও আনন্দ-বিশিষ্ট আরও উচ্চস্তরের এমন চেতনা আছে যা অংশতঃ বা অপূর্ণভাবে নয়, পরন্তু পূর্ণতঃ ও পরিপূর্ণভাবে জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম। এই জড় বা অন্ন থেকে প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে সচ্চিদানন্দে অভিব্যক্তি আপনা-আপনি বা খেয়ালের বশে হয় না, সেও পরমাত্মার নির্দেশেই হয়। এই উচ্চস্তরের চৈতন্যের মধ্যে মানবমনের প্রগতি ও পরমাত্মার লীলারই প্রকাশ। জাগতিক জীবন পরম পুরুষার্থ থেকে বিচ্যুতি নয়, বরং সেখানে পৌঁছবারই পথ। মানবজীবনকে মূল্যহীন বলে ভাবা ঠিক নয়।[১] মানুষের বাসনার মাধ্যমেই ভাব বাস্তবে পরিণত হয়। আত্মাব পক্ষে এ সংসার ভ্রান্তি বা মায়া বলে পরিত্যাজ্য নয়, বরং তাকে আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির ক্ষেত্র বলে দেখা উচিত। এখানে জড়ের মধ্যে ঐশী চেতনার বিকাশ সম্ভব হয়। শঙ্কর-এর মতে অবগতিই সমস্ত জাগতিক ব্যাপারের চরম উদ্দেশ্য।[২] পৃথিবীই স্বর্গ হবে। শর্তাধীন সত্তাকে নিঃশর্ত সার্থকতায় উন্নীত করা যায়। কালাতীত কালোৎপন্ন বস্তুকেই ভালবাসেন, স্বর্গরাজ্য থাকা সত্ত্বেও ভগবান পৃথিবীকে কামনা করেন।

পরমাত্মার সঙ্গে এই বিভেদ, বিচ্ছেদ কেন, কেন এই দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত? অহং পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের চেষ্টা না করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে কেন? এই কষ্ট, এই অজ্ঞতা, এই হাতড়ে বেড়ানো, এই সংগ্রাম কি জন্য? অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে যাত্রা কেন? এ কি শুধুই খেয়ালী বিধাতার অযৌক্তিক ইচ্ছা? আমরা ঈশ্বরকে জগতের অতীত বলি না, তিনি এর পিছনেও আছেন। তিনি নিজের অভিন্নতা দিয়ে এই পৃথিবী ধারণ করে আছেন ও আমাদের বিভেদের বোঝার মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহায্য করছেন। মানুষের স্বাধীন ক্রিয়ার সঙ্গে যে বিপদ ও অসুবিধা, যে বেদনা ও অপূর্ণতা অঙ্গাঙ্গীভাবে রয়েছে, তারই মধ্য দিয়ে বিশ্বজগৎ আধ্যাত্মিক ঐক্যের সম্ভাবনাকে আয়ত্ত করার সাধনা করছে। স্থূল আরম্ভ থেকে এই দুরূহ আরোহণ কেন? অনন্ত থেকে এই বিচ্ছেদ, শাশ্বত থেকে এই প্রভেদ কিভাবে এল? এই বিশেষ পরিকল্পনাটি পরম ব্রহ্মের কেন পছন্দ হল, তা যখন আমাদের সীমিত বুদ্ধিকে অতিক্রম করতে পারবে তখন বুঝতে পারব এবং এই জাগতিক ঘটনাবলীর পশ্চাতে যে পরম ঐক্য আছে তা আমাদের নজরে আসবে। আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে শুধু এই বলতে পারি যে এ এক মায়া, ঈশ্বরের লীলা অথবা তাঁর সৃজনীশক্তির প্রকাশ। মায়ার মানে এ নয় যে জগৎ মিথ্যা, অগ্নি

১ উপভোগৈরপি ত্যক্তম্ নাত্মানং সাদয়েন নরঃ
চণ্ডালত্বেঽপি মনুষ্যং সর্বথা তাত শোভনম্।

২ ভগবদ্‌গীতার নবম স্বর্গের দশম শ্লোকের উপর ভাষ্যে বলেছেন, "জগতঃ সর্বা প্রবৃত্তি··· অবগতিনিষ্ঠা, অবগত্যবসানৈব।"

ছাড়াই ধোঁয়া। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হল বাধাকে অতিক্রম করা, অসম্পূর্ণতা ও অজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণতা ও প্রজ্ঞা লাভ করা। একেই বলে মোক্ষ বা অতি চেতনার মধ্যে মুক্তি। এই পরম পুরুষার্থ, জীবনের চরম পরিণতি, এবং তা পাবার উপায়ই ধর্ম। মানব-সম্পর্কের মধ্যে থেকেই, এই সংসারে, এখনই মোক্ষের সাধনা করতে হবে। আধ্যাত্মিক ধারণাকে জয়ী হতে হলে, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই হতে হবে। বয়ঃপ্রাপ্তি, উদ্বাহবন্ধন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ইত্যাদিকে পবিত্র করার জন্য যে সব আচার-অনুষ্ঠান সে সব পূজারই অঙ্গ। দৃশ্য জগতের সব কিছুর মধ্যেই অদৃশ্য সত্তার প্রকাশ হতে পারে। আমরা যা কিছু করি, সবই দিব্য জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করে পবিত্র করা চলে।

ধর্মের ধারণা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ও সামাজিক সম্পর্কে যে সব নীতি আমাদের মেনে চলতে হয়, তাই ধর্মসঞ্জাত। ধর্মই জীবনে সত্যকে মূর্ত করে এবং আমাদের প্রকৃতিকে নূতন করে গড়বার শক্তি দেয়।

জীবনের অভিব্যক্তিতে মানুষের মস্তিষ্ক একটি অভিনব বস্তু। অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার একটা বিশিষ্ট ক্ষমতা মস্তিষ্কের আছে। মস্তিষ্কের জন্যই মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে পারে ও সেই শিক্ষাকে স্মৃতিতে গেঁথে রাখতে পারে। মানব ইতিহাস ও নৈসর্গিক ইতিহাসের মধ্যে তফাৎ এই যে মানব ইতিহাস নূতন করে শুরু হতে পারে না। ইতর প্রজাতিরা তাদের বংশগত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমেত হয় টিঁকে যায়, নয় লোপ পেয়ে যায়। তারা খুব কম জিনিসই শিখতে পারে। কোহ্লার (Kohler) এবং আরও অনেকে দেখিয়েছেন যে, মানুষের সঙ্গে বনমানুষের পার্থক্য যাকে আমরা বুদ্ধি বলি তার মধ্যে নয়, স্মৃতিশক্তির মধ্যে। যা তাদের জীবনে ঘটল জন্তুরা তার কথা ভুলে যায়, কাজেই কাজ করার সময় অভিজ্ঞতা থাকে না। আজকের ব্যাঘ্র ছয় হাজার বছর আগেকার ব্যাঘ্রের সঙ্গে অভিন্ন। প্রত্যেকেই তাদের ব্যাঘ্রজীবন এমন ভাবে শুরু করে যেন তার আগে আর কোন বাঘ জন্মায় নি। কিন্তু মানুষ তার অতীতকে মনে রাখে আর বর্তমানে কাজে লাগায়। নীট্সে বলেছেন, মানুষ দীর্ঘতম স্মৃতিবিশিষ্ট জীব। এই তার সম্পদ, এই তার চিহ্ন এবং এই তার বিশিষ্ট অধিকার। তার জীবনে তার সহজাত প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়েছে তার পূর্বলব্ধ অভ্যাস। সহজাত প্রবণতার উপর আছে মানসিক নিয়ন্ত্রণ। মানুষ শিক্ষাযোগ্য প্রাণী তাই তাকে সামাজিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আমরা যেভাবে কাপড়চোপড় পড়ি, যা খাই, যেভাবে ঘোরাফেরা করি, সে সবই সামাজিক শিক্ষার ফল। আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি যেন কমনীয় কাঁচা মাল, এবং আমাদের সংস্কৃতি যেন তাতে আকার ও রূপ প্রদান করে। আমরা যুক্তি বা সহজাত জ্ঞান অপেক্ষা অভ্যাস দিয়ে বেশী চালিত হই। মনুষ্য-স্বভাবের সহজাত আবেগ থেকে আমাদের আচরণের উৎপত্তি নয়, ওরা আসে কৃত্রিম মানসিক কারণ থেকে। প্রচলিত প্রথা আমাদের কর্মকে সর্বত্র নিয়ন্ত্রিত ও সীমায়িত করে। প্রথা যে আমাদের কি প্রকার অন্ধ করে রাখে তা অবিশ্বাস্য। কত রকম অন্যায় ও

অত্যাচার যে আমরা হয় নিজেরাই ঘটাই বা মেনে নিই, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। খুব শক্তিশালী ইঙ্গিত এবং নৈতিক আচরণ দিয়ে আমাদের মনকে সম্মতির জন্য প্রস্তুত করা হয়, তারপর আমাদের যা খুশী করানোর পথে আর কোন বাধা থাকে না। ক্রীতদাস প্রথা, শিশুহত্যা, ধর্মপীড়ন (inquisition), ডাইনী দাহন সবই মানুষের মর্যাদার পক্ষে সম্মানজনক বলে মনে হয়েছে, এখন যুদ্ধও সেই পর্যায়ে উঠেছে।

যে সব ক্রিয়াকর্ম মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে ও ধারণ করে, তাদের হিন্দুরা ধর্মের ধারণার মধ্যে এনে ফেলেছে। আমাদের নানা প্রকারের স্বার্থ, বিভিন্ন বাসনা, বিপরীত প্রয়োজন সব বেড়েই যায় এবং বাড়তে বাড়তে বদলে যায়। এই সমস্ত বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা ও বৈপরীত্য-এর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনই ধর্মের কাজ। ধর্মভাব থেকে আমরা পারমার্থিক সত্তাকে চিনতে পারি, সংসারবিমুখ হয়ে নয়, বরং সাংসারিক জীবনের অর্থ ও কামকে ধর্মবিশ্বাসের নিয়ন্ত্রণে এনে। জীবন এক, তাকে ধর্মজীবন ও ধর্মনিরপেক্ষ জীবনে ভাগ করা যায় না। ভক্তি ও মুক্তি পরস্পর-বিরোধী নয়।[১] ধর্ম, অর্থ, কাম একই সঙ্গে থাকে।[২] দৈনন্দিন জীবনের নিত্যকর্ম বাস্তবিক পরমাত্মারই সেবা। আমাদের সামান্য কর্মও নির্জন তপস্যার মতই কার্যকরী। হিন্দুরা জীবনের সমস্ত সুখের বন্ধ্যা বর্জনকে বা সন্ন্যাসকে খুব উচ্চ স্থান দেন না। মানুষের কল্যাণের পক্ষে শারীরিক কল্যাণ অপরিহার্য।[৩] সুখ সৎ জীবনেরই অংশ এবং ইন্দ্রিয়জ ও ইন্দ্রিয়াতীত উভয় রকমেই হয়। রৌদ্র উপভোগ করা, সঙ্গীত শ্রবণ করা, নাটক পাঠ করা, এ সব সুখ ইন্দ্রিয়জও বটে আবার ইন্দ্রিয়াতীতও বটে। সুখ মাত্রই নিন্দনীয় নয়।

সেই রকমই অর্থ মানুষের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। ঐশ্বর্যে পাপ নেই, যেমন দারিদ্র্যে পুণ্য নেই। নিজ সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টা কারুর পক্ষেই নিন্দনীয় নয়, কিন্তু সম্পদ বাড়াতে গিয়ে যদি অন্য লোকের আর্থিক বা নৈতিক ক্ষতি হয় তখনি প্রশ্ন ওঠে যে সেই উপায়ে ও সেই ফলযুক্ত ঐশ্বর্য সংগ্রহ ঠিক কিনা। হিন্দু-শাস্ত্রে ব্যক্তিগত লাভের চেয়ে সমাজসেবার উপর গুরুত্ব দেয় বেশী। জীবনের বিভিন্ন শ্রেয়ের অনুসরণ সমান ভাবে করতে হবে, একটার স্থান আর একটা দিয়ে

---

১ মহানির্বাণ তন্ত্রে আছে—

শ্রুতং বহুবিধং ধর্মং ইহামুত্র সুখপ্রদং
ধর্মার্থকামদং বিঘ্নহরং নির্বাণকারণম্।

২ ধর্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ পরস্পরবিরোধিনঃ
এষাং নিত্য বিরুদ্ধানাং কথং একত্র সংগমঃ
—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে
যদা ধর্মশ্চ ভার্যা চ পরস্পরবশানুগৌ
তদা ধর্মার্থকামনাং ত্রয়াণাং অপি সংগমঃ।

৩ শরীরং ধর্মসর্বস্বং রক্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ।

পূরণ করা চলবে না।[১] ভবভূতি বলেছেন, "সত্য নির্ণয়ের জন্য দার্শনিক জ্ঞান প্রয়োজন ; সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের দিকে সহায়তা করার জন্য অর্থ বাঞ্ছনীয়, আর যোগ্য উত্তরপুরুষের জন্য বিবাহিত জীবন আবশ্যক।"[২] কালিদাস রঘুবংশে বলেছেন, "যাঁরা ধন আহরণ করতেন দান করার জন্য, সত্য কথনের জন্যই অল্প কথা বলতেন, যশের জন্য জয়বাঞ্ছা করতেন, আর বংশবৃদ্ধির জন্য দারপরিগ্রহ করেন...।"[৩] প্রতিটি ধূলিকণাকে মধুতে পরিণত করতে আমাদের বলা হয়েছে।[৪] এক সময়ে আমাদের দেশে কলা ও সংস্কৃতি, ব্যবসা ও শিল্পে প্রভৃত উন্নতি হয়েছিল। দিল্লীর অশোক স্তম্ভে যে ইস্পাত ব্যবহৃত হয়েছে, আর গুণ এখনও বিশ্বের ইস্পাত শিল্পীদের বিস্ময়ের কারণ। ঐশ্বর্য ও ভোগের সঙ্গে সুনীতি ও পূর্ণতায় বৈপরীত্য নেই। প্রথম দুটি যদি লাভ করাই উদ্দেশ্য হয় তো ঠিক নয়, কিন্তু যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সামাজিক কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয় তো তারা আদরণীয়।

ধর্ম কথাটির অর্থ খুব ব্যাপক। ধৃ ধাতু (ধারণ করা, রক্ষা করা, পুষ্ট করা) থেকে এর ব্যুৎপত্তি।[৫] যে আদর্শ বিশ্বকে ধরে রেখেছে, যে তত্ত্ব থাকাতে বস্তু তার নিজ স্বকীয়তাতে ব্যক্ত হয়, তাই ধর্ম। বেদে ধর্ম সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানাদিকে ধর্ম বলা হত। ছান্দোগ্যোপনিষদ গৃহস্থ, সন্ন্যাসী ও বিদ্যার্থীর জন্য ধর্মের তিন শাখার কথা বলেছে।[৬] তৈত্তিরীয় উপনিষদ যখন আমাদের ধর্মাচরণ[৭] করার কথা বলে, তখন আমাদেব আশ্রম অনুযায়ী কর্ম করাব কথা বলে। ভগবদ্‌গীতা ও মনুসংহিতাতেও এইভাবেই কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। ধর্ম বৌদ্ধদের ত্রিরত্ন বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এর অন্যতম। পূর্ব মীমাংসার মতে ধর্ম কর্মে প্রেরণা দেয়।[৮] বৈশেষিক সূত্রের মতে অভ্যুদয় ও আনন্দ লাভই ধর্ম।[৯] আমরা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের জন্য চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের মানুষের সমস্ত কর্তব্যকে ধর্ম আখ্যা দিতে পারি। যদিও সামাজিক বিধির চরম উদ্দেশ্য হল মানুষকে আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও পূর্ণতা লাভ করতে শিক্ষা দেওয়া, তবু তার কালবশ্যতার জন্য তার মূল লক্ষ্য হল সামাজিক

---

১ ধর্মার্থকামঃ সমমেব সেব্য, যো হি একসক্ত স জনো জঘন্যঃ।

২ তে শ্রোত্রিয়াস্তত্ত্ব বিনিশ্চয়ায় ভূরিশ্রুতং শাশ্বতমাদ্রিয়ন্তে
ইষ্টায় পূর্তায় চ কর্মণেঽর্থান দারাংঽনপত্যায় তপোঽর্থমায়ুঃ ॥

মালতীমাধব, ১ম, ৫

৩ ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাং
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্। ১ম, ৭।

৪ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।

৫ ধারণাদ্ ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ

৬ ত্রয়ো ধর্ম স্কন্ধা—দ্বিতীয়, ২৩

৭ ধর্মং চর—১ম, দ্বিতীয়।

৮ চ উদনালক্ষণার্থো ধর্ম।

৯ যতো অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্মঃ।

অবস্থার উন্নতি করা যা থেকে অধিকাংশ লোকে এমন নৈতিক, ঐহিক ও মানসিক স্তরে উঠবে যে সকলের শান্তি ও কল্যাণের কারণ হবে। এই সব অবস্থা প্রত্যেককে তার জীবন ও স্বাধীনতা ক্রমশঃ আয়ত্ত করতে সহায়তা করবে।

যে মানবাত্মার মধ্যে পরমাত্মা বাস করেন তার মর্যাদা উপলব্ধি করাই হল ধর্মের মূল তত্ত্ব। "পরমাত্মা প্রত্যেক প্রাণীর অন্তরে বিরাজ করছেন, এই হল ধর্মের সার ও শাশ্বত বাণী।"[১] "একেই ধর্মের সার জান ও তাই আচরণ কর, তুমি তোমার নিজের প্রতি যে ব্যবহার ইচ্ছা কর না, সে রকম ব্যবহার অপরের প্রতি কোরো না।"[২] "যা আমাদের পক্ষে দূষণীয়, সে রকম ব্যবহার অন্যের প্রতি কোরো না, এই ধর্মের সার, অন্য রকম ব্যবহার স্বার্থপ্রণোদিত।"[৩] আমাদের অন্য লোককে নিজেদের মত করে দেখা উচিত। হে জাজলি, যিনি কায়মনোবাক্যে নিরন্তর অন্যের কল্যাণে ব্যাপৃত আছেন ও সকলের প্রতি সুহৃদভাবাপন্ন, তিনিই ধর্মের অর্থ জানেন।"[৪] সকল প্রাণীর উপর কায়মনোবাক্যে দ্বেষ বর্জন, সদিচ্ছা ও বদান্যতা, এই গুণগুলি আমাদের সকলের পক্ষেই প্রয়োজন।[৫] সদভ্যাস থেকেই মুক্তি।[৬] অর্থাৎ আমাদের সামাজিক জীবন এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে তার প্রত্যেক সদস্যের বাঁচবার, কাজ করার ও নিজের স্বকীয়তায় বিকাশ করার অধিকারকে কার্যকরীভাবে স্বীকৃত হবে। এ হল পবিত্র কর্ম। সামাজিক আকার প্রয়োজনীয় হলেও প্রাতিস্বিক জীবনের মর্ম তাকে অতিক্রম করে যায়। সামাজিক জীবন আমাদের পরিণতির এক অংশ, তার শেষ নয়। চঞ্চলতা ও সঙ্কটের মধ্য দিয়েই তার অভিযান। বিশেষ অবস্থার মধ্যে অস্তিত্বের সাধারণ স্তরকে যতদূর সম্ভব উঁচু করার চিরন্তন প্রয়াস চলেছে। হিন্দুধর্ম আমাদের বিধিব্যবস্থার একটা সূচী দিয়েছে এবং তার অনবরত পরিবর্তন করাও চলে। ধর্মশাস্ত্র হল অমর ধারণার মর রূপ, কাজেই পরিবর্তনীয়।

---

১ ভগবান বাসুদেবো হি সর্বভূতেষু অবস্থিতঃ এতদ্ জ্ঞানং হি সর্বস্য মূলং ধর্মস্য শাশ্বতম্।

২ শ্রূয়তাং ধর্মসর্বস্বং শ্রুত্বা চাপি অবধারয়তাম্, আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ।
—দেবল।

আত্মবৎ সর্বভূতানি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।—আপস্তম্ব।

৩ ন তৎ পরস্য সংদধ্যাৎ প্রতিকূলং যদ্ আত্মনঃ এষ সামাসিকো ধর্মঃ কামাদন্যঃ প্রবর্ততে।

৪ সর্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্বেষাং চ হিতে রতঃ, কর্মণা মনসা বাচা স ধর্মং বেদ জাজলে।
শান্তিপর্ব, ২৬১˙৯

আবার, সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্বদেবময়ো হরিঃ
সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্বধর্মময়ী দয়া। গীতাসার।

৫ অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু কর্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানং চ সতাং ধর্ম সনাতনঃ। মহাভারত শান্তিপর্ব, ১৬২˙২১

৬ বেদস্যোপনিষদ্ সত্যং সত্যস্যোপনিষদ্ দমঃ
দমস্যোপনিষদ্ মোক্ষঃ এতৎ সর্বানুশাসনম্।

ধর্মের উৎস

ধর্মের উৎস (১) শ্রুতি বা বেদ (২) বেদজ্ঞদের আচার ও ঐতিহ্য (৩) সাধুপুরুষদের ব্যবহার ও (৪) নিজস্ব বিবেক।[১]

বেদ হিন্দুধর্মের ভিত্তি।[২] এর প্রাচীন ও অর্থপূর্ণ কথাগুলি সরল, ভক্তি ও নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও নিশ্চয়তায় পূর্ণ। এর মধ্যে মানুষের চিরন্তন আশা ও আশ্বাসের সম্মিলন হয়েছে। সেই ঋষিদের আগ্রহ ও আন্তরিকতা ধারণা করাই দুরূহ, যাঁদের মুখ থেকে এই মহান্ প্রার্থনা প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল—অসৎ থেকে আমাকে সৎ-এ নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে নাও আলোতে। মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ করে দাও।"[৩] বেদবাণীর অনন্ত ব্যঞ্জনা।[৪] হারীতের মতে বেদ ও তন্ত্র দুইই শ্রুতির মধ্যে পড়ে।[৫] হিন্দুদের কয়েকটি সম্প্রদায়ের কাছে বেদ প্রামাণ্য নয়। মেধাতিথি বলেন "ভোজক, পঞ্চরাত্রিক, নিগ্রন্থ, অনর্থবাদ, পাশুপত প্রভৃতি বিরুদ্ধ সম্প্রদায়রা বলে যে তাদের ধর্মসূত্র যে সব মহাপুরুষ ও বিশিষ্ট দেবতার কাছ থেকে পাওয়া গেছে তাঁরা সেগুলির অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করেছিলেন, কাজেই তাঁদের মতে বেদ থেকে ধর্মের উৎপত্তি নয়।"[৬]

বেদে ধর্ম সম্বন্ধে সুসম্বন্ধ কোন বর্ণনা নেই। সেখানে শুধু আদর্শগুলি ও কতগুলি আচার বর্ণিত হয়েছে। ধর্মাচরণের উদাহরণ বাদ দিলে, বিধিনিষেধগুলি প্রায় সমার্থক স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে আছে। স্মৃতিতে বস্তুতঃ বেদজ্ঞ ঋষিরা যা মনে করে রেখেছিলেন তাই প্রকাশিত হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রের কোন বিধি যদি বেদ-সমর্থিত হয় তবে সেই বিধিও বেদের মতই প্রামাণ্য হয়। শ্রুতি ও স্মৃতিতে বিরোধ থাকলে শ্রুতিই গ্রাহ্য।[৭]

আরও

নাহং শপ্তঃ প্রতিশাপামি কিঞ্চিদ্ দমং দ্বারং হি অমৃতস্যেহ বেদ্মি
গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং ব্রবীমি ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।

১ বেদোঽখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্ বিদাম্
আচারশ্চৈব সাধূনাম্, আত্মনস্তুষ্টিরেব চ। মনুঃ দ্বিতীয় ৬.
গৌতম ধর্মসূত্র প্রথম, ১-২ দ্রষ্টব্য।

২ শ্রুতিপ্রমাণকো ধর্মঃ।—হারীত।

৩ অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।

৪ অনন্তা বৈ বেদাঃ।

৫ শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা, বৈদিকী তান্ত্রিকী চ। মনু, দ্বিতীয়, ১ এর উপর কুল্লুক কর্তৃক উদ্ধৃত।

৬ ন বেদমূলমপি ধর্মমভিমন্যন্তে। মনু, দ্বিতীয় ৬ এ উদ্ধৃত মন্তব্য।

৭ শাস্ত্রদীপিকা, ১, ৩-৪। কুমারিল লিখেছেন, "যেহেতু স্মৃতিশাস্ত্রগুলি মানুষের রচনা, বেদের মত সনাতন নয়, সেহেতু তারা স্বতঃ প্রামাণ্য নয়। মনু স্মৃতি প্রভৃতি লেখকদের স্মৃতির উপর নির্ভর করে লেখা আর স্মৃতির উৎসের প্রামাণ্যের উপর স্মৃতির সত্যতা

শিষ্ট লোকের আচরণও ধর্মের একটি উৎস।[১] সৎ লোকের আচরণ শাস্ত্রসম্মত হবে এরকম আশা করা যায়, কাজেই তা অনুসরণযোগ্য। সৎ লোক ব্রাহ্মণই হবে, এমন নয়। মিত্র মিশ্র সদ্ শূদ্রদের আচরণও প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেছেন। বশিষ্ঠের মতে তাদের নিঃস্বার্থ হওয়া উচিত।[২] স্থানীয় প্রথাও প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে[৩] ও সদাচারের অন্তর্গত হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "শাস্ত্রসম্মত হলেও লোকে যে আচরণের নিন্দা করে তা করা উচিত নয়।"[৪] বৃহস্পতি বলেছেন, "প্রত্যেক দেশ, জাতি ও পরিবারের বহুকালাবধি প্রচলিত অনুষ্ঠানাদিকে অখণ্ড-ভাবে রক্ষা করতে হবে।[৫] কোন কোন উপজাতির মধ্যে এক নারীর একাধিক পতি গ্রহণের প্রথা ছিল, হিন্দু শাসকরা তাতে বাধা দেন নি। এক নবাবিজিত দেশ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, "প্রচলিত প্রথা, আইন ও আচার নূতন রাজা আগের মতই মেনে চলবেন।[৬] কিন্তু প্রথা নীতিবিরুদ্ধ বা জনস্বার্থ-বিরোধী হলে চলবে না, সদাচার হওয়া চাই। গৌতম বলেছেন, শ্রুতিবিরুদ্ধ না হলে দেশ, জাতি ও পরিবারগত আচরণবিধি প্রামাণ্য।[৭] যা কিছু সমাজে গৃহীত হয় তা প্রচলিত চিন্তা ও ক্রিয়ার ধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়।

তত্ত্বজ্ঞদের আচরণের সঙ্গে সঙ্গে "বিবেক"ও ধর্মের উৎস বলে স্বীকৃত হয়েছে।[৮] যাজ্ঞবল্ক্য একজনের কি ভাল লাগে এবং সতর্ক চিন্তাজাত ইচ্ছাই বা কি, তা উল্লেখ করেছেন।[৯] এখানে যোগীদের বিবেকের কথা বলা হচ্ছে, অগভীর বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির খেয়ালের কথা নয়। অন্তর যাকে গ্রহণ করে[১০] বা আর্যরা যার প্রশংসা করে[১১] তাই ধর্ম। মনু অন্তরাত্মাকে যা তৃপ্তি দেবে তাই

নির্ভরশীল; অতএব কোন স্মৃতিকেই বেদের মত স্বয়ংসিদ্ধ বলা যায় না, অথচ যখন দেখি যে বেদজ্ঞ মহৎ ব্যক্তিদের এক অবিচ্ছিন্ন ধারা তাদের প্রামাণ্য বলে মেনে নিয়েছেন, তখন তাদের আমরা একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারি না। এইজন্য তাদের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। তন্ত্রবার্তিকা।

১ মহাভারতের একটি অতি পরিচিত শ্লোক "তর্কো অপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নৈকোমুনির্যস্য মতং প্রমাণম্ ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

২ অকামাত্মা ১, ৬

৩ অশ্বলায়ন ১. ৭. ১ বৌধায়ন, ১. ৫ (৩).

৪ ১, ১৫৬.

৫ দ্বিতীয় ২৯-৩১। দেশধর্মান্ জাতধর্মান্ কুলধর্মাংশ্চ শাশ্বতান্। পাষণ্ডগণ ধর্মাংশ্চ শাস্ত্রেস্মিন্ উক্তবান্ মনুঃ। মনু ১. ১১৮ তুলনীয়।

৬ প্রথম ৩৪২,৩

৭ দেশজাতিকুলধর্মাশ্চাম্নায়ৈরবিরুদ্ধাঃ প্রমাণম্।

৮ আত্মনস্তুষ্টিঃ। মনু ২য়, ৬।

৯ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ সম্যক্ সংকল্পজঃ কামো। দ্বিতীয় ১২, যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম, ৭.

১০ হৃদয়েনাভানুজ্ঞাতঃ। মনু, দ্বিতীয়-১

১১ যমার্যাঃ প্রশংসন্তি।— বিশ্বা মত্র।

করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[১] যা সুযুক্তি প্রণোদিত, তা একটি বালক বা শুক পাখী বললেও গ্রাহ্য হবে। আর যার মূলে সুযুক্তি নেই তা বৃদ্ধ বা স্বয়ং শুকদেব বললেও গ্রহণযোগ্য নয়।[২]

আপৎকালে আচরণবিধির ব্যতিক্রম আছে। প্রয়োজনের কোন বিধি নেই, এবং আত্মরক্ষার জন্য অপরিহার্য যে কোন আচরণই আপদধর্মে সমর্থিত হয়েছে। বিশ্বামিত্র একবার দেখলেন যে প্রাণরক্ষার জন্য কুকুরের মাংস চুরি করা তাঁর দরকার, তখন তিনি এই কাজের কৈফিয়ৎ হিসেবে বললেন যে, মরার চেয়ে বাঁচা ভাল। বেঁচে না থাকলে ধর্মরক্ষা করা চলে না।[৩] শ্রুতি সব চেয়ে বেশী প্রামাণ্য, তারপর প্রামাণ্য স্মৃতি অর্থাৎ মানুষের গড়া ঐতিহ্য, এবং স্মৃতির প্রামাণ্য বেদ-প্রামাণ্য-নির্ভর বলে বেদ-বিরোধী না হলেই স্মৃতি প্রামাণ্য। আচার ব্যবহার শিষ্টসম্মত হলে গ্রাহ্য। ব্যক্তির বিবেকও প্রামাণ্য।

আমাদের সকল প্রকার সমস্যা বেদের আমলে জানা সম্ভব ছিল না, কাজেই বেদের মর্ম যাঁদের অতি পরিচিত তাঁদের জ্ঞানের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। তাঁরাও সব রকম প্রশ্নের উত্তর বলে দিয়ে যান নি, কতগুলি সাধারণতঃ প্রযোজ্য নীতির নির্দেশ দিয়েছেন, নূতন সমস্যার ক্ষেত্রে সেই নীতিগুলি বিচার বিবেচনা করে প্রয়োগ করতে হবে। বিদ্বৎপরিষদের মত তখনই গ্রহণযোগ্য যখন আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি যে সে মত সংস্কারমুক্ত। সন্দেহ ও বিবাদের মীমাংসা তাঁরাই করবেন। মনু ও পরাশরে বলা হয়েছে যে লোকের অভ্যাসের আমূল পরিবর্তন করাব আগে এই রকম পরিষদ ডাকতে হবে। এরকম পরিষদ একশজন জ্ঞানী ব্রাহ্মণকে নিয়ে গঠিত হওয়া উচিত, কিন্তু সংকটকালে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও জিতেন্দ্রিয় একজনও পরিষদরূপে কাজ করতে পারেন।[৪] স্মৃতিচন্দ্রিকার মতে সাধুদের দ্বারা সৃষ্ট ঐতিহ্য বেদের মতই প্রামাণিক।[৫] মনু বলেন যে সভাসমিতি বসানোর অবসর না হয় তো একজন উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণই যথেষ্ট।[৬] সমাজের পালনীয়

---

১ চতুর্থ—১৬১।

২ যুক্তিযুক্তং বচো গ্রাহ্যং বালাদপি শুকাদপি
যুক্তিহীনং বচস্ত্যাজ্যং বৃদ্ধাদপি শুকাদপি ॥

৩ জীবিতং মরণাৎ শ্রেয়ো জীবন্ ধর্মম্ অবাপ্নুয়াৎ।

৪ মুনীনামাত্মবিদ্যানাং দ্বিজানাং যজ্ঞয়াজিনাং বেদব্রতেষু স্নাতানামেকোঽপি পরিষদ্ ভবেৎ। পরাশর, অষ্টম, ৩

যখন মা'দ ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন, তখন পয়গম্বর নাকি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তাঁর কাছে যে সব মামলা আসবে তার কিভাবে ফয়সালা করবেন। মা'দ বলেন, "আমি আল্লার বই অনুসারে বিচাব করব।" "আর আল্লার বই থেকে তুমি যদি নির্দেশ না পাও?" "তখন আমি আল্লার পয়গম্বরের নজির অনুসরণ করব।" কিন্তু সেখানেও যদি নজির না মেলে?" "তখন আমি নিজে মীমাংসা করতে প্রয়াসী হব।" Iqbal, the reconstruction of Religious Thought in Islam (1934) P 141.

৫ সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবৎ ভবেৎ।

৬ ধর্মজ্ঞঃ সময়ঃ প্রমাণম্।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা তাঁদেরই থাকা উচিত যাঁরা সংযমী, সর্বভূতে দয়াপরবশ, বেদজ্ঞ, যুক্তিযুক্ত মীমাংসায় অভ্যস্ত, সংসারাভিজ্ঞ (দেশ কাল বিভাগজ্ঞঃ) এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। এরাই জাতির চেতনা ও বিবেক। সামাজিক অভিব্যক্তির প্রাকৃতিক প্রণালী দ্বারা সামাজিক আদর্শ আপনা-আপনি জন্মায় না। এইসব আদর্শ সৃজনপ্রতিভাবিশিষ্ট ব্যক্তিদের আধ্যাত্মিক প্রয়াসের ফল। যদিও তাঁরা সংখ্যায় সর্বদাই নগণ্য, তবু প্রত্যক্ষ জ্ঞান পেয়ে না হোক, সামাজিক অভ্যাস দ্বারা তাঁদের প্রভাব সামান্য মানুষের উপর পড়ে। জনতা যান্ত্রিক ভাবেই সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে, এই বিকাশ তারা স্বকীয় প্রেরণায় কখনই করতে পারত না।

বিশেষ অবস্থায় কি করা উচিত তা আমাদেরই স্থির করতে হয়। আপস্তম্ব বলেন, "ধর্ম অধর্ম ডেকে বলে বেড়ায় না 'এই আমি, এই আমি'; দেব, গন্ধর্ব, পিতৃপুরুষরাও ঘোষণা করে না 'এইটি ঠিক' 'এইটি বেঠিক'।[১] আমাদের যুক্তি দিয়ে ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা করতে হয়, প্রাসঙ্গিকতা না বুঝে অন্ধের মত পুঁথির বাক্য অনুসরণ করা উচিত নয়।[২] মহৎ লোকেরা যার প্রশংসা করেন তাই ঠিক, আর তাঁরা যার নিন্দা করেন তা বেঠিক।[৩] সন্দেহ উপস্থিত হলে ধার্মিকের মতই গ্রাহ্য, এ মত শ্রুতিসিদ্ধ। মিতাক্ষরায় আছেঃ "যে আচরণ বিশ্ববাসীর বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে তা ধর্মানুযায়ী হলেও করা উচিত নয়, ওতে স্বর্গ-সুখ হয় না।"[৪] কোন্ কাজটা ঠিক তা যখন নির্ণয় করা কঠিন, তখন যিনি নিজ কর্তব্য পালন করেন, তিনি পাপের ভাগী হন না। তবে কোন্‌টা ঠিক সেটা একবার নির্ধারিত হলে, সেই পথই আমাদের অনুসরণ করতে হবে। ব্যাসের অনুশাসন হল ধর্মপথ কিছুতেই ত্যাগ করা উচিত নয়। তাতে যদি আমাদের সমস্ত ঐহিক কামনা ব্যর্থ হয়, ভয়ংকর দারিদ্র্য ও ভীষণ ফলভোগও করতে হয়, এমন কি তাতে যদি জীবননাশেরও আশঙ্কা থাকে।[৫] ভর্তৃহরি বলেন, "সৎ লোক কখনও সৎ পথ থেকে বিচ্যুত হবে না, তাতে সংসারী লোক তাকে প্রশংসাই করুক বা নিন্দাই করুক, সম্পদ লাভ হোক বা নষ্ট হোক, সাক্ষাৎ বিনাশের সম্মুখীন হতে হোক অথবা দীর্ঘজীবনই লাভ হোক।[৬]

---

১ ন ধর্মাধর্মৌ চরতঃ আবাম্ স্ব ইতি, ন দেবগন্ধর্বা ন পিতরঃ আচক্ষতে অয়ম্ ধর্মো, অয়মধর্ম ইতি। ১ম. ২০. ৬.

২ বৃহস্পতি—কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যোবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।

K. V. Rangaswamy Ayyangar (1941) প্রণীত রাজধর্ম, পৃ ১১৪।

আর্ষং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা
যঃ তর্কেনানুসংধত্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ। মনু, দ্বাদশ, ১০৬।

৩ যমার্যাঃ ক্রিয়মাণং প্রশংসন্তি স ধর্মঃ, যং গর্হন্তে সোঽধর্মঃ।

৪ ১ম, তৃতীয়, ৪

৫ ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্
ধর্মং ত্যজেদ্ জীবিতস্যাপি হেতোঃ।

৬ নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তবন্তু

যে সব ধর্মানুশাসন লঙ্ঘন করলে বিচারালয়ে দণ্ডনীয় হতে হয় তাকে ব্যবহার বা প্রকৃত আইন বলে। হিন্দু আইনজ্ঞরা নৈতিক অনুশাসন ও বিচারালয়ের আইনের নিয়মগুলির মধ্যে তফাৎ করেছেন। ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিধি আর ধর্মীয় ও নৈতিক আচার ও প্রায়শ্চিত্তবিধি স্বতন্ত্র। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে তিন অধ্যায় আছে, আচার, ব্যবহার এবং প্রায়শ্চিত্ত। বিবাহ, দত্তক গ্রহণ, সম্পত্তি বিভাগ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার ব্যবহারিক বিধি দ্বারা নির্ধারিত। ওগুলি সবই পূর্ব-প্রচলিত প্রথার ভিত্তিতে বিধিবদ্ধ। বৃহস্পতি বলেন যে শাসনকর্তারা চার রকমের আইন প্রয়োগ করবেন এবং সন্দেহস্থলে এইগুলির ভিত্তিতে বিচার করবেন: এই চার প্রকার আইনগুলি হল:—ধর্মবিধি, ব্যবহারবিধি, চরিত্র এবং রাজশাসন।[১] ন্যায়বোধ ও কাণ্ডজ্ঞানের ভিত্তিতে ব্যবহারিক বিধি প্রণয়ন করা হয় এবং তার দ্বারা পূর্বেকার আইন ও প্রথা বাতিল হয়ে যায়। আমরা হিন্দু আইনের নিয়মকানুন বিধান পরিষদের বিধি দ্বারা বাতিল বা পরিবর্তিত করতে পারি। বর্ণাসামর্থ্য নিরোধ আইন, The Caste Disabilities Removal Act, XXI of 1850), হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন (The Hindu Widows Remarriage Act, XV of 1856), বিশেষ বিবাহ আইন (The Special Marriage Act, III of 1872) ও তার ১৯২৩ সালের সংশোধন, ভারতীয় বিবাহ বিচ্ছেদ আইন (The Indian Divorce Act), আর্য সমাজ বিবাহ বৈধতা বিধি (The Arya Marriage Validation Act, XIX of 1937) যার দ্বারা আইনগত বিবাহ সিদ্ধ, আর হিন্দুনারীর সম্পত্তিঘটিত আইন (Hindu Women's Right to Property Act, XVIII of 1937) যাতে পুত্রসন্তান থাকলেও বিধবাকে মৃত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার দেওয়া হয়েছে, এসব ধর্মানুশাসনের মতই মান্য। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে মিঃ মেইন (Mayne) তাঁর হিন্দু আইন ও আচরণ (Hindu Law and Usage) সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মতে হিন্দু আইনের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, তার কোন বাণী পরলোক থেকে না এলে আর শোনা যায় না। আইন প্রণয়ন করে ও বিচারকদের রায় দিয়ে হিন্দু আইনের যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও মেইন-এর এই কথা মোটামুটি সত্যই থেকে গেছে। হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রের ন্যায্য নীতিগুলি যদিও আমাদের অনুসরণ করতে হবে তবুও বর্তমানকালে প্রয়োগ করার জন্য তাদের আইনগত সংশোধন দরকার। অবশ্য এ কাজ সুবিন্যস্ত ভাবে করতে হবে, খাপছাড়া ভাবে করা ঠিক নয়।

লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেচ্ছয়া,
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।

১ দ্বিতীয়, ১৮

পরিবর্তনের নীতি

সজীব সমাজের ঐতিহ্য বজায় রাখারও শক্তি চাই, আবার পরিবর্তন করার ক্ষমতাও থাকা চাই। বর্বর সমাজে পুরুষানুক্রমে কোনও প্রগতি নেই বললেই হয়। সব রকম পরিবর্তনই এই সমাজে সন্দেহের চোখে দেখা হয় এবং সমস্ত মানবিক শক্তি স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য ব্যয়িত হয়। সভ্য সমাজে প্রগতি ও পরিবর্তন সজীবতার লক্ষণ। যে সব জীর্ণ আচার ও অপ্রচলিত অভ্যাস শুধু গতানুগতিক ভাবে টি'কে আছে, তাদের অন্ধ অনুকরণের মত সমাজকে ভিতর থেকে অন্তঃসারশূন্য আর কিছুতে করে না। হিন্দুমতে আবশ্যকীয় পরিবর্তনের স্থান আছে। সামাজিক ঐতিহ্য একেবারে ভেঙেচুরে না দিয়েও নূতন নূতন সংকট, বিসম্বাদ ও গণ্ডগোলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের অতিক্রম করতে হবে। আধ্যাত্মিক সত্য শাশ্বত কিন্তু বিধিনিয়ম যুগে যুগে বদলায়।[১] আমাদের প্রিয় অনুষ্ঠানগুলি লোপ পায়। তাদের দিন গত হলে কালোৎপন্ন বস্তু কাল দ্বারাই বিনষ্ট হয়। কিন্তু কোন বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধর্মকে এক করতে পারি না। ধর্ম স্থায়ী হয়, কেননা তার মূল মানুষের স্বভাবে, তাই ঐতিহাসিক বিবর্তন সত্বেও ধর্ম টি'কে যায়। ধর্মের পদ্ধতি হল পরীক্ষাসাপেক্ষ পরিবর্তন। সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানই পরীক্ষামূলক, যেমন সমস্ত জীবনই পরীক্ষামূলক। বিধানদাতারা পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত, এমন কি যখন তাঁরা পরিবেশ অতিক্রম করতে চান তখনও। আইন ও অনুষ্ঠানের মধ্যে পবিত্র ও অপৌরুষেয় কিছু নেই। পরাশর স্মৃতির মতে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগে মনু, গৌতম, শংখ লিখিত ও পরাশর যথাক্রমে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। এক যুগের আচার ও বিশ্বাস অন্য যুগে চালাতে পারি না। সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে নৈতিক ধারণাগুলি সম্পূর্ণভাবে শর্তনিরপেক্ষ নয়, ভিন্ন ভিন্ন ধাঁচের সমাজের প্রয়োজনও অবস্থাসাপেক্ষ। ধর্ম পরম হলেও তার আধারিত বস্তুগুলি পরম ও কালাতীত নয়। নীতির মধ্যে একমাত্র শাশ্বত বস্তু হল মানুষের উন্নতির বাসনা। কিন্তু কাল ও অবস্থা দ্বারা প্রতি ক্ষেত্রে উন্নতির প্রকৃতি স্থিরীকৃত হয়। আমরা সমকালীন পরিস্থিতি বিচার না করে কোন সমাজপ্রচলিত প্রথাকে নিঃশর্ত নিয়মে উন্নীত করতে পারি না। মানুষের কোন কাজই কি অবস্থায় তা করা হয়েছিল তা সম্পূর্ণ বিবেচনা না করে গোড়া থেকেই একেবারে ভাল কি একেবারে মন্দ বলা চলে না। সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে যে আচরণ মানুষের সুখবৃদ্ধি করে তাকেই ভাল এবং যা মানুষের দুঃখের কারণ হয় তাকে মন্দ বলে ভাবা হয়। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ কল্পনাবিশ্বাসী ছিলেন না, বাস্তববাদীও ছিলেন না। তাঁদের আদর্শ ছিল এবং এই আদর্শ ব্যবহারিক ভাবে সম্ভাব্য। তাঁরা জানতেন যে সমাজের বৃদ্ধি ধীরে ধীরে হয়। যা মরে গেছে তাকে দূর করে রাস্তা পরিষ্কার করতে হবে। যে সব অনুষ্ঠান ও মতবাদ সজীবতা হারিয়ে ফেলেছে তাদের বর্জন করতে হবে।

১ পরাশর, প্রথম, ৩৩ যুগ রূপানুসারতাঃ। প্রথম, ২২, মনু, প্রথম, ৮৫৩ দ্রষ্টব্য।

অমর কালাতীত ধ্রুবতত্ত্ব জীবনের পুনরাবৃত্ত নবীনতার মধ্যেই প্রকট হয়। সংরক্ষণশীল শাস্ত্রকার হয়েও বিজ্ঞানেশ্বর বলেছেন যে শাস্ত্রসম্মত হলেও অনুপযোগী বিধিগুলির বর্জন করার অধিকার সমাজের আছে। তিনি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন যে একসময় গো-বলিদান ও গোমাংস ভক্ষণ বৈধ ছিল কিন্তু তাঁর সময় এই প্রথা মন্দ বলে পরিত্যক্ত হয়েছিল। অনুরূপভাবে নিয়োগ প্রথা একসময় সম্পূর্ণ বৈধ ছিল, কিন্তু এখন অবৈধ। যুগ-প্রয়োজনেই আইনকানুন তৈরি হয় আবার পরিত্যক্ত হয়। হিন্দুবিধির ভাষ্যকারদের রচনার সঙ্গে যাঁরা সুপরিচিত তাঁরাই জানেন যে, তাঁরা হিন্দুবিধি কতখানি অদলবদল করেছেন। শাসকরা পণ্ডিতদের সহযোগিতায় সমাজের প্রয়োজন বুঝে আইনের প্রয়োগ ও অদলবদল করতেন। সামাজিক অভিব্যক্তির এক এক পর্যায়ের ধারণা ও প্রয়োজন নীতিশাস্ত্র ও আইনে প্রতিফলিত হয়, তারপর ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পবিত্রতা অর্জন করে, আর সঙ্গে সঙ্গে অতিমাত্রায় পরিবর্তন-বিরোধী হয়ে ওঠে। সামাজিক নমনীয়তা হিন্দুধর্মের প্রধান লক্ষণ। সনাতন ধর্ম রক্ষা করা মানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নয়। তার সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করে আধুনিক জীবনে তার প্রয়োগ করতে হবে। সমস্ত রকমের যথার্থ বৃদ্ধি পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই অখণ্ডতা বজায় রাখে। বীজ থেকে বৃক্ষ, শুক্রবিন্দু থেকে পূর্ণাঙ্গ শিশু, এসব পরিণতির মধ্যে কোথাও ছেদ নেই। পরিবর্তন যখন আসে, তখন তাদের নূতন বলে মনেই হয় না, কেননা একীকরণ শক্তি ও সঙ্গে সঙ্গে নূতন পরমার্থকে সংযোগ করে ও নিয়ন্ত্রিত করে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ন্যগ্রোধ বৃক্ষের উদাহরণ দিয়ে এক পিতা পরম সত্তার সক্রিয় রূপ বুঝিয়ে দেন।

"ন্যগ্রোধ বৃক্ষের একটি ফল আনো।"

"এই ত এনেছি আর্য্য।"

"ভাঙো।"

"ভেঙেছি।"

"ওর মধ্যে কি দেখছ?"

"কিছুই না।"

পিতা তখন বললেন, "ওর মধ্যে যে সূক্ষ্ম সারবস্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ না তারই উপর এই বিরাট ন্যগ্রোধ বৃক্ষটি বেঁচে আছে।"[১]

অদৃশ্য সারবস্তু সেই সক্রিয় শক্তি যার অভাবে গাছটি শুকিয়ে মরে যাবে। ধর্মবৃক্ষকেও যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয় তো সেই অদৃশ্য শক্তিকে জীবনের বিচিত্র ও ক্রমবর্ধমান প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত ও ধারণ করতে দিতে হবে। আমাদের বহির্জগতের যে সব অভিজ্ঞতা ক্রমবর্ধমান ধারায় আমাদের চতুর্দিকে বর্ষিত হচ্ছে তাদের যদি নিয়ন্ত্রিত ও সার্থক না করতে পারি তো আমাদের সামাজিক শৃঙ্খলা চূর্ণ হয়ে যাবে, আমাদের সামাজিক চিন্তা সঙ্গতিহীন হয়ে পড়বে। ধর্মনীতি ও মূল্যবোধ নূতন অভিজ্ঞতার চাপের মধ্য দিয়েই বজায় রাখতে হবে। তবেই সর্বতোমুখী ও পূর্ণাঙ্গ সামাজিক প্রগতি বিধান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। আর যদি আমরা

---

১ ষষ্ঠ, ১০ ও পরবর্তী শ্লোকসমূহ।

পরিবর্তনশীল অবস্থায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শাস্ত্র খাটাতে যাই, তা হলে বিনাশ না হলেও অস্থিরতা আসবেই। আমাদের এখনই পরিবর্তন আনতে হবে এবং হিন্দুধর্মকে আধুনিক অবস্থার উপযোগী করে তুলতে হবে। আমাদের সমাজে নূতন শক্তির অনুপ্রবেশ, প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশে শিল্পবিস্তার, গুণ ও সুবিধার পৃথকীকরণ, হিন্দু সমাজে অহিন্দুদের প্রবেশ এবং বিবাহ বা ধর্মান্তর দ্বারা জাতিমিশ্রণ, স্ত্রীজাতির মুক্তি প্রভৃতি সমস্যাগুলি উদার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। বৈদিক যুগে আর্য হিন্দুদের দ্রাবিড়, আন্ধ্র, পুলিন্দ প্রভৃতি অনার্য হিন্দুদের স্বীকৃতি দেবার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে[১] আছে যে আন্ধ্ররা বিশ্বামিত্রের সন্তান। মনে হয় তিনি আন্ধ্রদের আর্যদের সমান বিবেচনা করতেন। পুরাণে আছে বিশ্বামিত্র নূতন সৃষ্টি করেছিলেন। বেদে আমরা পাই যে ব্রাত্যদের ব্রাত্যষ্টোম অনুষ্ঠানের পরে আর্যসমাজে গ্রহণ করা যেত।[২] দ্বাদশ পুরুষ পরেও তাদের শুদ্ধির ব্যবস্থা ছিল। ব্রাত্যরা কারা আমরা জানি না।[৩] তারা কোন পৃথক সম্প্রদায়ভুক্ত বা কর্তব্যচ্যুত উচ্চবর্ণের লোক, তা তর্কের বিষয়। সাধারণতঃ তাদের যবন (গ্রীক) ও ম্লেচ্ছদের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা হয়। গ্রীক ও শকেরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে ও ধর্মান্তরিত লোকেদের স্বভাবসিদ্ধ নিষ্ঠা দেখায়। গ্রীক দূত হেলিওডোরাস বিষ্ণুর ভক্ত (ভাগবত) হন এবং এক বৈষ্ণব মন্দিরে গরুড় স্তম্ভ স্থাপনা করেন।[৪] হূনেরাও বৈষ্ণব হয়েছিল। অনেক বিদেশী আক্রমণকারীরা ক্ষত্রিয় হিসাবে সমাজভুক্ত হন। যখন মুসলমান আক্রমণের ফলে বহুসংখ্যক হিন্দু নরনারীকে বলপূর্বক ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করা হয়, তখন সিন্ধু দেশে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রচিত দেবল স্মৃতিতে তাদের পুনরায় হিন্দুধর্মে দীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।[৫] যারা যুদ্ধে বন্দী হয়েছিল, বা অন্য ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল, বা নূতন ধর্মের নারীদের সঙ্গে মিশেছিল, তাদের বশিষ্ঠ, অত্রি ও পরাশরের মতানুসারে শুদ্ধি করে সমাজে গ্রহণ করা চলত। যে সব নারীরা হৃত অবস্থায় গর্ভবতী হয়, দেবল তাদের প্রসবের পর পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়েছেন, তবে বর্ণসংকর নিবারণের জন্য শিশুটিকে মাতার কাছ থেকে পৃথক করতে হত। চৈতন্য-শিষ্য রূপ ও সনাতন গোস্বামী মুসলমান ছিলেন, তাঁরা বৈষ্ণবদের চৈতন্য সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে নানা মূল্যবান গ্রন্থ

---

১ অষ্টম, ১৮

২ কাত্যায়ন, দ্বাবিংশ ৪, ১-২৮

৩ শঙ্কর বলেন ঃ "প্রথমজত্বং অন্যস্য সংস্কর্তৃরভাবাৎ অসংস্কৃতঃ ব্রাত্যঃ ত্বং স্বভাবতঃ এব শূদ্র ইতি অভিপ্রায়ঃ।

৪ সংলগ্নলিপি ঃ "দেব দেব বাসুদেবের এই গরুড়স্তম্ভ তক্ষশিলা নিবাসী দিয়ন-পুত্র, বিষ্ণু-উপাসক, হেলিওডোরাস কর্তৃক স্থাপিত। তিনি মহান রাজা আন্তিআলকিদ্ প্রেরিত গ্রীক রাজদূতরূপে ভাগভদ্র ও রক্ষাকারী রাজা কাশীপুত্রের রাজ্যসমৃদ্ধির চতুর্দশ বর্ষে তাঁর নিকট আগমন করেন।

৫ সিন্ধুতীরে সুখাসীনং দেবলং মুনিসত্তমং সমেত্য মুনয়ঃ সর্বে ইদং বচনমব্রুবন্ ভগবন্ ম্লেচ্ছনীতাহি কথং শুদ্ধিমবাপ্নুয়ুঃ।

রচনা করেন। শিবাজীর এক সেনাপতিকে জোর করে মুসলমান করা হয় ও তারপর সে দশ বৎসর এক মুসলমান পত্নীর সঙ্গে আফগানিস্থানে বসবাস করে। শোনা যায় শিবাজী তার পরেও তাকে পুনরায় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করেন। সাম্প্রতিক এক মামলায় মাদ্রাজ হাইকোর্ট স্থির করেন যে কোন খ্রীষ্টান হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলে, তার বর্ণের অন্য লোক যদি তাকে হিন্দু বলে গ্রহণ করে থাকে, তাহলে তাকে হিন্দু বলেই ধরতে হবে, যদিও তার ক্ষেত্রে রীতিমত শুদ্ধি অনুষ্ঠান হয় নি।[১]

নূতন অবস্থায় পড়ে নূতন স্মৃতির উদ্ভব হয়েছিল এবং বেদে বা প্রাচীন প্রথায় এমন কিছুই নেই যাতে আমাদের জীর্ণ ও পুরাতন রীতিনীতি আঁকড়ে থাকতে বলে। মেধাতিথি বলেন, "ঐ সব গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি যদি বর্তমানকালেও থাকেন তো তাঁদের কথা উত্তরপুরুষদের পক্ষে মনু ইত্যাদি শাস্ত্রকারদের কথার মতই প্রামাণ্য হবে।"[২] সত্য সম্বন্ধে যাঁদের অন্তর্দৃষ্টি আছে তাঁরা নূতন অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে গ্রহণ করে ধর্মের ধারকশক্তিকে নূতন করে তুলবেন। তাঁরা যদি পরিবর্তন সমর্থন করেন তো নিরাপত্তা বোধ ব্যাহত হবে না। প্রতিক্রিয়া ছাড়াই সংস্কার হতে পারবে। ভবিষ্যতে যে সব স্মৃতি রচিত হবে, তারা যদি বেদে বর্ণিত শাশ্বত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ভিত্তিতে লেখা হয় তো বেদের মতই প্রামাণ্য হবে। কালিদাসের ভাষায় প্রাচীন মাত্রই ভাল নয় এবং নূতন বলেই কোন রচনা খারাপ নয়।[৩]

আমাদের সমাজ যখন পথহীন অরণ্যে পরিণত হয়েছে, সেই সংকটমুহূর্তে পিতৃপুরুষের কথার সঙ্গে সঙ্গে নূতন বাণীও আমাদের শোনা উচিত। সব লোকের কাছে সব সময়ে একই আচার ব্যবহার প্রয়োজনীয় হতে পারে না।[৪] অতীতের নিয়ম যদি খুব বেশী ধরে থাকি, মৃত পুরুষদের সজীব প্রত্যয় যদি জীবন্ত লোকেদের কাছে মৃত প্রত্যয় হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সভ্যতা লোপ পাবে। যুক্তিযুক্ত সংস্কার আমাদের করতেই হবে।[৫] যে জীবদেহ থেকে ত্যক্ত পদার্থ নিষ্ক্রমণের পথ রুদ্ধ হয়, সে জীব মরে যায়। জীবিত লোকেই স্বাধীন থাকতে পারে। স্বাধীনতা অতীতকে অস্বীকার করে না বরং তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে সার্থক করে তোলে, যা কিছু উৎকৃষ্টতা তা রক্ষা করে নবীন প্রাণশক্তি দিয়ে নূতন আকার দেয়। পুরাতন প্রথাগুলো চরম বলে গ্রহণ করলে তারা জীবন্ত আত্মার শৃঙ্খলে পরিণত হয়।

১ বিচারপতি কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার বলেছেন যে বর্ণের কল্যাণ ও গঠন সম্পর্কে বর্ণই চরম বিচারক, সে বর্ণের লোকেরা যদি পুরাতন রীতিপদ্ধতি বর্জন করে নূতন গ্রহণ করা সমীচীন মনে করে থাকে, এবং সে নূতন রীতিপদ্ধতি যদি নীতিবিরোধী না হয়, তাহলে তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিতে হবে। —ইণ্ডিয়ান সোসিয়াল রিফর্মার। ১১শে আগস্ট ১৯৩১।

২ মেধাতিথির মনু। দ্বিতীয় ৬

৩ পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।

৪ নহি সর্বহিতঃ কশ্চিদাচারঃ সম্প্রবর্ততে।—শান্তিপর্ব ২৫৯, ১৭

৫ তস্মাৎ কৌন্তেয় বিদুষা ধর্মাধর্মবিনিশ্চয়ে
বুদ্ধিমাস্থায় লোকেঽস্মিন বর্তিতব্যং কৃতাত্মনা। মহাভারত।

সামাজিক স্বাধীনতার মূল্য যে শুধু নিরন্তর সতর্কতা তাই নয়, অনবরত নবীকরণ অন্তহীন প্রেরণা ও সৃজনীশক্তির অবিরাম ক্রিয়া। জীবন জীবনই নয় যদি না তা পুনঃপুনঃ নূতন আকার পরিগ্রহ করে। আমাদের পূর্বপুরুষ যা করেছেন তাই নিয়েই যদি সন্তুষ্ট থাকি, অবক্ষয় শুরু হয়ে যাবে। মধ্যযুগের খ্রীষ্টানরা যে জাড্য ও আলস্যকে সাংঘাতিক পাপ বলে মনে করতেন, তার বশে যদি আমরা আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্যের উন্নতি করার দুরূহ কার্যভার এড়িয়ে চলি তাহলে আমাদের সভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিছুদিন যাবৎ দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন মাত্রায় প্রায় সর্বব্যাপী মানসিক অবসাদের দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। যাঁরা মুখে যুক্তির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন তাঁরাও কাজের সময় প্রথাই অনুসরণ করেন। আমরা বৈদিকযুগের আচার ব্যবহারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারব না, সে চেষ্টা করলে ইতিহাসের ডায়ালেক্‌টিককে অস্বীকার করতে হয়। আবার ভারতের যেন কোন ইতিহাস নেই আর লোক শুধু চিন্তা করে তাদের স্বভাব বদলে ফেলতে পারে, এমনভাবে আমরা সব জিনিস নূতন করে শুরু করতে পারি না। যা আছে তার মধ্যেই সম্ভাব্যতার মূল প্রোথিত রাখা চাই। প্রত্যেক সভ্যতাকেই তার নিজ অভিজ্ঞতা ধরে চলতে হবে। ব্যক্তিদের মত জাতিরাও অন্যের কাছে অভিজ্ঞতা ধার করতে পারে না। তারা আমাদেব উপর আলোকসম্পাত করতে পারে, কিন্তু কার্য করার উপযোগী অবস্থা আমরা আমাদের নিজেদের ইতিহাস থেকেই পেতে পারি। অতীতের মধ্যে যার মূল আছে সেই বিপ্লবই স্থায়ী হয়। আমাদের ইতিহাস আমরা নিজেরা তৈরি করতে পারি বটে কিন্তু নিজেদের পছন্দ করা অবস্থায় নিজেদের ইচ্ছায় নয়। অবস্থাগুলি আমরা পেয়ে থাকি। মৃত সংস্কৃতিও পুনরুজ্জীবিত হতে পারে যদি নবজীবনের দীক্ষা দেবার যোগ্য দু-তিনজন মহাপুরুষ পাওয়া যায়। সংস্কৃতি ঐতিহ্য আর ঐতিহ্য স্মৃতি। সৃজনী প্রতিভাবিশিষ্ট ব্যক্তিদের পর্যায়ক্রমে আবির্ভাবের উপর এই স্মৃতির স্মৃতিকাল নির্ভর করে। সংস্কৃতির স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে তখনই যখন তা জমাট বাঁধে বা স্ফটিক রূপ ধারণ করে, আর অপমৃত্যু ঘটে তখনই যখন তার ঐতিহ্যে ছেদ পড়ে।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ইতিহাসে একটা সময় আসে যখন সামাজিক ব্যবস্থার মৌলিক অদলবদল না করতে পারলে সম্প্রদায়ে সজীব শক্তি থাকে না আর সে প্রগতির পথেও অগ্রসর হতে পারে না। সে যদি এমন দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে থাকে যে পরিবর্তনের চেষ্টাও না করতে পারে, তাহলে তাকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যেতে হবে। আমাদের সমাজে পরিবর্তন করবার এক উত্তম সুযোগ এসেছে। সমাজ থেকে মানুষের তৈরি অসাম্য ও অন্যায় দূর করে সকলকে স্বকীয় কল্যাণ সাধন ও উন্নতির জন্য সমান সুযোগ দিতে পারি। যাঁরা আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে সুপরিচিত বা বহুশ্রুত ও তার সারমর্ম বজায় রাখতে উৎসাহী তাঁরা যদি সমাজদেহে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন তাহলে আমরা হিন্দু ঐতিহ্যই অনুসরণ করব। ভারতে আমরা সমস্ত লেখা মুছে ফেলে অক্ষত পটে নব সুসমাচার লিখতে পারি না। গাছের বৃদ্ধির মত সত্যকার প্রগতিও আঙ্গিক ব্যাপার। মরা শাখা কেটে ফেলে শুকনো অতীতকে খসিয়ে ফেলতে হবে। আমরা অতীতে এতবার বদলেছি যে

সামান্য অদলবদলে ধর্মের আসল বস্তুতে কোন আলোড়ন হবে না। আমাদের কোন কোন অনুষ্ঠান সামাজিক ন্যায়বিচার ও আর্থিক কল্যাণের পথে বিষম অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের উচিত সেই সব বাধা দূর করা, কুসংস্কার-রক্ষক শক্তিদের তাড়ানো ও মানুষের মনের পরিবর্তন আনার সমূহ প্রয়াস করা। এখনকার দিনে জীবনের গতি দ্রুততর হয়েছে, জ্ঞান বাড়ছে, উচ্চাভিলাষ প্রসারিত হচ্ছে, আমাদের এখন বদলাতেই হবে, নয়ত বুঝতে হবে যে আমরা কানা গলিতে ঢুকে পড়েছি, সৃজনীশক্তি আমাদের লোপ পেয়েছে।

মঠেদের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। তারা শিখতেও পারে না, শেখাতেও পারে না, প্রেরণাও যোগাতে পারে না, আলোকসম্পাতেও অক্ষম। নূতন দীক্ষা বা উন্নতির আর তাদের ক্ষমতা নেই। সব চেয়ে ভাল যারা তার নির্দোষ ধ্যানমগ্ন ধৈর্য অবলম্বন করেছে। তাদের সম্পত্তি যদি আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হত, তাহলে দেশের নৈতিক উন্নতি হতে পারত। তারা বুঝতে পারে না, যে প্রতিষ্ঠানে ঐতিহ্য আকার নেয় সে প্রতিষ্ঠানের আয়ু ফুরোলেও ঐতিহ্য বেঁচে থাকে।

যে মহাপুরুষেরা হিন্দু জীবনকে অতীতে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, তাঁদের প্রায়ই তৎকালীন সাধারণ মানুষের জীবনের বিরোধে কাজ করতে হয়েছে। তাঁরা জন্মেছিলেন বলেই প্রাথমিক তত্ত্বে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল, চিন্তা ও কর্মে বিপ্লব এসেছিল, বীরোচিত একাগ্রতা ও সঙ্গতি দেখা দিয়েছিল। নিজের আত্মার মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের নূতন প্রেরণা পেয়ে তাঁরা সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কার ত্বরান্বিত করতে পেরেছিলেন। জীবনে যে বস্তু তাঁরা পেয়েছিলেন তারই ভিত্তিতে নূতন আশ্রয় তৈরি করেছিলেন। এই নূতনত্ব স্রষ্টারা ও বিদ্রোহীরা হিন্দু ইতিহাসকে দৃঢ় শক্তিতে অগ্রসর করে দিয়েছেন। তাঁদের অমূল্য শক্তি জড়, অন্ধবিশ্বাসী ও গোঁড়াদের দুর্ভর বোঝা সরাতে ব্যয়িত হয়েছে।[১] বেশীর ভাগ লোক সেকেলে চিন্তা ও অনুজ্ঞাত মেনে চলে, তাদের আত্মতুষ্টি নষ্ট করতে হলে পচা আচারপদ্ধতি অমান্য করতেই হয়। মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদার উপর যে নূতন করে জোর দেওয়া হচ্ছে তার জন্য সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

হিন্দু আইন এখন বিধিবদ্ধ হওয়াতে আইনের অবস্থা বিচার করে তা বদল করার কোন প্রতিষ্ঠানই নেই। ভাষ্যকারদের নূতন ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। বিচারের নজীরে যেটুকু পরিবর্তন হওয়া সম্ভব তা সীমিত, তার দ্বারা সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক পুনর্গঠন সম্ভব নয়। খাপছাড়া আইন প্রণয়ন করে নূতন অবস্থাকে আয়ত্ত করা যাবে না। ধর্ম বাড়ন্ত দেহের স্থিতিস্থাপক আচ্ছাদন। বেশী আঁট হলে ছিঁড়ে যাবে, ফল অরাজকতা, নৈরাজ্য ও বিপ্লব। ঢিলে হলে পায়ে পায়ে বেধে পড়ে যাব। জনসাধারণের বিচার-বুদ্ধির বেশী পেছিয়ে থাকাও ঠিক নয়, বেশী এগিয়ে যাওয়াও বিফল। পুরাতন মন্ত্রের শক্তি নেই, পুরাতন প্রতিষ্ঠান মর্যাদাহীন, অথচ ভারতের অতীতের আত্মা সজীব এবং পুরুষপরম্পরায় সে তার রহস্য উদ্ঘাটিত করে। যে সব আভাস উপরে দেওয়া গেল তা হয়ত গোঁড়াদের

১ বেকন বলেছেন, "নূতনত্ব যেমন আলোড়ন আনে, প্রথাকে বেশীদিন আঁকড়ে রাখলেও তাই হয়, আর যারা পুরোনোকে বেশী শ্রদ্ধা করে, তারা নূতনকে দেখতে পারে না।"

পছন্দ হবে না, আবার প্রগতিশীলরা তাকে রক্ষণশীল মনে করবে। যা আমাদের সমাজের জরুরী দাবী তাই আমি বলেছি।[১]

ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান

ধর্ম দিব্য-সাদৃশ্য লাভের অভিলাষ প্রকাশ করে। ধর্মের সাহায্যে আমরা আত্মার গভীরতার মধ্যে বেঁচে থাকতে পারি। ধ্যান ও উপাসনার দ্বারা আমাদের মন, মেজাজ ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী পরিমার্জিত হয়। ধ্যানের পাত্র হলেন পরমেশ্বর। যিনি আসলে বর্ণনাতীত তিনি নিরাকার ; কেউ তাঁকে চোখে দেখতে পায় না।[২] কোন মূর্ত ও প্রয়োগজ বস্তুর সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যায় না।[৩] আমরা শুধু বলতে পারি আত্ম সকলের শাসক, সকলের প্রভু, সকলের অধিপতি।[৪]

পরমেশ্বরের চিন্তা আমাদের কাছে প্রতিমা বা চিত্রের রূপ নেয়। ঈশ্বরে গভীরভাবে বিশ্বাসী অল্প লোকই তাদের বিশ্বাসের কোন প্রতীক চায় না। সর্বোচ্চ জ্ঞানলাভের মানসিক যোগ্যতা যাদের নেই, সেই বহুসংখ্যক লোকের জন্য জনপ্রিয় প্রতীক ব্যবহার করতেই হয়। সংকীর্ণ বুদ্ধি ক্ষুদ্র লোকেদেরও আমরা চটাতে পারি না, তাদেরও অধিকার আছে। সে অধিকার না মানলে তারা সম্পূর্ণ অন্ধকারে থেকে যাবে। যে গুরুরা তাদের ধোঁকায় না ফেলে সাহায্য করতে চান তাঁরা দার্শনিক সত্যগুলিকে জনতার বুদ্ধিগম্য প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করেন। সূক্ষ্ম সত্যকে পৌরাণিক আকার দেওয়া হয়। প্রতীকের সাহায্যে অনন্তকে সান্ত রূপ দেওয়া হয়। প্রতীক কখনও অনন্তকে সান্ত করে ফেলে না। প্রতীক সান্তকে স্বচ্ছ করে দেয়, যাতে তার মধ্য দিয়ে অনন্তের দর্শন পাওয়া যায়।[৫] পরমের পরিপূর্ণতা ধরবার মত কোন প্রতিমা নেই। প্রতিমা যদি পরমের স্থান দখল করে বসে, তবে তাকে পৌত্তলিকতা বলে।

কল্পনা মাত্রই ভ্রমসঙ্কুল।[৬] তবে ভ্রমের পরিমাণে তফাৎ থাকে। প্রতিমা

---

১ সুলভাঃ পুরুষঃ রাজন, সততং প্রিয়বাদিনঃ
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ। রামায়ণ।

২ ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।

৩ ন তস্য প্রতিমা অস্তি।

৪ সর্বস্য বশী, সর্বস্যেশানঃ, সর্বস্যাধিপতিঃ।—বৃহদারণ্যক উপনিষদ, চতুর্থ, ৪, ২২

৫ সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক স্তর পর্যন্ত খনন করে নর ও পশুর মূর্তিযুক্ত মোহর পাওয়া গেছে। সেযুগে মানব ও অতিমানব আকারের পূজার প্রাদুর্ভাব ছিল, তাদের কাছ থেকে বৈদিক আর্যরা তা গ্রহণ করে। বৈদিক দেবতারা নরাকারে বর্ণিত হয়েছেন। তাঁদের "দিবোনরঃ" বলা হত। এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাচীনতম প্রতিমা বাসুদেব ও সংকর্ষণ মূর্তি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর।

৬ সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম খ্যাতনামা কোয়েকার আইজাক পেনিংটন অনেকদিন আগেই বলেছিলেন, চরম ও সর্বোচ্চ সত্য ছাড়া সব সত্যই ছায়া, অথচ নিজক্ষেত্রে সব সত্যই ঠিক। নিজক্ষেত্রে যা বস্তু, অন্যক্ষেত্রে তা ছায়া, কেননা সে তীব্রতর বস্তুর ছায়া ; বস্তুও সত্য বস্তু, ছায়াও সত্যকার ছায়া।"

পরমেশ্বরের প্রতীক, তার উদ্দেশ্য বিরাট ও চরম সত্তার ভাব মনে জাগানো। তার মধ্যে নিরাকার সত্তার সার সত্যের আভাস পাওয়া যায়। চিদাম্বরমে নটরাজ শিবের গর্ভগৃহে কোন প্রতিমাও নেই, কোন লিপিও নেই। সেখানে ভগবানের কোন সান্ত আকারকে পূজা দেওয়া হয় না, যে সর্বব্যাপী বিশ্বাত্মা নিরাকার হয়েও সকল আকারের আধার, যে জ্যোতি সকল আলোকের একমাত্র উৎস তিনিই সেখানে পূজ্য। দর্শনাতীত ও স্পর্শনাতীতের গলায় দেবার জন্য এক গাছি দৃশ্য ও স্পৃশ্য মালা অন্ধকার ঘরে খালি দেওয়ালের গায়ে টাঙানো আছে। অদ্বৈত সিদ্ধির লেখক মধুসূদন সরস্বতী বলেন যে ভগবান কৃষ্ণের থেকে উচ্চতর কোন সত্যকে তিনি জানেন না।[১]

হিরাক্লিটাস বলেছেন, "প্রতিমার কাছে প্রার্থনা করা তো পাথরের দেওয়ালের সঙ্গে বাক্যালাপ করা।" আমরা তো পাথরের কাছে প্রার্থনা জানাই না, যে ঈশ্বরশক্তির মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধি প্রতিমায় মূর্ত হয়েছে তাঁর কাছেই আমাদের নিবেদন।

নিরাকারের ধ্যান ও সাকারের পূজা করার কথা বলা হয়েছে। মানুষ ঈশ্বরের সামনে একাই যায়, প্রত্যেকে নিজ নামে ও স্বকীয় নিয়তি নিয়ে। ঈশ্বর মানুষকে "তুমি" বলেই সম্বোধন করেন, আপনি বলে নয়। নির্জনে মানুষ নিজ আত্মার রহস্য ভেদ করতে পারে। আত্মার দান অন্যের মারফৎ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক মানুষের অন্তরের গভীরতম প্রকোষ্ঠে ঈশ্বরের আবাস। ধ্যানই সেই অন্তরাত্মার উপাসনা।

ধ্যানের প্রথম শর্ত সম্পূর্ণ সততা। আমরা দুর্বল, তবু আমাদের যতখানি সৎ হওয়া সম্ভব, ততখানি সৎ হওয়া উচিত। আমরা নিজেদের কাছে যে সব কৈফিয়ৎ দিই তার আসল স্বরূপ বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। ধ্যানে আমরা জীবনের তুচ্ছতা বর্জন করে অনন্তের সম্মুখীন হই। মানুষ যা চিন্তা করে সে তাই হয এবং আমরা তাই প্রার্থনা করি যে আমাদের মন মহৎ ভাবনায় পূর্ণ হোক।[২] যাদের পক্ষে বিমূর্ত ধ্যান দুরূহ, তারা নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধির উপযোগী আকার-সমূহ বেছে নেবে। এসব আকার কাল্পনিক নয়, সাধকদের কল্যাণের জন্য পরমাত্মা পরিগৃহীত রূপ[৩], এবং এইসব আকার মহাপ্রলয় পর্যন্ত থাকবে।[৪] তারা যদি ছায়া হয়, তবে তারা পরম জ্যোতিদ্বারা নির্মিত ছায়া। ধর্মের প্রতীক সাধকের

---

১ পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দ নেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে।

২ তান্ মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু।

৩ চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্যাঽশরীরিণঃ
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

৪ আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্ত্বং হি ভাষ্যতে।—বিষ্ণুপুরাণ।

নিরুক্তে যাস্ক (সপ্তম ৪) বলেছেন যে বিভিন্ন দেবতারা একই আত্মার (একস্যাত্মনঃ) অধমাংস (প্রত্যঙ্গানি)। বৃহদ্দেবতা (প্রথম ৭০, ৪) বলেছেন যে ক্রিয়াক্ষেত্র অনুযায়ী (স্থানবিভাগেন) দেবতাদের আকার কল্পনা করা হয়েছে।

প্রিয় সত্যের প্রতীক। অবাস্তব হলে সে এভাবে কাজ করতে পারত না। আমাদের গভীরতম বোধ ও তার ধর্মীয় প্রতিমা যদি পরস্পর উপযোগী না হয় তো আমাদের মনে তার দাগ পড়ত না। এটা বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রশ্ন নয়। আমাদের গভীরতম সত্তা কোন বস্তু নয়। এই সত্তার সঙ্গে তুরীয় সত্তার যে আন্তরিক সম্পর্ক তা নিয়েই কথা। আত্মা যদি এই সম্পর্ক বুঝতে পারে, তাহলেই সত্য তত্ত্ব প্রকট হয়। হিন্দু ধর্ম প্রত্যেককে তার নিজ প্রকৃতি অনুসারে চালনা করে, যাতে তার সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয়। যা কিছু সৎ সত্য ও নিজ প্রত্যয়ে নিষ্ঠাবান তার মধ্যেই ঈশ্বর সক্রিয়। পৃথিবীতে ঈশ্বরই একমাত্র বাস্তব সত্তা, তিনি কোন সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পত্তি নন। হিন্দু ধর্ম স্বীকার করে যে মানব-প্রকৃতির শক্তির মধ্যে ঈশ্বরের বিভূতি প্রকট হয়, এবং তা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় দেখা যায়, কাজেই খাড়া চড়াইয়ে উঠবার নানা পথ থাকতে পারে, কিন্তু সকলেই একই শীর্ষে পৌঁছবে। উপাসনা পদ্ধতি অনেকাংশে ঐতিহাসিক সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত হয়। এর জন্য বহু দেবতাবাদের সঙ্গে আপোস করার প্রয়োজন নেই। পরস্পরস্বতন্ত্র এমন কি পরস্পরবিরোধী বহু দেবতার পূজা এক জিনিস আর একই পরমাত্মার বিভিন্ন প্রকাশের পূজা আর এক জিনিস। খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন চার্চে বিভিন্ন সন্ত ও দেবদূত পূজা পেয়ে থাকেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সমস্ত খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ই একেশ্বরবাদী। প্রতিমা পূজা সাধারণ লোকের জন্য যতই প্রয়োজনীয় হোক, তা যে উপাসনার গৌণ পদ্ধতি এ স্বীকৃতি হিন্দুধর্মে সব সময়ই আছে। ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতা উপলব্ধিই উচ্চতম সাধনা, তার নীচে ধ্যান, তারও নীচে স্তোত্র ও মন্ত্র-জপ আর সব থেকে নীচে হল বহিরঙ্গ পূজা।"[১] আর এক শ্লোকে আছে "বহুবার পূজা এক স্তোত্রের সমান, বহু স্তোত্র এক মন্ত্রজপের সমান, অসংখ্যবার মন্ত্রজপ ধ্যানের সমান, আর নিরন্তর ধ্যান ব্রহ্মপ্রাপ্তির সমান।[২] যে দেবতারই পূজা করি তাঁকেই ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন বলে ধরে নেওয়া হয়। অথর্ববেদ বলেন, "হে গণপতি তোমাকে প্রণাম করি, তুমিই স্রষ্টা, তুমিই রক্ষাকর্তা, তুমিই লয়কর্তা, তুমি নিশ্চিতই ব্রহ্ম।"[৩] বিশ্বজননী আদ্যাশক্তি পরম ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। তুমি নিজেই সাধু লোকদের ভবনের লক্ষ্মী, পাপীর কুটিরে দারিদ্র্য, মার্জিতমন লোকেদের অন্তরে ধীশক্তি, সৎ লোকেদের মনে শ্রদ্ধা, সদ্বংশজাতদের মনে বিনয়, তোমাকেই প্রণতি করি। হে দেবি, বিশ্বকে রক্ষা কর।"[৪] আমরাআমাদের পছন্দমত মূর্তিতে ঈশ্বরের

---

১ উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ স্তুতির্জপোঽধমোভাবো বহিপূজাঽধমাধমঃ।

২ পূজাকোটিসমং স্তোত্রং স্তোত্রকোটিসমো জপঃ, জপকোটিসমং ধ্যানং ধ্যানকোটিসমো লয়ঃ।

৩ নমস্তে গণপতয়ে, ত্বমেব কেবলং কর্তাসি, ত্বমেব কেবলং হর্তাসি, ত্বমেব কেবলং খল্বিদং ব্রহ্মাসি।

৪ যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু অলক্ষ্মীঃ পাপাত্মনাং
কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ,
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা, তাং ত্বাং নতাস্ম
পরিপালয় দেবি বিশ্বম্। মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

উপাসনা করি। অত বড় অদ্বৈতবাদী শঙ্করও শক্তির নিষ্ঠাবান্ উপাসক ছিলেন। তাঁর সূত্রভাষ্যে লিখেছেন, "বিধবা ও কুমারীদের জন্য প্রার্থনা ও দেবপূজাদি ধর্মানুষ্ঠান দ্বারাও জ্ঞানলাভ হয়।"[১] তিনি বলেন, "প্রত্যেককেই নিজের ধ্যান ও পূজার পদ্ধতি নিজেকেই স্থির করতে হবে, তারপর যতদিন না ধ্যানের ফললাভ হয় বা ধ্যানের পাত্রের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়, ততদিন নিষ্ঠার-সঙ্গে তারই অনুসরণ করতে হবে।"[২] শঙ্কর নিজে শক্তি উপাসনা পছন্দ করেছিলেন ও কতকগুলি চিত্তালোড়নকারী স্তোত্র রচনা করেছিলেন। তিনি অনেক মন্দির ও মঠ স্থাপনা করেন, তার মধ্যে প্রধান হল শৃঙ্গেরী, দ্বারকা, পুরী ও হিমালয়ে জ্যোতির্মঠ।

হিন্দু-বিশ্বাসের প্রধান লক্ষ্য প্রতিমা পূজাকে স্বীকার করে মানুষের মনে ধর্মভাবের উদ্রেক করা, যে ধর্মভাবের দ্বারা সকল সত্তার মধ্যে অন্তর্যামী ঈশ্বরকে জানা যায়।[৩] ভাগবতে ভগবান বলেছেন, "আমি সকলের মধ্যে আত্মারূপে বিরাজ করছি অথচ আমার উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে লোকে প্রতিমা পূজার সমারোহ করে"।[৪] প্রতিমা পূজা আমাদের ততক্ষণই করতে দেওয়া হয় যতক্ষণ পরম ব্রহ্মকে সর্বত্র এবং যে কোন জায়গায় বিরাজমান দেখার মত আধ্যাত্মিক পরিপক্বতা আমাদের না আসে। "নিজের কর্তব্য সমাধা করে আমাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে প্রতিমাদির

---

১ তৃতীয়, ৪. ৩৫।

২ সূত্র ভাষ্য, তৃতীয়, ৩. ৫১। প্লেটোবাদী, টায়ারের ম্যাক্সিমাস বলেছেন, "যা কিছু আছে, ভগবান তাদের পিতা ও নির্মাতা, সূর্য ও আকাশের চেয়েও পুরাতন কাল ও কালাতীত, ও সর্বসত্তা প্রবাহের থেকেও বড়, কোন শাস্ত্রে যাঁর পরিচয় নেই, অবর্ণনীয় ও অদৃশ্য। আমরা সেই সার পদার্থ বুঝতে না পেরে, শব্দ, নাম ও চিত্র ব্যবহার করি, স্বর্ণফলক, গজদন্ত আর রৌপ্য, বৃক্ষ ও নদী, পর্বতশীর্ষ ও জলস্রোত সকলের মধ্যেই তাঁকে খুঁজি, পার্থিব প্রেমিকরা যে সকল সুন্দর বস্তুর মধ্যে তাদের দয়িতের প্রকৃতি দেখিতে পায়, তেমনি আমাদের অক্ষমতায় আমরা এই জগতের সমস্ত সুন্দর বস্তুকে তাঁর নামে নাম দিই। পার্থিব প্রেমিকের কাছে প্রিয়ের দেহবল্লরীই সব চেয়ে সুন্দর বস্তু, কিন্তু যা কিছু স্মৃতিপটে প্রিয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্মৃতির উদ্রেক করে তাতেই সুখী, একটি বীণা, একটি বর্শা, হয়ত একটি চেয়ার, অথবা দৌড়াবার মাঠ। প্রতিমা বিচারে আরও অগ্রসর হব কি? মানুষ জানুক ভাগবৎ বস্তু কে, তা হলেই হল। ফিডিয়াসের কারুকলা দেখে যদি গ্রীকের মনে ভগবৎ-স্মৃতি জাগে কিংবা একজন মিশরীর মনে পশুপূজা দ্বারা, কারুর মনে নদী দেখে বা অগ্নি দেখে, আমার এই বৈচিত্র্যে কোন আপত্তি নেই। তারা শুধু জানুক, তারা ভালবাসুক, তারা স্মরণ করুক।" Maximus of Tyre viii, 9. 10. Gilbert Murray কৃত ইংরাজী অনুবাদ Five Stages of Greek Religion, p. 100.

৩ ভূতাত্মনাং কৃতালয়ম্।

৪ অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মা অবস্থিতঃ
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতে অর্চাবিড়ম্বনম্। তৃতীয়, ২৯. ২১

মধ্যে পূজা করবে ততক্ষণই, যতক্ষণ না আমাকে সর্বভূতে বিরাজমান রূপে নিজের অন্তরে উপলব্ধি হয়"।[১] অল্পবুদ্ধিদের জন্য প্রতিমা, সাধুরা তো ব্রহ্মকে সর্বত্র দেখতে পান।[২] অশিক্ষিত লোকের কাছে প্রতিমা পূজা স্বভাবতই প্রিয়, কিন্তু সে যে অধম পথ তা অস্বীকার করা যায় না। এক সুপরিচিত শ্লোকে আছে যে ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখাই হল ধর্মাচরণের সর্বোচ্চ স্তর, যাঁরা তা না পারেন তাঁদের জন্য ধ্যানধারণা বিহিত, সে স্তরেও যদি আমরা না উঠতে পারি তো প্রতিমা পূজা অবলম্বন করা চলবে, তাও না পারলে হোম ও তীর্থযাত্রা বিধেয়।[৩] প্রতিমা পূজার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব জানলে, কি প্রতিমা ব্যবহার করা হচ্ছে তা নিয়ে বিচারের প্রয়োজন থাকে না। হিন্দুরা মানে যে জ্ঞাতার ভাবের মধ্যে ছাড়া কিছুই জানবার উপায় নেই। চাণক্য নীতিতে আছে, "কাঠ, মাটি বা পাথরের মধ্যে দেবতা নেই। ভাবের মধ্যেই তাঁর অস্তিত্ব। অতএব ভাবই আসল কারণ।"[৪] পূজার ফল পূজকের শ্রদ্ধানুযায়ী হয়।[৫] আসল প্রতীকের মধ্যে নানা স্তরের অর্থ আছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। আমাদের শ্রদ্ধা যত বাড়ে, অর্থও ততই পর্যাপ্ত হয়ে ওঠে। আমবা যে কোন প্রতীক নিয়ে আরম্ভ করতে পাবি, আমাদের নিজের দৃষ্টিভঙ্গী যত উচ্চস্তবে উঠবে ততই প্রতীক আসল বস্তুব কাছাকাছি পৌঁছবে। হিন্দুর মতে সব পথই এক পরম ব্রহ্মের দিকে নিয়ে যায়, শুধু তাই নয়, প্রত্যেকে যাত্রার মুহূর্তে যেখানে থাকে তদনুযায়ী তার নিজেব পথ বেছে নিতে পারে এ প্রত্যয়ও হিন্দুর আছে।

অনুষ্ঠানাদি ও পূজাপদ্ধতির মধ্যে উপাসনার ভাবটি মূর্ত হওয়া চাই। সম্প্রদায়েব ধর্মজীবনকে আনুষ্ঠানিক ও বোধগম্য রূপ দিতে হবে, তা নইলে উপাসনার পূর্ণ ঐশ্বর্য ও শক্তির বিকাশ হতে পারে না। আমাদের আধ্যাত্মিক অভিলাষকে যদি ক্ষীণ ও বিমূর্ত না করে বাখতে চাই তো তাকে এমন রূপ দিতে হবে যাতে মানুষের বিভিন্ন গুণ ও শক্তি ব্যবহার করা যায়, তাতে যদি উপাসনার পবিত্রতা কিছু নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে, সে ঝুঁকিও নিতে হবে। অবশ্য এ বিপদ থাকবেই যে হয়ত বহিরঙ্গে ভাব চাপা পড়ে যাবে, মন্ত্র জপ স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনার

---

১ অর্চাদবর্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মকৃৎ
যাবৎ ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্।

২ অগ্নির্দেবো দ্বিজাতিনাং যোগিনাং হৃদি দৈবতং
প্রতিমাসু অল্পবুদ্ধিনাং সর্বত্র সমদর্শিনাম্।

দাদুর কথায়, "মন্দিরেও যাবার দরকার নেই, মসজিদেও যাবার দরকার নেই, অন্তরের মধ্যেই আসল মন্দির ও মসজিদ, সেখানেই ঈশ্বরকে সেবা ও প্রণামাদি করা যায়।"

৩ উত্তমাসহজাবস্থা দ্বিতীয়া ধ্যানধারণা
তৃতীয়া প্রতিমাপূজা, হোমযাত্রা চতুর্থিকা।

৪ ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে, ন পাষাণে ন মৃন্ময়ে
দেবো হি বিদ্যতে ভাবে তস্মাৎ ভাবো হি কারণম্। সপ্তম ১২

৫ শ্রদ্ধানুরূপং ফলহেতুকত্বাৎ—ভাগবত, অষ্টম, ১৭

স্থান অধিকার করবে, বাহিরের দৃশ্য চিহ্ন অন্তরের প্রসাদকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। তবু পবিত্র বস্তু ও উৎসবাদি দ্বারাই মানুষের পূজা জীবনের বাস্তব তথ্যের মধ্যে মূল স্থাপন করে এবং জীবনকেই বদলাবার শক্তি অর্জন করে। মন্দিরের উৎসব, পূজার বিভিন্ন অঙ্গ, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি অব্যক্ত প্রত্যয়েরই বিভিন্ন রূপ।

বৈদিক যুগে আর্যদের মন্দিরও ছিল না, প্রতিমাও ছিল না। দ্রাবিড় সভ্যতা প্রতিমা পূজায় উৎসাহ দেয় ও যজ্ঞের স্থানে পূজা প্রবর্তন করে। বৈদিক উপাসনা থেকে হিন্দুত্বের বিকাশের পরে মন্দির ও প্রতিমা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বৈদিক স্তোত্র কিন্তু তখনও পঠিত হত এবং ঋষিদের প্রতিভার প্রেরণায় বৈদিক ও অবৈদিক উপাদান ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়ে আগম শাস্ত্র বেদের মতই প্রামাণ্য হয়ে উঠল। মন্দিরগুলি হিন্দুধর্মের দৃশ্য প্রতীক। এরা স্বর্গের প্রতি মর্ত্যের প্রার্থনা। নির্জন ও ভাবপূর্ণ পরিবেশে তাদের অবস্থান। হিমালয়ের মহান ও পবিত্র তুঙ্গ শিখরসমূহ বড় বড় মন্দিরের প্রাকৃতিক পশ্চাদ্‌পটের কাজ করে। ঊষাকালে উপাসনার্থ নদীতীরে যাওয়ার রীতি বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত। মন্দিরগুলির রহস্যময় নিস্তব্ধতা, সম্ভ্রম ও দূরত্বের আভাসদায়ী স্বল্প আলো, গীতবাদ্য, প্রতিমা ও পূজা সবগুলিরই ভাবোদ্রেক কবার ক্ষমতা আছে। সমস্ত প্রকার কারুকলা, স্থাপত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, কাব্য, চিত্র ও ভাস্কর্য ব্যবহার করে আমাদের ধর্মের অবর্ণনীয় শক্তি অনুভব করতে শেখানো হয়, যদিও কোন কলাবিদ্যাই ধর্মের যথার্থ বাহন হতে পারে না। যারা পূজায় অংশগ্রহণ করে, তারা ঐতিহাসিক হিন্দু অভিজ্ঞতা ও যে গভীর আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ আমাদের উত্তরাধিকারের সর্বোত্তম বস্তুকে গঠিত করেছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়।

বর্তমানে কিন্তু মন্দিরগুলোর মধ্যে নির্বোধ গতানুগতিকতা ও বিরক্তিকর কার্যধারাই দেখা যাবে। কিন্তু এত আবেগপূর্ণ আকর্ষণ ও প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধার পাত্র মন্দিরগুলিকে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু তাদের ভাব ও পরিবেশকে উন্নত করতে হবে। সৌন্দর্য ও মহিমার সহজাত আকর্ষণকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। উপাসকের চোখের সামনে সুন্দর প্রতিমাগুলিকে সর্বদা রাখতে হবে। ঈশ্বরের অতীন্দ্রিয় উপস্থিতির বোধ মনে জাগ্রত করার প্রস্তুতির জন্যই মন্দিরের উৎসব অনুষ্ঠান। এইসব উৎসব আমাদের সৌন্দর্যপিপাসা তৃপ্ত করবে বলে আশা করা যায়। মন্দিরের পূজা পবিত্রতম উপচারে করা উচিত। পুষ্প গন্ধ ইত্যাদি দিয়ে অর্চনা করা উচিত কিন্তু পশুবলি বন্ধ করতে হবে। ঋগ্বেদে পর্যন্ত আছে যে ভক্তিপূর্ণ স্তুতি, যজ্ঞকাষ্ঠ ও পাক করা খাদ্য বলিদানের মতই কার্যকরী।[১] পবিত্র পূজার্চনার উদ্দেশ্য ছাড়া জ্ঞানী লোকেরা কখনও প্রাণীহিংসা করেন না।[২] অহিংসা নীতি ও মাংসভোজনে অশুচিতার ভাব থেকে নিরামিষ ভোজনের রীতি প্রচলিত হয়েছে। অশোকের প্রভাবে ও বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তারের ফলে আমিষ বর্জন পুণ্যকর্ম বলে গৃহীত হয়েছে। বহু যুগ ধরে পূর্বপুরুষেরা

---

১ অষ্টম, ১৯. ৫. অষ্টম ২৪. ২০, ষষ্ঠ, ১৬. ৪৭।

২ অহিংসান্ সর্বভূতান্যন্যত্র তির্থেভ্যঃ। ছান্দোগ্য উপনিষদ, অষ্টম ১৫. ১.

আমীষাশী হলেও বর্তমানে ভারতের বহু লোক ইচ্ছাপূর্বক আমিষ বর্জন করেছে।[১] আসলে বলিদানের অর্থ হচ্ছে, ভগবানকে নিজের সমস্ত অর্পণ করা এবং ঈশ্বরের পূজো মনে করে নিজের কর্তব্য করা। ভাগবতে আছে, "হে ব্রাহ্মণ, ত্রিতাপ থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য ভগবান, ঈশ্বর, ব্রহ্মকে সমস্ত কর্ম সমর্পণ কর।"[২]

বহুদিন ধরে মন্দিরগুলি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে উঠেছে। বহির্জগতে প্রকাশের পূর্বে রূপকাররা সেখানে তাদের সর্বোত্তম রচনা উৎসর্গ করেছে, কবিরা তাদের কবিতা পাঠ করেছে, গায়করা গান করেছে। সৌন্দর্যের সমস্ত পবিত্র প্রতীক আমাদের শাশ্বতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মন্দিরগুলো সাধারণের প্রতিষ্ঠান হবে এবং সকলেরই তাতে প্রবেশাধিকার থাকবে। মন্দির থেকে জীবিকা উপার্জনকারী, প্রায়শঃ স্থূল ও অর্থগৃধ্নু পাণ্ডাদের বিদ্যার্জন করতে ও মার্জিত হতে উৎসাহিত করতে হবে। ভগবদ্ভক্তি জাগাবার জন্য এবং মন ও আচরণের পবিত্রতা রক্ষার জন্য মন্দিরের পূজার ব্যবস্থা। নারীদের মন্দিরে উৎসর্গীকরণের ফলে মনে সদ্ভাবের উদয় হবে এমন আশা করা ভুল।

বাড়ীতে পারিবারিক পূজোয় ধর্মভাব বজায় রাখা যায়। এইসব পূজোয় নারীরাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। মন্দিরে উপাসনার সময় ও ঋতু উৎসবে বহু লোকের ভিড় হয়। ভাগবতরা, শিক্ষিত কথাকার ও গায়কেরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে মহাকাব্য পুরাণাদির বাণী প্রচার করে; সন্ন্যাসী সম্প্রদায়েব আচার্যেরা ঐতিহ্য রক্ষা করেন ও তরুণদের শিক্ষা দেন। অবতারেরা হিন্দুধর্মের মুখ্য স্তম্ভস্বরূপ। হঠাৎ তাঁদের আবির্ভাব, প্রামাণ্য কোন নজীর নিয়ে তাঁরা আসেন না। ভারতের সর্বত্র ও সকল যুগে এইরূপ অবতাররা বার বার আবির্ভূত হয়েছেন। উপনিষদের ঋষি ও বুদ্ধদেব থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ ও গান্ধী পর্যন্ত এই ধারা চলেছে।

বহুবিধ উপবাস, জাগরণ, খাদ্যপানীয় সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিধিনিষেধ আত্মসংযমের সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মনু বলেছেন, "মাংস ভোজন, মদ্যপান, মৈথুন অস্বাভাবিক নয়, প্রাণীমাত্রই এসব চায়। তবে এসব বর্জন করলে সুফল পাওয়া যায়।"[৩] মহাভারতে আছে, "বাসনা পূরণ করে কখনও বাসনার তৃপ্তি হয় না বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন অগ্নি অধিকতর প্রজ্বলিত হয়, তেমনি বাসনা যত পূরণ করা যায় ততই বেড়ে যায়।"[৪] হিন্দু ঋষিরা অন্তরের পবিত্রতার জন্য ধর্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে গেছেন। গোতম তাঁর ধর্মসূত্রে সৎ লোকেদের আচরণের জন্য চল্লিশ রকমের পবিত্র আচারের কথা বলেছেন। তিনি

---

১ মনুর মতে প্রাণসংকটে মাংসভোজনে পাপ নেই। পঞ্চম, ২৭. ৩২।

২ এতৎ সংসূচিতম্ ব্রহ্মণ তাপত্রয়চিকিৎসিতম্
যদ্ ঈশ্বরে ভগবতি কর্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্।

৩ ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

৪ ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে। প্রথম ৭৫. ৪৯

বলেন, "এই চল্লিশটি সদাচার : তারপর আত্মার আটটি সদ্‌গুণ। এরা হচ্ছে সর্বভূতে করুণা, ধৈর্য, সন্তোষ, পবিত্রতা, নিষ্ঠা, সৎচিন্তা, লোভ ও হিংসা বর্জন। যাঁরা সদাচারগুলি পালন করেছে অথচ এই সদ্‌গুণগুলির অধিকারী নন, তাঁরা ব্রহ্মের সহিত মিলিত হতে পারেন না, কিন্তু যাঁরা একটিমাত্র সদাচার পালন করেছেন অথচ সবগুলি সদ্‌গুণ যাঁর আছে, তাঁর ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে।"[১] পুণ্য বলতে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বোঝায়। পুণ্যাচরণ সকলেরই করা উচিত।[২]

তীর্থযাত্রায় নৈতিক দিকটাই বড়। বীর মিত্রোদয় মহাভারত থেকে শ্লোক উদ্ধার করে দেখিয়েছে যে লোভী, শঠ, নিষ্ঠুর, দাম্ভিক ও ঐহিক সুখ-সর্বস্ব লোক সমস্ত তীর্থে স্নান করলেও শুদ্ধ হয় না। সে পাপী ও অপবিত্র থেকে যাবে। দেহের ময়লা ধুয়ে ফেললেই পবিত্র হওয়া যায় না ; অন্তরের গ্লানি দূর হলে তবেই পবিত্র হওয়া যায়।[৩] তীর্থস্থান পবিত্র, কারণ ভগবদ্ভক্ত লোক সেখানে বাস করেন।[৪] গঙ্গাস্নানে সকল পাপ ধুয়ে যায় এইরকম কথা আছে কিন্তু গঙ্গা ধর্ম প্রবাহেরই প্রতীক।"[৫] মহাভারতে আছে, "হে নরোত্তম, সত্যভাষণে যা পুণ্য হয় সমস্ত বেদ পাঠ বা সমস্ত তীর্থনীরে স্নান করলেও তার ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"[৬] আবার "এই বিরাট বিশ্বই ভগবানের মন্দির, নির্মল হৃদয়ই তীর্থ আর শাশ্বত সত্যই অবিনাশী শাস্ত্র।"[৭] জীবনতরী পার হওয়ার একমাত্র উপায় নৈতিক বিধি

১ অষ্টম।

২ এতে সর্বেষাং ব্রাহ্মণাদ্য চণ্ডালং ধর্মসাধনম্।

যাজ্ঞবল্ক্যব উপর মিতাক্ষরাব টীকা, ষষ্ঠ, ২২

৩ যো লুব্ধঃ পিশুনঃ ক্রূরো দাম্ভিকো বিষয়াত্মকঃ
সর্বতীর্থেস্বপি স্নাতঃ পাপো মলিন এব সঃ
ন শরীরমলত্যাগং নবো ভবতি নির্মলাঃ
মানসে তু মলে ত্যক্তে ভবত্যন্ত সুনির্মলঃ।

৪ ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্থভূতাঃ স্বযং বিভোঃ
তীর্থীকুর্বন্তিতীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা—ভাগবত, প্রথম, ১৩. ১০.

৫ সা হি ধর্মঃ দ্রবঃ স্বয়ং।—যম, স্মৃতিচন্দ্রিকায় উদ্ধৃত।

৬ সর্ববেদাধিগমনং সর্বতীর্থাবগাহনং
সত্যস্যৈব চ রাজেন্দ্র কলাং নার্হতি ষোড়শীম্।

৭ সুবিশালমিদং বিশ্ব পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতস্ সুনির্মলো তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।

মহাভারতেও আছে।

সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতাহি সাধবঃ,
কালেন ফলতে তীর্থং সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ।
নাম্ভোময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ,
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ।

মেনে চলা। "অন্যের বস্তু হরণ কোরো না, অন্যের মনে আঘাত কোরো না। সর্বদা ভগবচ্চিন্তা করবে।"[১]

বৈদিক যজ্ঞের সঙ্গে শ্রাদ্ধের তফাৎ আছে, যদিও পিতৃযজ্ঞ থেকেই শ্রাদ্ধের উৎপত্তি। গৌতম[২] ও আপস্তম্ব[৩] —এ শ্রাদ্ধকৃত্য বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। শ্রাদ্ধ পিতৃপুরুষের সরল পূজার স্থান অধিকার করেছে। শ্রাদ্ধের অধিকারীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আগে তিন পুরুষের জন্য ব্যবস্থা ছিল, মনুর সময় থেকে আরও তিন পুরুষ যোগ হল। সাক্ষাৎ তিন পুরুষ আর আগের তিন পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে ; পূর্বলিখিতবা পিণ্ডে অধিকারী, শেষোক্তরা পিণ্ডাংশ মাত্রে অধিকারী। মনু শুধু পিতার পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য ও তার শিষ্যেরা বিধান দিয়েছেন মাতার ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষ পর্যন্ত দৌহিত্রদের কাছ থেকে পিণ্ডের অধিকারী।[৪] শ্রাদ্ধ পিতৃ-পুরুষের নিকট শ্রদ্ধা নিবেদন। আমরা দেখাতে চাই যে আমরা তাঁদের স্মরণ করি, তাঁদের শ্রদ্ধা করি, এবং তাঁদের ক্ষুধা তৃষ্ণা তৃপ্তির জন্য প্রতীক খাদ্য পানীয় নিবেদন করি। ক্রিয়াটি মৃতদের সহিত সংযোগ স্থাপনের কল্পনাপ্রসূত।

গোসংরক্ষণ যদি ধর্মীয় কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে তো তা থেকে এই বোঝায় যে আমাদের বহু শতাব্দীর ঐতিহ্য নষ্ট হয় নি। শিকারীর যাযাবর বৃত্তির অবসান হয়ে যখন কৃষিজীবন আরম্ভ হল, তখন খাদ্য সংগ্রাহকের স্থান খাদ্যোৎপাদক অধিকার করলো, তখন দুধ দেয় বলে এবং কৃষিকাজে লাগে বলে গরু গৃহস্থের কাছে মূল্যবান হয়ে উঠল। আজও নিরামিষাশী হিন্দুদের কাছে দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য খুব মূল্যবান। গরু ক্রমশঃ মানুষের ধাত্রীমাতা বলে আদৃত হল। অতি প্রাচীন কাল থেকে গোরক্ষা ধর্মানুশাসনের অন্তর্গত।[৫] যতদিন ভারতের বেশীর ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল থাকবে এবং যান্ত্রিক কৃষিপদ্ধতি যতদিন না প্রযুক্ত হবে, ততদিন গোসংরক্ষণ প্রয়োজন বলে মানতে হবে, কিন্তু এর সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। গরু প্রাণীজগতের প্রতীক এবং গরুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রাণীজগতের প্রতিই শ্রদ্ধা। অথচ হিন্দুভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী হলেও বর্তমান ভারতে জীবজন্তুদের কষ্ট সম্বন্ধে ঔদাসীন্য এবং শিকার ও বলিদানের জন্য প্রাণীহিংসা খুব দেখা যায়। বহু হিন্দু রাজারা ও সাধারণ লোকেরা এর জন্য কিছুমাত্র মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করে না।

---

১ কস্যচিৎ কিমপি নো হরণীয়ম্, মর্মবাক্যমপি নোচ্চারণীয়ম্,
শ্রীপতেঃ পদযুগং স্মরণীয়ম্ লীলয়া ভবজলং তরণীয়ম্।

২ পঞ্চদশ।

৩ দ্বিতীয়।

৪ "পিতৃপুরুষদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর, মাতার ঊর্ধ্বতন পুরুষদের পিণ্ড দেওয়া উচিত।" প্রথম ২৪.২

৫ অদৌ মাতা গুরোঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নিকা
ধেনুর্ধাত্রী তথা পৃথিবী সপ্তৈতা মাতরাঃ স্মৃতিঃ।—চাণক্য

বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতা

বর্ণভেদ ব্যক্তিগত প্রকৃতির[১] উপর প্রতিষ্ঠিত কাজেই সেগুলি অনড় নয়। প্রথমে একই বর্ণ ছিল। আমরা হয়—সবাই ব্রাহ্মণ[২] বা সবাই শূদ্র ছিলাম। স্মৃতিতে আছে যে লোকে শূদ্র হয়েই জন্মায়, পরে সংস্কারের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়।[৩] সামাজিক প্রয়োজনে ও ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ব্যক্তিদের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে ভাগ করা হত। ব্রাহ্মণেরা পুরোহিত। তাদের সম্পত্তিও থাকে না, শাসনাধিকারও থাকে না। তারাই তত্ত্বজ্ঞানী ও সমাজের বিবেক স্বরূপ। ক্ষত্রিয়েরা শাসক, তাদের মূল ভাব জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা। বৈশ্যেরা ব্যবসায়ী ও শিল্পী, প্রযুক্তিবিদ, তাদের লক্ষ্য নিপুণতা। শূদ্রেরা প্রোলিটেরিয়েট, গতানুগতিক শ্রমিক। তারা কাজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে মাথা ঘামায় না, আদেশমত কাজ করে যায়, নিজস্ব অবদান সামান্যই রাখে। তারা নির্দোষ আবেগময় জীবনযাপন করে ও পরম্পরাগত প্রথায় বিশ্বাসী। বিবাহ, সন্তানোৎপাদন ও অন্যান্য ব্যক্তিগত সম্পর্কজাত পারিবারিক দায় মেটাতে পারলেই তাদের আনন্দ। সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয়, আর্থিক ও শৈল্পিক প্রভাবগুলির ভারপ্রাপ্ত বৃত্তিভিত্তিক সংঘগুলিই বর্ণ নামে অভিহিত। আর্য, দ্রাবিড়, গঙ্গা উপত্যকার পূর্ব থেকে আগত মোঙ্গল জাতিসমূহ, হিমালয় পারের পহ্লব, শক, হুন প্রভৃতি জাতি সবাই হিন্দু সমাজে আশ্রয় পেয়েছে। হিন্দুরা বহুবিধ লোককে দলের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের প্রাচীন ধর্মের অনুষ্ঠান ও ঐতিহ্য কিছু কিছু অদলবদল করে নূতন ধর্মে সংশোধিত আকারে বজায় রেখেছে। মহাভারতে আছে, ইন্দ্র সম্রাট মান্ধাতৃকে যবনাদি সমস্ত বিদেশীদের আর্যপ্রভাবে আনতে আদেশ দিয়েছিলেন।[৪] হিন্দু সমাজের মধ্যে ক্রমবিকাশের সকল স্তরের এত জাতির নিদর্শন আছে যে তা দেখে বিভ্রান্ত হতে হয়। ঋগ্‌বেদের যুগে আর্য ও দাসের মধ্যে বিভেদ ছিল, আর্যদের মধ্যে কোন স্পষ্ট ভেদ ছিল না। "ব্রাহ্মণ" রচনার সময় জন্মগত চতুর্বর্ণ বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিল্পকলা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পেশাগত বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত হতে লাগলো। স্মৃতিশাস্ত্রে

১ সত্ত্বাধিকো ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্তু রজোধিকঃ
তমোধিকো ভবেদ বৈশ্যো গুণসাম্যাত্তু শূদ্রতা।

২ বৃহদারণ্যক উপ, প্রথম ৪. ১১-৫। মনু, প্রথম. ৩১।

মহাভারত, দ্বাদশ, ১৮৮ও দ্রষ্টব্য

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মণমিদং জগৎ
ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কর্মভির্বর্ণতাং গতম্।

৩ জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।

৪ শান্তিপর্ব, ৬৫

চতুর্বর্ণের অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ দ্বারা নানা সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তির বর্ণনা আছে। বৈদিক আর্যরা যখন দেখতে পায় যে বহু বিভিন্ন বর্ণ ও জাতি, বিবিধ গোষ্ঠী ও শ্রেণী দ্বারা গঠিত এক বিষম জনতা নানাপ্রকার দেবতা ও উপদেবতার পূজা করছে, নানারকম অভ্যাস ও আচরণে রত, উপজাতীয় ভাবে পূর্ণ, তখন তারা চতুর্বর্ণ গ্রহণ করে তাদের সকলকে অঙ্গীভূত করার চেষ্টা করল। আদিম জাতীয় বিভেদের স্থলে চতুর্বর্ণের প্রতিষ্ঠা হল। এই শ্রেণীবিভাগ সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে গঠিত। মানুষের মধ্যে আত্মার অবস্থিতির স্বীকৃতি, হিন্দুধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ এবং এই দিকে থেকে সকল মানুষই সমান। ব্যক্তি-বৈচিত্র্যই বর্ণভেদের কারণ, আর নিঃস্বার্থ সেবা দ্বারা বর্ণভেদ অতিক্রম করাই জীবনের উদ্দেশ্য। বর্ণভেদ প্রথা সমস্ত মানবজাতির পক্ষেই প্রযোজ্য। মহাভারতে দেখি যে যবন (গ্রীক), কিরাত, দরদ (দর্দ), চীনা, শক, পহ্লব (পার্থীয়ান), শবর (দ্রাবিড় পূর্ব আদিম জাতি) এবং আরও অনেক অহিন্দুদের চারিবর্ণের কোন না কোনটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[1] এইসব বিদেশী জাতিরা হিন্দু সমাজভুক্ত হয়েছিল। বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিদেশীদের এই ধরনের কিছু কিছু সামাজিক পরিবর্তন দ্বারা হিন্দু সমাজভুক্ত করা হচ্ছে। বিদেশীরা যতদিন সমাজের সাধারণ ঐতিহ্য ও বিধিনিয়ম মেনে নিয়েছে ততদিন তাদেরও হিন্দু বলা হয়েছে। নন্দ, মৌর্য, গুপ্ত প্রভৃতি সাম্রাজ্য-স্থাপয়িতাবা গোঁড়ামতে নীচবর্ণের। গুপ্ত সম্রাটরা ম্লেচ্ছ লিচ্ছবি বংশে বিবাহ করেছিলেন। পরবর্তী কালে হিন্দুরা ইউরোপীয় ও আমেরিকান নারীদের বিবাহ করেছে। বিশেষ জাতীয় প্রভেদ সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বিবাহ সন্তোষজনকই হয়েছে। সামাজিক পরিস্থিতি আর একটু অনুকূল হলে, আরও সন্তোষজনক হতে পারে।[2] বর্ণাশ্রম প্রথা প্রথমতঃ ভারতের বিচিত্র জন-সমাজকে পরে সমস্ত পৃথিবীকে এক সাধারণ আর্থিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক বাঁধনে বাঁধবার উদ্দেশেই কল্পিত হয়েছিল। নির্দিষ্ট কাজ ও কর্তব্য

---

১ শান্তিপর্ব, ৬৫। আর মনু, দশম ৪৩-৪৪ও দ্রষ্টব্য।

২ অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক লর্ড ব্রাইস ব্রেজিল সম্বন্ধে বলেন, "আফ্রিকার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের পর্তুগীজ উপনিবেশগুলি ছাড়া, ব্রেজিলই একমাত্র দেশ যেখানে আইন ও প্রথাগত বাধা বিনা ইউরোপীয় ও আফ্রিকার জাতিদের মিশ্রণ চলেছে। মানবিক সাম্য ও সৌভ্রাত্রের নীতি চমৎকার কাজ করছে। শ্রেণী সংঘর্ষ নেই বললেই হয়। শ্বেতকায় লোকেরা নিগ্রোদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে না বা তাদের 'লিঞ্চ' করতে ছোটে না ; আমি দক্ষিণ আমেরিকার কোথাও কোন 'লিঞ্চ' করার কথা শুনিনি, দু-একটা যা হয়েছে তা রাষ্ট্রবিপ্লবের আনুষঙ্গিক হিসাবে। নিগ্রোদের ঔদ্ধত্য বাড়ছে এরকম নালিশ শোনা যায় না এবং অশিক্ষিত লোক, যাদের নীতি ও সম্পত্তি সম্বন্ধে খুব কম জ্ঞান, তাদের মধ্যে অপরাধের যতখানি প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তার থেকে বেশী নিগ্রোদের মধ্যে নেই। ব্রেজিলের ইউরোপীয় জনসংঘের উপর এই বর্ণসঙ্করের শেষ পর্যন্ত কি হবে তার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সাহস করি না। তবে দু-একটা যা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দেখা যাচ্ছে, তাতে যে ধীশক্তির মান কমে যাবে এমন ভাববার কারণ নেই।" South America, Observation and Impressions, 477 pp. 480.

আরোপ করে, তৎসংশ্লিষ্ট অধিকার ও সুবিধা দিয়ে আশা করা হয়েছিল যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে নিজ নিজ কাজ করে যাবে এবং জাতীয় ঐক্যে সিদ্ধ হবে। বৃত্তিগত দক্ষতা ও মেজাজ অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষকেই এই ছাঁচে ফেলা যাবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। প্রত্যেক মানুষ তার বিকাশের নিয়ম ধরে চলতে পারবে এই ছিল বর্ণধর্মের মূল কথা। পরধর্ম অনুকরণে শক্তিক্ষয় না করে নিজের নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়াই শ্রেয়।

যদিও এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল, বংশ ও শিক্ষার যথাযথ প্রভাবে শ্রেণীসমূহের মধ্যে প্রয়োজনীয় মনোভাব ও ঐতিহ্য গড়ে তোলা, তবু ব্যাপারটার মধ্যে অনমনীয় মনোভাব ছিল না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষ বা গোষ্ঠী বিশেষ বর্ণান্তর লাভ করেছে তার উদাহরণ আছে। বিশ্বামিত্র, অজামীঢ় ও পুরামিঢ় ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হয়েছিলেন, এমন কি বৈদিক স্তোত্রও রচনা করেছিলেন। যাস্ক তাঁর নিরুক্ত-এ উল্লেখ করেছেন যে শান্তনু ও দেবাপি নামে দুই ভাইয়ের একজন ক্ষত্রিয় রাজা হ'ল আর একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত হল। ক্রীতদাসী ইলুষার পুত্র কবষকে যজ্ঞে ব্রাহ্মণ যাজকের পদে বৃত করা হয়।[১] জনক ক্ষত্রিয় হয়ে জন্মালেও তাঁর গভীর জ্ঞান ও সাধুচরিত্রের জন্য ব্রাহ্মণ হতে পেরেছিলেন।[২] ভাগবতে আছে যে ধৃষ্ট নামে ক্ষত্রিয় উপজাতিকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করা হয়েছিল। জাত্যুৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা আছে। শূদ্র হলেও সৎকার্য করলে ব্রাহ্মণ হতে পারা যেত।[৩] ব্রাহ্মণ বংশে জন্মালেই বা পূজার্চনা, পাঠাদি বা পারিবারিক সম্পর্কের জন্য আমরা ব্রাহ্মণ হই না, আমাদের আচরণই ব্রাহ্মণত্বের হেতু।[৪] শূদ্র হয়ে জন্মেও আমরা উচ্চতম পর্যায়ে উঠতে পারি।[৫]

মানুষ সর্বদাই ভবমান। আসলে মানুষ সচল, নিশ্চলতার মধ্যে স্থিতিশীল নয়। আগে সামাজিক গতি সুস্থ ছিল এবং অনেকদিন ধরে বর্ণগুলি বংশগত দৃঢ়বদ্ধ জাতিতে পরিণত হয় নি। তবে প্রাচীন কাল থেকেই বৃত্তিগত বিভেদ কার্যকরী হয় নি। মেগাস্থিনিস বর্ণিত বর্ণভেদ ভিন্ন রকমের। তাঁর মতে রাষ্ট্রনায়ক ও রাজপুরুষরা সর্বোচ্চ, আর শিকারী ও বন্য মানুষরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে।

---

১ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয়, ১৯।

২ রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৫১-৫৫।

৩ এভিস্তু কর্মভির্দেবী শুভৈরাচরিতৈস্তথা
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি, বৈশ্যাঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ।

৪ ন যোনির্ণাপিসংস্কারো নাশ্রুতম্ ন চ সন্ততিঃ
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণং।

আবার, সর্বোয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন চ বিধীয়তে
বৃত্তিস্থিতস্তু শূদ্রোপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি। অনুশাসনপর্ব।

৫ শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সদ্‌গুণান্ উপতিষ্ঠতঃ, বৈশ্যত্বং লভতে ব্রাহ্মং ক্ষত্রিয়ত্বং তথৈব চ, আর্জবে বর্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমভিজায়তে। অরণ্যপর্ব।

পতঞ্জলি ব্রাহ্মণ রাজা ও মনু শূদ্র -রাজার উল্লেখ করেছেন। এখনকার মতই আলেক্‌জাণ্ডারের সময়েও ব্রাহ্মণ সৈনিক ছিল। প্রথমে যে ভাবেই কল্পিত হয়ে থাক, বর্ণ থেকে একটা বৃথা গর্বের ভাবের উৎপত্তি হয় ও নিম্নবর্ণের লোকদের হীন করা হয়। রামায়ণে রাম শম্বূককে ব্রাহ্মণোচিত তপস্যা করার জন্য হত্যাই করেন।[১]

মনু শূদ্রদের সম্বন্ধে যে সব অবাঞ্ছিত উক্তি করেছেন, তার উদ্দেশ্য বোধ হয় বৌদ্ধবিরোধী। বৌদ্ধরা শূদ্রদের সমস্ত রকম বিদ্যা, ধর্ম ও সন্ন্যাসের অধিকারী করেছিলেন। মনু ঐ সমস্ত শূদ্রেরা দ্বিজদের ভাবভঙ্গী নকল করছে বলে মনে করতেন।[২] মনু ধর্মশাস্ত্র পাঠ করার অধিকার শুধু ব্রাহ্মণদের দিয়েছেন, শঙ্কর কিন্তু সকল জাতিরই সে অধিকার স্বীকার করেছেন। প্রাচীন মতে যখন রীতিনীতির বাঁধন কঠিন হয়ে উঠল, তখন জৈন ও বৌদ্ধরা তার প্রতিবাদ করল, কেননা তারা মৈত্রী বা মানবিক সৌভ্রাত্র নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। কাজেই যারা বিশেষ ভাবে তাদের শক্তির পূর্ণ বিকাশের সুযোগে বঞ্চিত হয়েছিল তারা নূতন ধর্মে দীক্ষিত হল। হিন্দু আচার্যরা বর্ণবিভেদের নিন্দা করলেন। বজ্রসূচিকোপনিষদ বলেন, অব্রাহ্মণ নারীর গর্ভজাত অনেক সন্তান ব্রাহ্মণ সাধুর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন।[৩] কিন্তু আবার বর্ণ সম্বন্ধে গোঁড়ামি ও সংস্কার প্রবল হয়ে উঠল এবং তাতে যাদের অসুবিধা হল তারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করল। হিন্দু সমাজের মুমূর্ষু জীবন ও জ্যোতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য রামানন্দ, চৈতন্য, কবীর, নানক, দাদু ও নামদেবের মত মানবমৈত্রীর উদ্গাতাদের আবির্ভাব হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার উদার প্রভাবে বর্ণপ্রথা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে ও বিবাহসম্বন্ধীয় বিধিনিষেধ শিথিল হয়ে আসছে। রামমোহন রায়, দয়ানন্দ সরস্বতী ও গান্ধী আদি মহাপুরুষরা এই নীরব বিপ্লবে সহায়তা করেছেন।[৪] প্রাচীন শাস্ত্র থেকে তাঁরা অনেক সমর্থন পেয়েছেন। বেদজ্ঞানের জন্য লোককে বিপ্র বলা হত আর ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বলা হত ব্রাহ্মণ।[৫] মহাভারতের এক বিখ্যাত শ্লোকে আছে যে আমরা সবাই ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মাই তারপর আচরণ ও বৃত্তিদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণভুক্ত

১ রঘুবংশে (পঞ্চদশ, ৪২. ৫৭) কালিদাস এবং ভবভূতি উত্তররামচরিতে তাকে স্বর্গবাসী করেছেন।

২ শূদ্রাংশ্চ দ্বিজলিঙ্গিনঃ।

৩ জাত্যন্তরেসু অনেকজাতিসম্ভবাৎ মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি ব্যাস কৈবর্তকন্যায়াম বশিষ্ঠ উর্বশ্যাং…অগস্ত্যঃ কলসজাত ইতি শ্রুতত্বাৎ।

৪ এমন কি হিন্দু মহাসভাও প্রস্তাব করেন, "যেহেতু বর্তমানে প্রচলিত জন্মগত বর্ণভেদ প্রথা চিরন্তন সত্য ও নীতির বিরোধী, যেহেতু ইহা হিন্দুধর্মের মূল ভাবের বিপরীত, যেহেতু ইহা মানবজাতির সাম্য সম্বন্ধীয় মৌলিক অধিকারকে অগ্রাহ্য করে…এই নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভা এই প্রথার আপোসহীন বিরোধিতা ঘোষণা করছে এবং হিন্দু সমাজকে সত্বর এই প্রথা বর্জন করতে আহ্বান করছে।

৫ বেদপাঠেন বিপ্রস্তু ব্রহ্মজ্ঞানাৎ তু ব্রাহ্মণঃ।

হই।[১] সমস্ত পৃথিবী এক বর্ণ ছিল, আচরণ দ্বারা চার বর্ণ স্থাপিত হল।[২] আদিবাসীদের হিন্দুসমাজে ভুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া বহুদিন ধরে ধীরে ধীরে ও অগোচরে চলছে। উচ্চতর আদর্শের আকর্ষণই এই প্রক্রিয়ার কারণ। এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত ও সফল করার জন্য উচ্চবর্ণের হিন্দুদের তাদের স্বাতন্ত্র্য ও ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করতে হবে। বর্ণভেদের জন্য হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যবোধের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আঙ্গিক সমগ্রতা অর্জনের জন্য ও সাধারণ কর্তব্যবুদ্ধি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতি সম্পর্কীয় ভাব বর্জন করতে হবে। বর্জনীয়তা, হিংসা, লোভ ও ভয়কে আশ্রয় করে যে সব অসংখ্য জাতি ও উপজাত আছে তা থেকে মুক্ত হতে হবে।

দৈহিক পবিত্রতা (শৌচম্) অন্তরশুদ্ধির উপায়। পরিচ্ছন্নতা দৈবী ভাবের সহায়ক। আমাদের শুচিতার ধারণা আরও বৈজ্ঞানিক হওয়া দরকার। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা পরস্পরের রান্না খাদ্য খেতেন। মনু বলেন, দ্বিজরা শূদ্রদের পাক করা খাদ্য খাবেন না।[৩] কিন্তু ক্রীতদাস, পারিবারিক মিত্র এবং কৃষিকার্যের ভাগীদারদের পাক করা খাদ্য খাওয়া যায়।[৪] আমাদের কালে এসব ভেদ নিরর্থক, বিরক্তিকর এবং সামাজিক অবাধ গতি ব্যাহতকারী। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণরাও মাংস ভক্ষণ কবত। প্রাচীন বৈদিক ধর্মে পাঁচ রকমের প্রাণী বলিদান করার কথা আছে, ছাগল, ভেড়া, গরু বা ষাঁড় এবং ঘোড়া।[৫] বৌদ্ধ, জৈন ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে এই প্রথা নিন্দনীয় হয়ে উঠল। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য মাংস ভক্ষণের বিরুদ্ধে এত রকম বিধিনিষেধ আরোপ করেন যে ফলতঃ তাঁরা মাংস ভক্ষণে নিরুৎসাহিত করেন। কোন কোন দেশে (বাংলা, কাশ্মীর) এখনও পর্যন্ত ব্রাহ্মণরা মাংস ভক্ষণ করেন, আবার কোন কোন দেশে (গুজরাট) নিম্নবর্ণের লোকেরাও মাংস ভক্ষণ থেকে বিরত থাকেন। আমাদের অভ্যাস নিষেধ-নিয়ন্ত্রিত না হয়ে শুচিতা-নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে হবে। অস্পৃশ্যতা অনেক রকমের হতে পারে, বর্ণ সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘন করে, বিশেষ বৃত্তি গ্রহণ করে, অথবা কয়েকটি অনার্য ধর্ম গ্রহণ করে। অস্পৃশ্যতার পাপ বড়ই গ্লানিকর ও বর্জনীয়। ভগবদ্‌গীতা গুণকর্ম অনুযায়ী চার বর্ণের কথা বলেছেন,[৬] আর মানুষকে দৈব ও আসুর দুই ভাগে ভাগ কবেছেন।[৭] মনু চার বর্ণের কথাই

---

১ জনপ্রিয় শ্লোক—অনাদাবিহ সংসারে দুর্বারে মকরধ্বজে কুলে চ কামিনীমূলে কা জাতি পরিকল্পনা।

২ একবর্ণমিদং পূর্বং বিশ্বমাসীদ্ যুধিষ্ঠির
কর্মক্রিয়াবিশেষেণ চাতুর্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্। অরণ্যপর্ব।

৩ চতুর্থ, ২৩২, গৌতম, সপ্তদশ, প্রথম।

৪ চতুর্থ, ২৫৩, আপস্তম্ব, প্রথম, ১, ৮, ৯, ১৩, ১৪।

৫ ১ম, ১৭, ৩০, ৩৭।

৬ চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

৭ ষোড়শ, ৬।

বলেছেন, পঞ্চম বর্ণের উল্লেখ করেন নি।[১] হরিজনদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ অনুচিত। শঙ্কর "অস্পৃশ্য"কে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে তাঁকে বলা হয়েছিল যে এ কাজ অনুচিত।[২] পূজার জায়গা, সাধারণ কূপ ও শ্মশানঘাট, হোটেল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত। ভারতীয় নৃপতিদের শাসিত রাজ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট সংস্কার সাধিত হয়েছে।[৩] আজকের দিনে যা কিছু করা হচ্ছে তাতে ন্যায় বা বদান্যতার প্রশ্ন নেই, এ সবই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমাদের যা করা সম্ভব তা সমস্ত করলেও, আমাদের অপরাধের অল্প অংশেরই প্রায়শ্চিত্ত হবে।

সংস্কার

প্রধান সংস্কারগুলি হল (১) জাতকর্ম (২) উপনয়ন বা আধ্যাত্মিক জীবনে দীক্ষা ; (৩) বিবাহ ; (৪) অন্ত্যেষ্টি বা মরণোত্তর অনুষ্ঠান। বাকীগুলি যেমন নামকরণ, অন্নপ্রাশন বিদ্যারম্ভ বা হাতে-খড়ি জনপ্রিয় ধরনের সংস্কার। এইসব অনুষ্ঠানে শিশুদের প্রতি স্নেহ দেখাবার সুযোগ হয়। উপনয়ন ছাড়া বাকী অনুষ্ঠানগুলি বিভিন্ন আকারে সমস্ত হিন্দুর প্রতিপাল্য। উপনয়ন আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম

---

১ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণ দ্বিজাতয়ঃ, চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ। দশম, ৪।

২ অন্নময়াদন্নময়ম অথবা চৈতন্যমেব চৈতন্যাদ্
দ্বিজবর দূরীকর্তুং বাঞ্ছসি কিং ব্রূহি গচ্ছ গচ্ছেতি।

লণ্ডনে গোলবৈঠকে (১৯৩১) গান্ধী বলেছেন, "এই কমিটি (সংখ্যালঘু কমিটি) এবং সমস্ত জগৎ জানুক যে আজকের দিনে একদল হিন্দু সংস্কারক আছেন যাঁরা মনে করেন যে অস্পৃশ্যতা ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুদেরই লজ্জার কারণ, অস্পৃশ্যদের তাতে লজ্জা নেই, এবং এই কলঙ্ক দূর করার জন্য তাঁরা বদ্ধপরিকর। আমার সাধ্যমত জোর দিয়ে বলতে চাই, আমাকে একাই যদি ওর বিরোধিতা করতে হয়, তাও আমি প্রাণ দিয়ে করব।"

৩ বরোদার পরলোকগত মহারাজা গায়কওয়াড় অনেক ভাল ভাল সংস্কার প্রবর্তন করে গেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে রাজ্য নিয়ন্ত্রিত মন্দিরগুলিতে অন্ত্যজ সমেত সমস্ত শ্রেণীর হিন্দুর প্রবেশাধিকার থাকবে। ১৯৩৬ সালের ১২ নভেম্বর ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা ঘোষণা করেছেন, "আমাদের ধর্মের সত্য ও সার্থকতায় গভীরভাবে নিশ্চিত হয়ে বিশ্বাস করি যে এই ধর্ম ঐশ্বরিক উপদেশে চালিত এবং সর্বাঙ্গীণ সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে গঠিত। এ কথাও জানি যে এই ধর্ম শতাব্দীর পর শতাব্দী পরিবর্তিত অবস্থার প্রয়োজনে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। আমার হিন্দু প্রজারা যাতে জাতিকুলসম্প্রদায় নির্বিশেষে হিন্দুধর্মের আশ্বাস ও সান্ত্বনা থেকে বঞ্চিত না হয়, সেইজন্য আমি স্থির করেছি এবং এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি ও আদেশ দিচ্ছি যে মন্দিরের অনুষ্ঠানাদি ও তাদের যথাযথ পবিত্রতা রক্ষার জন্য যে সমস্ত বিধি ও নিয়ম করা হবে তা মেনে নিলে সরকারী কোন মন্দিরে জন্ম বা ধর্মের জন্য কোন হিন্দুর প্রবেশ নিষিদ্ধ করা যাবে না।"

বোঝায়। প্রথম জন্ম একতা ছিন্ন করে, প্রয়োজনের বশীভূত ও স্বতন্ত্র করে, দ্বিতীয় জন্ম হল ঐক্য ও মুক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম। প্রথম জন্ম থেকে শুধু বহির্জগতের অস্তিত্ব পাই, কিন্তু দ্বিতীয়টি থেকে অন্তরের গভীর স্তরের জীবনের সন্ধান পাই। উপনয়ন সংস্কারের উৎস ভারত-ইরাণীয়। আর তার সার হ'ল পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা। মন্ত্রটি সবিতৃ (সূর্য)[১] দেবতার কাছে প্রার্থনা কেননা তাঁকেই বিশ্বের উৎস ও চালক বলে কল্পনা করা হয়। সব সত্যই প্রতীকধর্মী। জীবন ও আলোকের প্রত্যক্ষ উৎস হিসাবে অন্য কোন কল্পিত প্রতীকের চেয়ে সূর্যই দৈবী ভাবের বেশী দ্যোতক। দৈবী শক্তির চাক্ষুষ প্রকাশের মধ্যে সূর্যই সর্বাগ্রগণ্য। মন্ত্রটির অর্থ "স্বর্গীয় আলোকের মহিমময় জ্যোতির আমরা ধ্যান করি, তিনি যেন আমাদের ধীশক্তিকে অনুপ্রেরিত করেন।"[২] উপনিষদের যুগে উপনয়ন সংস্কার খুব সবল ছিল। শিষ্য গুরুর কাছে সমিধ হাতে যেত এবং ব্রহ্মচর্য পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করত। অজিন পরিধান, উপবাস এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান যখন বৈদিক আর্যরা বনে বাস করতেন তখন থেকে চলে আসছে। যখন সত্যকাম জবালা হরিদ্রুমত গৌতমের কাছে সত্য কথা বলে, তখন তিনি শুধু বলেন, "বৎস, সমিধ আন, আমি তোমাকে দীক্ষা দেব।"[৩] সূত্র ও স্মৃতিতে অনুষ্ঠানটির আড়ম্বর বেড়ে যায়। সুপরিচিত মন্ত্র উচ্চারণ করে পবিত্র সূত্র ধারণ করা দীক্ষার প্রতীক।[৪] ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদেরও উপনয়নে অধিকার ছিল কিন্তু তারা সবাই তা গ্রহণ করত বলে মনে হয় না। সন্ধ্যাহ্নিকে বেদবহির্ভূত অনেক উপাদান মিশে গেছে, যেমন আচমন (জলগণ্ডূষ গ্রহণ), প্রাণায়াম (শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ), মার্জনা (শরীরে মন্ত্রপূত জল ছড়ানো), অঘমর্ষণ (সূর্যকে জলের অর্ঘ্যদান), জপ (বার বার গায়ত্রী পাঠ), উপস্থান (প্রাতে সূর্যপূজা ও সন্ধ্যায় বরুণপূজার মন্ত্র উচ্চারণ করা), উপসংগ্রহণ (নিজের নাম গোত্র উল্লেখ করে "আমি প্রণতি করছি" বলে নিজের কান স্পর্শ করা, নিজের পা ধরা ও মাথা নত করা)।

যাদের আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির উচ্চতম লক্ষ্যে পৌঁছবার যোগ্যতা আছে, সেই সমস্ত হিন্দু নরনারীকে উপনয়ন সংস্কারভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের বিধান আছে। তিন উচ্চবর্ণের জন্য বৈদিক পথ খোলা[৫]; ভাগবত বলেন যে নারী, শূদ্র ও পতিত ব্রাহ্মণ যাদের বেদে

---

১ ঋগ্বেদ। তৃতীয়, ৬২.১০

২ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। সূর্যকে বৈদিক ও অন্যান্য ঐতিহ্যে ঈশ্বরের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রথা সম্বন্ধে প্লাতো বলেছেন, "সমস্ত জগতে ঈশ্বরের ধারণা দিতে হলে সূর্যের মত এমন আর কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নেই।"

৩ ছান্দোগ্য উপনিষদ, চতুর্থ, ৪.৫

৪ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যৎসহজং পুরস্তাৎ
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ।

৫ তবে রথকার (ছুতার) ও নিষাদ স্থপতিদের (বাস্তুকার) ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা হয়েছে।

অধিকার নেই তাদের জন্য দয়ালু ঋষি মহাভারত লিখেছেন।[1] প্রাচীন কালে বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে বিধিনিষেধ খুব কঠোর ছিল।[2] ধর্মশাস্ত্র যুগে কিন্তু বেদপাঠ সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা এত বেড়ে গিয়েছিল যে গৌতম ঐ সংক্রান্ত বিধিলঙ্ঘনকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা দিয়েছিলেন।[3] শঙ্করের মতে বেদাধ্যয়নপ্রসূত ব্রহ্মবিদ্যায় যদিও শূদ্রের অধিকার নেই, তবু বিদুর ধর্মব্যাধের মত তারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করে জ্ঞানের ফল আধ্যাত্মিক মোক্ষলাভ করতে পারে।[4] জৈমিনি বলেন যে বাদরীয় মতে শূদ্ররা পর্যন্ত বৈদিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে।[5] মনু[6] শঙ্খ[7] ও যম শূদ্রদের সংস্কারের ব্যবস্থা দিয়েছেন কিন্তু বৈদিক মন্ত্র ছাড়া। কারণ যাই হোক, এই সব বিধিনিষেধে আধ্যাত্মিক উন্নাসিকতার গন্ধ পাওয়া যায় এবং পরে এসব নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক ও বিপদের সৃষ্টি হয়।

প্রাচীনকালে যাই হয়ে যাক্, বর্তমানে যাঁরা নিজেদের হিন্দু বলে দাবী করেন, তাদের কাছে আমাদের সমস্ত আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার উন্মুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। কোন কোন শৈব ও বৈষ্ণব সন্তরা অস্পৃশ্য শ্রেণীর লোক ছিলেন, অন্যেরা অব্রাহ্মণ ছিলেন। অনেক অব্রাহ্মণ সাধক পবিত্রতা ও ঈশ্বর উপলব্ধির উচ্চতম আদর্শে পৌঁছিতে পেরেছিলেন। প্রত্যেক ধর্মসংস্কারক সমস্ত সম্প্রদায়কে সত্য, অহিংসা, ত্যাগ ও সংযমের আদর্শে ব্রাহ্মণত্বের স্তরে উন্নীত করতে চেষ্টা করেন। যোগাভ্যাসের দ্বারা কিভাবে বর্ণসীমা অতিক্রম করা যায়, তাঁরা তার প্রণালী সকল সূত্রাকারে গ্রথিত করেছেন। বৌদ্ধ শ্রমণরা স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য ও কৌমার্য বরণ করে ব্রাহ্মণের সমান হন। মহান ভক্তরা বর্ণসীমার ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন। বহুসংখ্যক নারীর কাছে আত্মজ্ঞান লাভের সুযোগ এসেছিল। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মানুষই যে সমান, এই মতবাদ, উচ্চতর ত্রিবর্ণে জন্ম না নিয়েও যে লোকে আত্মজ্ঞান লাভ করেছে এই তথ্য এবং হিন্দু শাস্ত্রকারদের স্বীকৃতি যে এমন কি শূদ্রদেরও আত্মজ্ঞান লাভ করার অধিকার আছে,[8] এইসব থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে এখন জাতি ও পদ নির্বিশেষে সমস্ত হিন্দুর কাছে আমাদের

---

১ স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা
ইতি ভারতমাখ্যানং মুনিনা কৃপয়াকৃতম্। প্রথম, ৪. ২৫.

২ ছান্দোগ্য উপনিষদ, চতুর্থ, ১-২।

৩ দ্বাদশ-৪।

৪ শঙ্করবিজয়-১ম ৩, ৩৮।

৫ নিমিত্তার্থেন বাদরিস্তস্মাৎ সর্বাধিকারং স্যাৎ—প্রথম, ৩, ২৭। ভরদ্বাজ শ্রৌতসূত্র, পঞ্চম ২, ৮ ও কাত্যায়ন, প্রথম ৪, ৫ দ্রষ্টব্য।

৬ দশম, ১২৭।

৭ যাজ্ঞবল্ক্যের উপর বিশ্বরূপের ভাষ্য, প্রথম ১০।

৮ বীরমিত্রোদয় বলেন যে শূদ্ররা বেদাধ্যয়ন করবে এমন আশা করা যায় না, তবু তারাও স্মৃতি ও পুরাণ পড়ে আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। তাদেরও উচ্চতম আত্মোপলব্ধির অধিকার আছে। আত্মপ্রতিপাদকপুরাণশ্রবণেন আত্মজ্ঞানং ভাবয়েৎ।

আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার উন্মুক্ত করা উচিত। ব্রাহ্মণত্ব কোন শ্রেণী নয়, একটা স্বভাব। সবাই তা আয়ত্ত করতে পারে, যদিও অনেকে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেও ব্রাহ্মণত্বহীন হয়। ব্রাহ্মণত্বের সঙ্গে বৃত্তি, শিক্ষা, জন্ম বা লিঙ্গের কোন সম্পর্ক নেই। যে অবস্থায় আন্তরিক প্রসাদ ও বহিসৌন্দর্যের সম্মিলন ঘটে, সেই ব্রাহ্মণত্বে সকলের অধিকার আছে।

গায়ত্রী মন্ত্র আর ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আরম্ভ একই সময়ে এবং সকল নরনারীকে উচ্চ নীচ নির্বিশেষে তা শেখাতে হবে। ওর অন্তর্নিহিত মর্ম হল যা আছে সে সম্বন্ধে চির অস্থিরতা, আরও ভাল পথের জীবনের সবচেয়ে বড় পাওনা উন্নততর জীবনের স্বপ্ন। প্রত্যেকে চায় গভীরতর, তীব্রতর, বিস্তৃততর আত্মচেতনা ও স্পষ্টতর আত্মবোধ। আমাদের নিজেদের থেকে ভাল কিছু তৈরী করার চেষ্টা করতে হবে। সংশয়বাদী ও ঈশ্বরবাদীরাও তাদের বিবেক-বুদ্ধিকে কোন রকম আঘাত না দিয়েও এ মন্ত্র গ্রহণ করতে পারে। এতে শুধু মানুষের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও মানুষের প্রয়াসের লক্ষ্যের বিশ্বাস ধরে নেওয়া হয়েছে। সত্য ধর্ম আধ্যাত্মিক অভিযান ও অনন্ত নবরূপ গ্রহণ, আর গায়ত্রী মন্ত্র তারই প্রতীক। ভগবানই নিরন্তর পুনর্জন্ম। আমাদের নিজেদের নগ্নভাবে ও মিথ্যার মুখোশ বর্জিত ভাবে দেখতে হবে। তখনই আমাদের পুনর্জন্ম হয়।

বেদের ভিত্তিতে ভারতে যে সব ধর্মীয় ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, তা যে জীবনে ও আচরণে অনুসরণ করে তাকেই আমরা হিন্দু বলে ধরব। হিন্দু পিতা মাতা ছাড়া, যাদের পিতা বা মাতা একজনও হিন্দু, এবং মুসলমান খ্রীষ্টান নয়, সেও হিন্দু।

সম্প্রতি হিন্দুত্ব কালের প্রয়োজনে নিজেকে খাপ খাওয়াতে অক্ষমতা বা অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। অবস্থা বদলে গেছে বলেই তাড়াহুড়ো করে মৌলিক পরিবর্তন করলে যেন মনে হয় আমাদের ঐতিহ্যে বিশ্বাস নেই, কিন্তু তা বলে একেবারেই কিছু বদলাবে না, এরকম ভাবাও বোকামি। ঠিক যেমনটি আমরা পেয়েছি, সেই প্রাচীন প্রথাকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম ভুল, নিমিত্তের জন্য সংগ্রাম। আমাদের সংস্কৃতির মহান্ আদর্শগুলি বর্জন করা চলবে না, কিন্তু তারা যে আকার ও অনুষ্ঠানের মধ্যে রূপ নিয়েছে, তাদের অতিক্রম করতেই হবে। ইতিহাসের স্রোত উল্টোদিকে বহানো যায় না। মৌলিক বিপ্লব আর অতীতে ফিরে যাওয়া, এ দুইয়ের মাঝখান দিয়ে চলতে হবে। শ্রান্তিবশে এক এক সময় মনে হয় পুরনো সব কিছু ফেলে দিয়ে একেবারে নূতন যাত্রা শুরু করি। ঐতিহ্য ভারী বোঝা বলে মনে হয়, কেননা যে অনাসৃষ্টি আমাদের চতুর্দিকে ঘটছে তা থেকে ঐতিহ্য আমাদের রক্ষাও করতে পারছে না, আবার নূতন ধরনের জীবনযাত্রা শুরু করতেও বাধাসৃষ্টি করছে। কিন্তু ওভাবে সুবিধা হবে না। আমাদের অতীত ইতিহাসে যে সমস্ত অবিনাশী তত্ত্বের উৎপত্তি হয়েছে, সেগুলি ভাল করে প্রণিধান করে মানবিক মর্যাদা স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তুলতে হবে। অতীতের সার্থক তত্ত্বের সঙ্গে নূতনের সার্থক উপাদান মিশিয়ে নূতন ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের দেশ বহু যুগের পীড়নের মধ্যে থেকেও

নিজের আদর্শ বজায় রাখায় গৌরব করার মত অটলতা দেখিয়েছে। আশার আলো কখনও নেবে নি। বিদেশী শাসনের অন্ধকার পশ্চাদ্‌পটের উপর তা সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। কিন্তু ভারতের আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক মৃত্যু যদি ঠেকাতে হয় তো আমাদের সামাজিক অভ্যাস ও অনুষ্ঠানের মধ্যে বড় রকমের পরিবর্তন অপরিহার্য। হিন্দুধর্ম যদি তার বিজয়শক্তি পুনরুদ্ধার করে অগ্রসর হতে চায়, পৃথিবীতে অনুপ্রবেশ করে তাকে সমৃদ্ধ করতে চায়, তা হলে আমাদের ধর্মীয় চিন্তা ও আচরণ সংস্কৃত করতেই হবে।

চতুর্থ ভাষণ

হিন্দু সমাজে নারী

উপক্রমণিকা—প্রাচীন ভারতে নারী—মনুষ্য জীবনে প্রেম—দৈহিক ভিত্তি—জাতীয় উপাদান—বন্ধুত্ব—প্রেম—বিবাহ ও প্রেম—হিন্দু বিবাহানুষ্ঠান—বিবাহের বিবিধ রূপ—বাল্যবিবাহ—পাত্র-পাত্রী নির্বাচন—বহুপতিত্ব ও বহুপত্নীত্ব—বিধবাদের অবস্থা—বিবাহ-বিচ্ছেদ—সমাজ-সংস্কার—জন্ম-নিয়ন্ত্রণ—বিচ্যুতি-বিচার।

উপক্রমণিকা

নর-নারীর সম্পর্কের প্রশ্নে গুরুগম্ভীর বিচারের চেয়ে আন্তরিকতার দাম বেশী। জীবনের এই গভীরতম বিষয়ে আমরা জগতের সামনে নকল ভূমিকা নেবার চেষ্টা করি। সত্যবাদিতা ও আন্তরিক অখণ্ডতার স্থানে ছলনা ও কৃত্রিমতা চোখে পড়ে। তথ্যগুলি সততার সঙ্গে বিচার করে অতিরিক্ত আদর্শবাদী হবে না এমন পরিকল্পনা করা ভাল। মানুষের সামনে ভাল হওয়ার নৈতিক বিধির এমন একটা ছক রাখা উচিত যা তাদের পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব। যে পৃথিবীতে আমরা বাস করছি যেখানে সামাজিক অভ্যাস ও আচরণের ভিত ধ্বসে পড়ছে, সমাজ ভেঙে গিয়ে নূতন আকার নিচ্ছে। আমাদের সমাজের ধাঁচ তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তৈরী হওয়া উচিত।

নারী সম্বন্ধে বহুসংখ্যক মতামতের জন্য যে সব পুরুষ দায়ী তারা নারীদের স্বভাব সম্বন্ধে অদ্ভুত সব গল্প বলেছে, আর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে। নারীদের রহস্য ও পবিত্রতা, মোহ ও চাঞ্চল্যের চিত্র দিতে দিতে তাঁদের উদ্ভাবনী বুদ্ধি প্রায় সবটাই খরচ করে ফেলেছে।

প্রাচীন ভারতে নারী

নর নারীকে যখন পুরুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করা হয়, তখন তার মানে এই যে তারা পরস্পরের পরিপূরক। মনুষ্যজাতি দ্বিলিঙ্গ হওয়াতে শ্রমবিভেদের ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়। কতক ক্রিয়া পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই বৈশিষ্ট্য নারীকে তার রমণীত্ব থেকে বঞ্চিত করে না এবং নরনারীর স্বাভাবিক সম্পর্কও নষ্ট করে না। পুরুষ স্রষ্টা এবং নারী প্রেমিকা। নারীর বিশেষ গুণ লাবণ্য ও কোমলতা, শান্তি ও প্রীতি, বশ্যতা ও আত্মদান। পাশবিকতা, হিংসা, ক্রোধ ও ঘৃণা তার সাজে না। পুরুষ-প্রাধান্য স্বাভাবিক নয়। আমরা যে অজ্ঞতাবশতঃ মনে করি যে পুরুষ-

প্রাধান্য বুঝি সব যুগে সব রকম সমাজেই অবিসম্বাদী ভাবে স্বীকৃত ছিল, তা ঠিক নয়। পুরুষালী গুণের থেকে কমনীয়তা ও লাবণ্য নারীদের বেশী আসবে। নরনারীর প্রভেদ অপরিহার্য এবং তা থেকে পরস্পরের শিক্ষালাভ করাই উচিত।[১] জুলু ভাষার অভিধানে পুরুষ স্ত্রীদের দ্বারা শিক্ষিত জীব বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আসলে নারীরা পুরুষদের বাল্যকালে এবং বয়ঃপ্রাপ্তকালে তাদের শিক্ষিকার কাজ করে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন, "পিতা স্ত্রীর কাছে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন (জায়তে পুনঃ) বলে স্ত্রীকে জায়া বলে। স্ত্রী তার দ্বিতীয় মাতা।"[২] গীতগোবিন্দের মুখবন্ধের শ্লোকে কৃষ্ণকে গৃহে নিয়ে যাবার জন্য রাধাকে অনুরোধ করা হচ্ছে তার প্রকৃতিকে পূর্ণাঙ্গ করতে, কেননা সে ভীরু-স্বভাব বালক।[৩] আকাশ যখন মেঘাচ্ছন্ন, ভবিষ্যতের পথ গহন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে, এবং যখন আমরা আলোকশিখা-হীন অন্ধকারে একেবারে একা আর চতুর্দিকে সঙ্কট ঘনিয়ে আসে, তখন আমরা নিজেদের স্নেহময়ী নারীর হাতে ছেড়ে দিই।

কন্যার নাম দুহিতৃ, ইংরাজীতে ডটার; এর তাৎপর্য এই যে, কন্যার প্রধান কর্তব্য গো দোহন করা। বয়ন, সূচীকর্ম গৃহকর্ম এবং শস্য রক্ষণাবেক্ষণও তার কর্তব্য।[৪] বিদ্যালাভ করার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হত। ব্রাহ্মণকন্যাদের বেদজ্ঞান দেওয়া হত, ক্ষত্রিয় কন্যারা ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করত।[৫] বার্হুত ভাস্কর্যের মধ্যে নিপুণ অশ্বারোহিণীদের সৈন্যদলে দেখানো হয়েছে। পতঞ্জলি বর্শাবাহিনীর (সাক্তিকি) উল্লেখ করেছেন। মেগাস্থিনিস্ বলেন যে চন্দ্রগুপ্তের শরীররক্ষীদের মধ্যে নারীসৈন্য ছিল। কৌটিল্য স্ত্রী ধনুর্ধারিণীর কথা বলেন (স্ত্রীগণৈঃ ধর্ম্বিভিঃ)। গৃহে ও আরণ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বালক-বালিকা একসঙ্গেই শিক্ষালাভ করত। বাল্মীকি মুনির কাছে রামতনয় লবকুশের সঙ্গে আত্রেয়ীও শিক্ষালাভ করত।[৬] সঙ্গীত, নৃত্য ও অংকন প্রভৃতি কারুকলাতে বালিকাদিগকে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হত। এই সেদিন পর্যন্ত, পুরুষকে যে সকল কাজ সাধারণতঃ করতে দেওয়া হয় সে কাজও নারীরা নিপুণভাবে করতে পারে বলে প্রমাণিত হয়েছে।[৭] অথচ এখনও পর্যন্ত এই মত

---

১ একজন ফরাসী প্রতিনিধি নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া প্রসঙ্গে যখন বলেন যে স্ত্রীপুরুষে সামান্যই তফাৎ, তখন সমস্ত সংসদ সদস্যগণ দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার করে বলেন, "তফাৎটুকু বেঁচে থাকুক।"

২ দ্বিতীয়, অষ্টম, ১৩

৩ মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভুবঃ শ্যামস্তমালদ্রুমৈঃ
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়……ভীরু শিশুত্বাৎ ভয়শীলঃ।

৪ রঘুবংশ, চতুর্থ, ২০

৫ ঋগ্বেদ, প্রথম, ১১২, ১০, দশম ১০২, ২. দার্শনিক তর্কে তাঁর স্বামী ও শঙ্করের মধ্যে মধ্যস্থতা করার মত ধীশক্তি মদন মিশ্রের স্ত্রীর ছিল।

৬ ভবভূতি তাঁর মালতীমাধবে কামন্দকীকে ছেলেদের সঙ্গে পড়াশুনা করতে দেখিয়েছেন।

৭ মিসেস্ সার্লোট ম্যানিং-এর কাছে এক চিঠিতে, জে. এস. মিল লিখেছেন, "আপনি আমার কাছে ভারতের রাজ-পরিবারের মহিলাদের শাসনক্ষমতা সম্বন্ধে তথ্য জানতে চেয়েছেন

চলে আসছে যে বুদ্ধির ব্যাপারে স্ত্রীজাতি পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট।[১] চীনা প্রবাদ বলে, "পুরুষ মনে করে সে জানে, কিন্তু নারী জানে যে সে তার চেয়েও ভাল জানে।"

বৈদিক যুগে যজ্ঞই ছিল ধর্মাচরণের শ্রেষ্ঠ পন্থা। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তাতে অংশ নিতেন। উভয়েই যুগ্মভাবে প্রার্থনা ও বলিদান করতেন। কন্যাদেরও উপনয়ন হত ও তারা সন্ধ্যা করত। "ব্রহ্মচারিণী কন্যাকে এমন পাত্রে দান করতে হবে যে শিক্ষায় তার সমকক্ষ।[২] সীতা সন্ধ্যা করছেন, এমন উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩] হারীত নারীজাতিকে দুভাগে ভাগ করেছেন, ব্রহ্মবাদিনী আর সদ্যোবধূ।[৪] প্রথমোক্তারা বিবাহ করতেন না, বেদাধ্যয়ন করতেন ও নির্দিষ্ট অর্চনাদি করতেন, দ্বিতীয়াদের বিবাহের সময় উপনয়ন হত। যমের মত উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে পুরাকালে কন্যারাও উপবীত ধারণ করত, বেদাধ্যয়ন করত ও স্তবপাঠ করত।[৫]

এবং জিজ্ঞাসা করেছেন তাঁরা হিন্দু না মুসলমান। তাঁরা প্রায় সবাই হিন্দু। মুসলমান রাজ্যে এরকম প্রায়ই হতে পারে না। এইজন্য যে মুসলিম আইনে মা নাবালক ছেলের প্রতিভূ হতে পারেন না, কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে দত্তকই হোক বা নিজ পুত্রই হোক, মায়ের অভিভাবকত্বের অধিকার আছে। কিন্তু এই সব মহিলাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একজন, ভূপালের সিকন্দর বেগম, মুসলমান। ভারত ভবনে আমার বিভাগে এইসব দেশীয় রাজ্যগুলির ভার থাকাতে, কিভাবে তাদের শাসনকার্য চলে সে সম্বন্ধে আমার জানবার সুযোগ হয়েছিল এবং বহু বৎসর ধরে তেজোদৃপ্ত, শক্তিমান ও নিপুণ শাসনকার্যের যে সব দৃষ্টান্ত আমার নজরে এসেছে, তাদের বেশীর ভাগই নাবালক রাজপুত্রদের অভিভাবিকা রাণী বা বাঈরা পরিচালিত করেছেন।"

১ মিসেস্ অলিফ্যান্টের উপন্যাস "কির্স্টিন" সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে হেনরী জেম্স্ বললেন, "কষ্ট করে কুড়ি পাতা পড়তে পড়তেই আমার বিশ্বাস দৃঢ়তর হল যে সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্রীর ধারণা নিতান্ত নারীসুলভ। এমন এলোমেলো, খুঁতে ভরা, খঞ্জ, স্খলিত, দরিদ্র লেখা,—মনে হয় যেন ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে ছিন্নবস্ত্রা নারী কোন রকমে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে কাঁপতে কাঁপতে বুদ্ধি ও জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে গেলেন।" অপরদিকে ভার্জিনিয়া উল্ফ্ বলেন যে সাহিত্যটা পুরুষের গড়া জগৎ, সেখানে পুরুষের প্রধান কাজ খালি যুদ্ধ করা, টাকা রোজগার করা আর উর্দি পরে ঘুরে বেড়ানো, যেমন অধ্যাপকেরা গাউন পরে, বিশপরা আলখাল্লা পরে, জজেরা পরচুলো পরে আর সেনাপতিরা তাদের ফিতা পরে ঘুরে বেড়ায়।

২ যজুর্বেদ, অষ্টম, ১।

৩ রামায়ণ, দ্বিতীয় ৮৭, ১৯, ষষ্ঠ, ৪, ৪৮। ভাগবতে দাক্ষায়ণের কন্যাদের বর্ণনায় দেখা যায় যে তাঁরা ধর্ম ও দর্শনে পারদর্শিনী ছিলেন (চতুর্থ, প্রথম, ৬৪)।

৪ দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়াঃ ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যবধ্বশ্চ। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনামুপনয়নম্ অগ্নীন্ধ বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে চ ভিক্ষাচর্য, সদ্যবধূনাং তু উপস্থিতে বিবাহে কথঞ্চিৎ উপনয়নমাত্রং কৃত্বা বিবাহকার্যঃ।

৫ পুরাকল্পেষু নারীনাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে, অধ্যাপনাং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা। ব্রহ্মচর্যেন কন্যাযুবানাং বিন্দতে পতিম্—অথর্ববেদ, একাদশ, ৫, ১৮. গোভিলা কন্যাকে বর্ণনা করার সময় 'যজ্ঞোপবীতিনীম্' বলেছেন। দ্বিতীয় ১.১৯।

মনু বলেন যে কন্যাদের বিবাহই উপনয়নের সমতুল্য,[1] কিন্তু পূর্বে প্রচলিত প্রথার খাতিরে এবং স্বামী-স্ত্রী যেহেতু এক অপরের পরিপূরক সেইজন্য আধ্যাত্মিক জীবন ও সাধনায় স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকার থাকা উচিত। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হলেও নরনারীর আধ্যাত্মিক উন্নয়নে সমান অধিকার।

সমস্ত কন্যাকেই যে বিবাহিত হতে হবে এমন কোন ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা ছিল না। নারীর পক্ষে স্ত্রী ও মাতা হওয়াই সবচেয়ে নিপুণ ও দুরূহ কর্তব্য তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে কর্তব্যপালনে কোন নারীকে বাধ্য করা উচিত নয়। গণতন্ত্র যতটা এক প্রকার শাসনতন্ত্র, তার চেয়েও বেশী প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব মূল্যের স্বীকৃতি তা সে ব্যক্তি নরই হোক বা নারীই হোক, পতিতই হোক বা অপরাধীই হোক। একথা বরাবরই জানা আছে যে কারুর কারুর পক্ষে একক জীবনেই উদ্দেশ্য সাধনের সম্ভাবনা বেশী, আর সামাজিক জীবনের মত প্রণয় ও বিবাহ আধ্যাত্মিক জীবনের দিক থেকে মনকে বিক্ষিপ্ত করে। কোন কোন লোক যদি কৌমার্যেই সন্তুষ্ট থাকে, তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা যদি সেই দিকে হয়, কেউ যদি একক ও অনুদ্বেজিত জীবনযাপন করতে চায়, সমাজের পক্ষে তাদের সে একক স্বাধীনতাকে অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। যখন গার্হস্থ্যজীবনের জন্য তারা প্রস্তুত নয়, তখন জোর করে তা তাদের ঘাড়ে চাপানো ঠিক নয়। সমাজ ও বিদ্যালয়ের সমগ্র ঐতিহ্য, চুটকি আলাপ, পিতামাতাদের বংশরক্ষা করার স্বার্থ, পরলোকে জলগণ্ডূষ দেওয়া রূপ 'ধর্ম' পালন করার জন্য বংশধর না থাকার ভীতি, এসব মিলে অনেক অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য করে। অবশ্য আর্থিক ও অন্যান্য কারণে অবিবাহিতের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

তবে অল্পসংখ্যক স্ত্রীলোক পুরুষালী ধাঁচে গড়া, তারা কর্মতৎপর ও উচ্চাভিলাষী। তারা জীবনের প্রেয় বস্তুর জন্য সংগ্রাম করে, ক্রীড়া ও রাষ্ট্রনীতিতে আনন্দ পায়। তারা প্রণয় ও বৈবাহিক সম্বন্ধ এড়িয়ে চলতে চায়। ঘটনাচক্রে যদি তারা উদ্বাহবন্ধনে বাঁধা পড়ে তো তারা তাদের স্বামীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভের প্রয়াস করে এবং দাম্পত্যজীবনের শান্তি নষ্ট করে। তারা এই কথা প্রমাণ করতে গর্ব অনুভব করে যে গার্হস্থ্য জীবন তাদের যোগ্য নয়। যদিও এরকম নারী খুব অল্পসংখ্যকই হয়, তবু তাদের ব্যবস্থাও সমাজকে করতে হবে। এসব 'মদ্দাটে' নারী নারীত্বের উচ্চতম সম্ভাবনার শিখরে কখনও উঠতে পারেন না।

নারীদের পৃথক করে রাখার প্রথা অজ্ঞাত ছিল। অল্পবয়সী মেয়েরা স্বাধীন জীবনযাপন করত ও স্বামী নির্বাচনে তাদের মতামতই সর্বাগ্রে গ্রাহ্য ছিল। উৎসবে ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় (সমন) তরুণীরাও সুসজ্জিতা হয়ে অংশগ্রহণ করত।[2]

---

১ দ্বিতীয় ৬৭

২ প্রথম, ৪৮.৬ : প্রথম ১২৪.৮, চতুর্থ ৫৮.৮। কায়েগী সমনদের চিত্র দিয়েছেন, "স্ত্রী ও কন্যারা সুসজ্জিতা হয়ে আনন্দোৎসবে যোগ দিতে যায় যখন অরণ্য ও ক্ষেত্র নবীন হরিতে ভূষিত হয়। এই সময় তরুণ-তরুণীরা নাচবার জন্য মাঠে ছোটে। বাদ্য বাজে, তরুণ-তরুণীরা পরস্পরের হস্তলগ্ন হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে, তাদের পদভরে ধরণী কম্পিত হয়, আর উদ্বেলিত ধূলিতে নৃত্যরত যুগলেরা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ঋগ্বেদ, ১৯ পৃষ্ঠা।

নারীদের পিতৃ-সম্পত্তিতে অধিকার ছিল ও কখনও কখনও তারা অবিবাহিতা থেকে পিতার ও ভ্রাতার সংসারে থাকত।[১] অথর্ববেদে কন্যাদের আজীবন পিতৃগৃহে থাকার কথা আছে।[২] পৈতৃক সম্পত্তির কিছু অংশ তাদের যৌতুক হিসাবে দেওয়া হত, সেগুলি তাদের নিজেদের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হত। পরবর্তী সাহিত্যে এরই স্ত্রীধন বলা হয়েছে।

মহাকাব্যের যুগেও নারীদের বিশেষ কোন অক্ষমতার বোঝা বইতে হত না। তারা কৃচ্ছ্রসাধন করতেন ও বল্কল পরিধান করতেন। ধৃতব্রতা, শ্রুতবতী, সুলভা কুমারী থেকে আধ্যাত্মিক সাধনা করেছেন।

সন্ন্যাসের মহত্তাদর্শের ছায়ায় সন্ন্যাসীদের ভয় দেখানোর জন্য নারীদের দুর্বলতা সম্বন্ধে অনেক অত্যুক্তি করা হয়েছে,[৩] ত্যাগে উৎসাহ দেবার জন্য নারীদের বিষয়াসক্তির উৎস হিসাবে নীচু করে দেখানো হত। হেমচন্দ্র তাদের "নরকের রাস্তায় আলোকসম্পাতকারিণী" বলে নিন্দা করেছেন।[৪] একটি মহৎ ধর্মের ঐতিহ্য অনুসারে নারী সৃষ্টি হতে না হতে তার উপর দোষারোপ করে বলা হল, "নারী আমাকে প্রলুব্ধ করেছে।" খ্রীষ্টধর্মী ইউরোপের বদ্ধমূল বিশ্বাস যে নারীজাতির নিষ্ঠুরতা না থাকলে জগতে মৃত্যু অজ্ঞাত থেকে যেত। নারীদের বিশ্বাসঘাতকতা, পরোক্ষে নিন্দা ও পুরুষকে সর্বনাশের পথে প্রলোভিত করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু বরাহমিহিরের (ষষ্ঠ শতাব্দী) মতে ধর্ম ও অর্থের জন্য নারীদের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয় এবং মানুষের প্রগতির জন্য তারা অপরিহার্য। সংসারবিরাগী লোকেরা নারীদের ভাল গুণগুলি উপেক্ষা করে তাদের দুর্বলতাগুলি বাড়িয়ে দেখান বলে তিনি অভিযোগ এনেছেন।[৫] নারীদের দোষ পুরুষেরও আছে। সত্য কথা বলতে গেলে পুরুষদের পক্ষ থেকে যে সব গুণের দাবী করা হয় স্ত্রীলোকদের তার চেয়ে বেশী গুণই আছে।[৬]

---

১ ঋগ্বেদ, প্রথম ১১৭.৭। পিত্রালয়ে যে বৃদ্ধা হয় তাকে বলত অমাজুর। দ্বিতীয় ১৭.৭, দশম ৩৯.৩, অষ্টম ২১.৫।

২ প্রথম, ১৪.৩।

৩ ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি শালাবৃকানাং হৃদয়ানি এতা (মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে পারে না, কারণ তাদের অন্তর হায়েনার মত।)—ঋগ্বেদ, দশম, ৯৫.১৫। মনে রাখতে হবে এ স্বর্গবেশ্যা উর্বশীর উক্তি। আবার বলা হয়েছে স্ত্রীলোকদের বশ করা যায় না (স্ত্রিয়া অশাসাং মনঃ) সপ্তম, ৩৩.১৭।

৪ বীজং ভবস্য নরকমার্গদ্বারস্য দীপিকা। তের্তুলিয়ানের তিক্ত মন্তব্য তুলনীয়, "এই স্ত্রীজাতি পুরুষের উপর ঈশ্বরের অভিশাপ। তোমরা নরকের দ্বার, পুরুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব তোমরা নষ্ট কর।" এক লাতিন লেখক বলেন: "নারী পুরুষের মন বিভ্রান্তকারী" (Mulier est hominis confusio).

৫ যেপি অঙ্গনানাং প্রবদন্তি দোষান বৈরাগ্যমার্গেন গুণান্ বিহায়।

৬ গুণাধিকঃ। স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে ইউরিপাইডেস তাঁর মিডিয়া পুস্তকে বলেছেন, "সজীব ও অনুভূতিসম্পন্ন জন্তুদের মধ্যে আমরা মেয়েরাই সব চেয়ে হতভাগিনী, কেননা আমাদের স্বর্ণ পণ দিয়ে স্বামী ক্রয় করতে হয় অথচ সেই স্বামীই আমাদের কর্তা হয়ে

ঐতিহ্য দ্বারা চালিত না হলে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের মতই স্থিরমতি কমও নয় বেশীও নয়। তাদের যৌনপ্রকৃতিও পুরুষদের থেকে কম উন্মার্গগামী নয়।[১] নারীরাও নির্দোষ মেষশাবক নয় আর পুরুষরাও নরখাদক অসুর নয়। আদিম কালে অবাধ যৌনমিলনই প্রচলিত ছিল, আর তা পাপ বলে গণ্য হত না। নারীরা ইচ্ছামত বিচরণ করত।[২] সুযোগ সুবিধা পেলেই তারা এক বিবাহের সম্পর্ক ত্যাগ করত। ভিক্টোরিয়া প্রদেশের আদিবাসীদের মধ্যে নারীদের একই সঙ্গে এত প্রণয়ী থাকে যে কোন শিশুর পিতৃত্ব নির্ণয় করা দুরূহ।[৩] আরব ও ম্যাডগাস্কার দেশে অভিজাত নারীদের বিবাহ এক পুরুষের সঙ্গে হলেও তাদের নানা প্রণয়ী থাকে। সন্তান-ধারণের ঝামেলা নারীদের এক-বিবাহযুক্ত জীবনের দিকেই আকৃষ্ট করে। আর্থিক পরনির্ভরতা থেকে মুক্ত হলে নারীরা যে পুরুষদের থেকে বেশী এক-বিবাহনিষ্ঠ হবে এমন মনে হয় না। এক-বিবাহ যদি বার বার বিবাহবিচ্ছেদ দ্বারা খণ্ডিত হয় তো সে নামেই মাত্র এক-বিবাহ। মহাভারতে উত্তরকুরু দেশ[৪] ও মাহিষ্মতী নগরীর[৫] উল্লেখ আছে, সেখানে যৌনমিলন অবাধ ছিল। এই অবাধ মিলন নজীরহীন ছিল না এবং বড় বড় ঋষিরাও এ প্রথার প্রশংসা করেছেন।[৬] মহাভারতে আছে, যখন শ্বেতকেতুর পিতার সামনেই আর এক ব্রাহ্মণ এসে তার মাতাকে ধরে নিয়ে গেল তখন শ্বেতকেতু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল কিন্তু তার পিতা তাকে শান্ত ভাবেই বুঝিয়ে দিলেন যে এই প্রথাই প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। তিনি বললেন, "পৃথিবীতে সকল শ্রেণীর স্ত্রীই স্বাধীন। হে বৎস, সমস্ত শ্রেণীর মানুষই এ বিষয়ে গোজাতির তুল্য।"[৭] শ্বেতকেতুই নাকি অবাধ যৌন

বসে। অথচ তারা বলে যে আমরা গৃহে নিরাপদ জীবন যাপন করি আর তারা যুদ্ধে যায় কিন্তু এ বাজে কথা। একবার সন্তান প্রসব করার চেয়ে দুবার যুদ্ধে যাওয়া ভাল।"

১ জর্জ স্যান্ডের উক্তি তুলনীয়, "নারীর সতীত্ব পুরুষের চমৎকার উদ্ভাবন।"

২ কামাচারবিহারিন্যঃ স্বতন্ত্রা—মহাভারত, প্রথম, ১২২, ৪.

৩ W. Winwood Reade লিখিত Savage Africa (বর্বর আফ্রিকা) দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮৬৪) পৃ. ২৫৯ দ্রষ্টব্য।

৪ যত্র নার্যঃ কামচার ভবন্তি। ত্রয়োদশ ১০২, ২৬।

৫ স্বৈরিণ্যস্তত্র নার্যো হি যথেষ্টং বিচরন্ত্যুত। দ্বিতীয় ৩১, ৩৮

৬ প্রমাণদৃষ্টো ধর্মোঽয়ং পূজ্যতে চ মহর্ষিভিঃ।

আরও

স্ত্রীনামনুগ্রহ করঃ স হি ধর্মঃ সনাতনঃ।

অস্মিংস্তু লোকে চিরান্ মর্যাদেয়ং শুচিস্মিতে। প্রথম, ১২২, ৮

(হে স্মিতবাসিনী, নারীদের সুবিধার জন্য এই আচার প্রাচীনতা দ্বারা পূত, বর্তমান প্রথা অতি সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে।)

৭ অনাবৃতাহি সর্বেষাং বর্ণানামঙ্গনা ভুবি

যথা গাবস্ স্থিতাস্তাত স্ব স্ব বর্ণে তথা প্রজাঃ। প্রথম, ১২২, ১৪।

(প্রাণীজগতে স্ত্রীরাই তাদের যৌন জীবনের সঙ্গী বেছে নেয়। মনুষ্যজগতেও স্ত্রীরাই শেষ সিদ্ধান্ত নেয়। নিজে ইচ্ছা না করলে কোন স্ত্রীলোককেই বিপথে নেওয়া যায় না।)

মিলন বন্ধ করে বিধিবদ্ধ বিবাহের প্রচলন করেন।[১] নর ও নারী উভয়ের জন্যই তখন বিবাহাদর্শ নির্দিষ্ট করা হয়। "যে স্ত্রী পতি-অনুগামী থাকবে না সে সেই দিন থেকেই পাপিনী হবে; তার পাপ ভ্রূণহত্যার সমান। যে সতী ও অনুরাগিণী পত্নী যৌবন থেকে নিজের সতীধর্ম রক্ষা করেছে, সেই স্ত্রীকে উপেক্ষা করে যে পুরুষ পরস্ত্রী গমন করবে, সেও সমান পাপের ভাগী হবে।[২] এক-বিবাহ ব্যবস্থা নৈসর্গিক অবস্থা নয়, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা। প্রাক্‌বৈদিক যুগে অবাধ যৌনাচার প্রচলিত ছিল, ঋগ্বেদের সময় বিবাহ-সংস্কার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সম্ভবতঃ নারীদের ক্ষেত্রে বিবাহ বাধ্যতামূলক হল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতি-ক্রিয়া হিসাবে। দীর্ঘতমস্‌ বিধান দিলেন যে ভবিষ্যতে নারীরা অবিবাহিতা থাকতে পারবেন না।[৩] মনুর বক্তব্য এই যে, স্ত্রীলোকদের সকল প্রকার সংস্কারই হবে কিন্তু বৈদিক অনুষ্ঠান ছাড়া।[৪] কেবল তাদের বিবাহই বৈদিক সংস্কার।[৫] স্মৃতিশাস্ত্রে দীর্ঘদিনের কৌমার্যের নিন্দা করা হয়েছে ও গৃহস্থদের প্রশংসা করা হয়েছে। অবিবাহিত পুরুষের যজ্ঞে অধিকার রইল না।[৬] মনুতে ও ধর্মশাস্ত্রেই নারীরা চিরকাল পুরুষের বশ এই নীতি প্রথম প্রস্তাবিত হল।[৭] তাঁদের মতে নারীরা ভঙ্গুর বৃক্ষের মত, পুরুষরা তাদের সযত্নে রক্ষণ ও পালন করবে। পরবর্তী ভাষ্যকাররা পরমোৎসাহে স্ত্রীজাতির উপর বাধানিষেধ আরোপ করেছেন। কিন্তু নারীদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা মনুতেও আছে; বাণ, কালিদাস, আর ভবভূতির মত কবিদের কাব্যে তো আছেই। যদিও কোথাও কোথাও এমন কথা আছে যে বৈদিক অনুষ্ঠানে নারীর অধিকার পুরুষের সমকক্ষ নয়, তবু প্রধান মত এই যে ঐসব অনুষ্ঠানেও স্বামীর সঙ্গে যোগ দেবার অধিকার স্ত্রীর আছে, আর কুমারী হলে স্বতন্ত্র ভাবেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। পরবর্তীকালে যখন তাদের অবস্থার অবনতি হল, তখন ভক্তিধর্মের অভ্যুদয় হয়, এবং নারীদের সমগ্র ধর্মীয় প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা হয়।

১ প্রথম, ১২৮

২ ব্যুচ্চরন্ত্যাঃ পতিং নার্যা আদ্যপ্রভৃতি পাতকং
ভ্রূণহত্যাসমং ঘোরং ভবিষ্যতি অসুখাবহং
ভার্যাং তথা ব্যুচ্চরতঃ কৌমারব্রহ্মচারিণীং
পতিব্রতামেতদেব ভবিত পাতকং ভুবি। প্রথম. ১২২. ১৭-১৮

৩ অপতীনং তু নারীনামাদ্যপ্রভৃতি পাতকম্‌। মহাভারত, প্রথম, ১১৪, ৩৬।

৪ দ্বিতীয়, ৩৬

৫ দ্বিতীয়, ৩৭।

৬ অযজ্ঞিকো বা এষ যো অপত্নীকঃ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয়, ১. ২. ৬.

৭ পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে
পুত্রো রক্ষতি বার্ধক্যে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি। মনু, নবম, ২৩

অ্যারিস্টট্‌ল্‌ বলেন যে, পুরুষের সঙ্গে তার স্ত্রী ও পুত্রকন্যার সম্পর্কের মধ্যে ন্যায়বিচারের

নারীদের নানাপ্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও কতকগুলি সুবিধা তারা ভোগ করে আসছে। অপরাধ যতই গুরুতর হোক তারা অবধ্যা, তাদের কখনও ত্যাগ করা যায় না, এমন কি পরপুরুষগামিনী হলেও না। গৌতম বলেন যে, পরপুরুষগামিনী স্ত্রীলোককে গৃহে নজরবন্দী রেখে প্রায়শ্চিত্ত করাতে হবে।[1] বশিষ্ঠ[2] বলেন যে, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্ত্রীরা যদি শূদ্রগমন করে তো সন্তান-সম্ভাবিতা না হলে প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধা হবে, আর সন্তান-সম্ভাবিতা হলে এভাবে শুদ্ধা হবে না।[3]

মনুষ্যজীবনে প্রেম

পৃথিবীতে অনেক বড় বড় কীর্তি নারীর প্রেমের প্রেরণা পেয়ে ঘটেছে। কালিদাসের[4] মত প্রতিভাধর, নেপোলিয়নের মত বিজয়ী, মাইকেল ফ্যারাডের মত বিজ্ঞানী এবং আরও অনেক সংসার-স্রষ্টা ও সংসারত্যাগীরা তাঁদের জীবনে প্রেম যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে তার সাক্ষ্য দিয়েছেন। ইন্দ্রিয়োল্লাস, সফল সন্তোষ ও তীব্র প্রণয়-প্রবৃত্তি থেকেই গীতিকবিদের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতার উৎপত্তি। রামায়ণে রাম-রাবণের সংঘর্ষের কারণ নারী, ট্রয়ের যুদ্ধও নারীর উপর অধিকার সাব্যস্ত করা নিয়েই। জীবনের অন্তস্তলের আগুন থেকে প্রেমের শিখা জ্বলে, এই প্রেমই সমস্ত সৃষ্টির মূল উৎস। অনেক প্রতিভাবান লোক তাঁদের পাশে প্রেমিকার অভাবে তাঁদের জীবনে সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। পরস্ত্রী হয়েও বিয়াত্রিচে দান্তের মনে যে প্রেমের উদ্রেক করেছিলেন তারই প্রেরণায় ডিভাইনা কমিদিয়ার জন্ম। চণ্ডীদাসের অমর কাব্যের প্রেরণা যোগায় এক কৃষক-দুহিতার প্রেম, বিদ্যাপতির গানের উৎস এক রাণীর অনুপ্রেরণা। বীটোফেন তাঁর 'অমর প্রণয়িনী'র চরণে তাঁর উচ্ছ্বাস নিবেদন করেছিলেন।

নরনারীর সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্রকাররা অত্যধিক সংযম ও অত্যধিক স্বেচ্ছাচারের মাঝখান দিয়ে চলেছিলেন। যৌনপ্রবৃত্তি, প্রণয় ও বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হ্যাভেলক এলিস লিখেছেন যে, "ভারতে যৌনজীবনকে যতখানি পূত ও দিব্যভাবাপন্ন করা হয়েছে পৃথিবীতে আর কোথাও তত হয় নি। হিন্দু শাস্ত্রকাররা একথা কখনও

ধারণা ঠিক প্রয়োগ করা যায় না, কেননা সম্পত্তির উপর আবার ন্যায়বিচার কি? গ্রীক সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরেও নারীদের অবস্থা খুব কঠিন ছিল।

১ ২২. ৩৫ ২ একবিংশ ১২

৩ ব্যাস বলেন যে, "ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে গৃহে রাখবে কিন্তু তার ধর্মীয়, দাম্পত্য ও সম্পত্তির অধিকার থাকবে না এবং তাকে তিরস্কারের পাত্রী হতে হবে। কিন্তু ব্যভিচারের পর আবার যখন সে ঋতুমতী হবে (এবং আর যদি ব্যভিচার না করে) তো স্বামী সে স্ত্রীর সমস্ত পূর্ব অধিকার ভোগ করতে দেবেন।" দ্বিতীয় ৪৯-৫০

৪ কিংবদন্তী যে কালিদাস তার স্ত্রীর প্রথম প্রশ্নের দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও রঘুবংশ রচনা করেন। প্রশ্নটি ছিল অস্তি কশ্চিৎ বাগ্‌বিশেষঃ। ঐ তিন কাব্যের প্রথম শব্দ যথাক্রমে ঐ প্রশ্নের শব্দগুলি।

চিন্তা করেন নি যে যা স্বাভাবিক তা কখনও দুষ্ট ও অশ্লীল হতে পারে। এই ভাব তাঁদের সমস্ত রচনার মধ্যেই আছে এবং এ থেকে এমন কথা কখনই প্রমাণ হয় না যে তাঁদের নীতিবোধ শিথিল ছিল। ভারতে প্রণয়কে তত্ত্বীয় দিকে এবং ব্যবহারিক দিকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।"[১]

প্রকৃতির কাছে আমরা কাঁচা মাল পাই, মানুষের মন তাকে নূতন রূপ দেয়। এ যদি না হত তো আমাদের যৌনজীবন বনমানুষ বা কুকুরদের যৌনজীবনের মতই অর্থহীন হত। সহজাত যৌনপ্রবৃত্তি হৃদয় ও মস্তিষ্ক, বুদ্ধি ও কল্পনা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হলে প্রেমে রূপান্তরিত হয়। প্রেম অতীন্দ্রিয় ভক্তিও নয়, আবার পাশবপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করাও নয়। প্রেম একটি মানুষের প্রতি আর একটি মানুষের সহৃদয় আকর্ষণ। বিবাহানুষ্ঠান প্রেমের প্রকাশ ও বিকাশের একটি উপায়। বিবাহ শুধু একটা প্রচলিত প্রথা নয়, মানব সমাজের প্রচ্ছন্ন ভিত্তি। বিবাহের আদর্শে পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু বিবাহ মানবগোষ্ঠীর একটি স্থায়ী আকার বলেই মনে হয়। বিবাহ নিসর্গের জৈব উদ্দেশ্যের সঙ্গে মানুষের সামাজিক উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য স্থাপন করে। কী ভাবে এই সামঞ্জস্য কার্যকরী করা হয়, তার ওপর তার সফলতা বা বিফলতা নির্ভর করে। বিবাহের ফলে কখনও আমরা পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের আভাস পেতে পারি, আবার কখনও সুবিন্যস্ত নরকের জ্বালাও অনুভব করতে পারি।

অধিকতর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দিকে বর্তমান যুগের প্রবণতা। দৈহিক বা নৈতিক সংযম জনপ্রিয় নয়। নির্জ্ঞান অবদমনের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত বাড়ছে ততই প্রচলিত নীতিমার্গের উপর সন্দেহ বাড়ছে।[২] কাউন্ট হেরমান কাউজার লিঙ্ সম্পাদিত "দি বুক অব ম্যারেজ" নামক পুস্তকে লিখবার আমন্ত্রণের উত্তরে বার্নার্ড শ বলেন, "স্ত্রী বেঁচে থাকতে বিবাহ সম্বন্ধে সত্য কথা বলতে কোন পুরুষই সাহস করবে না, যদি না স্ট্রিণ্ডবার্গের[৩] মত তাকে সে ঘৃণা করে, যা আমি করি না। বইখানি আমি আগ্রহভরে পড়ব, জানি বইয়ের মধ্যে প্রধানতঃ সমস্যা এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই থাকবে।"[৪] সামাজিক দিক থেকে ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন এবং সংস্কৃতির গণতান্ত্রিক প্রসারের ফলে পারিবারিক জীবনের তাৎপর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নারীরা আর্থিক বিষয়ে স্বনির্ভর হচ্ছে, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সুবিধাদি সকলের পক্ষে

১ Studies in the Psychology of Sex, VI. 129.

২ "জগৎ যাকে নীতিশাস্ত্র বলে তা মানতে গেলে এত রকম আত্মত্যাগ করতে হয় যে তার আর কোন মূল্য থাকে না, আর নীতিশাস্ত্রীয় আচরণে সততাও নেই, জ্ঞানের নিশানাও নেই।" Freud in Introductory Lectures on Psycho-Analysis (1922) p. 362.

৩ সুইডিশ লেখক অগস্ট স্ট্রিণ্ডবার্গ তাঁর 'কনফেশন্স অফ এ ফুল' গ্রন্থে নিজের প্রথম অসুখী বিবাহের কাহিনী বলেছেন।

৪ বার্নার্ড শ-এর আর একটি এইরকম কৌতুকপ্রদ উক্তি আছে। যখন তিনি বিবাহ করেন তখন একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "বিবাহ সম্বন্ধে আপনার কি মত?" তিনি উত্তর দেন, "বলা শক্ত, বলতে পারি এ একটা 'ফ্রীমেসনরি'র (ফ্রীমেশন—খ্রীষ্টানদের একটি সম্প্রদায়)

প্রায় সমান হয়ে আসছে, আর মানুষের জন্য বৃত্তিদানের চেষ্টা করা হচ্ছে। এইসব গার্হস্থ্য জীবনে আমূল পরিবর্তন আনবে বলে মনে হয়।

বিবাহের মত অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যদি সার্থক বিচার করতে চাই, যা ঘটনাচক্রে এসে গেছে, তার থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় যদি পৃথক করে দেখতে চাই তা হলে এর উৎপত্তি ও বিকাশের জন্য যে সব প্রবণতা ও উদ্দেশ্য দায়ী সেগুলি বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। তাহলে আমরা দেখব যে বিবাহ ও সাধারণ যৌন ব্যাপারে যে সব জিনিস আমরা মূল্যবান বলে মনে করি সেগুলি আইন ও প্রথার মাধ্যমে আমাদের বুদ্ধি ও কল্পনার সৃষ্টি।

বিবাহানুষ্ঠানের উৎস কাব্যিক প্রণয়ও নয়, পাশবিক কামও নয়। আদিম মানুষের সহজ যৌন প্রবৃত্তিকে সংযত করার কোন কারণ ছিল না। আদিম মানুষ রমণীর সতীত্ব বা পুরুষের পিতৃত্বের দায়িত্বের কোন মূল্যই দিত না। সে যৌন-ঈর্ষাও বুঝত না, কাব্যিক প্রেমও বুঝত না। আদিম বিবাহ নারীকে বশে রাখার উপায় মাত্র ছিল আর আর্থিক প্রয়োজনের উপর তার স্থায়িত্ব নির্ভর করত, এই বিবাহে ক্ষণিক আবেগের কোন স্থানই ছিল না। নৃতত্ত্ববিদরা বলেন যে আদিম স্বামী আতিথ্যের সাধারণ রীতি হিসাবেই যৌনসঙ্গ দেবার জন্য তার স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় অতিথিকে ধার দিত, কিন্তু কাজের লোক হিসাবে তার উপর প্রভুত্ব সম্বন্ধে সে খুব সতর্ক ছিল। জীবন যখন আরও সুবিন্যস্ত হল, সম্পদ বাড়ল, তখন বিধিমত উত্তরাধিকারীর মাধ্যমে সম্পত্তির কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য বিবাহানুষ্ঠান সমর্থিত হল।[১] সভ্যতার আরও বিকাশ ঘটলে স্ত্রীকে শুধু ক্রীতদাসী বা বংশবৃদ্ধিকারিণী পশু হিসাবে না দেখে তার ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত হল এবং বিবাহ প্রথার উপর তার ব্যাপক প্রভাব পড়ল।

দৈহিক ভিত্তি

যৌন সম্পর্ককে অশুচি বা অশালীন বলে ভাবা নৈতিক বিকারের লক্ষণ। মানুষের জীবনের যৌন ভিত্তির উপর ফ্রয়েড যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন তার মধ্যে অত্যুক্তি থাকতে পারে কিন্তু ভ্রান্তি নেই। যৌন প্রবৃত্তির মধ্যে স্বরূপতঃ কুশ্রীতার কিছু নেই। এ সম্বন্ধে খ্রীষ্টধর্মে যে অনমনীয় কঠোর ভাব আছে হিন্দুধর্মে তার সমর্থন নেই।[২] যীশু বিয়ে করেন নি আর অপৌরুষেয় গর্ভাধানের সমগ্র ধারণার পিছনেই

মত; যারা বিয়ে করেন নি তাঁরা এর কিছুই জানেন না, আর যাঁরা বিয়ে করেছেন তাঁরা চির-নীরবতা রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

১ ডেমোস্থিনিস গ্রীকদের সাধারণ মনোভাব প্রকাশ করেছেন এইভাবে: "ফূর্তির জন্য বেশ্যা, দৈনিক দেহসেবার জন্য উপপত্নী আর বিশ্বস্ত গৃহরক্ষিণী ও সন্তানোৎপাদনের জন্য স্ত্রী আছে।" **Westermarck**-এর **Future of Marriage in Western Civilisation**-এ উদ্ধৃত (২৩ পৃঃ)।

২ সেণ্ট পল বলেন, "পুরুষের পক্ষে নারীকে স্পর্শ না করাই ভাল। তা সত্ত্বেও

স্বাভাবিক যৌনজীবন যেন একটা অশুচি ব্যাপার এই ধারণা রয়েছে। সেণ্ট জেরোম বলেন, "বিবাহে লোকবৃদ্ধি হয় বটে কিন্তু কৌমার্যে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে।" তিনি আরও লিখেছেন, "দেহে কুমারী কিন্তু মনে নয়, এমন আছে, এদের দেহ অক্ষত কিন্তু আত্মা দূষিত। যে কৌমার্য দৈহিক বা মানসিক কোন কাম দিয়েই কলুষিত হয় নি, তাই শুধু খ্রীষ্টকে অর্পণ করা যায়।" নিখুঁত হতে হলে আমাদের যৌনজীবন ও স্বাভাবিক পারিবারিক স্নেহ বর্জন করতে হবে। কিন্তু আমাদের আশা ও কল্পনা আপেক্ষিক পরিপূর্ণতাতেই সীমিত। বিবাহিত জীবনের অসম্পূর্ণ অবস্থার মধ্যে আমাদের নিখুঁত ভাবে চলতে হবে।

অপর পক্ষে হিন্দুদের কাছে যৌনজীবন পবিত্র। রামায়ণের প্রথম শ্লোকে কামাতুর পক্ষীমিথুনের বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য ব্যাধের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে।[১] কাম রোগও নয়, বিকারও নয়, এক সহজাত প্রবৃত্তি মাত্র।[২] হিন্দুরা গার্হস্থ্যাশ্রমকে উচ্চস্থান দেয়। যেমন সমস্ত জীব মাতার সাহায্যের উপর নির্ভর করে, তেমনি অন্য সব আশ্রম গার্হস্থ্যাশ্রমের উপর নির্ভর করে। "ইট কাঠ দিয়ে গৃহ তৈরী হয় না, গৃহিণী থেকেই গৃহের উদ্ভব, গৃহিণীহীন গৃহ আমার কাছে বনের সমান।"[৩] "কাঠ বা পাথর হলেই গৃহ হয় না, যেখানে গৃহিণী সেখানেই গৃহ।"[৪] হিন্দু মত নর-নারীকে অর্থহীন পরিপূর্ণতার জন্য তপস্বী তপস্বিনী বানাতে চায় না; যৌনবিরতিকে পরম গুণ বলেও মনে করে না। আমরা যদি

ব্যভিচার নিবারণের জন্য প্রত্যেক পুরুষের স্ত্রী থাক, প্রত্যেক নারীর স্বামী থাক। স্ত্রীর শরীরের উপর অধিকার নিজের নয়, স্বামীর, আর পুরুষের নিজের শরীরের উপর অধিকার নেই, স্ত্রীর অধিকার। কেউ কাউকে বঞ্চিত কোরো না। অবশ্য সাময়িক ভাবে পরস্পরের সম্মতিক্রমে উপবাস ও প্রার্থনার জন্য সংযম করা যায়, পরে আবার পরস্পর সমাগত হবে যাতে শয়তান অসংযমের জন্য প্রলোভিত না করতে পারে। কিন্তু আমি এ কথা অনুমতি হিসাবে বলছি, আদেশ রূপে নয়। কেননা জ্বলার চেয়ে বিবাহ করা ভাল। ভগবান মানুষকে যা দিয়েছেন, যেভাবে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন, সেইভাবে সে চলুক। যে লোক যে বৃত্তি গ্রহণ করেছে সে সেই বৃত্তিতেই নিষ্ঠা রাখুক। তাতে সে এ জগতের অপব্যবহার না করে সংব্যবহার করতে পারবে, কেননা জগতের প্রথা অনিত্য।" তারপর শেষ খোঁচা দিয়েছেন, "অবিবাহিত লোক ঈশ্বরের বস্তুকে শ্রদ্ধা করে, কিভাবে প্রভুকে সন্তুষ্ট করবে তাই সে চেষ্টা করে। কিন্তু বিবাহিত লোক পার্থিব বস্তুর কথাই ভাবে, কী করে স্ত্রীকে খুশী করবে তাই তার একমাত্র চিন্তা" প্রথম কোরিন্থিয়ান, সপ্তম।

১ মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।

২ Montaingne-এর কথায় "যে ক্রিয়ার ফলে পৃথিবীতে জন্মলাভ করেছে, তাকে যারা পশুসুলভ বলে, তারা নিজেরাই কি পশু নয়?"

৩ ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে
গৃহং চ গৃহিণীহীনমরণ্যসদৃশং মম।

৪ ন গৃহং কাষ্ঠপাষাণৈর্দারিতা যত্র তদ্ গৃহম্। নীতিমঞ্জরী, ৬৮।

নৈসর্গিক শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করি তো প্রকৃতি একসময়-না-একসময় তার প্রতিশোধ নেবেই। কামসূত্রের লেখক যৌনজীবনের বিভিন্ন দিক ও আকর্ষণের বর্ণনা দিয়েছেন, মানুষের মনের যে সব আলোড়ন জীবনকে পূর্ণ ও তীব্র করে তোলে, সেগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর আবেগময় জীবনপ্রীতি ও তীব্র অনুভূতিপ্রবণ আত্মিক প্রশান্তির বিবরণের সঙ্গে কৃচ্ছ্রসাধকদের ইন্দ্রিয়নিগ্রহের কোন সাদৃশ্য নেই। বাসনার নির্বিকার বিরোধের দ্বারা আত্মিক মুক্তিলাভ করা যায় না, তাদের বিচার-বিবেচনার দ্বারা সুবিন্যস্ত করেই লাভ করা যায়। আত্মাকে দেহবন্ধন থেকে মুক্ত করার মানে দেহকে বিনাশ করা নয়। সন্ন্যাসীরা উপবাস ও অন্যান্য দৈহিক নিগ্রহের মতই ব্রহ্মচর্য অভ্যাস করে ইন্দ্রিয় দমন করার জন্য। এইজাতীয় নিগ্রহের বিপদ এই যে, বর্জনীয় বিষয়ের দিকেই মন এতে আকৃষ্ট হয়, নেতিবাচক বন্ধনের সৃষ্টি হয়। এমন কি যৌন ব্যাপারেও উচ্চতম আদর্শ হল নিরাসক্তি, যৌন সম্পর্ককে প্রয়োজনমত ব্যবহার করা আর অনায়াসে পরিত্যাগ করা।

হিন্দু সংস্কৃতিতে বিবাহের শুধু প্রশ্রয় নেই, প্রশংসা আছে। জৈবশক্তির উপর বিপজ্জনক নিষেধ আরোপ করার সন্ন্যাসীসুলভ মনোভাবের নিন্দা করা হয়। যে ঈশ্বর নর ও নারী উভয়ই সৃষ্টি করেছেন তাঁকে উপহাস করা চলে না। পবিত্রতার যে কঠোর আদর্শ আমাদের প্রজাতিকে ধ্বংস করার ঝুঁকি নিয়ে আমাদের আত্মাকে বাঁচাতে চায়, তা আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরোধী। যদিও দৈহিক কামনা কোন গভীর বা শাশ্বত বস্তু নয়, তবু তারই ভিত্তিতে স্থায়ী ও সন্তোষজনক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা হয়। শারীরভিত্তি অসন্তোষজনক হলে বিবাহও সার্থক হয় না।[১] কিন্তু শুধু তাই যথেষ্ট নয়। কান্ট বিবাহের সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন, "দুটি ভিন্ন লিঙ্গের লোকের যৌন গুণের সারা জীবনব্যাপী পারস্পরিক অধিকার।" এ সংজ্ঞার্থ দোষমুক্ত নয়। এই সংজ্ঞার্থ সত্য হলে যৌন আবেগ কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যেত। জীবন যেমন শারীরবৃত্ত নয়, তেমনি ভালবাসাও কেবল লিঙ্গগত নয়। যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এক পেয়ালা কফি খাওয়ার মত নয়। এটা এমন তুচ্ছ, নিরর্থক ঘটনা নয়, যার কোন স্মৃতি মনে অবশিষ্ট থাকে না। প্রীতি, সখ্য ও প্রেম তার ফল। বর্তমানের অনিয়মিত যৌনজীবন ক্রমবর্ধমান ইতরতার লক্ষণ।

মানুষের কতকগুলি বিশেষ যৌন ধর্ম আছে। মানুষের বাসনা পর্যায়বৃত্তিক নয়। মানুষ ক্ষুধা না পেলেও খায়, তৃষ্ণা না পেলেও পান করে এবং সব ঋতুতেই সে সঙ্গম করে। জীবজগতে মানুষ ছাড়া এ সুবিধা একমাত্র খুব বড় বনমানুষের আছে। মূল বৈশিষ্ট্যের চেয়ে গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যই প্রাধান্য লাভ করে। মুখ, চোখ বা ধীশক্তি দ্বারা আমরা আকৃষ্ট হই। কখনও কখনও এ আকর্ষণ সমলিঙ্গ লোকের দিকেও ধাবিত হয়। মানুষ বহুদিন পর্যন্ত পিতামাতার আদরযত্ন পায়। খুব কম জন্তুই তাদের সন্তানদের বেশীদিন লালন করে। কুকুর-কুকুরীর সম্বন্ধ ক্ষণস্থায়ী। সারস ও স্ত্রী-সারস তাদের সন্তানদের বেশীদিন পালন করে, অতএব

১ "আমার দেহ দিয়ে তোমার অর্চনা করি" তুলনীয়।

তাদের সম্পর্ক কিছু বেশীদিন স্থায়ী হয়। কিন্তু সন্তানেরা বড় হলেই পিতা-মাতার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভুলে যায়। ভ্রাতা-ভগিনীর বন্ধন বলে কিছু নেই।

মানব-স্বভাবের মৌল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতেই হবে। স্বাভাবিক লোকের পক্ষে অসমলিঙ্গ এক ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রয়োজন। জীববিদ্যার মতে যৌন কামনার অতৃপ্তি থেকে স্নায়বিক অস্থিরতা আসে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে এর ফল শূন্যতা বা মানব-দ্বেষ। কখনও কখনও ব্যাপ্টিস্ট্ জন, যীশু, সেন্ট পল বা শঙ্করের মত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি প্রাণশক্তি স্বাভাবিক খাত থেকে অন্যত্র চালিত করে পারমার্থিক আনন্দ লাভ করতে পারেন কিন্তু খুব বেশীর ভাগ নরনারীর পক্ষে ও সমগ্র মানবজাতির পক্ষে যৌনসম্পর্ক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় উপাদান

জীবজগতের সব চেয়ে চমৎকার বৈশিষ্ট্য ফারের কথায় "জগৎব্যাপী মাতৃত্বের প্রবৃত্তি।" জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যেও আমরা মাতৃস্নেহ, আত্মদান ও দুর্বলকে রক্ষা করার উদাহরণ দেখতে পাই। হিংস্র ব্যাঘ্রও স্নেহময়ী মাতা হয়ে ওঠে। হিন্দুশাস্ত্রে তিন প্রকার ঋণশোধের কথা আছে[১]: ঋষিদের কাছে বেদাধ্যয়নের দ্বারা, দেবতাদের কাছে যজ্ঞ দ্বারা আর পিতৃপুরুষদের কাছে সন্তান উৎপাদন দ্বারা আমাদের ঋণশোধ করতে হয়। "নিঃসন্তান রমণীর দান গ্রহণ করলে গ্রহীতার জীবন-শক্তি হ্রাস পায়"; পুরুষ যতদিন না স্ত্রী গ্রহণ করে ততদিন সে অর্ধমানব, শিশুহীন গৃহ শ্মশানের সমান।[২] পরিবারের ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা তীব্রতম সামাজিক প্রবর্তনগুলির অন্যতম। পরিবার সমাজদেহের কোষ এবং কোষ যদি নিজেকে পুনর্জাত করার ইচ্ছা বর্জন করে তো জাতি মরে যায়। পেতাঁা বলেছেন, ফ্রান্সে শিশুর সংখ্যা খুব কম বলেই ফ্রান্সের পতন হয়েছিল। মুমূর্ষু সভ্যতার শেষ অবস্থায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ঔদাসীন্য দেখা যায় ক্ষীয়মাণ জন্মহার তার একটা লক্ষণ। উপনিষদের উপদেশ: "সন্তান-সূত্র কর্তন কোরো না", জাতিকে বেঁচে থাকতে হলে পালন করতে হবে।[৩] যৌনমিলন যতই সুন্দর ও পূত হোক, সন্তান বিনা অসম্পূর্ণ। বন্ধ্যাত্ব পুনর্বিবাহের সমর্থনে যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বিবাহ বৈধ পরিবার গঠনের সামাজিক সম্বন্ধ, যৌনসঙ্গমের অনুমতি-পত্র নয়। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আকর্ষণ সন্তানজন্মের পর বৃদ্ধি পায়। তারা পরস্পরকে আঘাত ও ঘৃণা করতে পারে কিন্তু তাদের খেয়ালের থেকে বড়, তাদের বিবাহের ও

---

১ ব্রহ্মচর্যেন ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ। তৈত্তিরীয় সংহিতা, ষষ্ঠ, ৩, ১০, ৫।

২ যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবৎ অর্ধো ভবেৎ পুমান্
যন্ন বালৈঃ পরিবৃতং শ্মশানমিব তদ্ গৃহম্।

৩ "দেখ, আমি তাকে আশীর্বাদ করেছি, তাকে ফলবান করব ও সন্ততিবৃদ্ধি করব।" নীটসে বলেছেন "নারী-রূপ প্রহেলিকার সমাধান সন্তান।"

ঘৃণার থেকে বড় কিছু তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে। সন্তানের কল্যাণ ইচ্ছা পিতামাতার উভয়ের মধ্যেই থাকে। এই ইচ্ছার ঐক্য কৃত্রিম নয়। এই ইচ্ছা মানুষের স্বভাবগত, শুধু মানুষের কেন সব প্রাণীরই স্বভাবের মৌলিক সত্যের প্রকাশ এই ইচ্ছায়। এই ইচ্ছা থেকেই মাতৃহৃদয়ে স্থায়ী স্নেহ ও আত্মদানের ভাব আসে। জৈব-ভিত্তির উপর পিতৃ-মাতৃত্বের মাধ্যমে জীবনব্যাপী ভাববন্ধন ও জটিল সাংস্কৃতিক বন্ধনের সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক দায়িত্ব ও সেবার সামাজিক সম্পর্ক এইভাবে স্থাপিত হয়। জৈব প্রয়োজন যখন কমে যায় তখন সন্তানস্নেহ বৃদ্ধি পায় এবং সন্তানস্নেহের মধ্য দিয়ে আমরা সংসার-জ্ঞান ও আন্তরিক অভিজ্ঞতা লাভ করি। পিতামাতার কাছে সন্তানরা আধ্যাত্মিক পুষ্টির উৎস।

আগে পুত্রের জন্য আগ্রহ ছিল এবং কন্যার জন্মের জন্য আগ্রহ ছিল না সম্ভবতঃ এই কারণে যে আধিভৌতিক শক্তির বিরুদ্ধে জীবনসংগ্রামে পুত্র কন্যার চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় ছিল। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এবং আদিম সমাজ-ব্যবস্থায় পুত্রের আর্থিক মূল্য কন্যার থেকে বেশী। অবশ্য তার মানে এ নয় যে পিতামাতারা কন্যাকে কম ভালবাসতেন। তখনও মার্জিত রুচির লোকেরা এই ব্যাপারে সুস্থ মনোভাব পোষণ করতেন। শিক্ষিতা কন্যা পরিবারের গর্বের বিষয় ছিল।[১] পিতৃপুরুষের পূজা সম্বন্ধে আগ্রহ যত বাড়ল, ততই পিতৃপুরুষদের পিণ্ডদানের জন্য পুত্রেরাই একমাত্র অধিকারী বলে বিবেচিত হতে লাগল। তাছাড়া কন্যার জন্য যোগ্যপাত্র পাওয়ার অসুবিধাও ছিল এবং বিবাহের পরও কন্যাদের ভবিষ্যৎ ছিল অনিশ্চিত। মেয়েদের সুখ-সুবিধা দানের ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তার জন্যই কন্যার চেয়ে পুত্রলাভ অধিকতর কাম্য বলে বিবেচিত হত, নারীজাতি সম্বন্ধে কোন[২] অবিচারের মনোভাব পুত্রকামনার কারণ নয়।

সব নারীরই মাতৃপ্রবৃত্তি থাকে না। কেউ কেউ মায়ের চেয়ে স্ত্রী হিসাবে বেশী যোগ্যতার পরিচয় দেন। এই দুই প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কোন কোন স্ত্রীলোক এমন আছে যারা মাতৃত্বের বোঝা ছাড়াই যৌনজীবন চায়, আবার এমন স্ত্রীলোকও আছে যাদের যৌনকামনা হয় একেবারেই থাকে না অথবা অল্প থাকে, কিন্তু তাদের মাতৃত্বের কামনা প্রবল। বিবাহের মধ্যে এই প্রবণতার সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়।

১ কন্যেয়ং কুলজীবিতম্—কুমারসম্ভব, ষষ্ঠ, ৬৩,
আরও, বিদ্যাবতী ধর্মপরা কুলস্থী লোকে নারীনাং রমণীয়রত্নম্।

২ পুত্রীতি জাতা মহতীহ চিন্তা কস্মৈ প্রদেয়েতি মহান্ বিতর্কঃ
দত্ত্বা সুখং প্রাপ্যাতি বা ন বেতি কন্যাপিতৃত্বং খলুনাম কষ্টম্।

পঞ্চতন্ত্র, মিত্রভেদ ৫।

নর ও নারী শুধু উন্নত শ্রেণীর পশু নয় আর বিবাহও শুধু জনসৃষ্টির জন্য নয়। প্রেম জৈবস্তরে দুই প্রাণীর পরস্পরের মধ্যে ডুবে যাবার মত নেশার জিনিস নয় আর মানুষরাও শুধু মানবজাতিকে বজায় রাখার যন্ত্র নয়। জৈব প্রয়োজন ছাড়াও সঙ্গীর প্রয়োজন আছে, বিবাহ থেকে সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। নিজের মনের কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করার বুদ্ধির সাহায্যে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার অংশ দেওয়া বা নেওয়ার বাসনা, স্নেহ পাওয়ার ও দেওয়ার বাসনা, এক কথায় অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণতা লাভের ইচ্ছা মানুষের সর্বদাই আছে। শুধু নিজেকে নিয়ে বাঁচা যায় না। আমরা বন্ধু চাই কিন্তু যে বন্ধুর কাছে আমাদের গভীরতম অনুভূতি প্রকাশ করতে পারি না বা যে বন্ধুর সঙ্গে গভীরতম অনুভূতি বিনিময় করা যায় না, সে বন্ধুর বিশেষ মূল্য নেই। আমরা যদি এমন বন্ধুলাভে সমর্থ হই, যার উপর আমাদের পরিপূর্ণ আস্থা আছে, যার সঙ্গে অন্তরের গভীরতম চিন্তা ও অনুভূতি বিনিময় করা যায়, তাহলে আমরা নিজেদের আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করি। অপর পক্ষে যদি স্বকীয়তার বন্ধন এড়াবার জন্য লোকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি, তাহলে সেটা একটা আত্মপ্রশ্রয় দান-এর ব্যাপার হয়ে ওঠে, বিরক্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় মাত্র। আমরা জীবনের কেন্দ্রকে বর্জন করে বহির্মণ্ডলে বৃথা ঘোরাফেরা করি। রাইনের মারিয়া রিল্‌কে'র (Rainer Maria Rilke) ভাষায় প্রেম "সেই বস্তু যেখানে দুই নিঃসঙ্গতা পরস্পরকে রক্ষা করে, স্পর্শ করে ও অভি-বাদন করে।" ওমর যখন বলে ওঠেন,

> "সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের পাশে শীতল ছায় ;
> খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটি যায়।
> তার পাশেতে মৌন ভাঙ্গি গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর,
> সেই তো সখী স্বপ্ন মোদের, সেই বনানী স্বর্গপুর॥"

(অনুবাদ : কান্তিচন্দ্র ঘোষ)

তখন তিনি বলতে চান যে "সাকী" পাশে না থাকলে বাঁচাও যায় না, জীবনকে উপভোগও করা যায় না। এই হল উত্তম সঙ্গ। গানের সুরে প্রকাশ হয় নিষ্ঠা, সত্য, আনুগত্য ও প্রীতিপূর্ণ সেবা। এ সব জিনিস আমরা সকলেই পাবার প্রয়াস করি, কিন্তু খুব কম লোকেই পায়। বন্ধুত্ব আর যৌন আকর্ষণ ভিন্ন বস্তু। পুরুষের কাছে বুদ্ধিমতী ও সহমর্মী নারীসঙ্গ আর নারীর কাছে অনুরূপ পুরুষের সঙ্গ নিষিদ্ধ করা যায় না। প্লেটো বর্ণিত প্রেম যখন দুর্লভ, তখন স্ত্রীর কাছেই বন্ধুত্বের প্রত্যাশা রাখতে হবে। কথিত আছে "স্ত্রীকে স্বামীর সঙ্গে অভিন্নমনা, ছায়ার মত অনুগামিনী, সমস্ত সৎকার্যে সঙ্গিনী ও সর্বদা প্রফুল্ল ও গৃহকর্মে রতা হতে হবে।"[১] ঋগ্বেদের স্ত্রীরা স্বামীর সখী ও একই

১ ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্মসু
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকর্মসু দক্ষয়া।

বিষয়ে আগ্রহবতী ছিলেন। যাকে বলা যায় মানসিক পরিপূরণ বা একই রকমের মেজাজ, তা থাকলে তবেই চিন্তা ও অনুভূতির মিল হয় ও সে মিল ক্রমশ গাঢ় হয়। বুদ্ধি ও সৌন্দর্যবোধের ক্ষেত্রে একই স্তর এবং মূল্যমানের সাদৃশ্য থাকলে তবেই সত্যকার সার্থক বিবাহের সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যায়। ভাব ও অভিলাষের মিলের থেকে দুঃখে ভাগ নেওয়ার ফলে মানুষের সহানুভূতি বেশী লাভ করা যায়। সম্পূর্ণ অভিন্ন দুটি লোক তৈরী করা বিবাহের উদ্দেশ্য নয়। বিভেদ অবশ্য থাকবেই, আর লিঙ্গপ্রভেদ দিয়েই তো শুরু। তবে পার্থক্য খুব বেশী হলে চলবে না। একজন যদি নির্জীব হয় আর একজন অতিরিক্ত প্রাণোচ্ছল হয়, একজন যদি কল্পনাশক্তিহীন আর একজন হঠকারী হয়, তাহলে বিবাহ সফল হবে না। দুজনকে পরস্পরের পরিপূরক হতে হবে, যাতে উভয়েই আত্মা ও নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আবিষ্কারের পরস্পর সহায়ক হয় এবং দুজনে মিলে জীবন-ঐক্যে মধুর হয়ে ওঠে। বিবাহ-সম্পর্ক প্রাণ ও মন দুয়েরই পরিতৃপ্তি বিধান করে। জীবনের যে সমস্ত কাজ নারীরাই ভাল করতে পারে, নারীরা সেই সমস্ত কাজেই জড়িত হয়ে পড়ে এবং পুরুষেরা মানসিক সৃষ্টিতে নিয়োজিত থাকে। কঠোর শ্রম করা, সেবা করা ও পরিবার প্রতিপালন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জাতীয় কর্তব্য। নারী যদি এমন কাজে ব্যাপৃতা থাকে যাতে তার রক্ষণকার্যে অসুবিধা হয়, তাহলে সে তার নিজেরই গভীর সত্তাব বিরোধিতা করবে। আনন্দ দেওয়া, কর্তব্যে প্রেরণা যোগানো তার কাজ, সে যদি পুরুষের নকল করতে চায় তাহলে সে তার নিজের ভূমিকায় সফল হবে না। আধুনিক নারী জননী ও গৃহলক্ষ্মীর ভূমিকায় আর তৃপ্ত নয়, আরও উন্নত কোন কর্মে সে আত্মনিয়োগ করতে চায়। নারীদের শিক্ষার ও চাকুরির ব্যাপারে যদিও বেশী সুযোগ দেওয়া উচিত তবু তাদের প্রধান কাজ হবে মা ও গৃহলক্ষ্মী হওয়া।

বিবাহের মধ্য দিয়ে অপরিহার্য বন্ধুত্বের অভাব যদি না মেটে, তবে তার বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়। এথেন্সের গৌরবময় যুগে পেরিক্লেসের আস্পেসিয়া নামে একজন সুশিক্ষিতা মিলোনিয়ার নারী উপপত্নী ছিল। ডেমোস্থিনিস প্রকাশ্য আদালতে দাবি করেন "স্ত্রী ছাড়া প্রত্যেক মানুষের অন্তত দুজন উপপত্নীর দরকার।"

প্রেম

জৈব, জাতীয় ও মানবিক উপাদানের ভিত্তিতে আমরা আত্মার সৃষ্টিধর্মী জীবনের সুন্দর মন্দিরটি গড়ে তোলার চেষ্টা করি। প্রেম বলতে যৌনসুখ, বংশবৃদ্ধি বা সখ্যের চেয়েও কিছু বেশী বোঝায়। ব্যাপারটা ব্যক্তিগত। এই ঘনিষ্ঠ বন্ধনে পাশবিক প্রয়োজন, বংশপ্রতিষ্ঠা বা আত্মসুখের চেয়ে বেশী কিছু পাওয়া যায়। প্রেমের মধ্য দিয়ে আমরা এক আধ্যাত্মিক সত্তার সৃষ্টি করি, ইন্দ্রিয়সুখ, মনের শান্তি ও আত্মার আনন্দের মধ্য দিয়ে আমাদের নিজস্ব নিয়তির বিকাশ হয়। হৃদয়ের ঝড় আত্মার প্রশান্তিতে হারিয়ে যায়। প্রেম একটা বহ্নিশিখার সঙ্গে আর এক বহ্নিশিখার মিলন নয়, প্রেম হল আত্মার কাছে আত্মার আহ্বান।

মানবজীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে সাম্য অমূল্য। বিবাহ সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে সাম্য স্বীকার করতেই হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কোন কোন ব্যাপারে অসাম্য যে আমরা শুধু মেনে নিই তাই নয়, তাতেই আনন্দ পাই। সত্যকার প্রেম সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্যেই সফল হয়।[১] সত্যকারের প্রেম প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে না। সে কোন কিছু হাতে না রেখে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। যা গুরু তাকে হাল্কা করে ফেলে। কোন বোঝাকেই ভার মনে করে না, শ্রান্তি জানে না, কিছুকেই অসম্ভব মনে করে না, সমস্ত কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে। এইরকম প্রেমই অবিনশ্বর। আমাদের আত্মার গভীরতম প্রদেশে এক অনির্বাণ পবিত্র শিখা আছে। আমরা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা রক্ষা করতে পারি। ইতর, পাশবিক, স্বার্থপর, হিংস্র বা তুচ্ছ মানবিক কামনা বা ভঙ্গুর ভালবাসা বা আদায়ী মনোভাবের সঙ্গে এ প্রেমের কোথাও কোন মিল নেই। এই শক্তি পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে, পৃথিবীকে স্বর্গে [টেনে তোলার জন্য। মন, আত্মা ও দেহের এ মিলন মৃত্যুহীন। সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে এই হল পবিত্রতম। প্রেম আমাদের অন্তরের দিক থেকে সম্পূর্ণ ও তৃপ্ত করে। প্রেমই একমাত্র জিনিস, যা আমরা নিজের বলে দাবি করতে পারি। জীবনের এই একমাত্র সম্পদ যা একান্তভাবেই নিজস্ব, জীবনের আর সব সম্পদই ভাগ করে নিতে হয়। প্রেমের আঘাত যত তিক্ত হোক, এর ত্রুটি যতই শোচনীয় হোক, প্রেমই জীবনের পরম আশীর্বাদ।

আমাদের অধিকাংশের কাছে বিবাহ শুধু একটা জোড় বাঁধা, বংশবৃদ্ধির জন্য পরস্পরকে সহ্য করার প্রচেষ্টা, আদান-প্রদানের ভিত্তিতে একসঙ্গে থাকার সাধনা। কিন্তু কখনও কখনও কোন পুরুষের সঙ্গে এমন নারীর দেখা হয় যাদের জীবনে সব দিক থেকেই মিল লক্ষ্য করা যায়। এরা চিরকাল একসঙ্গে থাকে। আসল প্রেম দেহ ও আত্মার যুগপৎ মিলন, সে মিলন এত ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় যে মনে হয়, তা যতদিন জীবন ততদিন স্থায়ী হবে। এই গভীর ও আবশ্যিক বন্ধন হৃদয়কে স্নেহধারায় এমন ভাবে সিক্ত করে রাখে, জীবনকে আবেগের তীব্রতায় এমন ভাবে নতুন করে যে ঐ ধরনের আর এক সম্পর্কের কথা ভাবাও শুচিতার অবমাননা বলে মনে হয়। মনোনীত পাত্র অল্পায়ু বলে সাবিত্রীর পিতা তাঁকে অন্য স্বামী নির্বাচন করতে বলেন, তাতে সাবিত্রী উত্তর দেন: "স্বল্পায়ু হোক আর দীর্ঘায়ু হোক, সংগুণযুক্ত হোক বা গুণহীন হোক, একবার যাকে নির্বাচিত করেছি, তাকে আর বদলাতে পারব না।[২] যিনি রাক্ষসীমায়াকে ধ্বংস করার জন্য দেবমায়া বলে কথিতা[৩] সেই সীতা সম্বন্ধে হনুমান রামকে বলেন যে তিনি লঙ্কায় শুকিয়ে যাচ্ছেন এবং মৃত্যুর জন্য

---

১ মৃদুত্বং চ তনুত্বং পরাধীনত্বমেব চ
স্ত্রীগুণা ঋষিভিঃ প্রোক্তা ধর্মতত্ত্বার্থদর্শিভিঃ।

মহাভারত, ত্রয়োদশ, ১২, ১৪।

২ দীর্ঘায়ুরথবাঽল্পায়ুঃ, সগুণো নির্গুণোঽপি বা,
সকৃদ্ বৃতো ময়া ভর্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোমি অহম্। মহাভারত।

৩ জনকস্য কুলে জাতা দেবমায়েব নির্মিতা।

রামায়ণ, বালকাণ্ড, প্রথম, ২৫।

প্রস্তুত হচ্ছেন।[১] অথচ রাবণকে জয় করার পর সীতাকে দেখে রামের যুগপৎ পুলক, প্রেম ও লজ্জার উদয় হল আর তিনি বললেন যে সীতার প্রেমের জন্য তিনি যুদ্ধ করেন নি বা জয়লাভ করেন নি, শুধু তাঁর নিজের ও নিজ বংশের সুনাম রক্ষার জন্যই এ কাজ করছেন।[২] রামচন্দ্র সীতাকে আরও বললেন, "আমি তোমাকে ফিরে নিতে চাই না. তুমি যেখানে খুশী যেতে পার. লক্ষ্মণ, ভরত, সুগ্রীব অথবা বিভীষণ, যার কাছে ইচ্ছা যাও।"[৩] অনেকে বলেন, এই বিশ্রী শ্লোকগুলি আদিতে বামায়ণে ছিল না, পরে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু এ থেকে বুঝতে হবে যে পুরুষদের মধ্যে যিনি সব চেয়ে ভাল তিনিও প্রেমের ব্যাপারে ও কষ্ট-সহিষ্ণুতায় আশিতপূর্ণ শিক্ষানবীশ আর এ ব্যাপারে রমণীরাই সার্থক শিল্পী। কালিদাসের লেখায় আছে পতিপরিত্যক্তা সীতা বলছেন, "সন্তানের জন্মের পর আমি সূর্যমুখী হয়ে তপস্যা করব যাতে পরজীবনে তোমাকেই স্বামীরূপে পাই, আর আমাদেব বিচ্ছেদ না হয়।"[৪] সেই নারীরাই সর্বশ্রেষ্ঠা প্রেমিকা, যাদের প্রেম প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে না, যারা পরিত্যাগকারী দয়িতকে বলতে পারে যে "আমার প্রতি তুমি কি ব্যবহার কর, তার উপর আমার প্রেম নির্ভর করে না।" স্পিনোজা কি আমাদের শেখান নি যে প্রতিদানের কথা চিন্তা না করে ভগবানকে ভালবাসাই উচ্চতম ও পবিত্রতম প্রেম? কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রেমের অংশীদার চাই।

প্রেম হুকুম দিয়ে সৃষ্টি করা যায় না। দুটি মানুষের সম্পর্ক সম্পূর্ণ নিজস্ব, এর মধ্যে অন্যের প্রবেশাধিকার নেই। অবিশ্বাসের কাজে ব্যক্তিগত স্বভাবই নষ্ট হয়ে যায়, কেননা ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণতা ও সার্থকতার জন্য যা দরকার, অবিশ্বাস তাকে নষ্ট করার চেষ্টা করে। বিবাহ সম্বন্ধে এই মনোভাব সংস্কৃতিসম্মত। কেননা এমন আদিম জাতি আছে যেখানে নিজের স্ত্রীকে আগন্তুকের কাছে আতিথেয়তার চিহ্নস্বরূপ নিবেদন করা হয় এবং এমনও আছে যেখানে পারিবারিক আয় বাড়ানোর জন্য স্ত্রীকে দিয়ে রোজগার করানো হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্বামীই স্ত্রীকে অন্যের সঙ্গে ভাগে সম্ভোগ করতে রাজী নন এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি এক বিবাহের ভাবকেই পুষ্ট করে।

আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আত্মিক ভাবের মধ্যে বিলীন করে উচ্চতর মিলন লাভের বিবাহ হল সহজ পন্থা কিন্তু একমাত্র পন্থা নয়। প্রেম স্থায়ী বন্ধন সৃষ্টি

---

১ মর্ত্যব্যোতি কৃতনিশ্চয়া। সুন্দরকাণ্ড, ষষ্টিতম, ১৮।

২ যুদ্ধকাণ্ড, অষ্টাদশোত্তর শত, ১৫-১৬।

৩ লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কিং বুদ্ধিং যথাসুখং
সুগ্রীবে বানরেন্দ্রে বা রাক্ষসেন্দ্রে বা বিভীষণে
নিবেশয় মনস সীতে যথা বা সুখমাত্মনা।

যুদ্ধকাণ্ড, অষ্টাদশোত্তর শত, ২০-২৩

৪ সাহং তপঃ সূর্যনিবিষ্টদৃষ্টিরূর্দ্ধং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিস্যে
ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি ত্বমেব ভর্তা ন চ বিপ্রয়োগ।

রঘুবংশ—চতুর্দশ ৬৬।

করে। প্রেমের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়, মানুষ সম্পূর্ণ হয়, বিবাহের উদ্দেশ্যই তাই। আমরা নৈসর্গিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য বিবাহ করি না, বিবাহ করি আত্মার সম্পদ বাড়ানোর জন্য, আত্মনস্তু কামায়, তৃপ্তির ঐশ্বর্য ভোগ করার জন্য। প্রেমভাবাপন্ন হয়ে আমাদের আকুল মন বহির্জগৎকে নূতন রস দিয়ে গ্রহণ করে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম তীব্রতর পুলক অনুভব করে; যেন কোন অদৃশ্য শক্তি পৃথিবীর সমস্ত রঙ নূতন করে রাঙিয়ে দিচ্ছে, যেন প্রত্যেক জীবের মধ্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার করছে। প্রেমকে ইন্দ্রিয় থেকে পৃথক করে, অতিরিক্ত দেহবশ্যতা মুক্ত করা সম্ভব, এতে আমাদের মধ্যে যে পশু ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে আত্মা বশে রাখতে পারে। আমরা তো নারী বা নরকে ভালবাসি না, তার পিছনে যে ব্যক্তি আছে তাকেই ভালবাসি। পদমর্যাদা ঐশ্বর্য বৃত্তি সৌন্দর্য লাবণ্য বা মোহিনী শক্তিকে ভালবাসি না, ব্যক্তিটিকে ভালবাসি। দুটি স্বাধীন ও সমান ব্যক্তির যে আত্মোন্নতি একা একা করা সম্ভব নয়, তাই পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে লাভ করার জন্য যে মিলন তাকেই বলে বিবাহ। বৈসাদৃশ্য থাকবেই তবে যতদূর সম্ভব তার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। স্পিনোজা বলেন, "আমরা এক-একটি বস্তু যত ভাল করে বুঝব, ঈশ্বরকে তত ভাল করে বুঝতে পারব।" পৃথিবীতে ঈশ্বরের কোন জীবকে যে ভালবাসে নি সে ঈশ্বরকে পরিপূর্ণভাবে ভালবাসতে পারে না। এক মানুষের প্রতি আর এক মানুষের ভালবাসার মত এত সত্য ও ধ্রুব ও সুখের উৎস আর কিছু নেই। ভালবাসার মধ্য দিয়েই আমরা যা জানি তার থেকে বেশী জ্ঞানলাভ করি, যা অনুভব করি তার থেকে বেশী ভাল হই, আমরা যা তার থেকে মহত্তর হই। ক্ষুধা ও অসহায়তার মধ্যে হৃদয় চায় যে কোন রকমে হোক তাকে ভালবাসতেই হবে, তার অস্তিত্ব যে সম্পূর্ণ নিরর্থক নয় তা ভালবাসার মধ্য দিয়েই জানা যায়। দুঃখপূর্ণ, অশ্রুসিক্ত পার্থিব প্রেমের মধ্য দিয়েই স্বর্গের পথ।

মহান জগদীশ্বরই নাকি নিজেকে স্বামী ও স্ত্রী এই দুই ভাবে নিজেকে ভাগ করেছেন।[1] পুরুষ স্ত্রী ছাড়া সম্পূর্ণ নয়। স্বামী ও স্ত্রী মিলেই পূর্ণতা। স্ত্রী অর্ধাঙ্গিনী, মহাদেব ও পার্বতীর অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ভারতের বহুস্থানে আছে। প্রেম দুটি মূলতঃ ভিন্ন একক সত্তার দৈহিক বোঝাপড়া, মানসিক আত্মীয়তা আত্মিক বোধের মধ্যে দিয়ে মিলন বোঝায়। পুরুষ ও স্ত্রী শুধু এক দেহ নয়, এক আত্মাও। তাদের যে রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী অভিন্ন হতে হবে তা নয়, তবে তাদের মধ্যে বোঝাপড়া চাই। বিবাহে পারমার্থিক উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রায়োগিক আধেয় থাকে বলেই বিবাহকে সংস্কার বলে। আমাদের উদ্দেশ্য যে দুটি লোক পরস্পরকে ভালবাসে তাদের মিলনসাধন। তাদের বাসনা তৃপ্ত হয়েছে (আপ্তকাম) তাই তাদের আর বাসনা নেই (অকাম)। এই গভীর ও স্নেহার্দ্র যোগসূত্রই হ'ল কোনপ্রকার বিচ্যুতির বিপক্ষে সব চেয়ে ভাল রক্ষাকবচ। যাকে আমরা ভালবাসি, যখন তার সঙ্গে আমরা থাকি

১ স ইমমেবাত্মানম্ দ্বেধাঽপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ ভবতাম্।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ, প্রথম, ৪. ৩.

তখন আমরা তৃপ্ত, তখন কেন জন্মেছি, কেন বাঁচি এসব প্রশ্ন ওঠে না। তখন বুঝি যে সখ্য ও প্রেমের জন্য জন্মেছি।

বিবাহ ও প্রেম

অনেক বিবাহ জৈব স্তরেই থেকে যায়। সেখানে প্রেম নেই, ঠাণ্ডা ও হিসাব করা যৌন বা পাশবিক কামনাই সেখানে সব। সেখানে স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুতে "অভ্যাসচ্যুতির জন্য কষ্ট হয়, হারানো লোকের জন্য শোক হয় না।" বিবাহকে শুধু একটা সুবিধাজনক কর্তব্য মনে করলে বিবাহ সীমিত লক্ষ্যের সুবিধামূলক অনুষ্ঠান হয়ে উঠে।[১] সেক্ষেত্রে বিবাহ দ্বারা প্রাকৃতিক মানুষের উপর যে বাধানিষেধ আরোপ করা হয় তাকে নিগড় বলেই মনে হয়, কেননা সেখানে প্রেম নেই। এমন কি গোড়ায় যে বিবাহ ঐশ্বর্য ও পদমর্যাদা পাবার ইচ্ছা থেকে সাধিত হয়, তা থেকেও গভীরতর ও উন্নততর বস্তুর উদ্ভব হতে পারে। প্রীতিবন্ধ মিলনের আনন্দ সেখানেও ক্রমশ আসতে পাবে। কারুর স্ত্রী হওয়া একটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র, আসল কথা প্রেম।

এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা বলেন, বিবাহপদ্ধতি আনুষ্ঠানিক দিক দিয়েই মারাত্মক।[২] সুখী না হওয়ার জন্য যেন আমরা ছট্‌ফট করি। নিষিদ্ধ বস্তুর উপরই আমাদের আকর্ষণ। অবৈধ ভালবাসা থেকে পরিত্যাগ, আপস, বিচ্ছেদ, অনুতাপ, বিদ্রোহ প্রভৃতি মানুষের অনেক রকম দুঃখের উৎপত্তি। উপন্যাস ও চিত্রে জীবনের যৌন কামনার দিকটাকে বাড়িয়ে দেখানো হয়, বলা হয় ওর মধ্যে যান্ত্রিক একঘেয়েমি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ আছে। মনে হয় যেন অবৈধ যৌন মিলনই সভ্য মানুষের প্রধান পেশা।

উত্তাল প্রবৃত্তির সঙ্গে গভীর প্রেমকে অনেক সময় গুলিয়ে ফেলা হয়। আমাদের মনে হয় আমরা যখন আবেগময় অভিজ্ঞতা লাভ করি, মাথাটা যখন ঘুরে যায়, কি করছি কোথায় যাচ্ছি যখন বুঝতে পারি না, তখন বুঝি আমরা পূর্ণতর, তীব্রতর জীবনযাপন করছি। ওরকম অবস্থায় যেন একটা প্রারম্ভিক ও মহান এক বস্তুর

১ এইচ. জি. ওয়েলস্ বলেন, "বিবাহের সজ্ঞার্থ একজন পুরুষ আর একজন পুরুষের মেয়েকে ভরণপোষণ করার দায়িত্ব বোঝার মত গ্রহণ করে, তা বলে তার শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে দায়িত্ব নেওয়া হল এমন কোন কথা নেই।"

২ সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের রাজতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সময়কার নাট্যকাররা বিশ্বাস করতেন, বিবাহিতের প্রণয় বিরক্তিকর। ভানব্রুগ স্যার জন ব্রুটের জবানীতে বলেছেন: "যদি শুধু বিয়ের চাটনী দিয়ে খেতে হয় তো প্রেমের মাংসটা কি চটচটে! দু বছরের বিয়েতে আমার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো নষ্ট হয়ে গেছে—কোন বালক তার শিক্ষকের উপর এত বিরক্ত হয় না, কোন বালিকা তার বিবুকে এত খারাপ চোখে দেখে না, কোন সন্ন্যাসিনী জপতপ সম্বন্ধে, কোন অবিবাহিতা বৃদ্ধা কুমারীত্ব রক্ষায় শ্রান্ত হয় না আমি যত বিবাহ সম্বন্ধে হয়েছি। স্ত্রী নামেই যেন অভিশাপ আছে!" "মেয়েমানুষ মন্দ নয়, যতদূর জানি তার কোন দোষ নেই, কিন্তু সে যদি স্ত্রী হয় তবেই মরণ" দি প্রোভোকড্ ওয়াইফ, প্রথম, ১, দ্বিতীয়, ১।

নামে সব কিছু বিধি ও শৃঙ্খলা ভাঙা যায়। এরকম সম্পর্কের মধ্যে দুঃখের বীজ লুকানো থাকে, এতে কোন সাহায্যই হয় না, অত্যধিক শ্রান্তি আনে। আমরা যখন প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হই, তখন আর নিজের উপর অধিকার থাকে না। প্রবৃত্তি আমাদের অন্তরের শত্রু, তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই হবে। এটা একটা বিকৃত আতিশয্য, একটা নৈসর্গিক শক্তি, যা প্রণয়ীদের পেয়ে বসে এবং তাদের নষ্ট করে ছাড়ে। প্রেম একটা আকস্মিক হৃদয়োচ্ছ্বাস নয়। প্রেম আন্তরিক ও গভীর সমর্পণ, নিজেকে প্রিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। মহান্ বস্তুর সঙ্গে তুচ্ছ বস্তুকে যেন সমান করার চেষ্টা না করি। গভীর প্রেমের সঙ্গে আবেগপূর্ণ ভালবাসার উত্তেজনার তুলনা হয় না।

প্লেটো তাঁর ফীড্রাস (**Phaedrus**) আর সিম্পোসিয়াম (**Symposium**) নামক পুস্তকে এক রকম খ্যাপামির উল্লেখ করেছেন যা দেহ থেকে জন্মলাভ করে মন পর্যন্ত দূষিত রোগের সঞ্চার করে। এ ধরনের ভালবাসার তিনি অনুমোদন করেন না, কিন্তু আর এক ধরনের উন্মাদনা বা প্রলাপ আছে যা দৈব প্রেরণা ছাড়া মানুষের আত্মায় জন্মায় না। এই উন্মাদনা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ নয়, এর প্রভাব বাইরে থেকে আসে; এই উন্মাদনা আসলে যুক্তি ও স্বাভাবিক বোধের অগম্য এক অনন্ত দিব্যোল্লাস, ভাবাবর্তন। এই ভাব পরম উৎসাহ নামে পরিচিত। এর আসল মানে "ভগবানে পাওয়া", কেননা এ উন্মাদনা শুধু যে দৈবপ্রেরিত তাই নয়, গভীরতমরূপে এর পরিণতি দিব্যভাব লাভে। এ যুগপৎ উন্মাদনা ও পরম প্রকৃতিস্থতা।

যে প্রেম আমাদের উচ্চতম বস্তুর দিকে নিয়ে যায় তার প্রতীকই আদর্শ রমণী। রমণীকে শুধু ভোগের উপাদান বলে মনে করা ঠিক নয়। সত্য বটে সে স্ত্রী, সে সাহায্যকারীও বটে, কিন্তু সে সর্বোপরি ও সর্বপ্রথম একজন মানুষ। সে রহস্য ও পবিত্রতার আধার, তাকে একটা সম্পত্তি, পরিচারিকা বা গৃহকর্ত্রী মাত্র হিসাবে ভাবা যায় না। তার আত্মা আছে, পুরুষের পক্ষে সে সাধারণতঃ বাস্তব বুদ্ধির সেতু। তাকে আমরা যদি শুধু মাতা বা গৃহিণী হিসাবে ধরে দৈনন্দিন তুচ্ছ প্রয়োজনের মধ্যে নামিয়ে আনি তো তার মধ্যেকার সর্বোত্তম সত্তা প্রকটই হবে না। প্রত্যেক পুরুষের মত প্রত্যেক নারীকেও তার আবেগের আগুন, অন্তরের উল্লাস, আত্মার শিখাকে বিকশিত করার সুযোগ দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা বলছে: "আমি চিত্রাঙ্গদা। দেবীও নই আবার সাধারণ করুণার পাত্রীও নই যে পতঙ্গের মত উপেক্ষাভরে ঝেড়ে ফেলে দেবে। তুমি যদি আমাকে বিপদে ও দুঃসাহসিক অভিযানে তোমার পাশে স্থান দাও, তবেই আমার আসল সত্তাকে জানতে পারবে।" বিবাহ অনুষ্ঠানে এই কথাটি স্বীকৃত হওয়া চাই। যে প্রেম সুখে সার্থক তার ইতিহাস নেই, যে প্রেম ব্যর্থ ও জীবনে অভিশপ্ত আমরা তারই কথা বেশী শুনি।

অনেকের অবিন্যস্ত ধারণা যে বিবাহ ও প্রেম পরস্পরবিরোধী।[১] একটা প্রশ্ন

---

১ কাউণ্টেস অফ শাঁপানির বাড়িতে যে প্রেমের আদালত বসেছিল তার বিখ্যাত রায় এইরূপ: "আমরা এতদ্দ্বারা ঘোষণা ও স্বীকার করছি যে দুই বিবাহিত লোকের উপর প্রেমের কোন অধিকার নেই। প্রণয়ীরা পরস্পরকে স্বেচ্ছায় কোন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন দ্বারা উদ্বুদ্ধ না

কখনও কখনও ওঠে, "বিবাহিত লোক প্রেমের কি জানে?" "তারা পরস্পরের প্রতি এত আসক্ত যে তারা বিবাহিত হতে পারে না।" ক্রোচের ভাষায় বিবাহে প্রেমের প্রসাদ নেই, আছে বর্বর আকর্ষণ বা ইন্দ্রিয়পরায়ণতার শোভা। উদ্দেশ্য যখন সাধিত হয় তখন দুই এক হয়ে যায় কিন্তু পথ দীর্ঘ ও দুরূহ। প্রেম বিবাহ-সম্পর্কের যাত্রাপথের শুরু নয়, প্রয়াস ও ধৈর্যলব্ধ সিদ্ধি। যারা প্রথম প্রেমের উত্তেজনা ও আনন্দোল্লাসে একটা মিথ্যা আদর্শ খাড়া করে তাদের বিবাহিত জীবনই সাধারণতঃ বিফল হয়। বিবাহের নবীনত্ব চলে গেলে, নতুন রকমের অভিজ্ঞতা ও রোমান্টিক স্বপ্নের পরেই আসে দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি; অভ্যস্ত স্বামীর মধ্যে রোমান্সের প্রণয়ী হারিয়ে যায়, উদ্বেল আবেগ গার্হস্থ্য শান্তিতে পর্যবসিত হয়। বিবাহ গোলাপ ও স্বপ্নের নিরন্তর অভিজ্ঞতা নয়, নিরুদ্বিগ্ন সুখের প্রস্তুতি। সুখ দেশকালের আকস্মিক ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক্ষণিকের বস্তু। সমস্ত নশ্বর বস্তু যে ধ্বংসের অধীন তা রূপ ও আবেগের শিখাকেও গ্রাস করতে পারে কিন্তু সংযমের পুরস্কার স্বরূপ যে সুখ পাওয়া তার অবিনশ্বর উপাদানকে নষ্ট করতে পারে না। বস্তুত পরিপূর্ণ জীবনের মায়াময় ও ক্ষণস্থায়ী উপাদান যে দেহ তাকে আমরা চাই না। জীবনসঙ্গীকে মেনে নেওয়া ও তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যসমেত তাকে গ্রহণ করার ইচ্ছা বিবাহিত জীবনের বিশ্বস্ততা প্রকাশ করা। প্রথম কয়েক বৎসরের উল্লাস এবং বর্বর উত্তেজনার স্থানে নির্ভরযোগ্য সখ্য, কাজ ও মনকে অংশীদারী, সহিষ্ণুতা ও বোঝাবুঝি এসে বসে। বিবাহ সুখের হতে হলে প্রয়োজন উদার আত্মদান, অনন্ত সহিষ্ণুতা ও ধীরতা, আন্তরিক শিষ্টতা।

বিবাহ যে পরস্পরের উপর স্বত্বস্বামিত্ব অর্পণ করে এরকম ধারণা আসল প্রণয়ের অভিব্যক্তির পরিপন্থী।[১] নিরাপত্তা বোধ আবেগ দমন করে। অভ্যাসে অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যায়, আবেগ নষ্ট হয়, আর আত্মা তৃপ্তি ও ক্ষতি উভয় সম্বন্ধেই অন্ধ হয়।

বিশ্বস্ত এক-বিবাহের আদর্শই লক্ষ্য হওয়া উচিত, যদিও লক্ষ্যসাধন কঠিন। পৃথিবীর বড় বড় কাব্যকাহিনী একনিষ্ঠ প্রেমেরই উপাখ্যান। একের প্রতি নিষ্ঠা বজায় রাখতে যে দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, তাই পৃথিবীর নর-নারীকে মুগ্ধ ও বিচলিত করেছে। জগতের শ্রেষ্ঠতম মনীষীদের একজন বলেছেন যে "খাঁটি প্রেমের পথ কখনও মসৃণ হয় না" যদিও ঘটনাচক্রে ভাগ্যক্রমে সেরকম হয়েও যেতে পারে। বিবাহ একটি শিল্প ও আর্ট, এতে আনন্দও আছে, দুঃখও আছে।

হয়ে সবই দিতে পারে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী কর্তব্যপ্রণোদিত হয়ে পরস্পরকে সব কিছু দিতে বাধ্য থাকে, কিছুই প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।" ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে মের ক্যালেন্ডস্-এর তিনদিন আগে, সপ্তম ঘোষণা। Denis de Rougement লিখিত Passion and Society-তে উদ্ধৃত। ইংরাজী অনুবাদ (১৯৪০) ৪২ পৃঃ।

১ সকলৈর্নায়কগুণৈঃ সহিতঃ সখী মে পতিঃ
স এব যদি জারস্যাৎ সফলং মম জীবিতম্।

সহজিয়ারা মনে করে যে ঈশ্বরের প্রতি যে আবেগপূর্ণ প্রেম অনুভব করা প্রয়োজন, তার আভাস শুধু গোপন অবৈধ প্রণয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়।

জীবনযুদ্ধের কাঠিন্য বিবাহ থেকে শুরু হয়, শেষ হয় না। বিবাহকে সফল করতে হলে দুজনেরই সহযোগিতা দরকার, যদিও বিফল করার পক্ষে একজনই যথেষ্ট। বিবাহের অংশীদারীতে ধৈর্য প্রয়োজন। বিবাহকে পরীক্ষা বলে না ধরে গভীর অভিজ্ঞতা বলে ধরতে হবে, সে অভিজ্ঞতা প্রথমে দুর্বল ও ভঙ্গুর হলেও দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে বেড়ে দৃঢ় হয়। দ্রৌপদী সত্যভামাকে বলেছিলেন, "সুখ থেকে সুখ জন্মায় না, সতী-নারী দুঃখের মধ্য দিয়ে সুখ উপলব্ধি করে।"[১] সংকট দ্বারা যে আহত হয় নি; সে নারী অসম্পূর্ণা, কেননা যন্ত্রণার দীক্ষায় সে বঞ্চিত। উমা শিবকে তাঁর অপরূপ রূপলাবণ্য দিয়ে পান নি, পেয়েছিলেন কঠোর কষ্টের তপস্যার ফলে। নারীর কষ্ট সহ্য করার প্রতিভা আছে, সে যদি তাকে এড়িয়ে চলে তো জীবনানন্দ অনুভব করার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলে। শকুন্তলায় কালিদাস দেখিয়েছেন যে দুটি প্রেমময় আত্মা কি ভাবে দুঃখের মধ্যে পড়ে সুসম্বন্ধ হয়, পরস্পরের যোগ্য হয়ে গড়ে ওঠে। দেবতারা অদ্ভুত। আমাদের মধ্যে যা ভাল, শান্ত, মানবতা ও প্রেম-পূর্ণ তার ভেতর দিয়েই তাঁরা আমাদের জন্য সংকট সৃষ্টি করেন। তাঁরা আমাদের দুঃখ দিয়ে বড় জিনিসের জন্য প্রস্তুত করেন। বহু শতাব্দীর ঐতিহ্য-বাহিনী ভারতীয় নারী পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিঃস্বার্থ সব চেয়ে আত্মত্যাগী, সব চেয়ে ধৈর্যশালিনী, সব চেয়ে কর্তব্যপরায়ণা, দুঃখভোগেই তার গর্ব।

বিবাহের উদ্দেশ্য বিবাহেই শেষ নয়, বিবাহ আত্ম-পরিপূর্ণতা লাভ করার সাধারণ উপায় মাত্র। মানুষের সঙ্গে সম্পর্কই আমাদের জীবনের ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিগত ব্যাপার, এর মধ্যেই আমরা নিজেদের সম্পূর্ণ করে পাই। আমাদের যে জীবন বাইরের জনসাধারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাতে আমাদের একটা অংশ মাত্র সক্রিয় হয়। আমাদের প্রেমময় ও সহমর্মী ব্যক্তিগত জীবনের নিজের বাইরে কোন লক্ষ্য নেই। মানুষের পক্ষে নিজেদের অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান, পরস্পরের সঙ্গে বোঝা-পড়া করা, পরস্পরের সঙ্গে মনবিনিময় করে আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া স্বাভাবিক। যদিও এ সম্পর্কে কোন আংশিক বা সীমিত উদ্দেশ্য সাধন করে না, এবং সমাজেরও কাজে লাগে না, তবু একে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সমাজ ও আইন দুই আছে। এমন জনগোষ্ঠী আছে, যা ব্যক্তিগত নয়, যেখানে গোষ্ঠীতে তার কর্তব্য দিয়ে ব্যক্তির স্থান নিরূপিত হয়, সমগ্রের কল্যাণে সে কি কাজে আসে সেইটাই সেখানে বড়। যে লক্ষ্যে আমাদের সকলেরই স্বার্থ আছে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে যখন আমরা অন্যের সঙ্গে মিলিত হই, তখন কর্মীগোষ্ঠী ও সামাজিক সহযোগিতার উদ্ভব হয়। সংঘর্ষ এড়িয়ে সাধারণ উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে আমাদের আইন-নির্দিষ্ট বা প্রথা-সমর্থিত বিধিনিষেধ মানতে হয়। ব্যক্তি সমাজের অঙ্গ, কাজেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা কিছু পরিমাণে সীমায়িত করার অধিকার সমাজের আছে।

সুবিন্যস্ত সমাজে এসব বিধিনিষেধ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নিগড় বলে মনে

---

১ সুখং সুখেনেহ ন জাতু লভ্যং দুঃখেন সাধ্বী লভতে সুখানি।
বনপর্ব, ২৩৩'৪।

হবে না। যেহেতু বিবাহের ফল সমাজদেহে সংক্রামিত হয়, সেই হেতু বিবাহ ব্যাপারে সামাজিক বিধি প্রণয়ন করা হয়। তবে সামাজিক বিধি দিয়ে সমস্ত প্রকার সামাজিক অবিচার ও অকল্যাণের প্রতিকার হয় না। মানুষের তৈরী আইনকানুন মানুষের মনের সব খেয়ালের সঙ্গে কখনই খাপ খাইয়ে চলতে পারে না। কিন্তু সেগুলি যদি কঠিন ও অনমনীয় হয় তো আমাদের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে আমাদের অর্থহীন বিকলাঙ্গ জীবনযাপন করতে বাধ্য করতে পারে।

হিন্দু-বিবাহানুষ্ঠান

হিন্দুদের জীবনের পুরুষার্থ বা লক্ষ্য চারটি—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই উদ্দেশ্য সাধনে যে সৃজনধর্মী জীবনযাপন করা প্রয়োজন তারই মধ্যে অংশগ্রহণ করার জন্য একটি নর ও একটি নারীর যে সাহচর্য তাই হিন্দু বিবাহের আসল আদর্শ। সন্তান উৎপাদন, তাদের পালন ও উন্নততর সমাজ-বিন্যাসে সহযোগিতা তো আছেই, কিন্তু বিবাহের প্রধান লক্ষ্য স্থায়ী সাহচর্যের প্রয়োজন মিটিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ করা, যাতে একজনের জীবন আর একজনের পরিপূরক হয় এবং দুজনে মিলে সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে। বিবাহিত দম্পতির ব্যক্তিত্ব পরস্পরের সৃষ্টি। এ আদর্শ বৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে এবং বিস্তৃত বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে তার স্বীকৃতি রয়েছে এবং সে অনুষ্ঠান আজ অবধি প্রচলিত রয়েছে। হৃদয়াবেগের যে পূর্ণতায় ন্যায়বুদ্ধি, বোঝাবুঝির ক্ষমতা, অন্যের সম্বন্ধে বিবেচনা ও সহিষ্ণুতা জন্মায় তার বিকাশের জন্য মহৎ সুযোগের প্রারম্ভ বিবাহ-অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানটিকে সরল করে আনা যায়, কেননা নবদম্পতির মনে আদর্শের ছাপ রাখার জন্য যে আচার অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক তার সংখ্যা খুব কম।

প্রথমতঃ পাণিগ্রহণ, বর কনের হাত ধরে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করে। সমৃদ্ধি সৌভাগ্য ও দাম্পত্যনিষ্ঠার অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ, যথাক্রমে পূষণ, ভগ ও আর্যমনের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয়। উভয়পক্ষ বক্ষদেশ স্পর্শ করে বলে যে দুই দেহ হলেও অতঃপর যেন তারা একমন হয়। "তোমার হৃদয়ে যেন দুঃখ কখনও প্রবেশ করতে না পায়, স্বামীগৃহে তোমার সমৃদ্ধি হোক, তার জীবনের ও প্রফুল্ল শিশুদের জীবনের আশীর্বাদে তোমার জীবন পবিত্র হোক।" তারপর তারা একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করে তাদের প্রেম যেন পায়ের নীচের পাথরের মতই স্থায়ী ও দৃঢ় হয়। রাত্রে ধ্রুবতারা ও অরুন্ধতীকে দেখানো হয়। বরকে ধ্রুবতারার মত অবিচল ও কন্যাকে অরুন্ধতীর মত সতী হতে বলা হয়। সপ্তপদী অনুষ্ঠানে বর-কনে একসঙ্গে সাতবার পা ফেলে এগিয়ে চলে এবং প্রার্থনা করে যেন তাদের বিবাহিত জীবন প্রেম, ঔজ্জ্বল্য, সুযোগ, সমৃদ্ধি, আনন্দ, সন্ততি ও পবিত্রতা দ্বারা পূর্ণ হয়। স্বামী স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলে, "সপ্তপদ সম্পূর্ণ করে আমার সাথী হও। আমি যেন তোমার সহচর হই। কেউ যেন তোমার সঙ্গে আমার সাহচর্য নষ্ট না করতে পারে। যাঁরা আমাদের কল্যাণকামী তাঁরা যেন আমাদের সাহচর্যের সমর্থন করেন।" স্বামী-স্ত্রী শপথ গ্রহণ করে যেন ধর্ম, প্রেম

ও পার্থিব সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরস্পরের আশা ও আকাঙ্ক্ষা তারা তৃপ্ত করতে পারে।[১] "মহামিলনটি যেন অবিচ্ছেদ্য হয়" এই প্রার্থনা দিয়ে উৎসব শেষ হয়। বিশ্বদেবতারা আমাদের হৃদয় যুক্ত করুন, জল আমাদের হৃদয়কে মিলিত করুন। মাতরিশ্বন, ধাতর ও দেবেষ্ট্রি আমাদের বন্ধন নিবিড় করুন।[২] নারীকে আশীর্বাদ করা হয় দীর্ঘায়ু স্বামীর সৎ স্ত্রী হওয়ার জন্য।[৩] সপ্তপদী অনুষ্ঠানের শেষে কন্যা স্বামীর পরিবারভুক্ত হয়। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ সম্পূর্ণ হল বলে ধরা যায়। অনেকে আবার মনে করেন যে বিবাহের সম্পূর্ণতার জন্য সহবাস প্রয়োজন। বিবাহের পর তিন রাত্রি দুইজনে একই ঘরে ভিন্ন শয্যায় শয়ন করে থাকবে এবং সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করবে।[৪] বিবাহজীবনে যে ইন্দ্রিয় সংযম অপরিহার্য, এ তারই স্মারক। পাত্র পাত্রী পবিত্র থেকে বিবাহে প্রবিষ্ট হতে হয়। তারা তাদের সতীত্বকে রক্ষা করে ও বিবাহের সময় অপরকে তাই অর্ঘ্য দেয়। এর অভাব আর কোন বস্তু দিয়ে পূরণ করা যায় না।[৫]

স্ত্রীর আসন বেশ উচ্চে। সে-ই গৃহকর্ত্রী, শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদ ইত্যাদির উপর তার পূর্ণ কর্তৃত্ব।[৬] জীবনের সে সক্রিয় অংশীদার।[৭] ধর্মাচরণ, বিষয়

---

১ খৃষ্টান সূত্র "আমি তোমাকে বিবাহিত স্ত্রী বলে গ্রহণ করছি, এই দিন থেকে ভাল হোক মন্দ হোক, ধনী হই বা নির্ধন হই, সুস্থ হই বা অসুস্থ হই, আমরণ তোমাকে পাব ও রক্ষা করব এবং তার জন্য সত্যবদ্ধ হচ্ছি।"

২ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ।—ঋগ্বেদ, দশম. ৮৫, ৪৭।

৩ অবিধবা বর্ষাণি শতং সাগ্রং চ সুব্রতা
তেজস্বী চ যশস্বী চ ধর্মপত্নী পরিব্রতা।

৪ বিবাহবাসরের পর এক বর্ষ পর্যন্ত তারা সঙ্গত হবে না, অথবা দ্বাদশ রাত্রি বা ছয় রাত্রি অন্ততঃ তিন রাত্রি। (সম্বৎসরং ন মিথুনম্ উপেয়াতাং দ্বাদশরাত্রম্ ষড়রাত্রং ত্রিরাত্রমন্তত) পরাশর, গৃহ্যসূত্র প্রথম, ৮১।
স্পার্টার লাইকার্গাসও নববিবাহিত স্বামীদের বহুদিন সংযমী হয়ে থাকার বিধান দিয়েছেন।

৫ হিন্দু ঐতিহ্য ব্রহ্মচর্য ও নারীর সম্মান শেখায়। রাম লক্ষ্মণ যখন সীতার অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন সীতা পথে যে সব অলংকার নিশানার উদ্দেশ্যে ফেলে গিয়েছিলেন সেগুলি সুগ্রীব তাঁদের সামনে রাখেন। দেখে রামের চোখ জলে ভরে এল, তিনি লক্ষ্মণকে সেগুলি সনাক্ত করতে বললেন। লক্ষ্মণ বললেন যে কেয়ূর, কুণ্ডল তিনি চিনতে পারছেন না, তবে নূপুর চিনতে পারছেন, কেননা প্রত্যহ তাঁর চরণ বন্দনা করার সময় তারা তাঁর পরিচিত হয়ে আছে।
নাহং জানামি কেয়ূরে, নাহং জানামি কুণ্ডলে, নূপুরে ত্বাভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনম্।

৬ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রুবং ভব
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু।

৭ অর্দ্ধং ভার্য্যা শরীরস্য (স্ত্রী শরীরের অর্ধাংশ)

ব্যাপার বা ভাবজীবনে তাকে বর্জন করা উচিত নয়। সমস্ত ধর্মাচরণ একসঙ্গে করতে হবে।[১]

সীতাকে বনবাসে দেওয়ার পর রাম স্বর্ণসীতাকে পাশে রেখে যাগযজ্ঞ করতেন। কুল্লূক মনুসংহিতার ভাষ্যে[২] বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণ থেকে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি উদ্ধার করেছেন: "পুরুষ নিজে অর্ধ মাত্র। স্ত্রী গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত সে অসম্পূর্ণ, পূর্ণজাত নয়। স্ত্রী গ্রহণ করার পরই সে পূর্ণ হয়।" সেইজন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরা ঘোষণা করেন: "যে স্বামী সেই স্ত্রী।"[৩] পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সম্পর্ক সহযোগিতার ও পরস্পর নির্ভরতার। তারা স্বতন্ত্রভাবে অসম্পূর্ণ কিন্তু মিলিত হয়ে একে অপরকে পূর্ণ করে। এই সম্পর্ককে ভারত অর্ধনারীশ্বর মূর্তির মধ্যে স্বীকৃতি দিয়েছে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সর্বোত্তম বন্ধু, সমস্ত সম্বন্ধের সার, সমস্ত বাসনার তৃপ্তি, সমগ্র জীবন। স্বামীর কাছে স্ত্রীও এইরূপ, স্ত্রীর কাছে স্বামীও এইরূপ।[৪]

সীতা স্বামীর দুঃখে অংশ নেওয়ার জন্য বনবাস বরণ করলেন, গান্ধারী স্বামী যে সুখে বঞ্চিত তা বর্জন করার জন্য চোখ বেঁধে রাখতেন। লজ্জানম্রা, শুচিস্মিতা কান্তাসখি আদর্শ স্ত্রী পুরুষের অশেষ তৃপ্তির আধার।[৫] আবার যে স্ত্রী স্বামীর সুখ ও কল্যাণকামী, যার আচরণ শুদ্ধ, যে সংযমী, সে ইহলোকে যশস্বিনী ও পরলোকে অশেষ সুখভাগিনী হয়।[৬] কালিদাস স্বামী-স্ত্রীকে শব্দ

---

১ ধর্মে চ অর্থে চ কামে চ অনতিচরিতব্যা সহধর্মশ্চরিতব্যঃ সহাপত্যমুত্পাদয়িতব্যম্।

রামকৃষ্ণ স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য কি ভাবে নিজের জীবনের ব্রত বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন সেকথা বিবেকানন্দ বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁকে বলেন, "আমি প্রত্যেক নারীকে জননী রূপে দেখতে শিখেছি। তোমার সম্বন্ধেও এই ধারণাই আমার থাকতে পারে। কিন্তু আমি যখন তোমাকে বিয়ে করেছি, তুমি যদি আমাকে সংসার করতে বল তো আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব।" কাজেই রামকৃষ্ণ তাঁর সাধনার জীবন তাঁর স্ত্রীর সম্মতিক্রমেই গ্রহণ করেছিলেন। Complete Works, Third Edition (1928) IV. 169.

২ নবম, ৪৫।

৩ অর্ধো হি এষ আত্মনঃ; তস্মাজ্জায়াং ন বিন্দতে, নৈতাবৎ প্রজায়তে, অসর্বো হি তাবদ্ভবতি। অথ, যদৈব জায়াং বিন্দতে অথ প্রজায়তে, তর্হি সর্বো ভবতি। তথাচ এতদ্বেদবিদো বিপ্রা বদন্তি যো ভর্তা স ইব ভার্যা স্মৃতা। নবম্ ৪৫।

৪ প্রেয়ো মিত্রং বন্ধুতা যা সমগ্রা সর্বেকামাঃ সেবাধির্জীবিতম্বা।
স্ত্রীণাং ভর্তা ধর্মদারাশ্চ পুংসামিতি অন্যোন্যং বৎসয়োর্জ্ঞাতমস্তু। মালতীমাধব ষষ্ঠ, ১৮।

আবার, অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরণুগুণং সর্বাস্ববস্থাসু যৎ
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরস যস্মিন্ন হার্যো রসঃ। উত্তররামচরিত, ষষ্ঠ, ৩৯।

৫ কার্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী ভোজ্যেষু মাতা শয়নেষু রম্ভা
ধর্মানুকূলা ক্ষময়া ধরিত্রী ষড়্গুণ্যমেতদ্ধি পতিব্রতানাম্।

৬ পতিপ্রিয় হিতেযুক্তা স্বাচারা সম্যতেন্দ্রিয়
ইহ কীর্তিমাপ্নোতি প্রেত্যচানুপমং সুখং

ও তার অর্থের সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন।[১] সীতা অনসূয়াকে বলছেন যে তাঁর স্বামী তাঁকে পিতামাতার মত ভালবাসতেন।[২] এ আদর্শ, এই কল্পনাকে সার্থক করার জন্য নরনারী উভয়েই প্রয়াসী হয়।

গৃহস্থালি সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ। গৃহস্থ এর মধ্য দিয়েই মোক্ষলাভ করে। বশিষ্ঠ বলেন, গৃহস্থের জীবন সেবা ও তপস্যার জীবন এবং গার্হস্থ্যাশ্রম আশ্রমসমূহের মধ্যে বিশিষ্ট।[৩] স্ত্রী-পুত্র থাকলেই গৃহ হয় না, সামাজিক কর্তব্য পালন করা দরকার।"[৪] ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ সত্য জ্ঞান লাভের চেষ্টা করবেন এবং সমস্ত কর্ম ভগবানকে সমর্পণ করবেন।[৫]

বিবাহের বিবিধ রূপ

দুই মহাকাব্য, স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্রে আট রকম বিবাহের উল্লেখ আছে,[৬] যার মধ্যে পূর্ববর্তী যুগে প্রচলিত কোন কোন প্রথা পরবর্তী যুগে স্বীকৃত হয়েছে। এর অনেকগুলি ঋগ্বেদের আমল থেকে চলে আসছে। প্রাচীনকালের বিশ্বাস ও আচরণ অকেজো হয়ে গেলেও তাদের রক্ষা করার একটা প্রবণতা হিন্দুত্বের আছে। ঐ আট রকমের চারটি সমর্থিত, বাকীগুলি অসমর্থিত।

পাত্রীকে বলপূর্বক গ্রহণ করাকে পৈশাচ বিবাহ বলে ও সেটা খুব নিম্নস্তরের। পাত্রীকে ঠকিয়ে বা নেশা করিয়ে স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হয়। বৌধায়ন বলেন, "সুপ্তা, অচৈতন্যা বা উন্মত্তা বালিকাকে বিবাহ পৈশাচ বিবাহ।"[৭]

আবার, পতিব্রতা পতিপ্রাণা পত্যুঃ প্রিয়হিতেরতা
যস্যাস্যাদীদৃশী ভার্যা ধন্য স পুরুষ ভুবি।

১ বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ। রঘুবংশ, প্রথম, ১।

২ মাতৃবৎ পিতৃবৎ প্রিয়াৎ। রামায়ণে কৌশল্যাকে দশরথের আদর্শ স্ত্রী বলে দেখানো হয়েছে।
যদা যদা হি কৌশল্যা দাসীবচ্চ সখী ইব চ ভার্যাবদ ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চ উপতিষ্ঠতে।

রঘুবংশে কালিদাস ইন্দুমতীকে "গৃহিণী, সচিবঃ, সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ" বলেছেন।

বরাহমিহির বলেছেন, "জায়া বা জনয়িত্রী বা সম্ভবঃ স্ত্রীকৃতো নৃণাম।
হে কৃতঘ্নাঃ তয়োর্নিন্দাম্ কুর্বতাং বঃ কুতঃ সুখং?

৩ গৃহস্থ এব যজতে, গৃহস্থস্তপ্যতে, তপশ্চাতুর্ণামাশ্রমানান্তু গৃহস্থস্তু বিশিষ্যতে।

৪ গৃহস্থোপি ক্রিয়াযুক্তো নাগৃহেন গৃহাশ্রমী
ন চৈব পুত্রদারেণ স্বকর্ম পরিবর্জিতা।

৫ ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃস্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ
যদ্ যদ্ কর্ম প্রকুর্বীত তদ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ

৬ বশিষ্ঠ ও আপস্তম্ব মাত্র ছয় প্রকারের বিবাহের উল্লেখ করেছেন: ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব, ক্ষত্র (বা রাক্ষস) এবং মানুষ (আসুর)। গৌতম ও বৌধায়ন আরও দু প্রকারের বিবাহ যোগ করেছেন: প্রাজাপত্য এবং পৈশাচ। মহাভারত, প্রথম ৭৪, ৮-৯৩ দ্রষ্টব্য।

৭ প্রথম, ১১, ৯।

এ ধরনের বিবাহকে নীচ বলে নিন্দা করা হত, কিন্তু যেহেতু কয়েকটি উপজাতির মধ্যে এ প্রচলিত ছিল, তাই একেও বৈধ বলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া যে সমাজে কৌমার্য পবিত্র বলে ধরা হত, সে সমাজে যে রমণী তার কুমারীত্ব হারিয়েছে তার ভালরকম বিবাহের সম্ভাবনা ছিল না, কাজেই যে পাষণ্ড তার কুমারীত্ব নষ্ট করেছে, ধর্ষিতাকে বিবাহ করতে শাস্ত্রকারেরা তাকে বাধ্য করতে চাইতেন।

যে যুগে নারীদের যুদ্ধে লুটের সামগ্রী বলে পরিগণিত করা হত, রাক্ষস বিবাহ সেই যুগের। বিজয়ী কনেকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করত। অনেক ক্ষেত্রে রমণী স্বেচ্ছায় বিজেতার সঙ্গে চলে গেছে। রুক্মিণী, সুভদ্রা, বাসবদত্তা তাদের স্বামী কৃষ্ণ, অর্জুন ও উদয়নকে সাহায্য করেছে। ঋগ্বেদের আমলে আর্য প্রভুরা ক্রীতদাসীতে সঙ্গত হতেন, কিন্তু এসব সম্পর্কও বৈধ বলে স্বীকৃত হয়েছিল।

আসুর বিবাহে বর কনেকে কিনে নেন। মূল্য দিয়ে বিবাহ।[১] এই প্রথায় নারীর মূল্য মেনে নেওয়া হয়েছে, নারী বিনামূল্যে পাওয়া যায় না বলে মনে করা হয়েছে। এই বিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু এর পিছনে সমর্থন ছিল না। কন্যাক্রেতা জামাতাকে বিজানাত বলে।[২] এই তিন ধরনের বিয়েই সম্পূর্ণ নিন্দিত।

গান্ধর্ব বিবাহ পরস্পরের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে সাধারণতঃ সমর্থিত।[৩] একজন আর একজনকে বেছে নেয়, কামসূত্র মতে এই আদর্শ বিবাহ।[৪] এই স্বতঃস্ফূর্ত বিবাহের কোন অনুষ্ঠান বা উৎসব নেই। মধ্যরাত্রে পলায়ন, ক্রুদ্ধ পিতামাতা ইত্যাদি কাব্যের উপাদান সম্বলিত বিবাহ এই পর্যায়ে পড়ে। এই ধরনের বিবাহের সব চেয়ে হৃদয়গ্রাহী উদাহরণ কালিদাসের মহান্ নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলায় বর্ণিত দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার বিবাহ। কবির ইঙ্গিত প্রবৃত্তির তাড়নায় সিদ্ধ এই ধরনের বিবাহ স্থায়ী না হওয়ারই সম্ভাবনা। প্রথম দর্শনেই প্রেমের ভিত্তিতে গোপন মিলন যথেষ্ট নয় বলে কন্যা অভিশপ্ত হল এবং তাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হল। রাজসভায় সে অপমানিতা ও পরিত্যক্তা হল। যখন সে তপশ্চর্যা দ্বারা শুচি হল এবং কামনার বন্ধন কর্তব্যের অনাসক্তিতে পর্যবসিত হল তখনই শকুন্তলা স্ত্রী ও জননীর আসনে সুপ্রতিষ্ঠিতা হল। ত্যাগের কঠোরতার দ্বারা কামনার আবেগ তপঃনিষ্ঠার রূপ নিল। গান্ধর্ব বিবাহে মন্ত্রোচ্চারণ হত না বলে[৫] তাকে জাতে তোলার জন্য বিধান দেওয়া হয় যে মিলনের পর অনুষ্ঠান করতে হবে,[৬] অন্তত তিন উচ্চবর্ণের জন্য[৭] এই রীতিতে বিবাহ যেন সামাজিক

---

১ ঋগ্বেদ, দশম, ২৭, ১২।

২ ঋগ্বেদ, প্রথম, ১০৯ ৩ বৌধায়ন (প্রথম, দ্বিতীয় ২০-২১) এর নিন্দা করেছেন, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মকাণ্ড, ২৭-২৬৩ দ্রষ্টব্য।

৪ গান্ধর্বমপ্যেকে প্রশংসন্তি সর্বেষাং স্নেহানুগতত্বাৎ। বৌধায়ন প্রথম, দ্বিতীয়, ১৩৭।

৫ তৃতীয়, ৫, ৩০। ৫ নিমন্ত্র।

৬ দেবল, মনুতে কুল্লুক কর্তৃক উদ্ধৃত, অষ্টম, ২২৬।

৭ গান্ধর্বেষু বিবাহেষু পুনর্বৈবাহিকো বিধিঃ
কর্তব্যশ্চ ত্রিভির্বর্ণৈঃ সময়েনাগ্নিসাক্ষিকঃ। দেবল।

সমর্থনের প্রতীক। যখন থেকে বাল্যবিবাহপ্রথা চালু হল তখন থেকে পারস্পরিক প্রেমের আকর্ষণের কোন ভিত্তি রইল না।

আর্ষ বিবাহে পাত্রীর পিতাকে জামাতার কাছ থেকে একটি গরু ও একটি ষাঁড় গ্রহণ করতে দেওয়া হয়। এটা আসুর বিবাহের পরিবর্তিত রূপ এবং সমর্থিত বিবাহের মধ্যে নীচু স্তরের।

দৈব বিবাহে পূজক তাঁর কন্যাকে পূজারীর কাছে বিবাহে অর্পণ করেন। একে দৈব বিবাহ বলে এইজন্য যে দেবতার কাছে যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় এই বিবাহ নির্ণীত হয়। এরকম বিবাহের স্থান খুব উচ্চ নয় এইজন্য যে ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে বিবাহানুষ্ঠান মিশ্রিত করা উচিত নয়। বৈদিক যজ্ঞ উঠে যাওয়াতে এ ধরনের বিবাহ লোপ পেয়েছে।

প্রাজাপত্য বিবাহে কন্যাকে যথোপযুক্ত সমারোহ সহকারে বরের হাতে সমর্পণ করা হয় আর দম্পতিকে ধর্মাচরণে অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হয়ে থাকতে বলা হয়। পিতা সমর্পণের সময়ে কন্যাকে আদেশ করেন, "একসঙ্গে শাস্ত্রবাক্য পালন কর।" ব্রাহ্মবিবাহ প্রায় এই রকমই। এই রীতিতে বরকে বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রণ করে সালংকারা কন্যাকে অর্পণ করা হয়। বর গ্রহণকালে শপথ করে যে সর্বদা সর্ব কর্মে সে সস্ত্রীক আচরণ করবে।[১]

অনেক বিবাহ উর্বশী ও পুরূরবার বিবাহের মত, শুধু একটা অঙ্গীকার মাত্র। রমণী তার দেহ দেয় কিন্তু আত্মসমর্পণ করে না।[২] এ হল যৌন সম্পর্কের অপব্যবহার। দৈহিক মিলন আন্তরিক আধ্যাত্মিক প্রসাদের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যাদের আত্মা অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হয়েছে, তারা দেহের মিলনকে আত্মার মিলনের বহিরঙ্গ বলে মনে করে। আমাদের মনে রাখতে হবে যৌন মিলন জীবনের মহান্ সংস্কার। আন্তরিক সতীত্বের উদাহরণ যথেষ্ট আছে, যেখানে নারীর দৈহিক পবিত্রতা জোর করে নষ্ট করা হয়েছে, বা নারী নিজের দেহের ভাবরাজ্যে অস্তিত্ব অবর্তমান জেনে দেহদান করেছে।

ব্রাহ্মবিবাহ সব শ্রেণীর মধ্যে সমর্থিত ও জনপ্রিয়। এতে দম্পতি প্রার্থনা করে যেন তাদের মৈত্রী ও প্রেম স্থায়ী ও যথার্থ হয়। অন্য রকমের বিবাহে বলপূর্বক হরণ (আসুর), বলাৎকার (রাক্ষস) এবং ফুসলানোকেও (গান্ধর্ব) বৈধ বলা হয়। এ সব সভ্যতার বিকৃত রূপ। এসব বিবাহ-প্রথায় রমণীকে যৌনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য প্রয়োজনীয় পাত্রী মাত্র বিবেচনা করে তাকে ব্যক্তিত্ব-শূন্য করা হয় এবং তার সাম্যের অধিকার অস্বীকার করা হয়। শাস্ত্র যে এ প্রথার নিন্দা করে, তার কারণ শাস্ত্রকাররা চান না যে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে একজনের পছন্দের উপর নির্ভর করে। শাস্ত্রকাররা নারীর স্বার্থেই এসব বিবাহ-বিধি স্বীকার করেছিলেন।

---

১ মালাবারে সম্বন্ধ বিবাহ আইনঘটিত বিবাহের মত, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার থাকে। বর কন্যাকে একখানি বস্ত্র সমর্পণ করবে ও সামাজিক একটা ভোজ দেবে। ব্যস্। স্ত্রীর বৈধ মর্যাদা আছে যদিও সে স্বামীর ধর্মজীবনে অংশগ্রহণ করে না। বিবাহের সন্তানরা মাতার গোত্র পায়।

২ ঋগ্বেদ, দশম, ৯৫. ৫।

বেদের ঋষিরা শিখিয়েছেন যে যৌন ব্যাপারে অনেক সহিষ্ণুতা দরকার, কেননা লোকেদের মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য। নীতি বৈধ অনুষ্ঠানের উপর ততটা নির্ভর করে না যতটা নর ও নারীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের উপর। বর্তমানে বিবাহের প্রচলিত রূপ ব্রাহ্মবিবাহের আদর্শে যদিও কখনও কখনও গান্ধর্ব ও আসুর বিবাহও দেখা যায়।

বাল্যবিবাহ

বৈদিক যুগে বা রামায়ণ মহাভারতের আমলে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না। সুশ্রুত বলেন যে পুরুষের দৈহিক শক্তির পূর্ণ পরিণতি হয় পঁচিশ বৎসর বয়সে ও নারীর ষোল বৎসর বয়সে[১] যদিও যৌবনপ্রাপ্তির লক্ষণ বারো বৎসর বয়সেই দেখা দিতে পারে। ঐ বয়ঃপ্রাপ্তির আগে বিবাহ হলে তা হানিকর হতে পারে।[২] যদি পঁচিশ বৎসর বয়স হবার আগে কোন পুরুষ ষোল বৎসরের কম বয়সের বালিকার গর্ভাধান করে, তাহলে হয় ভ্রূণ গর্ভেই মরে যায় নয় যদি জন্মায়ও তো অল্পায়ু হয় আর যদি বেশীদিন বাঁচেও তো দুর্বল হবে। অতএব অপরিণত বালিকার গর্ভাধান করা উচিত নয়।[৩] প্রাচীনকালে চিকিৎসকের এই উপদেশ অনুসৃত হত। বৈদিক বিবাহ প্রথায় ধরে নেওয়া হয়েছে যে যেসব কন্যা অংশগ্রহণ করতে পারে, তারা মনে ও দেহে পরিণত স্ত্রীলোক, বিবাহিত জীবন আরম্ভ করতে প্রস্তুত। উদ্বাহ শব্দের অর্থই হল যে বালিকা স্ত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করতে প্রস্তুত। বিবাহ মন্ত্রে[৪] দেখা যায় বালিকা যৌবনোৎফুল্লা ও স্বামী সঙ্গাভিলাষী। যে নিজে স্বামী মনোনীত করতে পারে তাকেই কন্যা বলা হয়।[৫] বিবাহকালে সীতা, কুন্তী ও দ্রৌপদী পূর্ণযুবতী ছিলেন এবং বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীর সঙ্গে তাঁদের দৈহিক মিলন ঘটেছিল। গৃহ্যসূত্রে বিধান দেওয়া আছে যে বিবাহ উৎসবের চতুর্থ দিনে দৈহিক মিলন ঘটবে। 'নগ্নিকা' শব্দের অর্থ কুমারী বালিকা অথচ এমন অপরিণত বয়স্কা নয় যে তার লজ্জাসরমের বোধ হয় নি।[৬] বরকন্যা তাদের ব্রহ্মচর্য রক্ষা করবে এবং তাদের কৌমার্য অক্ষুণ্ণ রেখে

---

১ পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে
সমত্বাগত বীর্যৌ তৌ জানীযাং কুশলো ভিষক্। ৩৫. ৮।

ভাগবতও এই মত অনুমোদন করেন, মহাভারতে ত্রিশ বৎসরের পুরুষকে ষোড়শ বর্ষীয়া বালিকাকে বিবাহ করতে বলা হয়েছে।—ত্রিংশদ্বর্ষ ষোড়শাব্দং ভার্য্যাং বিন্দেদ্ অনগ্নিকাম্।

২ ১৪. ৮।

৩ দশম, ১৩।

৪ যস্মাৎ কামযতে সর্বান্ কামের্ধাতোশ্চভাবিনি তস্মাৎ কন্যেতি সুশ্রোণি স্বতন্ত্রা বরবর্ণিনী।

৫ ঋগ্বেদ, দশম ১৮৫।

৬ হিরণ্যকেশিন ও জৈমিনি যৌবনপ্রাপ্তির আগে বিবাহ নিষেধ করেছেন। তাঁরা বলেন, গুরুগৃহে পাঠ সমাপন করে ছাত্রের অনগ্নিকা অর্থাৎ পরিণতবয়স্কা নারীকে বিবাহ করা উচিত।

পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবে। কৌমার্য অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদে যৌবনপ্রাপ্তির পূর্বেই বিবাহ প্রথা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে প্রচলিত হল। বালকদের উপনয়নের সঙ্গে বালিকাদের বিবাহকে এক করে দেখা হতে লাগল। যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত থাকায় যারা উপার্জনক্ষম হয় নি তাদেরও বিয়েতে বাধা ছিল না। অনেক স্মৃতিকার মত দিলেন যে যোগ্য পাত্র না পেলে অযোগ্য পাত্রেও কন্যার বিবাহ দিতে হবে।[১] কন্যাদের পক্ষে বিবাহ আবশ্যিক হল, কিন্তু পুত্রদের ক্ষেত্রে হয় নি। অবশ্য আদিতে এ প্রথা শুধু ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। খ্রীষ্ট জন্মাবার দু-তিন শত বৎসর আগে যখন ধর্মশাস্ত্রসকল লেখা হয় তখন তাতে এই বিধান ছিল যে যৌবনপ্রাপ্তির পর বালিকাদের বিবাহে দেরি করা চলবে না। শাস্ত্রকাররা অবশ্য যোগ্যপাত্র না পাওয়া গেলে যৌবনোদ্গমের পর তিন বৎসর পর্যন্ত কন্যাদের অবিবাহিত রাখতে অনুমতি দিয়েছেন। মনুও এ মত সমর্থন করেছেন।[২] যদি তিন বৎসর পর্যন্ত অভিভাবকরা যোগ্যপাত্র না পান তো কন্যার নিজেরই পাত্র মনোনীত করার অধিকার ছিল।[৩] সাবিত্রীর যৌবনপ্রাপ্তির পর বহুদিন পর্যন্ত অবিবাহিত থাকায় তাঁকে পাত্র মনোনয়নের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি সত্যবানকে মনোনয়ন করেন। সত্যবান সব দিক দিয়ে পাত্র হিসাবে বাঞ্ছনীয় কিন্তু কোষ্ঠীর ফলে অল্পায়ু। সেইজন্য সাবিত্রীর পিতা এই বিবাহের বিরোধিতা করেন কিন্তু সাবিত্রী সত্যবানকে মনে মনে বরণ করার জন্য অন্য কাউকে পছন্দ করতে অস্বীকার করেন। কাজেই বিবাহ হয় এবং কোষ্ঠীফল বৃথা হয়। মনুর মত যাঁরা বাল্যবিবাহ সমর্থন করেন, তাঁরাও যোগ্য পাত্র না পাওয়া গেলে কন্যাদের অবিবাহিত রাখার অনুমতি দিয়ে দেন।[৪] কন্যার অযোগ্য পাত্রে বিবাহিত হওয়ার চেয়ে আজীবন পিতৃগৃহে থাকা ভাল।[৫] কামসূত্রে বাল্যবিবাহ ও পরিণত বয়সে বিবাহ দুইয়েরই স্বীকৃতি আছে।[৬]

কন্যারা যখন তাদের পতিনির্বাচন করতে পারত, তখনও তারা সাধারণতঃ তাদের পিতামাতার পরামর্শ ও সম্মতি চাইত। বর-কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হলেও, সাধারণতঃ পিতামাতা তাদের সম্মতি নিয়েই বিবাহের বন্দোবস্ত করতেন। অথর্ববেদে দেখতে পাই যে পিতামাতারা কন্যাপ্রার্থীদের তাঁদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতেন ও কন্যারা তাদের মধ্য থেকে পতিনির্বাচন করতেন।[৭] জাতক কাহিনীগুলোতে পিতামাতারা

---

১ দদ্যাদ্ গুণবতে কন্যাং নাগ্নিকাং ব্রহ্মচারিণে।
অপিবা গুণহীনায় নোপরুন্ধ্যাদ্ রজস্বলাম্।

২ চতুর্থ ১২।

৩ নবম, ৯০। বৌধায়ন চতুর্থ, ১. ৪। বশিষ্ঠ, সপ্তদশ, ৬৭. ৬৮ ও দ্রষ্টব্য।

৪ কামমামরণাৎ তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যাস্তু মত্যপি ন চৈ বৈনং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ। নবম, ৮৯। মেধাতিথি বলছেন, "যৌবনপ্রাপ্তির আগে কন্যাকে বিবাহ দেবেন না, যোগ্য পাত্র না পেলে, যৌবনপ্রাপ্তির পরও বিবাহ দেবেন না। (প্রাগৃত্বো কন্যায়া ন দানম্, ঋতুদর্শনেঽপি ন দদ্যাদ্ যাবদ্গুণোবান বরো প্রাপ্তঃ।

৫ নবম, ৮৯।

৬ তৃতীয়, ২-৪।

৭ ষষ্ঠী, ৬১. ১।

তাদের পুত্রকন্যাদের সঙ্গে তাদের বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করছেন, এরকম লেখা যায়। মহাকাব্যের যুগে স্বয়ম্বর প্রথা (কন্যার স্বেচ্ছায় বরবরণ) খুবই প্রচলিত হয়েছিল। স্বকীয় পছন্দ ও পিতামাতার পরামর্শে কন্যারা যোগ্যপাত্রই পেতেন। অধীর যুবা বরদের ক্বচিৎ সঙ্কুচিতা ও অনভিজ্ঞা কন্যাদের উপর চাপানো হত। যে ব্যাপারে মনস্তত্ব, কুল, পারিবারিক ঐতিহ্য ও শিক্ষাদীক্ষা সংশ্লিষ্ট সেটা একজনের খেয়ালের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। বাল্যবিবাহ না হলেও, যৌবনের প্রারম্ভেই পিতামাতার দ্বারা নির্বাচিত এবং বর-কন্যা দ্বারা সমর্থিত বিবাহই ভারতে সাধারণতঃ প্রচলিত। এ প্রথার স্বপক্ষে অনেক কিছু বলা যায়। প্রেম প্রধানতঃ একটা নিজস্ব মনের অভিজ্ঞতা, তার অপরিহার্য অঙ্গ কল্পনা ও কামনা। প্রেমিক আসল লোকটাকে দেখে অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ অনুভব করে না, তার নিজের মনে তার সম্বন্ধে যে কল্পনা তাই তাকে আকর্ষণ করে। প্রত্যেক পুরুষের অন্তরে এমন এক মানবীর মূর্তি আছে যা আসলে কোন বিশেষ নারী নয়, কল্পনা মাত্র। তেমনি প্রত্যেক নারীর মনেও একটি ঈপ্সিত পুরুষের মূর্তি আছে। অল্প বয়সে বিয়ে হলে মন গ্রহণক্ষম ও নমনীয় থাকে এবং যুবক তার স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সব চেয়ে বুদ্ধিমান পুরুষও যে নারী তাকে আকর্ষণ করে তার প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞ। প্রেমের উৎস প্রেমিকের অন্তরে; প্রেম পাত্র বা পাত্রী উপলক্ষ মাত্র। পাত্র যেমনি হোক, আবেগ ও আকর্ষণ একই রকমের হয়।[১] আবেগের তীব্রতাই আমাদের বাস্তব দৃষ্টি অন্ধ করে দেয় এবং বিষয়ের রূপ এমন ঘোমটার আড়ালে ঢেকে দেয় যার মধ্যে আমরা ঢুকতে পারি না। অপরের সঙ্গে মিলনে তৃপ্ত হবে আমাদের এমন সমস্ত বাসনা ও স্বপ্ন যদি একবার আমরা কোন নারীর উপর আরোপ করে বসি তাহলে সে নারী যতই বৈশিষ্ট্যহীনা ও বুদ্ধিহীনা হোক, আমাদের সম্পূর্ণরূপে বশে রাখার ক্ষমতার সে অধিকারী হবে। মেয়েরাও এইরকম ভাবে তাদের

---

১ এই সম্বন্ধে ডঃ জনসনের সঙ্গে বসওয়েলের বিবাহ সম্বন্ধীয় আলোচনা উল্লেখযোগ্য। "আচ্ছা মহাশয়, আপনার কি মনে হয় না যে এরকম একজন নারী যদি পাওয়া যায় যে তার সঙ্গে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করা যায়, তো সেরকম আরও পঞ্চাশজন নারী পৃথিবীতে পাওয়া যাবে?"

ডঃ জনসন বললেন, "নিশ্চয়ই, পঞ্চাশ কেন পঞ্চাশ হাজার।"

"কেউ কেউ ভাবেন প্রত্যেক পুরুষের উপযুক্ত একজনই নারী আছেন, তারা পরস্পরের জন্যই সৃষ্ট, তাদের মিলন না হলে, তারা অন্য কারুর সঙ্গেই সুখী হতে পারে না। আপনি তাঁদের সঙ্গে একমত নন?"

ডঃ জনসন। "নিশ্চয়ই নয়। আমার মনে হয় পাত্র-পাত্রীকে কোন নির্বাচনাধিকার না দিয়ে যদি লর্ড চ্যান্সেলার চরিত্র ও অবস্থা বিবেচনা করে বিবাহের ব্যবস্থা করেন, তাহলে সাধারণতঃ সেই সব বিবাহই সুখের হবে।

ক্যালভিনকে তাঁর বন্ধুরা বিবাহ করতে বললে তিনি তাঁর স্ত্রীর পদ প্রার্থিনীদের সম্বন্ধে বিবেচনা করতে রাজী হয়ে বলেন, "আমি নারীর আকর্ষণ সম্বন্ধে প্রলাপ করার মত উন্মাদ নই। মিতব্যয়ী, পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবতী ও আমার শরীরের প্রতি যত্নশীলা যে কোন স্ত্রীলোক হলেই আমার চলবে।"

স্বপ্ন তাদের স্বামীদের উপর আরোপ করে, ফলে স্বামীটি আর একটি ব্যক্তি থাকে না, ভাবমূর্তি হয়ে ওঠে। স্বামী বা স্ত্রী আমাদেরই সৃষ্টি, আমরা একটি আদর্শের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করি। পরিচয়ের ফলে প্রেমের ধরন দয়িতের ধাঁচে গঠিত। সহজ প্রবৃত্তিজাত বাসনা ধীরে ধীরে পরিণত হয়ে অন্য লোকটির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। সুসঙ্গতি একটা প্রক্রিয়া, আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। ছেলেমেয়ে একসঙ্গে থাকলে পরস্পরের কাছে আকর্ষণীয় হবার স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং তা থেকেই পারস্পারিক সঙ্গতির সৃষ্টি হয়। একটি সুপরিচিত শ্লোক বলে যে রাজা, নারী ও লতা তাদের নিকটস্থ বস্তুকে জড়িয়ে ধরে।[১] মেয়েরা সব জায়গায় মানিয়ে নিতে পারে। যেখানে স্থাপন করা যাবে সেখানেই তার শেকড় চালিয়ে দেবে।

বিবাহে পিতামাতার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যে মনোভাব তা অপব্যবহার জাত, বিশেষ করে যখন মেয়েদের বেলায় সকাল সকাল বিবাহের ব্যবস্থা হয় আর মৃতদাররা পুনর্বিবাহ করতে পায়। কোন কোন পিতামাতা যুগপৎ টাকার লোভে ও শাস্ত্রবাক্য পালনের অজুহাতে ধনী বুড়োর সঙ্গে সদ্য প্রস্ফুটিতা সুন্দরী বালিকাদের বিবাহ ব্যবস্থা করে। বিবাহের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এরকম ঘটনা অসম্ভব হয়ে আসছে। যৌথ পরিবার প্রথার ভঙ্গুরতা, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, আর্থিক সংগ্রাম ইত্যাদির জন্য ছেলেমেয়েদের বিবাহের বয়স ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। সর্দা আইনে মেয়েদের ও ছেলেদের নিম্নতম বিবাহযোগ্য বয়স যথাক্রমে চোদ্দ ও আঠারোতে নির্ধারিত হয়েছে এবং তাই এখন সমাজে চালু হয়ে গেছে। পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই বিবাহের বয়স ও সাবালকত্ব প্রাপ্তির বয়স একই করা যেতে পারে। যৌবন-প্রাপ্তির পরে বিবাহের ব্যবস্থায় হিন্দু সমাজ বৈদিক প্রথায়ই ফিরে যাচ্ছে।

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

আমরা আগেই দেখেছি যে মানসিক, জাতিগত ও মানবিক উপাদান সমূহের সমন্বয়ের উদ্দেশ্যেই বিবাহ। এগুলি বাইরের জিনিস হলেও খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এদের উপর ভিত্তি করেই আমাদের পরিণত ও দায়িত্বপূর্ণ প্রেমের প্রতিষ্ঠা করতে হয়।[২] কেননা পরিণত ও দায়িত্বপূর্ণ প্রেমের মধ্যেই ব্যক্তির পরিণতি ও বিবাহের সত্যকার উদ্দেশ্য নিহিত। আমরা যাকে ভালবাসি তাকে না বিয়ে করে যাকে বিয়ে করি তাকে ভালবাসি। বিয়েটা সূক্ষ্ম হিসাবনিকাশের ব্যাপার নয়। বর ও কনে একত্র বা আলাদা আলাদা কিভাবে বিকশিত হবে তা আমরা আগে থেকে বুঝি না। সমাজ পাত্র-পাত্রী নির্বাচন সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম নির্দিষ্ট করতে পারে। "কন্যা রূপ চায়, মাতা ধন, পিতা বিদ্যা, আত্মীয়স্বজনেরা পারিবারিক সম্মান, আর বাকী সবাই ভোজ

১ প্রায়েণ ভূমিপতয়ঃ প্রমদা লতাশ্চ যৎ পার্শ্বতো বসতি তৎ পরিবেষ্টয়ন্তি। প্রণয় সান্নিধ্যের উপর নির্ভরশীল, পিতামাতারা তাই বিবেচনা করে কৌশলে নৈকট্যসাধন করেন।

২ ভাববন্ধনপ্রেম।—কালিদাস।

অভিলাষ করে।"[১] প্রজাতিরক্ষার জন্য বিবাহ ব্যবস্থা, কাজেই সুপ্রজনন বিদ্যাও একটা বিচার্য বিষয়। যে গাছ পোঁতে সে যেমন জমি ও জলহাওয়ার কথা বিবেচনা করে, খেয়ালের বশে কাজ করে না, তেমনি জীবনের প্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে বিবাহের কথা বিবেচনা করতে হবে। প্রজাতি শুধু রক্ষা করলেই হবে না, তাকে উন্নত করতে হবে। সাধারণতঃ একই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরের পরিবারের লোকদের বিবাহ বাঞ্ছনীয়।[২] খুব নিকট সম্পর্কের লোকের মধ্যে বিবাহ ঠিক নয়, কিন্তু হিন্দু বিবাহের বর্তমান বিধান একটু বেশী কঠোর। হিন্দু সমাজ-কর্তারা চান নিজের বর্ণের মধ্যে বিবাহ হবে (অন্তর্বিবাহ) আবার সগোত্রে হবে না (বহির্বিবাহ), আবার পিতামাতা উভয়ের দিক দিয়ে কতকগুলি রক্তের সম্বন্ধকে বাদ দিতে হবে (সপিণ্ড বহির্ভূত বিবাহ)। এক গোত্রের হলেই যে রক্তের সম্বন্ধ থাকবে তা নাও হতে পারে। আদিতে হয়ত সেরকম সম্পর্ক ছিল কিন্তু কুল-প্রতিষ্ঠাতা থেকে কয়েক পুরুষ পরে আর সে কথা খাটে না। কাজেই সগোত্র বিবাহের সম্বন্ধে নিষেধের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, এখনও এ নিষেধাজ্ঞা বাতিল করা যায়। এরকম একটা অনুমতিজ্ঞাপক আইন করা যায় যে কোন হিন্দু-বিবাহ শুধু সগোত্র হয়েছে বলে অসিদ্ধ হবে না, হিন্দু শাস্ত্র, প্রথা বা ব্যবহার যাই বলুক না কেন। কয়েক রকম সপিণ্ডদের মধ্যে বিবাহ নিষেধ প্রথা তুলে দেবার কথা এখন বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। মামাতো পিসতুতো বা খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো ভাইবোনের বিবাহকে ধর্মবিরুদ্ধ বা অহিন্দুজনোচিত কর্ম বলে মনে করার কারণ নেই। অর্জুন তাঁর মামাতো বোন সুভদ্রাকে বিয়ে করেছিলেন। কৃষ্ণ তাঁর দুই পিসতুতো বোন মিত্রবিন্দা ও ভদ্রাকে বিয়ে করেছিলেন। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ (গৌতম বুদ্ধ) তাঁর মামাতো বোন গোপা (যশোধরা)-কে বিয়ে করেছিলেন। সংস্কার কৌস্তুভে আছে যে মনু, পরাশর, অঙ্গিরস এবং যম প্রভৃতি মহর্ষিরা পিতা ও মাতার দিক দিয়ে তৃতীয় পর্যায়ের সম্পর্কিত লোকদের বিয়ে সমর্থন করেন।[৩] প্রাচীন কাল থেকেই সপিণ্ড বিবাহ সংক্রান্ত আইন ভঙ্গ করা হয়েছে। বৈদ্যনাথ তাঁর স্মৃতিমুক্তাফলে বলছেন, "অন্ধ্রদেশে বেদজ্ঞ সজ্জনরাও মাতুল-কন্যা পরিণয় প্রথা অনুসরণ করেন আর দ্রাবিড়দের মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যেও এক পূর্বপুরুষের চতুর্থ উত্তরপুরুষে বর-কনের বিয়ে চলে।"

---

১ কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বরয়তে বিত্তং পিতা শ্রুতম্
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।

বাক্‌ল্ লিখেছেন, "বিবাহ ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ দিয়ে চালিত হবে না, গড় আয় দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হবে।

২ বয়োরেব সমং বিত্তং বয়োরেব সমং শ্রুতম্
তয়োর্মৈত্রী বিবাহশ্চ ন তু পুষ্টবিপুষ্টয়োঃ।

মহাভারত, প্রথম, ১৩১. ১০।

৩ তৃতীয়াং মাতৃতঃ কন্যাং তৃতীয়ং পিতৃতস্তথা
বিবাহয়েৎ মনুঃ প্রাহ পরাশর্যোঽঙ্গিরাযমঃ।

দেখাই যাচ্ছে যে বিবাহের উদ্দেশ্য যখন যৌন আকর্ষণ ও সন্তান স্নেহের ভিত্তিতে স্থাপিত পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ তখন তাকে সফল করতে হলে যে সব গুণের দরকার তার বিচার যারা একটু দূরে থেকে দেখবে ও যারা নিজেরা অনাসক্ত তারাই ভাল করে করতে পারবে। শুধু একজোড়া সুন্দর চোখ বা সম্ভোগযোগ্য রম্য দেহ দেখেই না বিয়ে করে ফেলি সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে, যোগ্যা পাত্রী ও আকর্ষণী শক্তিযুক্ত মন খোঁজ করতে হবে।[১]

অনুলোম বিবাহ অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পাত্রের সঙ্গে নিম্নবর্ণের পাত্রীর বিবাহ প্রচলিত ছিল। এরকম বিবাহের ফলে যে সব সন্তান-সন্ততিরা জন্মাত তারা একটা মাঝামাঝি বর্ণভুক্ত হত। ধর্মশাস্ত্রে ভিন্ন বর্ণের গর্ভজাত পত্নীদের সন্তানদের পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে ব্যবস্থা আছে। হিন্দু ইতিহাসে অনুলোম বিবাহের বহু দৃষ্টান্ত আছে যদিও শতাব্দীর পরে এরকম বিবাহে আর উৎসাহ দেওয়া হত না প্রতিলোম বিবাহ অর্থাৎ নিম্নবর্ণের পাত্র ও উচ্চবর্ণের পাত্রীর বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল এবং এরকম বিবাহজাত সন্তানদের চতুর্বর্ণে স্থান দেওয়া হত না, চণ্ডাল বা নিষাদ বলে গণ্য করা হত। কতকগুলি জাতি যখন এইরকম নিষিদ্ধ বিবাহ থেকে জাত বলে বর্ণনা করা হয়, তখন এরকম নিষিদ্ধ বিবাহ একেবারে অপ্রচলিত ছিল না। ঋগ্বেদে অসবর্ণ পাত্র-পাত্রীর বিবাহের বহু উদাহরণ আছে। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রভেদ ক্রমেই কমে আসছে এবং অসবর্ণ বিবাহ আবার বেশি করে হবে এবং তাতে হিন্দু ধর্মভাব ক্ষুন্ন হবে এমন বলা চলে না। চাণক্য নীচকুল থেকেও স্ত্রী গ্রহণ করার বিধান দিয়েছেন।[২] অনেক শিলালিপিতে দেখা যায় যে হিন্দু রাজারা বিদেশী রাজপুত্রীদের বিয়ে করেছেন।[৩] মনু[৪] স্ত্রীরত্ন হলে নীচ ও মন্দ পরিবারের কন্যাকেও বিবাহ করা সমর্থন করেছেন। মহানির্বাণ তন্ত্রে শৈব বিবাহের মাত্র দুই রকম শর্ত দেওয়া আছে—(ক) কন্যা নিষিদ্ধ সম্পর্কের হবে না এবং (খ) তার অন্য স্বামী থাকবে না। জাতি ও বয়সের কথা বিবেচনার প্রয়োজন নেই।[৫] এরকম বিধানে অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবা বিবাহ দুয়েরই সমর্থন আছে। বর্তমান যুগে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের বিবাহকে বৈধ করার জন্য পাত্রপাত্রীর কারুরই ধর্ম পরিবর্তনের শর্ত না রেখে সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্টকে প্রসারিত করা যেতে পারে।

---

১ এক অপরিচিতা বার্নার্ড শ'কে লেখেন, "তোমার পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক আছে আর আমার সব চেয়ে সুন্দর দেহ আছে, আমরা মিলিত হলে আমাদের সন্তান নিখুঁত হবে।" শ জবাব দেন, "আর সন্তানের দেহটা যদি আমার মত ও মস্তিষ্কটা তোমার মত হয়?"

২ বিষাদপি অমৃতং গ্রাহ্যং মেধ্যাদপি কাঞ্চনং
নীচাদপি উত্তমাং বিদ্যাং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।

৩ কান-এর ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম ভাগ (১৯৪১), পৃ. ৩৮৯ দ্রষ্টব্য।

৪ দ্বিতীয়. ২৩৮।

৫ বয়োজাতি বিচারোঽত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে
অসপিণ্ডা ভর্তৃহীনাম্ উদ্বাহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ।

স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সমান অধিকার বলে স্ত্রীর নাম পত্নী।[১] দম্পতি মানে স্বামী-স্ত্রী গৃহস্থালির যুগ্ম মালিক। কাজেই সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নেই। এই বিবাহই আদর্শ এবং দু-রকমের আদর্শ নীতির ক্ষেত্রে চালানো যায় না। ভারতবাসীর মনে শিবপার্বতী, রামসীতা, নলদময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবানের দৃষ্টান্তের ছাপ রয়ে গেছে।

বহুপতিত্ব ও বহুপত্নীত্ব নিষিদ্ধ কিন্তু কোন কোন অবস্থায় উভয়েরই ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুপতিত্ব প্রচলিত ছিল।[২] দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর কথা বিখ্যাত। দ্রৌপদীর পিতা পঞ্চস্বামীর প্রস্তাব শুনে হতভম্ব হয়ে বলেন যে এ জিনিস আচারবিরুদ্ধ (লোকধর্ম বিরুদ্ধম্)। কিন্তু যুধিষ্ঠির যুক্তি দেন যে পারিবারিক ঐতিহ্যে এ জিনিসের যুক্তি আছে, এবং সকল অবস্থায় কোন্ কাজ ঠিক তা বোঝা শক্ত।[৩] এ প্রথার সমর্থনে অদ্ভুত অদ্ভুত যুক্তি দেখানো হয়েছে; এবং তন্ত্রবার্তিক ব্যাপারটির বাস্তবতা অস্বীকার করে একে রূপক হিসেবে গ্রহণ করতে বলেছেন। পাঁচজন পুরুষ এক রাজলক্ষ্মীকে বরণ করেছেন, ঐটাই আসল কথা। কিন্তু ক্ষত্রিয় উপজাতিদের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল। অনেকে এই প্রথার বিরোধিতা করেন। তান্ত্রিক লেখকরা এই বিরোধীদের দলে। মালাবার সম্প্রদায়ের এ প্রথা এখনও চলে আসছে, তবে এর আদর আর পূর্বের মত নেই।

অন্য আদিম সমাজের মত রাজ-রাজড়ার ঘরে বহুপত্নীত্ব প্রচলিত ছিল।[৪] সাধারণ

১ দাম্পত্যো সহাধিকারাৎ।

আম্নায়ে স্মৃতিতন্ত্রে চ পূর্বাচর্যৈশ্চ সূরিভিঃ

শরীরার্ধং স্মৃতা ভার্যা পুণ্যা পুণ্যফলে সমা,

যস্য নোপরতা ভার্যা দেহার্ধং তস্য জীবতি,

জীবত্যাবর্ধশরীরে তু কথমন্যঃ স্বমাপ্নুয়াৎ।

২ আপস্তম্ব উল্লেখ করেছেন যে কোন কোন সম্প্রদায়ে এক নারীকে একটা গোটা পরিবারের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। (দ্বিতীয় ২৭, ৩)

বিবাহটা দুটি পবিবারের মধ্যে অঙ্গীকার (কন্যা কুলায় এব দীয়তে)।

বৃহস্পতি বলেছেন, এ প্রথা কলিযুগে নিষিদ্ধ।

৩ সূক্ষ্মো ধর্মো মহারাজ নাস্য বিদ্মো বয়ং গতিম্,

পূর্বেষামানুপূর্বেণ যাতং বর্ত্মানুযামহে। মহাভারত, প্রথম, ১৯৫, ২৯।

৪ কলম্বাস ১৪৯২ সালের ১২ই অক্টোবর তাঁর আবিষ্কৃত নূতন দ্বীপের লোকের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, 'এই সব দ্বীপে প্রত্যেক লোকের এক পত্নী আছে, কেবল রাজা ও রাজপুরুষদের কুড়িটি পর্যন্ত স্ত্রী থাকতে পারে।" নিরক্ষরবৃত্ত সংলগ্ন আফ্রিকার কয়েক

লোক প্রায়ই একটাই বিয়ে করত। কিন্তু শাস্ত্রে স্বামীকে পত্নীর সম্মতি নিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার বিধান দেওয়া হয়েছে। যেখানে প্রথমা স্ত্রী নির্বোধ, অনারোগ্য-রোগাক্রান্তা, বন্ধ্যা বা ব্যভিচারিণী, সেখানে দ্বিতীয় বিবাহ সমর্থিত। বহুবিবাহ বিরল হয়ে আসছে, কিন্তু এখনও প্রচলিত। আইনে বহু বিবাহের স্বীকৃতি প্রচুর দুঃখের কারণ হয়েছে।[1]

মনু স্ত্রীজাতির উপর কতটা অবিচার করেছেন তা বোঝা যায় যখন তিনি তাদের মন্দ স্বামীকেও ভক্তি করতে বলেন।[2] এ যেন স্বামীর কাছে এক ধরনের ক্রীতদাসী হয়ে থাকা। স্বামীভক্তিকে অত্যন্ত বাড়িয়ে দেখাবার জন্য মনু মহারাজ এই সব অত্যুক্তিমূলক শিক্ষাপ্রচার করেছেন। যে সব স্বামী স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাসী তাদের খুব নিন্দাও আছে। আপস্তম্ব তাদের গাধার চামড়া পরিয়ে অন্নভিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। তা হলেও আচার-ব্যবহার স্ত্রজাতির অনুকূল নয়। মৃতদার ও বিধবাদের সঙ্গে ব্যবহারে তফাৎ আছে। পুরুষ বলে যে স্ত্রী না থাকলে সস্ত্রীক ধর্মাচরণের বিধান মানা যায় না, কাজেই স্ত্রী মরে গেলে আর একবার বিবাহ না করলে চলবে না। এ যুক্তি অকাট্য নয়, কারণ ধর্মাচরণের পক্ষে স্ত্রী অপরিহার্য নয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে যে মৃতদার ব্যক্তি বৈদিক যাগযজ্ঞ করতে পারেন, শ্রদ্ধাই

উপজাতি সম্বন্ধে W. Winwood Reade বলেন, "একজন পুরুষের একমাত্র স্ত্রী যদি মনে করে যে তার আর এক স্ত্রী পোষণ করার ক্ষমতা আছে তো তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, না করলে কৃপণ বলে গালাগাল দেয়।"

১ পরলোকগত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার বলেছিলেন, "হিন্দু আইনে বহু বিবাহের সমর্থন পরিত্যাগ করার সময় হিন্দুসমাজে এসেছে। প্রাচীন হিন্দু আইনে এক বিবাহই সমর্থিত ছিল, বহু বিবাহ বিকল্প হিসেবে চলত···প্রাচীনকালে একাধিক বিবাহ করলে আইনসঙ্গত কৈফিয়ৎ দিতে হত কিন্তু বর্তমান হিন্দু আইনের বিধান অনুসারে স্বামী যত খুশি বিবাহ করতে পারবেন, তার জন্য প্রথমা স্ত্রীর সম্মতি বা কোন রকম কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন নেই, এ অত্যন্ত অন্যায়। বর্তমান যুগে স্ত্রীলোকের সমানাধিকার যখন এ বিষয়ে অন্ততঃ স্বীকার করতেই হবে, তখন এ সংস্কারে দেরি করার কোন কারণ নেই। বিশেষ বিবাহ আইনে হিন্দুদের বিবাহ এক বিবাহ এবং আশ্চর্যের বিষয় যে মারুমাকথায়ম আইন (মালাবারে প্রচলিত) সম্প্রতি এক বিধান দিয়ে এক বিবাহের প্রচলন করেছে ; কেবল সাধারণ হিন্দু সমাজে এখনও বহু বিবাহ বৈধ হয়ে রয়েছে।" মাদ্রাজ জার্ণাল, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৪১। (হিন্দু আইনের এ সংস্কার স্বাধীন ভারতে করা হয়েছে। অনুবাদক)

২ বিশীলঃকামবৃত্তো বা গুণৈর্বা পরিবর্জিতঃ
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ। পঞ্চম, ১৫৪।

আরও

দুঃশীলঃ কামবৃত্তো বা ধনৈর্বা পরিবর্জিতঃ
স্ত্রীণামার্য্যস্বভাবানাং পরমং দৈবতং পতিঃ।

রামায়ণ, দ্বিতীয়, ১১৭. ২৪.

সেক্ষেত্রে স্ত্রীর কাজ করবে।[১] বিষ্ণু বলেন যে মৃতা স্ত্রীর প্রতিমা দিয়েও কাজ চলে। রামায়ণে আছে রাম এইভাবেই যজ্ঞ করেছিলেন। কিন্তু পরে মনু এবং অন্য শাস্ত্রকারেরা মৃতদারদের আবার বিবাহের নির্দেশ দেন।

বিধবাদের অবস্থা

ঋগ্বেদের সময় বিধবাদের পুনর্বিবাহের কথা শোনা যায়, তার পর বিধবাদের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কোন নারীর একসঙ্গে দুই স্বামী থাকা অবাঞ্ছনীয়।[২] যে নারীকে পূর্বে আর একজন ভোগ করেছে, তাকে বিবাহ করা সম্বন্ধে একটা অনিচ্ছার মনোভাব দেখা যায়। এই মনোভাব থেকেই যাজ্ঞবল্ক্য পরামর্শ দিয়েছেন যে "অন্যপূর্বা নয়" এমন স্ত্রীকে বিবাহ করবে।[৩] কিন্তু মহাভারতে এমন কয়েকটি উদাহরণ আছে যেখানে এ উপদেশ গ্রহণ করা হয় নি। জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। ত্রিশঙ্কু এক রাজাকে বধ করে তার স্ত্রীকে বিবাহ করেন এবং সেই স্ত্রীর দ্বারা এক সন্তানও লাভ করেন। রাজা ঋতুপর্ণ নলের স্ত্রী জেনেও দময়ন্তীকে দ্বিতীয় স্বয়ম্বরে লাভ করার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। সত্যবতীর স্বামী মারা যাওয়ার অব্যবহিত পরেই রাজা উগ্রায়ুধ তাকে বিবাহ করতে চান। নাগরাজা ঐরাবতের বিধবা কন্যাকে অর্জুন বিবাহ করেন ও তার দ্বারা একটি ছেলেও হয়। জাতকেও এ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। কোশলের এক রাজা কাশীর রাজাকে বধ করে তাঁর সন্তানবতী রাণীকে বিয়ে করেন।[৪] উচ্ছঙ্গ জাতকে একটি নারীর স্বামী, পুত্র ও ভ্রাতা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। সে তার ভ্রাতার প্রাণভিক্ষা করে বলে যে নূতন স্বামী ও নূতন পুত্র সে আবার পেতে পারে কিন্তু সে নূতন ভ্রাতা পাবে কোথায়?[৫] কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে লিখেছেন, "স্বামীর মৃত্যুর পর কোন স্ত্রীলোক যদি ধর্মজীবন যাপন করতে চায় তাহলে তার স্ত্রীধন, টাকাকড়ি ও অলঙ্কারাদিই যে ফিরে পাবে তাই নয়, যৌতুকের অবশিষ্টাংশও ফিরে

---

১ সপ্তম, ৯-১০

২ তৈত্তিরীয় সংহিতা, ষষ্ঠ, ৬. ৪. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, তৃতীয়, ১২। একজন স্ত্রীলোক অশ্বিনীদের জিজ্ঞাসা করে, "বিধবা যেমন তার দেবরের বিছানায় যায়, তোমাদের তেমনি কে বিছানায় নেবে? (কো বাম্ শয়ূত্রং বিধবেব দেবরং কৃণুতে?)। অথর্ব বেদেও আছে: "এক স্বামী পেয়েও পরে যদি আরেক স্বামী গ্রহণ করে, সেই যুগলের বিচ্ছেদ করানো যাবে না যদি তারা পঞ্চৌদন ও একটি ছাগল দান করে। ছাগল, পঞ্চৌদন ও ভালরকম দক্ষিণা দিলে পুনর্বিবাহিতা দ্বিতীয় স্বামীও সেই লোকেই গমন করে।" নবম, ২৭, ২৮।

৩ প্রথম, ৫২

৪ অসতরূপ জাতক। কুণাল জাতকও দ্রষ্টব্য।

৫ N. K. Dutt, Woolmer স্মারক গ্রন্থে তাঁর "প্রাচীন ভারতে বিধবা" নামক প্রবন্ধে ইতিহাস থেকে অনেক উদাহরণ উল্লেখ করেছেন।

পাবে। যদি সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে তো বিবাহ উপলক্ষে তার শ্বশুর ও স্বামী তাকে যা দান করেছিল তা সব দিয়ে দেওয়া হবে। বিধবা যদি শ্বশুর-নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বরণ না করে তো শ্বশুর ও স্বামী প্রদত্ত ধনে অধিকার থাকবে না।[১]

স্মৃতিগ্রন্থে বিধবাবিবাহের ক্রমবর্ধমান বিরোধী মত লক্ষ্য করা যায়। আপস্তম্ব বিধান দেচ্ছেন, "কোন পুরুষ যদি পূর্বে বিবাহিতা স্ত্রী বা অসবর্ণার সঙ্গে বাস করে, তারা দুজনেই পাপের ভাগী হবে।"[২] বেশ বোঝা যাচ্ছে, তখন বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের আশংকা ছিল। মনুও এরকম বিবাহের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কেননা তিনি বলেছেন যে পুনর্বিবাহিত বিধবার (পৌনর্ভবা) গর্ভজাত ব্রাহ্মণ সন্তান ব্রাহ্মণই হবে যদিও তাকে ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের সমান মনে করতে হবে।[৩] গৌতমও বিধবাবিবাহের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, কেননা তিনি বিধবার দ্বিতীয় স্বামীর পুত্রকে বৈধ উত্তরাধিকারী না থাকলে পূর্বতন স্বামীর সম্পত্তির এক চতুর্থাংশের অধিকার দিয়েছেন।[৪] বশিষ্ঠ[৫] ও বিষ্ণু[৬] উত্তরাধিকার ব্যাপারে চার রকমের সন্তানের মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসজাত পুত্রকে চতুর্থ শ্রেণীতে ফেলেছেন এবং দত্তকপুত্রের চেয়ে উচ্চ স্থান দিয়েছেন। বিধবাদের অল্প-কালের জন্য কঠোর জীবন যাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। "বিধবাকে ছয় মাস ভূমিশয্যা নিয়ে ধর্মব্রত পালন করতে হবে··তারপর তার পিতা তাকে মৃত স্বামীর ক্ষেত্রজ সন্তান গর্ভে ধারণ করতে নির্দেশ দেবেন।"[৭] স্ত্রীলোকদের পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে বশিষ্ঠ খুব উদার বিধান দিয়েছেন। "যদি কোন কন্যাকে হরণ করা হয়ে থাকে এবং তার মন্ত্র দ্বারা বিবাহ না হয়ে থাকে, তাহলে তাকে বৈধ ভাবে অন্য লোকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া যায়, তাকে কুমারীর মতই মনে করতে হবে। কোন কন্যা যদি শুধু মন্ত্রপাঠ দ্বারা বিবাহিত হয়ে থাকে এবং তার স্বামীর সঙ্গে দৈহিক মিলন না ঘটে থাকে তো তার আবার বিবাহ দেওয়া যায়।"[৮] অমিতগতি তাঁর ধর্মপরীক্ষায় (১০১৪ খ্রীষ্টাব্দ) বিধবাবিবাহের উল্লেখ করেছেন, "যদি কোন বিবাহিতা নারীর স্বামী দুর্ভাগ্যক্রমে মারা যায় তো তার আবার বিবাহানুষ্ঠান হওয়া উচিত যদি অবশ্য ইতিমধ্যে তার যৌন মিলন না হয়ে থাকে। স্বামী যদি গৃহত্যাগ করে তো সাধ্বী স্ত্রী সন্তানবতী হলে আট বৎসর, অন্যথায় চার বৎসর অপেক্ষা করবে। যদি এইভাবে পাঁচবারও সঙ্গত কারণে স্ত্রীলোক পুনরায় স্বামী গ্রহণ করে তো পাপভাগিনী হবে না। ব্যাস ও অন্যেরা এই রকম বলেন।"[৯] বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকলেও মনু ইত্যাদিরা বলেন যে তপক্লিষ্ট সংযত জীবনই

---

১ তৃতীয়, ২. ২ দ্বিতীয়, ৬, ১৩, ৪ ৩ তৃতীয়, ১৮১

৪ ঊনত্রিংশ, ৮ ৫ সপ্তদশ, ১৮ ৬ পঞ্চদশ, ৭

৭ বশিষ্ঠ, সপ্তদশ, ৫৫-৫৬, বৌধায়ন, দ্বিতীয়, ২, ৪, ৭-৯।

৮ সপ্তদশ। বৌধায়ন, চতুর্থ, ১, ১৭-২৮ও দ্রষ্টব্য।

৯ একদা পরিণীতাপি বিপন্নে দৈব যোগতঃ
ভর্তর্যক্ষতযোনি স্ত্রী পুনঃ সংস্কারমর্হতি

বিধবাদের আদর্শ জীবন।[১] এমন কি পরাশর যিনি বিধবাদের বিবাহ বৈধ বলে বিধান দিয়াছেন তিনিও বলেন, "যে বিধবা স্বামীর মৃত্যুর পর সতীধর্ম পালন করেন, তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারিণীর মত স্বর্গে গমন করেন।"[২] হেমাদ্রি, রঘুনন্দন ও কমলাকরের মত পরবর্তী ভাষ্যকাররা বিধবা বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ করেছেন। তাঁদের পূর্ববর্তী কালে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগুপ্তকে হত্যা করে তাঁর বিধবা পত্নী ধ্রুবদেবীকে বিবাহ করেন এবং তাঁর গর্ভজাত পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত সিংহাসন পায়।[৩] এরকম আরও উদাহরণ আছে। তৎকালীন ধর্মনিষ্ঠা এতে ব্যাহত হয়নি। কোন একটা আদর্শকে স্বেচ্ছায় বরণ করা এক কথা, আর তাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া আর একটা কথা। নারীর সতীত্ব সর্বোচ্চ ধর্ম বলে প্রশংসা করা হয়, আর তা ছাড়া বিধবারা তাদের মৃত পতির প্রতি গভীর প্রেমের জন্যও বিবাহ করতে অস্বীকার করতে পারে।

বিধবা বিবাহ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী ও খ্রীষ্টীয় অব্দের দ্বিতীয় শতকের মধ্যে অপ্রিয় হয়ে ওঠে। তখনও বালবিধবার বিবাহে অনুমতি দেওয়া হত।[৪] আলবেরুনি লিখে গেলেন যে বিধবা-বিবাহ প্রথাবিরুদ্ধ বলে নিষিদ্ধ ছিল এবং এ নিষেধ বাল-বিধবাদের উপরও প্রসারিত করা হয়েছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব তিন শতক পর্যন্ত বিধবাদের অসুবিধা তৎকাল প্রচলিত নিয়োগ প্রথা দ্বারা খানিকটা দূর হত।[৫] স্বামীর ভ্রাতা দেবরের (দ্বিতীয় বর ঃ) সঙ্গে বিধবার পুনর্বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। স্বামীর মৃতদেহ চিতায় স্থাপিত হলে, মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা বিধবার হাত ধরে এই কথাগুলি বলত, "ওগো নারী, তুমি যার কাছে শুয়ে আছ তার প্রাণ নেই, তুমি তোমার স্বামীকে ছেড়ে জীবিতদের জগতে ফিরে এস আর যে তোমার হাত ধরেছে ও তোমাকে প্রেম নিবেদন করছে তার পত্নী

প্রতীক্ষতাষ্টবর্ষাণি প্রসূত বনিতাং সতি
অপ্রসূত চ চত্বারি প্রোষিতে সতি ভর্তরি
পঞ্চস্বেষু গৃহীতেষু কারণে সতি ভর্তৃষু
ন দোষো বিদ্যতে স্ত্রীণাং ব্যাসাদিনাম ইদং বচঃ।
স্যার আর জি. ভাণ্ডারকরের সংগৃহীত রচনার দ্বিতীয় খণ্ড (১৯২৮) পৃ. ৩১০ দ্রষ্টব্য।

১ যাজ্ঞবল্ক্য, প্রথম, ৭৫, পরাশর, চতুর্থ, ৩১ এবং পঞ্চত্রিংশ, ১৪।

২ মনু, পঞ্চম, ১৬০।

৩ আলতেকার-এর "এক নূতন গুপ্ত রাজা"। বিহার উড়িষ্যার রিসার্চ সোসাইটির জর্নাল (১৯২৮) পৃ. ২২২-৫৩, (১৯২৯) পৃ. ১৩৪-৪১।

৪ বশিষ্ঠ, সপ্তদশ, ৬৬, বৌধায়ন দ্বিতীয়, ২.৪৭।

৫ মার্টিন লুথার বলেছিলেন, "এক সুস্থ নারী যদি অসুস্থ পুরুষকে বিবাহ করে থাকে এবং অন্য পুরুষকে প্রকাশ্যে বরণ না করতে পারে আর সম্মানের হানিকর কাজও না করতে চায়, কেননা পোপ এত বেশী সংখ্যক সাক্ষী চায়…তাহলে সে তার স্বামীকে বলবে, দেখ বাপু, তুমি আমার যুবতী দেহকে বঞ্চিত করেছ এবং তদ্দ্বারা আমার দেহ ও আত্মা নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে

হত।"[১] "মহাভারতেও এরকম আচরণের কথা জানা যায়. "স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী যেমন দেবরকে বিবাহ করে তেমনি ব্রাহ্মণ পৃথিবীকে রক্ষা করতে অসমর্থ হলে পৃথিবী ক্ষত্রিয়কে পতিত্বে বরণ করেন।"[২] মৃত স্বামীর জন্য দেবর বা নিকট আত্মীয়দের ঔরসে যে সন্তান হত তাকে ক্ষেত্রজ বলা হত। বংশরক্ষাই আসল উদ্দেশ্য ছিল এবং সন্তান জন্ম নিলেই এই প্রথার বৈধতা আর স্বীকৃত হত না। বিধবার পুত্র থাকলে পারিবারিক সম্পত্তির একটা অংশ সে পায়। মহাভারতের পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র এবং পঞ্চপাণ্ডবই নিয়োগের ফলে জন্মলাভ করেন।

নিয়োগাচার দৈহিক শুচিতা ও যৌন ব্যাপারে নিষ্ঠার অভাব সূচক বলে আপস্তম্ব ও বৌধায়ন এর বিরোধিতা করেন। মনু একে পশ্বাচার বলে নিন্দা করেছেন।[৩] আমাদের যুগেও এ প্রথা নিন্দিত।[৪] নিয়োগ প্রথা ক্রমশঃ অব্যবহৃত হয়ে পড়ে। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী এ প্রথার পুনরুজ্জীবনের অনুমতি দিলেও তাঁর অনুগামীরা সোজাসুজি বিধবা বিবাহ প্রথাই গ্রহণ করেন।

বৈদিক সাহিত্যে সতীদাহ প্রথার সরাসরি উল্লেখ নেই। গৃহ্য সূত্রে গার্হস্থ্য জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে কিন্তু সতীদাহ প্রথার কোন উল্লেখ নেই। পরবর্তী ভাষ্যকাররা ও শাস্ত্রকাররা ঋগ্বেদের[৫] এক শ্লোক উদ্ধার করে সতীদাহ প্রথা সমর্থন করেন। শ্লোকটি এইরূপ: "যে সব নারীরা বিধবা নয় এবং উত্তম স্বামী যাদের আছে তারা চোখে কাজল লাগিয়ে ঢুকুক, অশ্রুহীনা, রোগহীনা, সালঙ্কারা, তারাই প্রথম গৃহে প্রবেশ করুক।[৬] শ্লোকটি

আর ভগবানের চোখে আমাদের বিবাহ অসিদ্ধ। অতএব আমাকে তোমার ভাই বা সর্বোত্তম বন্ধুকে গোপনে বরণ করতে দাও, তাহলে তোমার নাম বজায় থাকবে, সম্পত্তি কোন অজানা লোকের হাতে যাবে না। তুমি আমাকে আমার অজ্ঞাতে বঞ্চনা করেছ, এখন আমাদ্বারা অজ্ঞাতসারে তুমি বঞ্চিত হও।" Brian Linn, মার্টিন লুথার (১৯০৪), পৃ ২১২-১৩।

১ ঋগ্বেদ দশম, ১৮.৮, দশম ৪০-২।

২ শান্তিপর্ব, ৭২-১২।

৩ পদ্মধর্ম, নবম, ৬৬।

৪ কলিবর্জ্য। পরাশরের বিধবা বিবাহের অনুমতি কলিযুগের নামে বাতিল করা হয়; সো অয়ম পুনরুদ্বাহো যুগান্তরবিষয়ঃ। নির্ণয়সিন্ধুর তৃতীয় ভাগে কলিবর্জ্য অধ্যায়ে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে:

অগ্নিহোত্রং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পালপৈতৃকম্
দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তিঃ কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ।

(স্থায়ী অগ্নিরক্ষা, গোবধ, সন্ন্যাস গ্রহণ, শ্রাদ্ধের সময় মাংস ভোজন ও নিয়োগ প্রথা কলিযুগে বর্জনীয়।) সন্ন্যাস সম্বন্ধে নিষেধ শঙ্কর বাতিল করেছেন।

৫ দশম, ১৮.৭। অথর্ববেদ, দ্বাদশ, ২,৩১ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ষষ্ঠ ১০, ২-৩ দ্রষ্টব্য

৬ ইমা নারীরবিধবা সুপত্নীরঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।
অনাশ্রবো নমিবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে।

বিধবাকে সম্বোধন করে উচ্চারিত হয় নি, বরং সম্মিলিত নারীদের উদ্দেশে উচ্চারিত হয়েছে ; এবং "অগ্রে"র বদলে "অগ্নে" বসালে অর্থ বিকৃত হয়ে যায়। এ প্রথা সম্ভবতঃ ভারত জার্মান জাতির কয়েকটি শাখাতে প্রচলিত ছিল এবং ভারতীয় আর্যরাও তার অন্তর্গত, কিন্তু এটা পরিষ্কার যে ঋগ্বেদ একে সমর্থন করে নি। ভারতে যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল তার গ্রীক সাক্ষ্য আছে এবং বিষ্ণুস্মৃতিতে এর প্রশংসা আছে। রাজারাজড়াদের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল। মহাভারতে সতীদাহের দুইটি উদাহরণ আছে। মাদ্রী পাণ্ডু রাজার চিতায় আরোহণ করেন।[১] বসুদেবের স্ত্রীরাও তাদের স্বামীর চিতায় পুড়ে মরেন।[২] রাজাদের মধ্যে এটা সাধারণ প্রথা ছিল না। কুরুপত্নীরা তাদের স্বামীদের মৃতদেহসকল দাহ করে যথারীতি শ্রাদ্ধ-শান্তি করেন।[৩] খ্রীষ্টীয় যুগের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে ভারত শক ও হূনেদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়, সেই সময় রাজারা তাদের স্ত্রীদের সম্মান রক্ষার্থ এই প্রথা অনুসরণ করেন। হিন্দু আচারবিধি বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর আচার ব্যবহার ও জীবনযাপনপ্রথা কুক্ষিগত করে। ওরা সকলেই ব্রাহ্মণদের আচার ব্যবহার গ্রহণ করতে চাইত। নিরামিষ ভোজন ও বিধবাদের বিবাহ নিষেধ সম্বন্ধে নীচবর্ণেরা উচ্চবর্ণের নকল করে। বিপর্যয় যত বাড়ে, সতীদাহ প্রথাও তত বাড়ে, কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সর্বদাই হয়েছে। কাদম্বরীতে বাণ বলেছেন, "এ প্রথা নিরক্ষররা অনুসরণ করে ও মোহের অভিব্যক্তি, অজ্ঞতার পথ, দূরদৃষ্টির অভাব-সূচক নির্বোধ কার্য। পিতামাতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও স্বামী মরে গেলে জীবন দান করতে হবে—এর চেয়ে বোকামি আর কিছু নেই।" ভাল ভাবে বিবেচনা করলে এই আত্মহত্যা স্বার্থপরতার চিহ্ন যাতে শোকের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়। মনুসংহিতার ভাষ্যে মেধাতিথি সতীদাহকে আত্মহত্যা বলে উল্লেখ করেছেন, ধর্মাচরণ বলেন নি।[৪] শিখদের আদিগ্রন্থে আছে, "হে নানক, যারা আগুনে পুড়ে

অথর্ববেদে দেখি সতীদাহ সম্বন্ধে বেদপূর্ব যুগের এক প্রথার উল্লেখ আছে।

ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যত উপত্বা মর্ত্য প্রেতম্।

পুরাণমনুপালয়ন্তি তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণং চ দেহি। অষ্টাদশ, ৩.১।

"এই স্ত্রী তার স্বামী-লোক কামনা করে, মৃত তোমার পাশে শুয়েছে, হে মর, প্রাচীন প্রথা অনুসরণ করে তাকে ধন ও সন্ততি দাও।" পরে নারীর পরিবর্তে গরুকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। নারীকে বেঁচে থেকে অন্যকে বরণ করার অনুমতি দেওয়া হয়, একমাত্র শর্ত হল, নূতন [illegible] স্বামীর সগোত্র হবে। অথর্ব বেদ, নবম, ৫, ২৭, ২৮ দ্রষ্টব্য।

১ প্রথম, ১২৬, ২৫-২৬।

২ অথর্ববেদ, সপ্তদশ, ৭.১৮-২৪।

৩ মহাভারত, স্ত্রীপর্ব।

৪ পঞ্চম, ১৪৭। বৃহস্পতি তুলনা করেন :

আর্ত আর্তে, মুদিতে হৃষ্টা, প্রোষিতে মলিনা কৃশা

মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ, সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা।

এ হয়ত আদর্শ স্ত্রীর একটা অতিরঞ্জিত বর্ণনা।

মরে তারা সতী নয়, যারা ভগ্ন হৃদয় নিয়ে বেঁচে থাকে তারাই সতী।" প্রেমিকের মৃত্যুতে প্রেমের গভীরতার মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তাতে কখনও কখনও মৃত্যুই শ্রেয় মনে হয়। এটা কোন বিশেষ দেশ বা জাতিতে সীমাবদ্ধ নয়।[১] পাশ্চাত্য চিন্তার প্রসারের সঙ্গে সামাজিক বিবেকের যে জাগরণ হয় তার সুযোগ নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রামমোহন রায় ১৮৫৬ সালে বিশেষ অবস্থায় বিধবা বিবাহ বৈধ করার আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম হন এবং এ আইন বৈদিক ঐতিহ্য ও আচার দ্বারা অনুমোদিত।

বিবাহ-বিচ্ছেদ

স্ত্রী বর্তমানেও পুরুষের পুনরায় দারপরিগ্রহের কথা আগেই বলেছি। যজুর্বেদে আছে যে একজন পুরুষের অনেক স্ত্রী থাকতে পারে কিন্তু একজন স্ত্রীর বহু স্বামী থাকতে পারে না। অর্থাৎ একই সময়ে একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকতে পারে কিন্তু একজন নারীর পক্ষে একই সময়ে একাধিক স্বামী থাকা চলবে না।[২] কোন কোন অবস্থায় নারীর পুনর্বিবাহ চলতে পারে। "দেশ-ত্যাগী পুরুষের স্ত্রী পাঁচ বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করে তার পর পুনরায় স্বামী গ্রহণ করতে পারে।[৩] নারদস্মৃতিতে আছে: "স্বামী যদি মৃত হয় বা হারিয়ে যায়, কিংবা সংসারত্যাগী হয় অথবা ধ্বজভঙ্গ হয় বা জাতিচ্যুত হয়, এই পাঁচ রকমের আপদে নারী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারে। ব্রাহ্মণ নারী বিদেশগত স্বামীর জন্য আট বছর অপেক্ষা করবে, নিঃসন্তান হলে চার বৎসর অপেক্ষা করবে, তার পর আবার বিয়ে করতে পারবে। ক্ষত্রিয় নারী সন্তান-বতী হলে ছয় বৎসর আর নিঃসন্তান হলে তিন বৎসব অপেক্ষা করবে। বৈশ্য নারী সন্তানবতী হলে চার বৎসর আর নিঃসন্তান হলে দুই বৎসর অপেক্ষা করবে। শূদ্র নারীর অপেক্ষা করার কোন নিয়ম নেই। স্বামী জীবিত আছে যদি জানা যায় তো নির্দিষ্ট প্রতীক্ষার সময় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এই হল প্রজাপতির নির্দেশ।[৪] পাঁচ বৎসর পরে স্বামী ফিরে এলে স্ত্রী যদি তার কাছে যেতে অনিচ্ছুক হয়, তা হলে সে নিকট-আত্মীয়কে পুনরায় বিয়ে করতে পারে।[৫]

১ ডিসেম্বর ১৯১৭ সালে মস্কাতে যে বিদ্রোহ হয় তখন এক হতব্যক্তিকে "লাল সমাধিতে" সমাধিস্থ করাব সময় তার প্রণয়িনী বিদ্রোহী বালিকা কবরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে কফিনেব উপর শুয়ে পড়ে এবং বলে ওঠে, "আমাকেও কবর দাও ওই যখন মরে গেল, বিপ্লব নিয়ে আমি কি কবব ?" মানবজীবনে প্রণয় মাতৃত্ব বা মৃত্যুর মত জীবনেব কেন্দ্রীয় ঘটনার কাছে বিপ্লব অতি তুচ্ছ ঘটনা।

২ সহেতি যুগপদ্ বহুপতি নিষেধো ন তু সময়ভেদেন।

৩ বশিষ্ঠ, সপ্তদশ।

৪ ঐ, দ্বাদশ, ৯৬।

৫ ঐ সপ্তদশ, ৬৭।

ধর্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণীকে তার স্বামীর জন্য পাঁচ বৎসর প্রতীক্ষা করতে বলা হয়েছে, কৌটিল্য তাকে কমিয়ে এনেছেন দশ মাসে।[১] বশিষ্ঠ এবং নারদকে অনুসরণ করে কাত্যায়ন বিধান দিয়েছেন: "বর যদি ভিন্নবর্ণ হয়, জাতিচ্যুত হয়, পুরুষত্বহীন, দুষ্টবৃত্তিধারী, সগোত্র, ক্রীতদাস বা চিররুগ্ন হয় তো কন্যার বিবাহ হয়ে গেলেও তাকে অন্যের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া যায়।"[২]

এই সুপরিচিত শ্লোক।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।[৩]

কোন কোন অবস্থায় নারীর স্বামী বর্তমানে দ্বিতীয় বিবাহ মঞ্জুর করেছেন। কৌটিল্য লিখেছেন: "স্বামী যদি দুশ্চরিত্র হয়, অথবা বহুদিন বিদেশে থাকে, রাজদ্রোহী হয় বা স্ত্রীর পক্ষে বিপজ্জনক হয়, কিংবা জাতিচ্যুত বা ধর্মভ্রষ্ট হয় তো স্ত্রী তাকে পরিত্যাগ করতে পারে।"[৪] তারপর তিনি যে দম্পতি পরস্পরের সঙ্গে বাস করতে অক্ষম তাদের বিচ্ছেদ ঘটাবার বিশদ উপদেশ দিয়েছেন, যদিও এই সুবিধা তিনি শুধু যারা আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ রীতিতে বিবাহিত তাদেরই দিয়েছেন। স্বতন্ত্রবাস ও বিবাহবিচ্ছেদ সম্বন্ধে উদার মতের বদলে অবিচ্ছেদ্য বিবাহ বন্ধনের উৎপত্তি হল সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসের প্রতি আকর্ষণের ভয়ে। বিবাহবিচ্ছেদ উচ্চবর্ণের লোকের জন্য নিষিদ্ধ হলেও, অন্যদের এ সুবিধা ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব যুগে সমাজের সকল স্তরেই বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ প্রচলিত ছিল। বাৎস্যায়ন নারীদের পুনর্বিবাহের কথা সমর্থন করে লিখেছেন: "নীচ বর্ণেরও দুবার বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মিলন বাঞ্ছনীয়ও নয়, আবার নিষিদ্ধও নয়।"[৫] অর্থাৎ মানবিক অনুষ্ঠান হিসাবে বিবাহ পবিত্র হলেও, অবস্থা এমন হয়ে পড়তে পারে যখন দম্পতিকে চির দুঃখ থেকে বাঁচানোর জন্য বিচ্ছেদই একমাত্র পথ। একবার একটা আমরণ বন্ধনে ধরা দিয়েছে বলে, দুজনকে দুঃখের মধ্যে চিরকাল থাকতে বলা আমাদের মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে পাপ।[৬] এরকম অবস্থা অনেক সময় আত্মাকে বিনষ্ট করে। অসুখী পিতামাতার একসঙ্গে থাকা সন্তানদের পক্ষেও ভাল নয়। যেসব গোঁড়ামিকে আর আমরা শ্রদ্ধা করি না, তাদের সমর্থনে আইন আমাদের গার্হস্থ্য ঘনিষ্ঠ জীবনে বিপর্যয় ঘটিয়েছে। অবশ্য তুচ্ছ কারণে বিবাহবিচ্ছেদ করলে সামাজিক ভারসাম্য

১ তৃতীয় ৪।

২ মাধবের পরাশরভাষ্য এবং নির্ণয়সিন্ধুতে উদ্ধৃত।

৩ পরাশর, চতুর্থ ৩০, গরুড়পুরাণ, ১০৭'২৮, অগ্নিপুরাণ, ১৫৪'৫, নারদ দ্বাদশ, ৬৭।

৪ অর্থশাস্ত্র, তৃতীয়, ৩।

৫ ন শিষ্টো ন প্রতিষিদ্ধ। কামসূত্র, ৫'৩।

৬ মিলটন বলেছেন: "মানুষের মঙ্গল ও করুণার প্রয়োজনীয়তার উপরে যে বিবাহ বা অন্য বিধিকে স্থান দেয়, তাকে পোপীয়, বা প্রোটেস্টান্ট বা আর যা কিছুই বলা হোক না আসলে সে ফারিসীর থেকে ভাল নয়।"

নষ্ট হয়ে যায়। পাশ্চাত্য বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকতর সুযোগ দিয়েছে বলে মানুষের মোট সুখ বেড়েছে, কিংবা অন্ততঃ মানুষের দুঃখ মোটের উপর কমেছে কিনা সেটা বিচার্য বিষয়। বিবাহের পবিত্রতার উপর গার্হস্থ্য ধর্মাচরণ, পারিবারিক অখণ্ডতা এবং সন্তান-পালন নির্ভর করে। বিবাহ যদি চুক্তিমাত্র না হয়ে একটা সংস্কার হয়, তবে গভীরভাবে চিন্তা না করে বিবাহ করা অনুচিত। বিবাহকে যদি আমরা সংস্কার বলে গ্রহণ করি তাহলে তার সফলতার সম্ভাবনা বেশী। বহু শতাব্দী ধরে হিন্দু সমাজে নারীর পুনর্বিবাহের বিরোধী মনোভাবই প্রাধান্যলাভ করে এসেছে।

কোন কোন হিন্দু বর্ণের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ চলিত আছে। বিবাহবিচ্ছেদের কারণ সে সব ক্ষেত্রে দুর্ব্যবহার, নিত্য কলহ, স্বামীর ধ্বজভঙ্গ বা প্রথম বিবাহকালের কোন বিধিবহির্ভূত ঘটনা। বিধবাবিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদের পর নারীদের পুনর্বিবাহ বৈধ করে আমরা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারদের ধারণা মতই চলছি। জে. ডি. মেইন বলেন, "বিধবা হবার পর বা বিবাহবিচ্ছেদের পর হিন্দু নারীদের পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে যে নিষেধ আরোপ করা হয় তার ভিত্তি হিন্দু আইনে বা প্রচলিত প্রথায় নেই। যে নারী যুক্তিযুক্ত কারণে স্বামীকে পরিত্যাগ করেছে বা স্বামী যাকে পরিত্যাগ করেছে, কিংবা যার স্বামী মৃত তার পুনর্বিবাহ প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা স্পষ্ট ভাষায় সমর্থন করেছেন।"[১]

বর্তমানে স্বামী যতবার ইচ্ছে বিয়ে করতে পারেন অথচ স্বামীপরিত্যক্তা হলেও স্ত্রীর বিয়ে করার স্বাধীনতা নেই। স্বামী যদি স্ত্রী বর্তমানে বা অবর্তমানে আবার বিয়ে করতে পারেন তাহলে বিবাহ-বন্ধনকে অবিচ্ছেদ্য বলা চলে না। প্রেমহীন বিবাহ বা বিবাহের অর্থহীন অভিনয় সমাজে প্রচলিত থাকলেও যারা বিবেকবান তাদের মনকে আহত করে।[২] এমন অনেক পরিত্যক্তা পত্নী আছেন যাদের সুখের কোন ব্যবস্থা নেই। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পুনর্বিবাহের জন্য ধর্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তারা যদি ইচ্ছা করেন তবে তাদের বিয়ে করার অধিকার দিতে হবে। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনকে উদার করাই যথেষ্ট নয়। দু-একটা দুঃখজনক পরিস্থিতি, কটু বচন, সত্যকার বা কাল্পনিক অন্যায় নিয়ে বিদ্বেষপূর্ণ চিন্তা, মেজাজের অসঙ্গতি, এসব থেকেই বিবাহবিচ্ছেদ হতে পারে। হয়ত একটু আত্মত্যাগ বা বোঝাপড়া করলে বিবাদ মিটে যায় কিন্তু খুব উদার বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনে থাকলে, বিবাহ মেটাবার তাগিদ থাকে না। বলশেভিক বিপ্লবের গোড়ায় বিবাহ-বন্ধন আর আগের মত দৃঢ় ছিল না। বিবাহবিচ্ছেদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেই বিবাহবিচ্ছেদ করা যেত। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী ইচ্ছা করলে বিবাহ বেঁচে যাবে এই আশায় পরস্পরকে আঁকড়ে থাকতে পারত। একই রেজিস্ট্রি অফিসে একই দিনে

---

১ *Hindu Law and Usage*, Tenth Edition by এস. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার (১৯৩৮) পৃ. ১৮৫।

২ Galsworthy বলেছেন, "বন্ধন ছিন্ন করার সব দ্বার রুদ্ধ করলে বিবাহ যেন ক্রীতদাস প্রথা হয়ে ওঠে। কোন লোকই কারুর মালিক হতে পারে না। এখন সকলেই তা বুঝছে।" —*To Let*.

বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ দুই-ই সম্পন্ন হতে পারত। "কিন্তু অল্পস্থায়ী বিবাহের পরিসংখ্যান এতই ভয়াবহ হয়ে উঠল যে সম্প্রতি এক আইন করা হয়েছে যে বিবাহের পর কিছুদিন—আমার বিশ্বাস কয়েক সপ্তাহ—না গেলে বিবাহবিচ্ছেদ বৈধ হবে না। অবশ্য বিবাহ বা বিবাহবিচ্ছেদের রেজিস্ট্রেশনের খরচ নামমাত্র—পাঁচ ডলারের মত।"[১]

বিবাহ-বন্ধনকে সাধারণতঃ স্থায়ী বলেই ধরতে হবে।[২] বিবাহিত জীবন একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়লে তবেই বিবাহবিচ্ছেদের কথা ভাবা চলে। এ প্রথাটা তীব্র ঔষধের মত, এতে নিজের জীবন তো ছিন্নমূল হয়ই, অন্যের জীবনও বিপর্যস্ত হয়। সন্তানদের জীবন ও শ্রদ্ধা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। সন্তানদের জন্য বিবাহকে স্থায়ী বলে মনে করতেই হবে। বিবেকী পিতামাতা ছেলেদের আবেগ সঙ্কট এবং স্নায়বিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন করার চেয়ে নিজেদের কষ্টভোগ করা অধিকতর কাম্য বলে মনে করে। এমন কি সন্তানহীন হলেও বিবাহবিচ্ছেদ সহজে ঘটতে দেওয়া ঠিক নয়। বিবাহ চুক্তিমাত্র নয়, আত্মিক জীবনের একটা অংশ। ঝুঁকি কাঠিন্য মানবজীবনের সম্ভাব্য নিয়তি, কাজেই আমাদের দুয়েরই সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। মানুষ হিসাবেই মানুষের সঙ্গ করতে হবে, তার দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা, কামনা দুজনেরই থাকবে, এবং সেগুলির সমন্বয় করতেও সময় লাগবে। ক্যাথলিক খ্রীস্টান সম্প্রদায়ে বিবাহের সময় বরকনের নত মস্তকের উপর ক্রস ও তলোয়ার ধরা হয়। ক্রস দিয়ে বোঝায় যে মানুষকে উচ্চতর শক্তির উপর দুঃসাহসিক বিশ্বাস রাখতে হবে আর ক্রসের আইনভঙ্গ করলে যে শাস্তি হবে তলোয়ার তারই প্রতীক। যে চরম মূল থেকে সকল জিনিসের উৎপত্তি তার প্রতি আকর্ষণের চিহ্ন ও অঙ্গীকার হিসাবে প্রেমকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে, যারা বিবাহকে সংস্কার ভাবে তারা তাই মনে করে; এবং সেইদিক থেকে দেখলে আমাদের খানিকটা ঝুঁকি নিতে হবে এবং সে মহৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া চলবে না। আমরা বিয়ে করি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের অখণ্ডতা লাভ করার জন্য এবং চরম তত্ত্বের সঙ্গে সেইভাবে খাপ খাওয়ানোর জন্য যা না হলে ব্যক্তি বা সমাজ কারুরই সুখ থাকে না। এখনও এই প্রাচীন মত ভারতবাসীদের আকৃষ্ট করে, তাদের মধ্যে স্থায়ী বিবাহ ও পারিবারিক স্নেহ বোধ হয় অন্য যে কোন দেশের থেকে বেশী দেখা যায়। এ সৌভাগ্য বেশীর ভাগ ভারতীয় নারীদের চরিত্রের

---

১ Dreiser looks at Russia, পৃ. ১৬৫।

২ পৃথিবীর সমস্ত বড় ধর্মই বিবাহ-বন্ধনের পবিত্রতার কথা মানে। ফারিসীরা এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, পুরুষের পক্ষে স্ত্রী বর্জন করা কি বৈধ? এ প্রশ্ন করে তাঁকে লোভ দেখাল। তিনি উত্তর দিলেন, "মুশা তোমাদের কি আজ্ঞা দিয়েছেন?" তারা বললে, মুশা যে বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন প্রণয়ন করেছেন তাতে স্ত্রীকে ত্যাগ করা চলে। যীশু বললেন, "তোমরা কঠিন হৃদয় বলে তাঁকে এইরকম করতে হয়েছে। সৃষ্টির প্রারম্ভেই ঈশ্বর পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন। এই কারণেই পুরুষ পিতামাতাকে পরিত্যাগ করে স্ত্রীর সহিত মিলিত হবে, তারা এক দেহ হয়ে যাবে, দুই আর থাকবে না। কাজেই ঈশ্বর যাদের যুক্ত করেছেন মানুষ যেন তাদের পৃথক না করে।" সেণ্ট মার্ক, দশম, ২-৯।

লোকোত্তর মর্যাদা, প্রসাদগুণ ও শান্তি থেকে উদ্ভূত। তাদের অনেকের কাছেই সহনশীলতাই জীবনের লক্ষ্য। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে নরনারীর মনে এই আশার উদয় হয় যে সঙ্গ করতে পারলে তার পুরস্কার পাওয়া যাবে এবং শান্তভাবে দুঃখভোগ করতে পারলে কঠিনতম হৃদয়ও বিগলিত হবে। পুরুষের পক্ষে বিবাহবিচ্ছেদ সহ্য করা যত সহজ, মেয়েদের পক্ষে তত নয়; পুরুষ নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে গার্হস্থ্যজীবনের বিপর্যয় খানিকটা ভুলে যেতে পারে। কিন্তু মেয়েরা নিঃসঙ্গ। শিকল কাটলেই আমাদের পাখা গজায় না।

অবিচ্ছেদ্য বিবাহ-বন্ধনের মতবাদ চরম নয়, কিন্তু সেটাই আদর্শ। খুব বিশেষ ব্যতিক্রম হিসাবেই তা থেকে বিচ্যুতি ঘটতে দেওয়া চলে। এক সময় সার্থক ও প্রয়োজনীয় ছিল এমন অনেক বিধি ও প্রথা এখন নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। তাদের কোন কোনটা আত্মাকে পীড়িত করে, তাদের ত্যাগ করতে হবে। হিন্দুদের মধ্যে এক বিবাহের প্রচলন অনেকদিন আগেই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বহু-বিবাহ অবৈধ করতে হলে, কোন কোন অবস্থায় বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা বৈধ করতে হবে। বর্জন, নিত্য নিষ্ঠুরতা, ব্যভিচার, উন্মাদ, অনারোগ্য রোগই শুধু বিবাহবিচ্ছেদের কারণ হতে পারে, তাও উভয়পক্ষের মধ্যে যে কোনটির ইচ্ছাক্রমে। এরকম আইন আইনের পক্ষে যতটা সম্ভব বিশুদ্ধ, সুস্থ ও সুখী জীবন প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করতে পারে, তা হিন্দু ঐতিহ্যের আদর্শের সঙ্গে অসঙ্গতও হবে না।

সমাজ-সংস্কার

আমাদের সামাজিক আইনে অসঙ্গতি আছে। একাধিক স্ত্রীসহ কোন হিন্দু যদি ধর্মান্তর গ্রহণ করে খ্রীষ্টান হয় তো স্ত্রীদের আপত্তি না থাকলে সে একাধিক স্ত্রী রাখতে পারে, যদিও খ্রীষ্টানদের পক্ষে একই সময় একাধিক স্ত্রী রাখা অপরাধ। হিন্দু ধর্মান্তর গ্রহণ করে মুসলমান হলে তার উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হবে মুসলিম আইন অনুসারে, যদি না সে দেখাতে পারে যে প্রচলিত প্রথা দ্বারা মুসলমান উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তিত হয়েছে। মুসলমান স্বামী ধর্মান্তর গ্রহণ করলে তার বিবাহ অসিদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু হিন্দু খ্রীষ্টান হয়েও তার স্ত্রী রাখতে পারে। খ্রীষ্টান ধর্মান্তর গ্রহণ করে মুসলমান হলে প্রথম স্ত্রীর জীবদ্দশায় আবার বিবাহ করতে পারে, কিন্তু খ্রীষ্টান থাকাকালীন সে কাজ করলে তাকে দ্বি-বিবাহের অপরাধে অপরাধী হতে হয়। হিন্দু বিবাহবিচ্ছেদে অধিকারী নয় কিন্তু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলে সে স্বচ্ছন্দে বিবাহ করতে পারে। আবার ৪৬ বোম্বাই, ৮৭১ এবং ৫৫ বোম্বাই ১[1] মামলায় অনুলোম বিবাহ সিদ্ধ ও বৈধ বলে গণ্য হয়েছে, কিন্তু এ মত এ. আই. আর ১৯৪১ মাদ্রাজ ৫১৩-তে পরিত্যক্ত হয়েছে। আবার বিধবা-বিবাহ আইনের (১৮৫৬ সালের পঞ্চদশ আগস্ট) দ্বিতীয় ধারাতে পুনর্বিবাহিত বিধবার কাছ থেকে তার পূর্ব স্বামীর সম্পত্তির অধিকার লোপ করা হয়েছে। কিন্তু যখন প্রশ্ন উঠল, যে সকল বর্ণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে তাদের পক্ষে এ আইন খাটবে কিনা, এলাহাবাদ হাইকোর্ট বললে, খাটবে না[2], অন্যেরা বললে খাটবে।

---

১ ৫২ মাদ্রাজ ১৬০—ও দ্রষ্টব্য। ২ ৫৫ এলাহাবাদ, ২৪।

হিন্দু নারীর সম্পত্তিতে অধিকার সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগেও গোলমাল আছে। কাজেই সমগ্র সমাজে খাটবে অথচ বর্তমান যুগের স্বাধীনতাও সাম্যভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে এমন একটা সাধারণ আইন বিধিবন্ধ করার প্রয়োজন আছে। হিন্দু আইন কমিটি উত্তরাধিকার ও বিবাহ-সংক্রান্ত আইন এইভাবে প্রণয়নের চেষ্টা করছেন।

স্ত্রীলোকদের অবলা বলে। যে সভ্যতায় দৈহিক শক্তিই প্রাধান্যসূচক ছিল সেখানে সন্তান-জননী অবলাকে শক্তিমান পুরুষদের বলপ্রয়োগ থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। কিছুকাল আগে পর্যন্ত মেনে নেওয়া হয়েছে যে নারীরা দুর্বলতর ও অধিক সুকুমার অতএব রক্ষণীয়া আর তার জীবিকা উপার্জনেরও প্রয়োজন নেই, কেননা অন্য কাজের থেকে তার ঘরের কাজের দাম বেশী। গৃহ যতদিন মানবজীবনের কেন্দ্রে থাকবে, ততদিন স্ত্রীই পারিবারিক জীবনের সব থেকে প্রয়োজনীয় সদস্য থাকবে। কিন্তু গৃহের বদলে হোটেলের আবির্ভাব হচ্ছে, পর্ণকুটিরের জায়গা ঘরের সারি দখল করছে। আমরা যাযাবর জীবনযাপন করছি কিন্তু হিন্দু আদর্শ পরিবার-প্রথার স্থায়িত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের মূল মাটিতে। ভারতীয় নারী শাশ্বত জননী। সে বাল্যকাল থেকে জননী হবার অভিলাষিণী। সম্প্রতি নারীর আর্থিক স্বাধীনতার কথা খুব সোচ্চারে আলোচিত হচ্ছে। একথা মানতেই হবে যে সমগ্র পৃথিবীতে আজও বেশীর ভাগ নারীর লক্ষ্য বিবাহ ও সুরক্ষিত গৃহ। মেয়েরা চাকরি করলে লাভ খুব বেশী হবে না। গৃহকর্ম যথেষ্ট শ্রমসাধ্য, মেয়েরা অন্য কাজ করতে গেলে গৃহকর্মে ক্ষতি হবেই। গৃহের মধ্যেই মেয়েদের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য দিতে হবে। সম্পত্তির স্থায়িত্ব, উত্তরাধিকার, স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির হস্তান্তরের অধিকার ইত্যাদি পুরুষের সমপর্যায়ে স্ত্রীলোকদেরও দেবার চেষ্টা করা উচিত। মেয়েদের সম্পত্তি-সংক্রান্ত আইনের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। দুঃস্থ ও আশ্রিত, বিশেষ করে বালক, বৃদ্ধ ও বণিতাদের যত্ন নেওয়া হিন্দুধর্মের বিশেষ লক্ষ্য। নির্ভরশীলা নারী প্রথমে পরিবারের, পরে কুলের আশ্রিতা। কৌটিল্য মেয়েদের কর্মশালা নির্দেশ করেছেন এবং পুরুষ আত্মীয়দের উপর তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়েছেন।[১] স্বামীর স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার উদারভাবে স্বীকার করতে হবে। শাস্ত্র বলেন, স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী এবং জীবনের সমস্ত ব্রতে তার সহকারিণী। স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর আজীবন অধিকার দিতেই হবে। বৃহস্পতির মতে নিঃসন্তান বিধবাদের স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার অন্যান্য পিণ্ডদাতাদের আগে।[২] নিঃসন্তান মাতামহের সম্পত্তি যে কন্যা না পেয়ে দৌহিত্র পায়, এ ব্যবস্থা বদল করতে হবে। দৌহিত্র পিণ্ড দিতে পারে, কন্যা পারে না, সেটা খুব বড় বাধা নয়। ছেলেদের মত মেয়েদেরও উত্তরাধিকার স্বীকার করতে হবে।

বিবাহ-বিধি যাই হোক মাতৃত্বের রক্ষণাবেক্ষণ করতেই হবে।[৩] পিতামাতার

---

১ দ্বিতীয়, ২৩।

২ কে ভি রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, রাজধর্ম (১৯৪১) ৫১ পৃঃ।

৩ নাৎসী জার্মানীতে লোকসংখ্যা বাড়ানো সরকারী দায়িত্ব ছিল, তার জন্য সরকার অবৈধ

দোষে সন্তানের শাস্তি হওয়া উচিত নয়। সমস্ত সন্তানই বৈধ এবং আইনের দৃষ্টিতে সমান হওয়া উচিত।

প্রাচীনকালে স্মৃতিকার ও তাঁদের ভাষ্যকারের প্রাচীন শাস্ত্রবাক্য নির্বাচন ও নির্ধারণ করে আইন কালোচিত করে নিয়েছিলেন। আদালত ও বিধানসভা এখন ভাষ্যকারদের স্থান নিয়েছে। অবশ্য প্রাচীন ভাষ্যকারদের যতটা স্বাধীনতা ছিল, আদালতের ততটা নেই। কাজেই আইনকে যুগোপযোগী করার ভার বিধান সভাকে নিতে হবে[১]।

দেবদাসী প্রথার উৎস যাই হোক, বর্তমানে এই পদ্ধতি থেকে বেশ্যাবৃত্তির উৎপত্তি হয়েছে, কাজেই প্রথাটি দুষ্ট এবং বর্জনীয়। সামাজিক পবিত্রতাকামী সকল ব্যক্তিই এর বিরোধিতা করেন এবং মাদ্রাজে আইন করে এই প্রথা বন্ধ করা হয়েছে। মিশর, গ্রীস ও রোমে প্রাচীনকালে দেবতাদের উদ্দেশ্যে কুমারীদের উৎসর্গ করার প্রথা প্রচলিত ছিল। দেবদাসীরা নীতি-বিগর্হিত জীবন যাপন করে এবং এ প্রথা শুধু ঘটনাচক্রে নয়, আমাদের সমাজজীবন ও বিবাহ পদ্ধতির অংশ হিসাবে গড়ে উঠেছে। ভারতের প্রত্যেক মন্দিরে গর্ভগৃহ ছাড়া নাটমন্দির আছে। শিবপুরাণে আছে,

---

যৌন সম্পর্কের দিকে চোখ বুজে থাকত। জার্মান সৈনিকরা বিজ্ঞাপন দিয়ে জার্মান নারী ও যুবতীদের আমন্ত্রণ করত যে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার আগে যেন তাদের দ্বারা গর্ভবতী হয়। এতে সরকারী উৎসাহ ছিল।

নিউ স্টেটস্‌ম্যান, ১৬ই জুলাই ১৯৪০, পৃঃ ৮।

১ ১৯৪২ সালের ২৬নং বিলে যাঁরা উইল না করে মারা যাবেন, তাঁদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও স্ত্রীধন সম্বন্ধে প্রস্তাব আছে আর ২৭নং বিলে বিবাহ সম্বন্ধে। প্রথম বিলের ধারায় বিধবা, পুত্র ও কন্যা যুগপৎ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। বিধবা ও পুত্র সমান অংশ পাবে, কন্যা বিবাহিতা হোক বা অবিবাহিতা হোক, সন্তানবতী বা নিঃসন্তান হোক, তার অর্ধেক অংশ পাবে। মৃত ব্যক্তির পূর্ব মৃত পুত্রের সম্পত্তির অংশ জীবিত পুত্র বা তার অবর্তমানে পৌত্র পাবে। এর মধ্যে বিধবা পুত্রবধূকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে, বোধ হয় এইজন্য যে সে তার পিতার সম্পত্তির অংশ পাবে, আবার পূর্ব মৃত পুত্রের কন্যাদের সম্বন্ধেও কোন বিবেচনা করা হয় নি।

কিন্তু "উত্তরাধিকারসূত্রে বা ভাগাভাগির ফলে প্রাপ্ত, কিংবা খোরপোষের জন্য দত্ত অথবা কোন আত্মীয় বা অনাত্মীয় লোকের বিবাহের আগে পরে দত্ত সম্পত্তি, অথবা স্বোপার্জিত বা যে কোন উপায়ে অর্জিত বা প্রাপ্ত সম্পত্তি"তে স্ত্রীলোকের পূর্ণ অধিকার, এমন কি হস্তান্তর-ক্ষমতা পর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছে।

স্ত্রীলোকের সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীধন বলে স্বীকৃত হয়েছে এবং কন্যা ও তাহার সন্তানদের সেসবের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তাদের অবর্তমানে পুত্র ও তার বংশধরেরা, নিঃসন্তান হলে স্বামী, তারপর নিকটাত্মীয়রা অধিকারী হবে। পুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকারে পুরুষদের অগ্রাধিকার যখন ছিল তখন স্ত্রীধনে মেয়েদের অগ্রাধিকার দেওয়া ঠিকই হয়েছিল। কিন্তু এখন যখন কন্যাদেরও পৈতৃক সম্পত্তির অংশ দেওয়া হচ্ছে, তখন স্ত্রীধনের উত্তরাধিকার নিয়েও অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নেই।

শিবের মন্দির নির্মাণ করতে হলে নৃত্যগীতে পটিয়সী সহস্র সহস্র উত্তম বালিকার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তারের যন্ত্র বাজাতে পারে এরকম পুরুষ সঙ্গীতজ্ঞও থাকা চাই।[1]

অনেকে বলেন, অনেক স্থলে বিবাহও বেশ্যাবৃত্তিরই এক বিশেষ রূপ ; আসলে বিবাহ টাকা দিয়ে যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তির একটু বেশী আদৃত ব্যবস্থা, আর সে ব্যবস্থা আইন, প্রথা ও ধর্ম দ্বারা সম্ভ্রান্ত বলে স্বীকৃত। বেশ্যা বাজার খারাপ করে, কেননা যৌন বেসাতি সে বাজার দর অর্থাৎ বিবাহের চেয়ে কম দরে বেচে। আর্থিক নির্ভরতার বিনিময়ে নারী তার অবিবাহিত অবস্থার কাজ ও ব্যক্তিত্ব পরিত্যাগ করে। তার দেহ ও গুণ দিয়ে সব চেয়ে বেশী দর যা পাওয়া যায়, তাই নিয়ে তার দেহ বেচার পর তাকে সেই ব্যবস্থা বিনা নালিশে মেনে চলতেই হয়, মনে মনে যত অনুতাপই থাক। অনেক লোক তাদেব মেয়েদের যে শিক্ষা দেয় তা শুধু যৌবন থাকতে থাকতে কোন পুরুষকে আকর্ষণ করার জন্য আব তারপর তার গুণ ও শক্তি দিয়ে যাতে পরিবারের পক্ষে সে একজন প্রয়োজনীয় ব্যক্তি হয়ে উঠতে পাবে তার জন্য। বিব্যহেব উদ্দেশ্যই হল নিজের ভরণপোষণ করতে পুরুষকে চুক্তিতে আবন্ধ করার ফাঁদ।

বিবাহ সম্বন্ধে এ ধরনেব মত ন্যায়সঙ্গত নয়, কেননা নিষ্ঠা ও গার্হস্থ্য জীবন সুস্থভাবে যাপন কবার সম্ভাবনা বিবাহানুষ্ঠানেব এক অচ্ছেদ্য অংশ। বেশ্যাবৃত্তি সতী মেয়েদের দুর্বৃত্তের নজব থেকে রক্ষা করে, সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করে, এবং কেলেঙ্কারি ঘটতে দেয় না, ইত্যাদি যুক্তি শুধু অন্যায় ঢাকবার চেষ্টা।

---

২৭ নম্বরের বিলে সংস্কার বিবাহ ও রাষ্ট্রীয় বিবাহ এই দুই ভাগে বিবাহকে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম বিবাহে দুই পক্ষই হিন্দু হওয়া চাই এবং কোন পক্ষেরই স্বামী বা স্ত্রী থাকবে না। দুই পক্ষই স্বজাতি হবে কিন্তু সগোত্র বা এক প্রকাবেব হবে না। তারা পরস্পরের সপিণ্ডও হবে না। পাত্রী যদি ষোল বৎসবেব নীচে হয় তো বিবাহের সময় তার অভিভাবক, পিতা-মাতা পিতামহ, ভ্রাতা বা অন্যান্য জ্ঞাতি বা মাতুলের সম্মতি দরকার। বরের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ হলে বিবাহ চলবে না। বিবাহ সংস্কারেব অপরিহার্য অঙ্গ,—হোম ও সপ্তপদী। সপ্তপদী শেষ হলেই বিবাহ সিদ্ধ হল, সহবাস অপ্রযোজনীয়।

রাষ্ট্রীয় বিবাহে এক পক্ষ হিন্দু, অন্য পক্ষ হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈন। কোন পক্ষেরই স্বামী বা স্ত্রী জীবিত থাকলে চলবে না। পাত্রের আঠারো বৎসর ও কন্যার চৌদ্দ বৎসব পূর্ণ হওয়া চাই। একুশ বৎসরের কমবয়স্ক বা বয়স্কা পাত্র বা পাত্রীর অভিভাবকের সম্মতি প্রয়োজন। আর নিষিদ্ধ সম্বন্ধ পাত্র-পাত্রীর বিবাহও অবৈধ। ভারতীয় বিবাহবিচ্ছেদ আইন (১৮৬৯) এই বিবাহে প্রযোজ্য হবে।

উভয় প্রকারের বিবাহেই এক বিবাহের নীতিকে অঙ্গীভূত করা হয়েছে। সংস্কার রীতির বিবাহে বিবাহবিচ্ছেদের বাবস্থা না থাকাতে রাষ্ট্রীয় রীতির বিবাহই সাধারণতঃ জনপ্রিয় হবে।

১ উত্তমস্ত্রীসহস্রৈশ্চ নৃত্যগেয়বিশারদৈঃ
বেণুবীণাবিদগ্ধৈশ্চ পুরুষৈর্বহুভির্বৃতম্।
বায়বীয় সংহিতা। উত্তরখণ্ড, ২০, ১১৪।

পুরুষের বদখেয়াল মেটাবার জন্য নারীকে হীন করা অন্যায়। নারীদের প্রতি এরকম কুব্যবহার করলে তাদের আত্মা প্রায় বিনষ্ট হয়। ব্যক্তিগত বিচ্যুতি এক কথা, কিন্তু পাশববৃত্তির সরকারী স্বীকৃতি অন্য কথা। মেয়েদের পণ্য বলে ভাবা ঠিক নয়। নারীদের ব্যক্তিত্ব আছে বলে মানলে, বেশ্যাবৃত্তি তাদের ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে অপরাধ।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ

মালথাস জনসংখ্যার উপর এক প্রবন্ধ লিখে এই প্রস্তাব করেন যে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সমান্তরভাবে (in A. P.) বৃদ্ধি পায় কিন্তু মানুষের বংশবৃদ্ধি গুণোত্তর ভাবে হয় (in G. P.), কাজেই এই প্রবণতা কোন রকমে প্রতিহত করতে না পারলে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হবে। আর ভূমির মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির হারও চিরকালের জন্য বজায় থাকবে না। কি ভাবে এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তারও কিছু পরামর্শ তিনি দিয়েছেনঃ দেরিতে বিয়ে (বিয়ের আগে সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য) এবং সন্তানোৎপাদনের জন্য ছাড়া যৌন-মিলন বর্জন। মালথাসের অনেকগুলি অনুমান ভ্রান্ত। জনসংখ্যা বাড়লেই যে দারিদ্র্য বাড়ে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় নি। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে অন্ন-সংস্থান করার মত নৈসর্গিক উপকরণ যথেষ্ট নেই, একথাও মিথ্যা।

অত্যধিকবার সন্তান প্রসবের কষ্ট থেকে নারীদের বাঁচাবার জন্য মহাত্মা গান্ধী খুবই উদগ্রীব কিন্তু তিনি মনে করেন যে যন্ত্রপাতি বা ঔষধপত্রের সাহায্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সমাজের স্নায়বিক এবং নৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। আমাদের বংশবৃদ্ধির অপচয়মূলক পদ্ধতি যার ফলে বারোটি সন্তান জন্মালে ছজন বাঁচে, চলুক, তা মহাত্মা গান্ধী চান না। তাঁর মতে অধিক সন্তান উৎপাদন নিবারণের উপায় যৌন সংযম। অন্য ভাবে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করলে যৌন সম্পর্কটাই মূল লক্ষ্য হবে এবং তৎসংক্রান্ত দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া হবে। কামতৃপ্তিকে একটা উদ্দেশ্য বলে ধরা ঠিক নয়। যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র ব্যবহার করে যৌন মিলনকে বিকৃত করা হয়, বংশরক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় আর সুখই একমাত্র লক্ষ্য হয়। আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট বলেছিলেন, "সন্তান জন্মের জন্য ছাড়া সহবাস করা প্রকৃতির পক্ষে ক্ষতিকর।"

অন্য ব্যাপারের মত এ ব্যাপারেও আদর্শ এবং ব্যবহারের মধ্যে তফাৎ আছে। অচ্ছেদ্য বিবাহ-বন্ধন আদর্শ, কিন্তু অবস্থানভেদে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা থাকা চাই। তেমনি সংযমের দ্বারা জন্মশাসন আদর্শ বটে[১], কিন্তু যন্ত্রপাতি বা ঔষধ-

১ প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রকারবা কোন কোন অবস্থায় যৌন মিলন বর্জনীয় বলে বিধান দিয়েছিলেন। ব্যাসের এক শ্লোক কমলাকার উদ্ধার করেছেন, তার মর্ম "নারী বৃদ্ধা, বন্ধ্যা, অশিষ্ট বা মৃতবৎসা হলে, বা যখন সে পরিপক্ক হয়নি, অথবা কেবল কন্যাই প্রসব করছে বা যখন অনেক পুত্র হয়েছে তখন পুরুষ তার সঙ্গে সঙ্গম বর্জন করবে।"

বৃদ্ধাং বন্ধ্যাং অসদ্বৃত্তাং মৃতাপত্যামপুষ্পিনীম্
কন্যাসূং বহুপুত্রং বর্জয়েন্ মুচ্যতে ভয়াৎ।

পত্রের প্রয়োগে জন্মনিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ করা যায় না। নরনারী শুধু নিজেদের দৈহিক সুখের জন্য পরস্পর মিলিত হবে না, শুধু সন্তানপ্রাপ্তির জন্য সহবাস করা উচিত এরকম চিন্তা ঠিক নয়। যৌন কাম মাত্রই মন্দ এবং তাকে নীতিগত ভাবে দমন করতে হবে এরকম ভাবা ঠিক নয়। বিবাহ শুধু সন্তানোৎপাদনের জন্য নয়, আত্মিক বিকাশের জন্যও। নরনারী সন্তানও যেমন চায়, পরস্পরকেও তেমনি চায়। বহুসংখ্যক নরনারীর জীবন থেকে তাদের একমাত্র স্ফূর্তির উৎস কেড়ে নিলে, অনেকখানি দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক অতৃপ্তির সৃষ্টি করা হবে। লর্ড ডসন লিখেছেন, "পরিবারের সংখ্যা যদি চারটি সন্তানে সীমাবদ্ধ করা হয়, তাহলে বিবাহিত দম্পতির উপর যে সংযমের বোঝা পড়বে, তাতে বহুদিন ধরে ব্রহ্মচর্য পালন করার সামিল হইবে। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে আর্থিক কারণে বিবাহের আদি অবস্থাতেই পরিবার সংক্ষেপ করার বেশি প্রয়োজন হয় অথচ তখনই কামনা সব থেকে তীব্র থাকে, এইসব বিবেচনা করেই আমি বলছি যে জনতার পক্ষে এরকম দাবী মেটানো অসম্ভব। সংযমের দ্বারা পরিবার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে স্বাস্থ্য ও সুখের উপর তা বিরুদ্ধ প্রতিকার করবে এবং নীতির দিক থেকেও তা বিপজ্জনক হবে। ব্যাপারটি ভয়াবহ। এ যেন তৃষ্ণার্ত লোকের কাছে জল রেখে বলা যে, তুমি জল পান করতে পারবে না। কাজেই ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণ হয় বিফল হবে আর যদি সফল হয় তো নানা দিক থেকে ক্ষতিকর হবে।"

অনেক সময় বলা হয় যে জন্মনিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিক ব্যাপারে অস্বাভাবিক হস্তক্ষেপ মাত্র। কিন্তু আমাদের সকল রকম আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতি নির্মাণই তো প্রাকৃতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ। বর্বর প্রথার সঙ্গে আমাদের আচারে তফাৎ আছে এবং তাও প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম। প্রাচীন বস্তু আধুনিক বস্তুদের থেকে বেশি প্রকৃতি-ঘেঁষা বললে, বহুবিবাহ ও অবাধ যৌন মিলন বেশি স্বাভাবিক বলে মানতে হবে। বর্তমান সামাজিক আবহাওয়া ও তজ্জনিত আর্থিক নিরাপত্তার অভাবে এবং সন্তানকে জীবনে ভাল ভাবে আশ্রয় দেওয়ার জন্য পিতামাতাদের আগ্রহাতিশয্যে অনেক দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ কাপড়-চোপড় পরার মতই স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আসলে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আপত্তি তার অপব্যবহার থেকে উদ্ভূত। যে সব নারী গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও সন্তান পালন এড়িয়ে যেতে চায় ও যে সব পুরুষ নিজেদের কৃতকর্মের দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে চায়, তারাই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। কিন্তু একটা জিনিস অপব্যবহার করা হয় বলেই তার যোগ্য ব্যবহার আপত্তিজনক নয়। যাদের সন্তানদের খাওয়াবার সামর্থ্য নেই, তারা যদি এই পদ্ধতিতে নিজেদের পরিবারকে সীমিত রাখে তো আমরা তার নিন্দা করতে পারি না। দরিদ্র শ্রেণীর লোকের কাছে সন্তান অবাঞ্ছিত নয় কিন্তু তারা তাদের দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে পালন করতে চায় না। এর যোগ্য প্রতিকার তাদের ছেলেদের উপযুক্ত পরিবেশে পরিপুষ্ট করার ব্যবস্থা করা। তাদের অবস্থা স্থায়ী বলে না ভেবে উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে। আমরা পশু নই। যৌন মিলনকে দায়িত্বপূর্ণ

ব্যক্তির মত পাত্রপাত্রীর সম্মতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। সন্তানদের প্রয়োজনে যদি আত্মসংযম প্রয়োজন হয় তা করতে হবে। পিতামাতা যদি মনে করে যে তাদের পরস্পরের সুখের জন্যে তারা ভবিষ্যতের ঝুঁকি নিতে রাজী আছে, তবে তাদের বারণ করার দরকার নেই। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে জন্মনিয়ন্ত্রণের চেয়ে যৌন সংযম ভাল। কিন্তু মানুষ সকলেই তপস্বী নয়, যদিও তপস্বী হবার চেষ্টা তারা করতে পারে। বর্তমান অবস্থায় সামাজিক অর্থ-ব্যবস্থার দিকে চেয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণীর জন্য।

বিচ্যুতির বিচার

মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি কোন দেশের মানুষ কিভাবে বিচার করে তাই দিয়ে সেই দেশের সভ্যতার মান যাচাই করা যায়। আমরা বিবাহ সম্বন্ধে যে আইনই করি না কেন, বিবাহিত নয় এমন নরনারীর মিলন ঘটবেই। সাধারণতঃ হিন্দু ঋষিরা মানুষের দুর্বলতা ও ত্রুটি অপরিসীম ক্ষমার চোখে দেখতেন। যাকে অপরাধ বলা হয় তা অনেক সময় নীচ ও পশুমনের প্রকাশ নয়, বরং স্নেহশীল ও সংবেদনশীল মনেরই প্রকাশ। আইনকে অগ্রাহ্য করা সত্যকার দুষ্টামি নয়। যে আচরণ এখন আমরা নৈতিক বলে মনে করি তার অনেকটাই অর্থহীন ও আচারগত। সজীবতার অভাবে আমাদের বিধিগুলি যান্ত্রিক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। যা প্রচলিত তাই সমাজের রুচিমত হয়। আইন মানা বা কর্তব্য করা নীতির সবচেয়ে উঁচু আদর্শ নয় যদিও সামাজিক শৃঙ্খলা ও শিষ্টতার পক্ষে এগুলি একান্ত প্রয়োজন। এদের দৃঢ়তা নৈতিক অন্তর্দৃষ্টি তীব্রতর করার উদ্দেশ্যে, কারো মনোভঙ্গ করার জন্য নয়। কিন্তু নীতিকথার যান্ত্রিক পালনই জীবনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যখন কোন সমীপবর্তী নরনারীর আত্মা ও মনের মধ্যে গভীর ঐক্য আবিষ্কৃত হয়, যখন তারা পরস্পরের চোখে চোখ রেখে বুঝতে পারে যে যাকে দেখছে তার মধ্যে সে অবাক শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও প্রণয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে, যখন দেহের মিলনের আগে হৃদয়ের মিল হয়ে যায়, তখন তারা মিলনের ক্ষণে যা করে তাই পবিত্র। যে এরকম প্রণয়ের বিরুদ্ধে কিছু বলে তার নিজের মনই ভ্রান্ত। অগস্টাইনের উপদেশ "ভগবানকে ভালবাস, তারপর যা খুশী কর" থেকে বোঝা যায় সত্যকার প্রণয়ের জীবন নিয়ম-কানুনের ঊর্ধ্বে।[১] যদি প্রেম ও আনন্দের জীবন প্রচলিত বিধিনিষেধ

---

১ আবেলার্দ ও হেলোয়াসের গল্প শুনুন। তারা পরস্পরকে গভীর ভাবে ভালবাসত কিন্তু নানা বিপদাপদে তারা তফাৎ হয়ে পড়ে। তাদের তীব্র আবেগ ভাষারই ওপর প্রকাশ হতে পারত। হেলোয়াস তার দয়িতকে চিঠি লিখতে বলে 'আমাদের শত্রুদের দ্বেষ যে সুখ কখনও আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না, আমরা যেন নিজেদের অবহেলায় তা না হারাই। আমি পড়ব তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার সাক্ষরে দেখবে আমি তোমার স্ত্রী।' সে আগে আবেলার্দকে বিয়ে করতে রাজী হয় নি যে সূক্ষ্ম আবেগের জন্য তার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে। 'আমি কেন তোমাকে বিয়ে করতে একান্ত অনিচ্ছুক

এবং আনুষ্ঠানিক বিধির দ্বারা খণ্ডিত হয়, তাহলে এইসব বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করা যেতে পারে। লোকের স্বভাবকে সুবিন্যস্ত করা ও শারীরিক, জাতীয়, সামাজিক, মানবিক ও পারমার্থিক উপাদানের সমন্বয় ঘটানোর জন্যই বিবাহবিধি। কাজেই সংযম ও সু-অভ্যাস প্রয়োজন। ব্যর্থতা শারীরিক, মানবিক বা পারমার্থিক যে কোন দিক দিয়ে আসতে পারে। আমরা ধরে নিই এক বিবাহ স্বাভাবিক। ব্যাপারটা অত সোজা নয়। আমাদের প্রবৃত্তি আছে। একান্ত প্রয়োজনীয় হলেও বিশ্বস্ততা রক্ষা করা সহজ নয়। অনেকে একপরায়ণতাকে অসম্ভব ও নিষ্ঠুর কুসংস্কার

ছিলুম তার কারণ তুমি না বুঝে পারবে না। আমি যদিও জানি যে স্ত্রীর স্থান সংসারে সম্মানিত এবং ধর্মপরা পবিত্র, তবু আমার কাছে তোমার উপপত্নী হওয়ার দাম বেশী, কেননা তাতে উভয় পক্ষই স্বাধীন থাকবে। বিবাহ-বন্ধন সম্মানজনক হলেও সে বন্ধনই এবং আমি যে সর্বদা একজন লোককে ভালবাসতে বাধ্য হব, যে হযত পরে আমাকে আর ভালবাসতে নাও পারে, এরকম অবস্থায পড়তে আমি ইচ্ছুক নই। সেইজন্য আমি স্ত্রীর মর্যাদাকে তুচ্ছ করেছি, উপপত্নী হয়ে সুখে থাকব এই আশায।' ব্রহ্মচারিণীর ব্রত নিয়েও সে অতীতের জন্য অনুতপ্ত নয়। সে তার পাপের জন্য চোখের জল ফেলে নি, তার প্রিয়ের জন্যই তার দুঃখ। 'মনে রেখো আমি এখনও তোমায় ভালবাসি যদিও নিরন্তর চেষ্টা করছি যাতে না ভালবেসে পারি।' আমি সর্বদাই বলে এসেছি জগতের সম্রাজ্ঞী হওয়ার থেকে আবেলার্দের উপপত্নী রূপে তার সঙ্গে বাস করাকে আমি শতকোটি গুণ শ্রেয বলে মনে করি। পৃথিবীপতির বৈধ স্ত্রী হওয়ার থেকে তোমার অনুরাগী হওয়াই আমাকে বেশী সুখী করত। ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরে প্রেমের মোহিনী শক্তি নেই। "A Treasury of the World's Great letters, ed by M Lincoln Schuster (1941), P 37.

আবেলার্দ নিষিদ্ধ প্রণয ও প্রণযাভিলাষে ক্ষতবিক্ষত হয়ে জবাব দেয। তার ধর্ম তাকে এক দিকে টানে, তার হৃদযাবেগ আরেক দিকে নির্দেশ দেয। ব্যর্থ ও সঙ্গিহীন দার্শনিক দেখলেন যে সংসার ত্যাগ করলেই ভক্তি ও কর্তব্যবোধ পাওযা যায না। স্বর্গের করুণাবিন্দুবর্জিত মরুভূমিতে যাকে আর ভালবাসা উচিত নয, মন তার দিকেই ধায়। সে তার প্রেমিকার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলার জন্য সেণ্ট পল ও অ্যারিস্টটলের মধ্যে ডুবে গেল আর তার দযিতাকে উপরোধ করল যেন তার নিষ্ঠায অবিচলতা দিযে তাকে আরও কষ্ট না দেয। এই ধ্রুপদী প্রেমকাহিনী যে সমস্যা প্রকাশ করে তা মানুষ সৃষ্টি হবার সময় থেকে চলে আসছে। আবেগের স্থান ধর্মতত্ত্বের বিধি অধিকার করল এরকম পলাযনপরতা সমস্ত প্রেমবিদ্ধ লোককে সান্ত্বনা দিতে চায কিন্তু পারে না। টাইমসের সাহিত্য সংখ্যা ২১শে জুন ১৯৪১, পৃঃ ২৯৮।

Wuthering Heights-এ কাথি বলেছেন, "পৃথিবীতে আমার যা সব চেয়ে বড় কষ্ট তা হিথক্লিফের কষ্ট আমি প্রত্যেকটি শুরু থেকে দেখেছি ও অনুভব করেছি. আমার জীবনের একমাত্র চিন্তাই সে। আর যদি সব নষ্ট হয় এবং সে থাকে তো আমিও থাকব আর সে যদি যায় আর সব থাকে তবে পৃথিবী আমার কাছে অজানা হয়ে উঠবে আমি তার অংশ থাকব না। লিণ্টনের প্রতি আমার ভালবাসা গাছের পাতার মত, আমি খুব ভাল করে জানি শীতে তা ঝরে যাবে। কিন্তু হিথক্লিফের প্রতি আমার প্রেম শাশ্বত শিলার মত, দেখতে সুন্দর নয, কিন্তু একান্ত প্রযোজন। নেলি আমিই হিথক্লিফ। সে সর্বদা সর্বক্ষণ আমার মনে বিরাজ করছে আনন্দের উৎস বলে নয, যেমন আমি আমার নিজের কাছে আনন্দের উৎস নয, শুধু আমিই। অতএব আর আমাদের বিচ্ছেদের কথা তুলো না সে সম্ভব নয় ।"

বলে মনে করেন এবং এটা পূর্ণ জীবন যাপন করার অক্ষমতা, প্রথাগত বিষয়ে নিস্তেজ আকর্ষণ, ঘৃণ্য ভীরুতা ও কল্পনাশক্তির অভাবের সূচক বলে তাঁরা মনে করেন। অনেক সময় আমরা মনে করি যে স্ত্রীলোকের স্বামী ও সন্তান পেলেই সব পাওয়া হল। মায়ার আবরণ উন্মোচন করে আসল সত্যের সম্মুখীন হতে মেয়েরা ভয় পায়। মর্যাদাবোধ, পারিবারিক স্নেহ এবং সামাজিক জীবন যে প্রথা মেনে চলার উপর নির্ভর করে, সে প্রথা যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক, তা নারীকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে কিন্তু তার সমগ্র প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ তাতে নাও হতে পারে। তার কামনা জাগ্রত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তৃপ্ত নাও হয়ে থাকতে পারে। এই সংকট থেকেই বিবাহ 'সমস্যা'র উৎপত্তি। প্রেম-বিধুরতা রমণীয়, কিন্তু নীতিসঙ্গত নয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা না থাকলে আমাদের মানবতা যথেষ্ট নয় বুঝতে হবে। গ্রীক মাইলেসাস শুধু নীতিবাগীশ লোক ছিলেন, সক্রেতিস তার থেকে বেশী সার্থক। ফারিসীরা আচার-বিচারে ছিলেন ত্রুটিহীন, কিন্তু যীশুর সততা তাদের থেকে অনেক বেশী। বিবাহ-বহির্ভূত প্রেম যদি অবৈধ হয় তবে প্রেমহীন বিবাহ অনৈতিক। কঠোর ও ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক বিধিব্যবস্থার জন্য অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়েছে, অনেক জীবন বিনষ্ট হয়েছে। আত্মার অবিচলিত নিষ্ঠা থেকে আমরা দেহের পরম আনুগত্যকে বেশী মূল্য দিই। এক সময় এক যুবক পথের ধারে বসে এক নষ্ট স্ত্রীকে বলেছিলেন, "আমি তোমার নিন্দা করি না। যাও আর পাপ করো না।" গোঁড়া নীতিবাগীশ হয়ে অনেক সময় আমরা অমানুষের মত কাজ করি। দু রকমের নীতিবোধ আছে, প্রথম কল্যাণ লাভের চরম পথ, আর একটা সামাজিক প্রথা মেনে চলার আপেক্ষিক পথ। সামাজিক ন্যায়-অন্যায় বোধ সমাজ নিজের মত করে গড়ে নেয়। নৈতিক বিধি অনুসরণ করেই আমাদের আদর্শের দিকে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের আদর্শ শুধু নৈতিক নয়, পবিত্র; শুধু শুদ্ধ নয়, সুন্দর; শুধু যথেষ্ট নয়, পরিপূর্ণ; শুধু আইন নয়, প্রেম।

এমন কি রামায়ণেও কোথাও কোথাও ভুল আদর্শ দেখানো হয়েছে। রাবণবধের পর রাম সীতাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন, কেননা সীতা রাবণের গৃহে বহুদিন ছিলেন।[১] সীতা তার প্রতিবাদে বললেন যে বন্দিনী হিসাবে দেহের উপর তাঁর কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু মন তাঁর স্ববশে ছিল এবং তা সর্বদা রামের প্রতি একনিষ্ঠ ছিল।[২] কিন্তু স্মৃতিকাররা এ কঠোর নীতি অবলম্বন করেন নি। যজুর্বেদে যজ্ঞের একটা সময়ে স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করা হত: তোমার প্রণয়ী কে (কস্তে জারঃ)? যখন সে তার নাম করত অর্থাৎ নিজের দোষ স্বীকার করত, তখন সে পাপ থেকে অব্যাহতি পেত। মনু বিভিন্ন প্রকার সন্তানের তালিকায়

---

১ রাবণাঙ্কপরিভ্রষ্টাং দৃষ্টাং দুষ্টেন চক্ষুষা
কথং ত্বং পুনরাদদ্যাং কুলং ব্যপদিশন মহৎ। ষষ্ঠ. ১১৮, ২০

২ মদধীনং তু যত্তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ততে
পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরা—ষষ্ঠ. ১১৯, ৮।

জারজ সন্তানকেও স্থান দিয়েছেন। স্ত্রীলোক যদি বন্দিনী বা ধর্ষিতা হয় তো তার সম্বন্ধে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করতে হবে এবং শুদ্ধি অনুষ্ঠানের পর তাকে গ্রহণ করতে হবে। বশিষ্ঠ বলেন যে নারী যদি বন্দিনী হয় বা দস্যু দ্বারা অপহৃতা হয় অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষিতা হয় তো তাকে বর্জন করা চলবে না।[১] অত্রিরও তাই মত।[২] ধর্ষণের ফলে নারী সন্তান-সম্ভাবিতা হলে তারও ব্যবস্থা আছে। অত্রি ও দেবল সন্তান প্রসবের পর সন্তান ত্যাগ করে তাকে পরিবারে গ্রহণ করতে বলেন। এও অন্যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে বিধিবিধান আরও কঠোরতর হল এবং ধর্ষিতা নারীকে পরিবারে আর গ্রহণ করা হত না। হিন্দু সমাজ এই অন্যায়ের জন্য যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে।

বেদের আমলে নষ্টা নারীরা তাদের দোষ স্বীকার করলে ধর্মাচরণেও যোগ দিতে পারত।[৩] বশিষ্ঠ ব্যভিচারিণীকেও অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের পর সমাজে গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন। পরাশর বলেন, পাপে নিত্যরতা হলে তবেই ব্যভিচারিণীকে পরিত্যাগ করা উচিত।[৪] ব্যভিচারের জন্যও পুরুষ নারীর চেয়ে বেশী দায়ী।[৫]

প্রাচীনকালে যারা বাস করত তারা আসল মানুষই, কোন বিমূর্ত সত্তা নয়। তাদের কোমল ও সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন হৃদয়ে আবেগের ঢেউ উঠত। পূর্বরাগ, অন্ধ আবেগ, আন্তরিক স্নেহ, সন্দেহ, আশঙ্কা, বিদ্রোহ, দুঃখ, নৈরাশ্য এসব তখনও লোকের মনে দেখা দিত, তারা প্রবৃত্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করত এবং নৈতিক বিধি অমান্য করতে ইতস্ততঃ করত না। ঋগ্বেদেও বিপথগামী নারী, অবিশ্বাসিনী স্ত্রী,[৬] পলায়ন ও অবৈধ মিলনের কথা আছে। আর আমাদের মহাকাব্যে বিশ্বামিত্র ও মেনকার কাহিনীর মত কত গল্প আছে যেখানে বড় বড় বীরদেরও চিরাচরিত কর্তব্যের অপ্রশস্ত পথে পদস্খলন হতে দেখা যায়। আমাদের চেয়ে অনেক ভাল লোক, যাঁরা এমন কাজ করে গেছেন যা করার কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না, তাঁরাও সাধারণ দুর্বলতামুক্ত ছিলেন না। ব্যাস অবিবাহিত অব্রাহ্মণ কন্যার পুত্র ছিলেন, মহর্ষি পরাশর এই অব্রাহ্মণ কন্যার সৌন্দর্যে বিভ্রান্ত হন। ভীষ্মও অবিবাহিতার পুত্র। পুরু শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র, শর্মিষ্ঠা রাজা যযাতির স্ত্রী ছিলেন না, তাঁর রাণীর সহচরী মাত্র ছিলেন, অথচ কালিদাসের মতে কণ্ব মুনি শকুন্তলাকে তার স্বামীগৃহে পাঠাবার সময় উপদেশ দিচ্ছেন, শর্মিষ্ঠা যেমন ব্যবহার

---

১ স্বয়ং বিপ্রতিপন্না বা যদি বা বিপ্রবাসিতা
বলাৎকারোপভুক্তা বা চোরহস্তগতাপি বা
ন ত্যজ্যা দূষিতা নারী নাস্যাস্ত্যাগো বিধীয়তে
পুষ্পকালমুপাসীতা ঋতুকালেন শুদ্ধ্যতি।—ধর্মসূত্র অষ্টাবিংশতি, ২-৩, তৃতীয় ৫৮ একবিংশ—৮। অথর্ববেদ, প্রথম, ৩.৪, ২-৪ও দ্রষ্টব্য।

২ পঞ্চম, ৩৫। পরাশর দশম, ২৬-৭ও দ্রষ্টব্য।

৩ শতপথ ব্রাহ্মণ দ্বিতীয়, ৫.২.২০

৪ দশম, ৩৫।

৫ তস্মাৎ পুরুষে দোষাহি অধিকো নাত্র সংশয়ঃ—মহাভারত, দ্বাদশ ৫৮·৫

৬ দ্বিতীয় ২৯.১, চতুর্থ ৫, দশম ৩৪.৪।

যযাতির সঙ্গে করেছিলেন সেইরকম ব্যবহার শকুন্তলারও তার স্বামীর সঙ্গে করা উচিত।[১] আবার যযাতির কন্যা মাধবীর কথা ধরা যাক। তার অভিভাবক ছিলেন ঋষি গালব। তিনি তাকে চারজন রাজার কাছে পর পর অর্পণ করেন এই শর্তে যে তার গর্ভে একটি করে সন্তান উৎপাদন করেই তাকে ত্যাগ করতে হবে। এই-ভাবে মাধবী চার পুত্রের জননী হল। যখন তাকে পিতামাতার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হল, তখন গালব জোর করে তার বিবাহের ব্যবস্থা করেন এবং এক স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেন, কিন্তু মাধবী এক বৃক্ষের গলায় মালা দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে তিনি বনে তপশ্চারণ করে বাকী জীবন কাটাবেন। বিধবা উলুপী অর্জুনকে বরণ করেন এবং তাঁর গর্ভে ইরাবাণ নামক অর্জুনপুত্রের জন্ম হয়। মহাভারত সুস্পষ্ট ভাবেই নারীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। যৌন অনাচার অবস্থাভেদে পাপ বা অপরাধ হয়ে ওঠে, আর আসলে দেহের পাপ মনের পাপের চেয়ে বড় নয়। মানুষের ব্যাপার আমাদের মনের শুচিতা সহকারে বিচার করা উচিত। যৌন জীবন ব্যবহারিক দিকে একটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেখানে পথ দেখাবে রুচি ও মেজাজ, বাসনা ও কলা। ব্যক্তিগত আচরণ সমস্ত বিধিনিষেধমুক্ত করা উচিত, কেবল যতটুকু সমাজের বিশেষ করে দুর্বল ও অপরিণত বয়সীদের স্বার্থে প্রয়োগ করা দরকার ততটুকুই প্রয়োগ করা উচিত। মহাভারতে নরনারীর বিবাহ-বহির্ভূত বা পরীক্ষামূলক সম্পর্ক বিষয়ে একটা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায়। এ রকম সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি হল যে তা থেকে যৌন দায়িত্বহীনতা ও বিবেচনাহীন অবাধ মিলন প্রশ্রয় পায়। কিন্তু নির্বিচার যৌন মিলনের কথা এখন তুলছি না, কেননা তা কোনরূপেই অন্য কিছুতে পরিবর্তন করা যায় না। নির্বিচার যৌন মিলনাকাঙ্ক্ষা একটা রোগ, তার প্রতিকার করা দরকার। সুচেতী নরনারী যে নির্বিচার যৌন মিলনের সমর্থক হবে এরকম আশঙ্কা নেই।

খুব অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে কয়েকজনের পক্ষে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কই যৌন জীবন তৃপ্ত, মূল্যবান ও স্থায়ী করার একমাত্র উপায়। বিশ্বাসী হলে অসুবিধায় পড়তে হবে এই ভয় দেখিয়ে নরনারীকে বিশ্বাসী রাখার কাল অনেকদিন গত হয়েছে। আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ আমাদের নিজেদের আত্মা। নিজের আত্মার কাছে নির্দোষ না থাকলে লোকের কোন মূল্যই থাকে না, এমন কি তার নিজের কাছেও থাকে না।

স্বামীর ব্যভিচার স্ত্রীর ব্যভিচারের চেয়ে বেশী ক্ষমার যোগ্য বলে সাধারণতঃ মনে করা হয়। এর একমাত্র কারণ যে পুরুষ বহু শতাব্দী ধরে সমাজ চালাবার ভার নিয়ে এসেছে। তারা তাদের স্ত্রীদের এই বলে প্রতারণা করে যে তাদের বিচ্যুতির কোন গুরুত্ব নেই, এ একটা সাময়িক ব্যাপার, এর কোন স্থায়ী ফল হবার সম্ভাবনা নেই। কাজেই তাদের মৌলিক সম্পর্ক বদল হয় না। স্ত্রী যদি তাতেও খুশী না হয়ে ঝগড়া করে তখন স্বামীরা খুব গম্ভীর ভঙ্গীতে বলে, তার পক্ষে এটা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তুচ্ছ নীতি থেকে তার নিজের সুখের গুরুত্ব অনেক বেশী।

---

১ যযাতেরিব শর্মিষ্ঠা ভর্তুর্ বহুমতা ভব।

নারীকে সম্পত্তি বলে মনে করা থেকেই এই দু'রকম মানের উৎপত্তি।[১] স্ত্রীকে সম্পত্তি বলে মনে করা হয়।[২] তার ব্যভিচার সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ ; স্ত্রীর উপর স্বামীর একচেটে অধিকারের উপর অবৈধ আক্রমণ।[৩] গলস্ওয়ার্দি স্ত্রী সম্পত্তিবিশেষ, ফরসাইট পরিবারের এই রকম বিশ্বাসের কথা অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। বিয়ের নাম করে আমরা স্ত্রীর দেহের উপর অধিকার সাব্যস্ত করি। মেয়েরাও তাদের স্বামীর উপর সম্পত্তির অধিকার অনুভব করে। স্বামী অবিশ্বাসী হলেও কুলে অজানা রক্ত সঞ্চারণের ভয় নেই, এইজন্য স্ত্রীর ব্যভিচারকে বেশী পাপের ভাগী বলে মনে করা হয়। তবে সব যৌন নিষেধের মধ্যেই সম্পত্তির ধারণা আছে একথাও বলা যায় না। সম্পত্তি বেহাত হচ্ছে বলেই যে যৌন অসূয়া জাগে তা ঠিক নয়। এই অসূয়ার মধ্যে ক্ষোভও আছে। তাছাড়া সতীত্ব ও পবিত্রতা অচ্ছেদ্য বলেও ধারণা আছে।

আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসমূহকে সংযত করা মানবিক মর্যাদার পক্ষে অপরিহার্য। প্লেটো তাঁর "ফিলেবাস"-এ লিখেছেন, 'হে ফিলেবাস, ঔদ্ধত্য, অতিভোজন, লোভ, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি প্রভৃতি সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে সীমা দেবী সীমিত লোকের জন্য নিয়মশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছেন আর তুমি বলছ যে সংযম মানেই আনন্দকে হত্যা করা, আমি বলি সংযম আনন্দকে রক্ষাই করে।' আমরা যদি সত্য, শিব ও সুন্দর জীবনের অভিলাষী হই তো আমাদের সংযত জীবনযাপন করতেই হবে। প্রবৃত্তির উত্তাল উন্মত্ততা দমনের জন্যই এটা প্রয়োজন। না হলে প্রেমের নাম করে অনেক নোংরা, অন্ধকার ও লজ্জাকর বস্তুকে আমরা সমর্থন করার চেষ্টা করব। ময়লা দিয়ে আমরা শুদ্ধ হতে পারি না। একটা জিনিস পরিষ্কার, সাধারণ মানুষের পক্ষে চিরাচরিত প্রথা অনুসরণ করাই পুরুষার্থ লাভের সব চেয়ে সহজ পথ। যারা অত্যন্ত সংযত এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন, যেমনটি সাধুদের মধ্যে দেখা যায়, তারাই প্রচলিত নিয়মকে অতিক্রম করতে পারে।

একটা ধারণা আছে, রাশিয়াতে অবাধ প্রেমে (খারাপ অর্থে) উৎসাহ দেওয়া হয়। কথাটা যে একেবারে মিথ্যা তা লেনিন ক্লারা জেটকিনকে ১৯২০ সালে যা লিখেছিলেন তা থেকেই বোঝা যাবে। "যৌন সমস্যা" সম্বন্ধে তরুণদের পরিবর্তিত মনোভাব অবশ্যই 'নীতিগত প্রশ্ন' এবং একটা তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেউ কেউ বলে, এই মত নাকি "বৈপ্লবিক" এবং "সমভোগবাদী"। তারা একথা সত্য বলেই বিশ্বাস করে। কিন্তু আমার এদের কথা মনে ধরে না। আমি যদিও খুব কড়া তপস্বী নই, তবু আমার মনে হয় যে তরুণদের তথাকথিত "নতুন যৌন জীবন" এবং কোন কোন

---

১ সেণ্ট পল বলেছেন, "পুরুষ ঈশ্বরের মহিমা ও প্রতিমা ; কিন্তু নারী পুরুষের মহিমা। কেননা নারী থেকে পুরুষ নয়, পুরুষ থেকেই নারী। তাছাড়া পুরুষকে নারীর জন্য সৃষ্টি করা হয় নি নারীকেই পুরুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।" প্রথম, কোরিন্থিবান একাদশ, ৭-৯।

২ অর্থো হি কন্যা কালিদাস, শকুন্তলা—চতুর্থ।

৩ মনুঃ "যে ক্ষেত্র নিজের নয় সেখানে বীজ বপন করা ঠিক নয়।" নবম, ৪২।

ক্ষেত্রে আরও বেশী বয়সের লোকেদের অনুরূপ কীর্তি বুর্জোয়া ব্যাপার, বুর্জোয়া বেশ্যালয়ের সম্প্রসারণ। আমরা সমভোগবাদীরা মুক্তপ্রেম বলতে যা বুঝি তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। তুমি অবশ্য সেই কুখ্যাত তত্ত্বের কথা জান যে সমভোগবাদী সমাজে যৌন-প্রবৃত্তির তৃপ্তি এক গ্লাস জল খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণের মতই সহজ ও সাধারণ ঘটনা। এই "এক গ্লাস জল" তত্ত্বটি তরুণদের সম্পূর্ণ ও চরম ভাবে উন্মত্ত করেছে। অনেক অল্পবয়সী লোকের এতেই কাল হয়েছে। যারা এর সমর্থক তারা নিজেদের মার্ক্সিস্ট বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু ধন্যবাদ, তারা মার্ক্সিস্ট মোটেই নয়। জিনিসটা অত সোজা নয়। যৌন মিলন শুধু স্বাভাবিক কোন চাহিদা পূরণের উপায়ই নয়, এর মধ্যে সংস্কৃতিঘটিত ব্যাপারও আছে, তা সে সংস্কৃতি যত উচ্চ বা নীচই হোক না কেন। তৃষ্ণা অবশ্য মেটাতেই হয়। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় কোন স্বাভাবিক লোকই কাদায় শুয়ে গর্তে জমে থাকা জল পান করে কি? কিংবা এমন গ্লাস থেকে জল খায় কি যার কানা অনেক লোকের ঠোঁটে লেগে চটচটে হয়ে গেছে? এবং এই ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী তা হল সমস্যাটির সামাজিক দিক। জল পান করা একটা নিজস্ব ব্যাপার, কিন্তু প্রণয়ে দুই পক্ষ আছে। আর একটা তৃতীয় পক্ষ, একটা নতুন জীবনের সম্ভাবনা আছে। এইখানেই সমাজের স্বার্থ। এইখানেই সম্প্রদায়ের প্রতি কর্তব্যের কথা এসে পড়ে। বিপ্লবে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়েরই শক্তি বৃদ্ধি ও দৃঢ় করা প্রয়োজন। ডানানৎসিওর নায়ক-নায়িকাদের উন্মত্ত লীলা-বিপ্লব সহ্য করবে না। যৌন স্বেচ্ছাচার বুর্জোয়া জগতেরই ব্যাপার। এটা ক্ষয়ের চিহ্ন। কিন্তু প্রোলেটেরিয়েট বর্ধিষ্ণু শ্রেণী। তার নেশার বা উত্তেজক ওষুধের প্রয়োজন নেই। আত্মনিয়ন্ত্রণ বা আত্মসংযম দাসত্ব নয়। এমন কি প্রণয় ব্যাপারেও নয়।[১] আদিম প্রবৃত্তিগুলি একটা প্রগতিবাদের লক্ষণ, এরকম ভ্রান্তি থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। বর্বর প্রকৃতির উপর ক্রমিক আধিপত্যই সভ্যতা। যে জাতির মধ্যে সতীত্ব ও যৌন ব্যাপারে আত্মসংযম ব্যাপকভাবে প্রচলিত সে জাতিই শক্তিশালী ও সৃজনধর্মী হবে।[২]

জীবনের মাত্র দুইটি পথই আছে। এক আত্ম-পরিতৃপ্তির প্রশস্ত ও সহজ পথ, আর এক আত্মসংযমের অপরিসর ও দুরূহ পথ। দ্বিতীয় পথে ঝুঁকি আছে, বীরত্ব আছে, আছে বর্জন বা ভুল বোঝাবুঝি; কিন্তু মানুষের মত মানুষের পক্ষে এই একমাত্র পথ। জীবন সহজ হবে, এটাই কাম্য নয়। উত্তেজনা বা মজা তার উদ্দেশ্য নয়, আত্মার মুক্তিই তার উদ্দেশ্য। বিবাহ তারই একটা উপায়। ভারতে যুগে যুগে কোটি কোটি নারী জন্ম নিয়েছে যারা খ্যাতি পায় নি কিন্তু তাদের দৈনন্দিন জীবন জাতিকে সভ্য করতে সহায়তা করেছে এবং তাদের অন্তরের উত্তাপ, আত্মদানের

১ ডেভিডসন সম্পাদিত Klaus Mehnert-এর Youth in Soviet Russia-তে উদ্ধৃত। পৃঃ ২০৭।

২ অলডুস হাক্সলী তুলনীয়: "বিবাহপূর্ব ও বিবাহোত্তর অবস্থায় যৌন সুযোগের উপর যে পরিমাণ সংযম আরোপ করা যায় সেই পরিমাণেই সমাজের সাংস্কৃতিক অবস্থা উন্নত হয়।" **Ends and Means.**

স্পৃহা, অনাড়ম্বরের আনুগত্য এবং অত্যন্ত দুঃখকষ্টের মধ্যেও সহ্য করার শক্তি এই প্রাচীন জাতির গর্ব করার জিনিস। যে নারীরা জননী, তারাই বর্তমান অবস্থায় অন্যায় ও অবিচার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে সচেতন এবং তারাই আত্মার গভীর ও বিস্তৃত পরিবর্তন আনতে পারে এবং একটি নূতন ধরনের জীবন সৃষ্টি করতে পারে। তখনই নবমানবের জন্ম হবে।

এমন সময় আসতে পারে যখন আত্মার মুক্তির পথে গার্হস্থ্য বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। আমরা সামাজিক বন্ধন গ্রহণ করেই তাকে অতিক্রম করি। মুক্তির জন্য বিবাহ অপরিহার্য নয়। মানবসত্তার নৈতিক প্রগতির পক্ষে একটা সময় আসতে পারে যখন আমরা যৌন কামনা জয় করতে পারব, মন ও দেহের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারব এবং আমরা সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন করে তুলতে পারব।

পঞ্চম ভাষণ

যুদ্ধ ও অহিংসা

যুদ্ধের প্রশস্তি—হিন্দু মত—খ্রীষ্টান মত—যুদ্ধের মোহ
—আদর্শ সমাজ—শ্রেয়বোধ সংক্রান্ত শিক্ষা—গান্ধী

যুদ্ধের প্রশস্তি

এই শেষ বক্তৃতায় 'সমাজে বলপ্রয়োগের স্থান' এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যাক। একদিকে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার প্রতি নিষ্ঠা, অন্যদিকে বর্তমান যুদ্ধের জন্য এই সমস্যাটি জরুরী হয়ে পড়েছে এবং এ ব্যাপারে ধারণাগুলিকে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। যুদ্ধ পরস্পরকে হত্যা করার সুবিন্যস্ত চেষ্টা। যুগযুগান্তর ধরে একে জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যবর্ধক সহযোগী বলে প্রশংসা করে আসা হচ্ছে। আমাদের বুদ্ধি আছে, যুক্তি প্রয়োগ করতে পারি, কাজেই আমরা আমাদের কাজকর্মের সমর্থনে যুক্তি প্রয়োগ করে থাকি। যুদ্ধকে সদুদ্দেশ্য সাধনের পন্থা বলে নির্দেশ করা হয়। এ সম্বন্ধে কয়েকটি বাণী উদ্ধার করা যায়। নীৎসে বলেন, "যে সব জাতি দুর্বল ও হেয় হয়ে আসছে, তারা যদি বেঁচে থাকতে চায় তো তাদের উপর যুদ্ধকে ঔষধ হিসাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।" তিনি ঘোষণা করেছেন, "পুরুষকে যুদ্ধবিদ্যা শেখাতে হবে আর নারীকে যোদ্ধার অবসর বিনোদনের জন্য প্রস্তুত করতে হবে, বাকী সবই বোকামি", "তোমরা বল যে মহৎ উদ্দেশ্য দ্বারা যুদ্ধ পবিত্র হয়, আমি বলি যুদ্ধ দিয়েই উদ্দেশ্যের উপর মহত্ত্ব আরোপ করা হয়।" রাস্কিন বলেন, "সংক্ষেপে আমার ধারণা হল যে সমস্ত মহৎ জাতিরাই তাদের চিন্তার ধ্রুবত্ব ও দৃঢ়তা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অনুধাবন করেছে, তারা যুদ্ধেই পুষ্ট হয়েছে এবং শান্তিতে ক্ষীণ হয়েছে। যুদ্ধ তাদের শিক্ষা দিয়েছে, শান্তি তাদের প্রতারিত করেছে, এক কথায় যুদ্ধেই তাদের জন্ম, শান্তিতে মৃত্যু।" মলৎকে বলেন, "যুদ্ধ ঈশ্বরের বিশ্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তার মাধ্যমেই মানুষের মহত্তম গুণসকল বিকশিত হয়।" তিনি লিখেছিলেন, চিরস্থায়ী শান্তি একটা স্বপ্ন মাত্র, "এমন কি সুন্দর স্বপ্নও নয়।" বের্নহার্দি বলেছেন, "যুদ্ধ জীবনের পক্ষে আবশ্যক ও মানবজীবনের অপরিহার্য নিয়ামক। তার ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে প্রজাতির অভিব্যক্তি বিপথগামী হবে, সমস্ত সংস্কৃতি বিলুপ্ত হবে।... যুদ্ধ না ঘটলে নীচু বা হতোদ্যম জাতিরা সুস্থ ও প্রাণবন্ত জাতিদের ডুবিয়ে দেবে এবং তার ফলে সর্বব্যাপী অবক্ষয় দেখা দেবে। যুদ্ধ নীতির একটি অপরিহার্য উপাদান। অবস্থাবিশেষে রাষ্ট্রকুশলীদের যে শুধু যুদ্ধ বাধানোর অধিকারই আছে তাই নয়, এটা তাদের নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য।" অস্‌ওয়াল্ড স্পেংলার (Oswald Spengler) লিখেছেন, "যুদ্ধ মানুষের উচ্চতর অস্তিত্বের চিরন্তন রূপ; যুদ্ধ

করার জন্যই রাষ্ট্রসমূহের সৃষ্টি।" মুসোলিনি বলেন, "যুদ্ধই মানবিক শক্তিকে উচ্চতম পর্যায়ে উন্নীত করে এবং যারা যুদ্ধের সম্মুখীন হয় তাদের উপর মহত্ত্বের ছাপ লাগিয়ে দেয়।" স্যার আর্থার কীথ ১৯৩১ সালে অ্যাবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে রেক্টর নির্বাচন উপলক্ষে যে ভাষণ দেন তাতে বলেছিলেন, "প্রকৃতি তার মানুষের বাগানকে কেটেছেঁটে সুস্থ রাখে, যুদ্ধ তার ছাঁটবার যন্ত্র। আমাদের এ যন্ত্র বর্জন করার উপায় নেই।" সমস্ত জাতির মধ্যেই এমন লোক আছেন যাঁরা যুদ্ধকে শক্তিবর্ধক জীবনপ্রদ ও দুর্বলতা নাশক বলে প্রশংসা করেন। বলা হয় যে সাহস, মর্যাদা, আনুগত্য ও শৌর্য আদি মহৎ গুণসকল যুদ্ধের মধ্যে বিকশিত হয়।

কালক্রমে মানুষের বিবেকবুদ্ধি বিবর্ধিত হয়েছে এবং আজকের দিনে যুদ্ধের প্রশস্তি আর গাওয়া হয় না, যুদ্ধকে দুঃখের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। অক্ষশক্তিরা (জার্মানী, ইতালি ও জাপান) সামাজিক বিকাশের জন্য যুদ্ধকে অপরিহার্য বলে মনে করে। তাদের মনে জাতির শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ শক্তি এবং শক্তিমানের লক্ষ্যই হল দুর্বলকে দমন করা। আক্রমণাত্মক যুদ্ধ অপরাধ নয়, গর্বের জিনিস। জয়লাভের জন্য প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, সন্ত্রাসবাদ, পাশবিকতা সবই যুক্তিযুক্ত। মিত্রশক্তিবর্গ (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া) বলে, তারা শান্তির জন্যই যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। তারা পৃথিবীকে এমন ভাবে সুবিন্যস্ত করবে এবং বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক সম্পর্ক এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করবে যে কিছুদিন অন্তর অন্তর যুদ্ধ করার প্রয়োজন হবে না। তারা শুধু যুদ্ধকেই ঘৃণা করে না, অক্ষশক্তিসমূহের অন্তরে যে ভাব, মেজাজ, যে মানসিকতা আছে তাও ঘৃণা করে।[১] যুদ্ধের সময় জঙ্গী মনোভাব জাগাবার জন্য শিক্ষার সকল প্রকার যন্ত্রই ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের ফিল্মে মারণযন্ত্রের ব্যবহার দেখানো হচ্ছে, যেমন কামানের গর্জন, মাইন ও টর্পেডোর বিস্ফোরণ, ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেন। অন্তরে বর্বর ঘৃণা ও মস্তিষ্কে বৈজ্ঞানিক ধূর্ততা নিয়ে আমরা শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছি।

ধর্ম কিন্তু অহিংসাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলে নির্দিষ্ট করেছে এবং হিংসাকে মানুষের অপূর্ণতার লক্ষণ হিসাবেই স্বীকার করেছে। আমাদের ত্রুটিপূর্ণ জগতে নিখাদ ভালো কখনও পাওয়া যায় না, নিখাদ ভালোর পূর্ণ প্রকাশের জন্য এমন জগতে যেতে হবে যা ভালোমন্দের অতীত। পৃথিবীতে আদর্শটি যতখানি প্রচারিত হওয়া উচিত ততখানি যদি না হয়ে থাকে তো তার জন্য আদর্শকে পরিত্যাগ করতে হবে এমন কোন কথা নেই। যে ব্যবহারিক জগৎ মানুষের বোকামি ও স্বার্থপরতা দ্বারা চালিত ও পরিবর্তনশীল তার সঙ্গে পরম নীতিকে সম্পর্কিত করতে হবে। যে সামাজিক পরিস্থিতিতে আমাদের আদর্শ পূর্ণতর সিদ্ধিলাভ করবে তার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এ সমস্যা সমাধানে ধর্ম এই দৃষ্টিভঙ্গীই গ্রহণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ হিন্দু ও খ্রীষ্ট ধর্মের শিক্ষার কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

---

১ হিটলার তাঁর "মাইন ক্যাম্প" পুস্তকে লিখেছিলেন, "জার্মান শক্তি বৃদ্ধির জন্য অস্ত্র তৈরী করাই বড় কথা নয়। আসল কথা লোককে অস্ত্রধারণ করার মনোবল দেওয়া। লোক একবার সেই মনোভাব দ্বারা চালিত হলে, অস্ত্রসম্ভার প্রস্তুত করার জন্য তারা সহস্র পন্থা বের করবে।"

হিন্দু মত

হিন্দুশাস্ত্র অহিংসাকেই পরমধর্ম বলে মনে করে। যে হিংসা মানুষ বা পশুদের যন্ত্রণা ও কষ্টের কারণ হয় তা থেকে বিরত থাকাই অহিংসা। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে যে যজ্ঞ বা বলিদানেও নৈতিক গুণই প্রধান উপচার।[১] অরণ্যস্থ ঋষিদের আশ্রমে মানুষ ও পশুদের সঙ্গে সখ্যের ভাব প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ কথা বলা যায় না যে হিন্দুশাস্ত্রে বলপ্রয়োগ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। দুরধিগম্য আদর্শকে কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে, তার থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিকে নিষেধ করা হিন্দুস্বভাব নয়। সাধারণ জীবন থেকে পরাঙ্মুখ হয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক পরিস্থিতির বিশেষ বিশেষ দাবিগুলিকে বিবেচনা করে তার সঙ্গে নীতিকে খাপ খাওয়ানোই হিন্দুরীতি। দূরনিহিত আদর্শ থেকে ব্যবহারিক কর্মসূচী ভিন্ন। অযৌক্তিক বলপ্রয়োগ হিংসা। আশ্রমবাসীরা যখন অনার্যদের দ্বারা পীড়িত হত তখন তারা নিজেরা প্রতিকার করত না, কিন্তু আশা করত যে ক্ষত্রিয়রা তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। ঋগ্বেদে আছে, "আমি রুদ্রের ধনুতে জ্যা রোপণ করব ও যারা ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করে তাদের ধ্বংস করব। আমি পবিত্র লোকদের রক্ষার জন্য যুদ্ধ করি এবং দ্যুলোক ও ভূলোক ব্যাপিয়া থাকি।"[২] বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্বে যদিও আধিভৌতিক অকল্যাণকে আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা পরাভূত করা হয়েছিল, তবুও অকল্যাণের বিরুদ্ধে জাগতিক প্রতিরোধও নিষিদ্ধ ছিল না। শত্রুদমনে আত্মিক শক্তির শ্রেষ্ঠতার উপর সর্বদা জোর দেওয়া হলেও, বলপ্রয়োগ একেবারে বাদ দেওয়া হয় নি। যে ঋষি ও তপস্বীরা সংসার ত্যাগ করেছেন এবং সুসম্বদ্ধ সমাজের কল্যাণ ও অকল্যাণের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন, তাঁরা ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠী-বিশেষের স্বার্থরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করতেন না, কিন্তু সংসারী লোকেদের প্রয়োজনমত ও সম্ভবস্থলে অস্ত্রদ্বারা আক্রমণ প্রতিরোধ করা কর্তব্য বলে গণ্য ছিল। যখন সেনাপতি সিংহ নামে এক যোদ্ধা বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে গৃহরক্ষার্থে যুদ্ধ করা অপরাধ কিনা তখন বুদ্ধদেব জবাব দেন, "যে শাস্তির যোগ্য তাকে শাস্তি দিতে হবে।" তথাগত এমন বলেন না যে, "শান্তিরক্ষার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে ন্যায়যুদ্ধ করা দোষের।" ভগবদগীতাও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। অর্জুন

---

১ অথয়ৎ তপো দানম্ আর্জবম্ অহিংসা সত্যবচনম্ ইতিতা অস্য দক্ষিণাঃ। তৃতীয়, ১৭, ৪।
আরও দ্রষ্টব্য

> অহিংসা প্রথমং পুষ্পম্, পুষ্পং ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ
> সর্বভূতদয়া পুষ্পং, ক্ষমাপুষ্পং বিশেষতঃ
> শান্তি পুষ্পং তপঃ পুষ্পং ধ্যানপুষ্পং তথৈবচ
> সত্যম অষ্টবিধং পুষ্পং বিষ্ণোঃ প্রীতিকবং ভবেৎ।
>
> —পদ্মপুরাণ।

২ প্রথম, দশ, ১২৫।

কর্তব্য পালনে ইতস্ততঃ করাতে তাঁকে স্বধর্ম শিক্ষা দেওয়া হয়। জীবনের শেষ দুই আশ্রম, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসে অহিংসাই অবলম্বন। ক্ষত্রিয়-গৃহস্থ অর্জুন সন্ন্যাসীর আদর্শ গ্রহণ করতে পারেন না। কৃষ্ণ ন্যায়বিচার পাবার জন্য ও কর্তব্য-পালন করার জন্য স্বার্থপর ও অধার্মিক শোষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অর্জুনকে উৎসাহিত করেন। কৃষ্ণ তাঁর নিষ্ফল শান্তিদৌত্য থেকে ফিরে বললেন, "যা সত্য, সুস্থ ও কল্যাণপ্রসূ তা দুর্যোধনকে বলা হল কিন্তু সে নির্বোধ তাতে কর্ণপাত করলে না। আমার বিবেচনায় এই পাপীদের জন্য চতুর্থ ব্যবস্থা অর্থাৎ যুদ্ধ-ব্যবস্থাই উচিত, অন্য উপায়ে তাদের দমন করা যাবে না।" আবার কোন লোক যদি নিজ স্বার্থে কাউকে বধ করে তো সে অপরাধী, কিন্তু সে যদি সাধারণ কল্যাণের জন্য বধ করে তো তা দূষণীয় নয়। তা ছাড়া অর্জুনের দৃষ্টিভঙ্গী দুর্বলতাজাত, শক্তিজাত নয়। তাঁর বধ করাতে আপত্তি ছিল না, আত্মীয়বধেই আপত্তি। তাঁকে তাই ক্রোধ, ভয় ও ঘৃণা বর্জন করে যুদ্ধ করতে বলা হল। প্রেমের বিপরীত ঘৃণা, বল নয়। কোন কোন অবস্থায় ভালবেসেও বলপ্রয়োগ করতে হয়। ভালবাসা শুধু ভাবালুতা নয়। প্রেম বলপ্রয়োগে অকল্যাণকে দমন করতে পারে, কল্যাণকে রক্ষা করতে পারে। কৃষ্ণ অর্জুনকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন ও তাঁকে বিশ্বকল্যাণে নিয়োজিত কর্মীর ভূমিকা গ্রহণ করতে বললেন। তিনি আরও বললেন, প্রত্যেককেই জগতে যথাসাধ্য স্বধর্ম পালন করতে হবে। যে মানবতা ও প্রীতির খাতিরে অর্জুন যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে চেয়েছিলেন, তারই জন্য তাঁকে যুদ্ধ করতে বলা হল। অহিংসা একটা দৈহিক অবস্থা নয়, এটা হল প্রেমের মানসিক অভিব্যক্তি।[১] মানসিক অবস্থা হিসাবে অহিংসা ও অপ্রতিরোধে তফাৎ আছে। ঘৃণা ও বিদ্বেষ বর্জনই অহিংসা। কোন কোন সময় প্রেমভাবই মন্দকে প্রতিরোধ করতে আহ্বান করে। তখন আমরা যুদ্ধ করি কিন্তু অন্তরে আমাদের শান্তি বিরাজ করে। নিজেরা মন্দ না হয়ে মন্দকে ধ্বংস করতে হবে। মানুষের কল্যাণই যদি সব চেয়ে বেশী কাম্য হয় তো যুদ্ধ ও শান্তি তাকে যতখানি সার্থক করবে ততখানিই ভাল। হিংসামাত্রই খারাপ তা বলা যায় না। পুলিসী হিংসার লক্ষ্য সামাজিক শান্তি। তার লক্ষ্য হল শৃঙ্খলাভঙ্গকে সংযত করা। সব সময়েই যুদ্ধের লক্ষ্য ধ্বংস নয়। মানুষের কল্যাণ যখন লক্ষ্য, যখন মানুষের ব্যক্তিত্বকে সে শ্রদ্ধা করে তখনও যুদ্ধও গ্রাহ্য। যখন আমরা বলি যে অপরাধী অন্যের ব্যক্তিত্বের অপমান করলেও তার ব্যক্তিত্বকে আমরা অপমান করব না, যখন দস্যুর জীবনকেও আমরা পবিত্র বলে ধরে নিই, যদিও সে তার থেকে মূল্যবান অনেক জীবন নষ্ট করেছে, তখন আমরা অকল্যাণকে মেনে নিই। বলপ্রয়োগকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে, তা ভাল কি মন্দ, এ বিচার করা যায় না। শল্যচিকিৎসা রোগীকে যন্ত্রণা দেয়, কিন্তু তাই আবার তার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত হতে পারে। ছুরিটা ডাক্তারের কি খুনীর, তাতেই মৌল পার্থক্য নিরূপিত হয়।[২]

---

১ যোগসূত্র, দ্বিতীয়, ৩৫। "অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎ সন্নিধৌ বৈরত্যাগ"।

২ "চিকিৎসকশ্চ দুঃখানি জনয়ন্ হিতং আপ্নুয়াৎ।" অনুশাসন পর্ব, ২২৭·৫।

যে ত্রুটিপূর্ণ পৃথিবীতে সকল মানুষ সৎ নয়, সেখানে জগতের গতি অব্যাহত রাখতে হলে বলপ্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী। সত্যযুগে জোর করার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু কলিযুগে মানুষ ধর্মচ্যুত হয়েছে, কাজেই বলপ্রয়োগ অপরিহার্য। রাজা দণ্ডধর। ক্ষত্রিয় বর্ণকে মেনে নেওয়া মানেই বলপ্রয়োগের যৌক্তিকতা স্বীকার করা। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্বীকার করেছেন যে ধর্মরক্ষা অর্থাৎ কর্তব্যপালনের জন্য শাস্তি প্রয়োজন।[১] বর্তমান সময়ে দুর্দান্তদের বাধা দেওয়া, অসহায়কে রক্ষা করা এবং মানুষে মানুষে ও গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে শান্তি বজায় রাখার জন্য বলপ্রয়োগ প্রয়োজন। কিন্তু এরকম বলপ্রয়োগেব উদ্দেশ্য বিনাশ নয়। যাদের উপর এর প্রয়োগ হবে, পরিণামে তাদের মঙ্গলই সাধিত হবে। অরাজকতা থেকে বাঁচতে হলে এরকম ন্যায়সঙ্গত পুলিসী ক্রিয়া প্রয়োজন।

হিংসা দণ্ড থেকে আলাদা। প্রথমটি নির্দোষের ক্ষতি করে, কিন্তু শেষেরটি অপরাধীকে আইনতঃ সংযত করে। শক্তি আইন প্রণয়ন করে না, সে আইনেব সেবক। ধর্ম বা ন্যায় নিয়ন্ত্রণ করে, শক্তি ধর্মের বিধানকে মেনে চলে। মহাভারত শিক্ষার্থীব আদর্শের এইভাবে বর্ণনা দিয়েছে: "সামনে চতুর্বেদ, পিছনে ধনুর্বাণ; একদিকে আত্মিক শক্তি যাঁরা আত্মার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হচ্ছে, অন্যদিকে ক্ষাত্রশক্তি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে।"[২] কিন্তু রামায়ণে বলা হয়েছে, "যোদ্ধার শক্তি হেয় কিন্তু ঋষির বলই সত্যকার শক্তি।"[৩] যেখানে অহিংসা সম্ভব নয়, সেখানে হিংসা সমর্থনযোগ্য।[৪] কথিত আছে, "গ্রামের কল্যাণে বা প্রভুব প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য কিংবা অসহায়কে রক্ষার জন্য যদি বধ বা বন্দী করা হয় বা যন্ত্রণা দেওয়া হয় তো পাপ নেই।"[৫] আবার বলা হয়েছে, 'গুরু শিষ্যকে শাসন কবে, প্রভু ভৃত্যকে শাসন করে, আর শাসক অপরাধীকে শাসন করে ধর্মপালন করেন। মনু বলেন, "কেউ যদি বধ করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে তবে তাকে বিনা দ্বিধায় হত্যা কবা যেতে পারে। এইরূপ আক্রমণকারী যদি গুরু, বৃদ্ধ, অল্পবয়স্ক, এমন কি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও হয় তবু তাকে হত্যা করা যায়।"[৬] বেদে সমর ও যুদ্ধের বর্ণনা আছে, যুদ্ধজয় ও শত্রুকে পরাজিত করার জন্য প্রার্থনা আছে। মহাকাব্যদ্বয়ের নায়কবা দেবারি অসুরদেব সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইতস্ততঃ করেন নি। ব্রাহ্মণরা পর্যন্ত অস্ত্রধারণ

---

১ ব্রহ্মতেজোময়ং দণ্ডং অসৃজৎ পূর্বং ঈশ্বরঃ। মনু, সপ্তম ১৪।
আবার, ধর্মোহি দণ্ডরূপেণ ব্রহ্মণা নির্মিতঃ পুরা। যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম ৫৩৩।

২ অগ্রতঃ চতুরো বেদাঃ পৃষ্ঠতঃ স শরং ধনুঃ
ইদং ব্রাহ্মং ইদং ক্ষাত্রম্, শাপদপি শরাদপি।

৩ ধিগ্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলম্ বলম্।

৪ গ্রামার্থং ভর্তৃপিণ্ডার্থং দীনানুগ্রহকারণাৎ
বধ বন্ধ পরিক্লেশান্ কুর্বন্ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
অনুশাসন পর্ব, ২৩১, ২৩

৫ গুরুঃ সংতর্জযন শিষ্যান্ ভর্তা ভৃত্যজনাং স্বকান্
উন্মার্গপ্রতিপন্নাংশ্চ শাস্তা ধর্মফলং লভেৎ। অনুশাসন পর্ব ২২৭, ৪

৬ অষ্টম ৩৫০।

করতেন, তার উদাহরণ পরশুরাম, দ্রোণাচার্য এবং অশ্বত্থামা।[1] কৌটিল্য তো ব্রাহ্মণ সৈন্যদলের উল্লেখই করেছেন। তারা নাকি পরাজিত শত্রুর প্রতি সদয় ব্যবহারের জন্য বিখ্যাত ছিল। মহাভারতে প্রশ্ন আছে: "কে এমন আছে যে হিংসা করে না? অহিংসাব্রতী তপস্বীরাও হিংসা করেন, তবে তারা বহু যত্নে যতদূর সম্ভব কম হিংসা করেন।[2] আমরা আত্মরক্ষার জন্য কাউকে বধ করতে বাধ্য হই, কাউকে খাদ্যের জন্য বধ করতে বাধ্য হই।[3] কিন্তু তার জন্য আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত এবং এতে আত্মতুষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই। একান্ত প্রয়োজন না হলে মৃত্যু ঘটানো বা কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

নিখুঁতভাবে ভাল করার ইচ্ছা এবং পূর্ণাঙ্গ আদর্শ থেকে বিচ্যুতির সঙ্গে আপস করে আংশিক কার্য করবার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে বৈপরীত্য আছে; অথচ সে বৈপরীত্যের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হবার রাস্তা। সমস্ত মানবিক প্রয়াসের মূল এইখানে। পরিপূর্ণ অহিংসার সর্বোত্তম আদর্শের সঙ্গে বাস্তব অবস্থার আপস আমাদের করতেই হয়, কেননা সর্বোত্তমকে আয়ত্ত করবার আমাদের উপায়গুলো এখনও পরিপূর্ণতা লাভ করে নি। ধর্মের এই নিয়মগুলি সামাজিক অবস্থাসাপেক্ষ এবং পরম কল্যাণের সূত্রগুলির সঙ্গে তাদের গরমিল থাকতে পারে। তা সত্ত্বেও তারা না থাকলেও সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পরম আদর্শকে স্থাপন করতে হবে এবং এই দুইয়ের ঘাত-প্রতিঘাতেই সামাজিক অভিব্যক্তি সম্ভব হয়।

অবিরাম সৃজনশীল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সমাজ-প্রগতি সম্ভব হয় এবং তার জন্য পরিপূর্ণ প্রেমের প্রতি নিষ্ঠা ও যে অবস্থায় আমাদের কাজ করতে হয় তার সম্বন্ধে সচেতনতা দুই-ই চাই। পরিপূর্ণ অহিংসাই যে আদর্শ তাতে সন্দেহ নেই। জগৎ প্রেম ও ন্যায় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। শাস্ত্রকার নারদ বলেছেন, "মানুষ যদি ধর্মাচরণে অভ্যস্ত হয় এবং সর্বদা সত্যাশ্রয়ী হয়, তাহলে

---

১ হিন্দুশাস্ত্রকারেরা দেশ ও ধর্মরক্ষার্থে ব্রাহ্মণদেরও অস্ত্রধারণের অনুমতি দিয়েছেন (মনু, অষ্টম, ৩৪৮), যদিও অনেক শ্লোকে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণদের পক্ষে অহিংসাই পরম ধর্ম। যথা—

অহিংসা পরমো ধর্ম সর্বপ্রাণভৃতাম্বব
তস্মাৎ প্রাণভৃতঃ সর্বান ন হিংস্যাং ব্রাহ্মণ ক্কচিৎ
অহিংসা সত্যবচনং ক্ষমা চেতি বিনিশ্চিতম
ব্রাহ্মণস্য পরোধর্ম বেদানাং ধাবণাপিচ।

—মহাভারত, আদিপর্ব, একাদশ ১৩, ইত্যাদি।

২ কেন হিংসন্তি জীবন্ বৈ লোকেস্মিন্ দ্বিজসত্তম, বহু সংচিন্ত্য ইব বৈ নাস্তি 'কশ্চিৎ অহিংসকঃ। অহিংসাযস্তু নিরতা যতয়ো দ্বিজসত্তম, কুর্বন্তি এবাহি হিংসাং তে যত্নাদল্পতরা ভবেৎ। বনপর্ব ২১২, ৩২-৩৪।

৩ সত্ত্বৈঃ সত্ত্বানি জীবন্তি। জীবিত বস্তু জীবিত বস্তুর উপরই নির্ভর করে।

মহাভারত।

ব্যবহার (মামলা)-ও থাকে না, ঘৃণাও থাকে না, স্বার্থপরতাও থাকে না।[১] জগতের সাধু ব্যক্তিরা পরিপূর্ণ অহিংসায় বিশ্বাসী। তারা মন্দ লোককে বুঝিয়ে এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দিয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করেন। তারা সহ্যশক্তি, কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যায় বিশ্বাসী, কেননা হিংসা থেকে ভয়, ঘৃণা, ঔদাসীন্য ইত্যাদি জন্মায় এবং যারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে অপরিণত ও বিকৃতবুদ্ধি তাদের পক্ষেই এসব শোভা পায়। সাধুরা শান্তিপূর্ণ ব্যবহার, সকলের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার এবং দুর্বলের প্রতি করুণার ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, অহিংসাই পরম ধর্ম, পরম তপস্যা, পরম সত্য এবং অহিংসা থেকেই অন্যান্য ধর্ম জন্মায়।[২] সাধু ব্যক্তিরা হিংসা করতে পারেন না, কেননা তাঁরা সমস্ত প্রবৃত্তি জয় করেছেন, তবে তাঁরা মন্দকে জয় করতে পারেন। "দারুণ ব্যক্তি মৃদু ব্যক্তির বশ, অদারুণ ব্যক্তিও মৃদু ব্যক্তির বশ, মৃদু ব্যক্তির পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়, অতএব মৃদুতাই অধিকতর শক্তিশালী"।[৩] যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে সিদ্ধিলাভ করতে চান তাঁরা সংসার ত্যাগ করেন, কোন মঠে আশ্রয় নেন বা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে যোগ দেন। এই সন্ন্যাসীদের কাছে অহিংসাই প্রত্যাশা করা যায়। 'তাঁরা সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন, সমস্ত জীবের প্রতিই সখ্যভাব পোষণ করেন এবং ব্রতী বলে তাঁরা কোন জীব, মানুষ বা পশুর কায়মনোবাক্যে কখনও হানি করেন না এবং সকল প্রকার আসক্তি ত্যাগ করেন।"[৪] বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের জীবকে কোন আঘাত বা যন্ত্রণা দিতে নিষেধ করেছেন। পার্শ্বনাথ তাঁর শিষ্যদের চারটি প্রতিজ্ঞার নির্দেশ দেন: "জীবে অহিংসা, সত্যাশ্রয়, চৌর্যবৃত্তি পরিহার এবং সম্পত্তি বর্জন।" সমাজের যেসব বহিরঙ্গের বিশেষ বিশেষ কাজ আছে, তাদের সঙ্গে সন্ন্যাসীদের সম্পর্ক নেই এবং তাঁদের কাজ শেষ হলেই তাঁরা অদৃশ্য হন। এসব বহিরঙ্গ ভেতরের প্রতিষ্ঠানেরই আকস্মিক প্রকাশ। এই সব সন্ন্যাসীরা সামাজিক আন্দোলনে অংশ না নিলেও সামাজিক বিবর্ধনে সাহায্য করেন। তাঁরা নিজেরা অংশ না নিয়েও সামাজিক

---

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ, পঞ্চম, ২ যেখানে অশ্বপতি কৈকেয় দাবী করছেন যে তাঁর রাজত্ব থেকে তিনি সকল চোর, মাতাল, নিরক্ষর ও লম্পটদের দূরীভূত করেছেন।

ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপঃ
নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ।

২ অহিংসা পরমো ধর্মঃ
অহিংসা পরমং তপঃ
অহিংসা পরমং সত্যম্
ততো ধর্মঃ প্রবর্ততে। অনুশাসন পর্ব, চতুর্থ, ২৫, আদিপর্ব, ১১৫, ২৫।

৩ মৃদুনা দারুণং হন্তি, মৃদুনা হন্তি অদারুণং
নাসাধ্যং মৃদুনা কিঞ্চিৎ তস্মাৎ তীক্ষ্ণতরং মৃদুঃ।

অকক্রোধেন জিনে ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জিনে
জিনে কদারিয়ং দানেন সচ্চেন অলীকবাদিনাং।

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং, অসাধুং সাধুনা জয়েৎ
জয়েৎ কদর্যং দানেন সত্যেনালীকবাদিনাম্। মহাভারত।

৪ বিষ্ণুপুরাণ, তৃতীয়, ৯।

আন্দোলন নিয়ন্ত্রিত করেন। তাঁরা আমাদের অ্যারিস্টটলের "motor immobilis"-এর কথা মনে করিয়ে দেন।

হিন্দুশাস্ত্র অহিংসাকে পরম কর্তব্য বলে প্রশংসা করে, কিন্তু কখন অহিংসা নীতি পরিত্যাগ করা যায় তারও নির্দেশ দেয়। আমাদের সমাজের বিধি, আইন ও আচার-ব্যবহার আদর্শ নয়, এখানে পদে পদে ত্রুটির সঙ্গে আপস করতে হয়, কাজেই এখানে সৈন্য, পুলিস, জেলখানা সবই আছে। এরকম সমাজেও কিন্তু সকল মানুষের সঙ্গে সম্প্রীতির ভাব বজায় রেখে জীবনযাপন করা সম্ভব। আদর্শকে সামনে রেখে, সেখানে পৌঁছবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করতে বললেও হিন্দু শাস্ত্র মানুষের হৃদয়ের কাঠিন্যের জন্য অনেক আইন ও অনুষ্ঠানের আপেক্ষিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েছে। "জ্ঞানীরা জানেন যে অন্যের হানিকর কাজে ধর্ম ও অধর্ম দুই-ই মিশে আছে।" কিন্তু এসব অনুষ্ঠান আরও ভাল বিন্যাসে পৌঁছবার সোপান মাত্র। অসম্ভব ভালর জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেদের হারিয়ে ফেলার দরকার নেই, আমাদের ত্রুটিহীন হবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করতে হবে এবং আদর্শের দিকে অগ্রসর হতে হবে। সভ্যতার প্রগতির বিচার করার সময় দেখতে হবে কতবার ও কি অবস্থায় নিয়মের ব্যতিক্রম স্বীকৃত হয়েছে। অল্পবয়সীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাশবিক ও নিষ্ঠুর পদ্ধতি বা অপরাধীদের নৃশংস শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে। অহিংসার আদর্শকে মূল্যবান লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং তা থেকে বিচ্যুতিকে বর্জনীয় বলে মনে করতে হবে। যীশু ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যেও অনুরূপ মত দেখা যায়।

খ্রীষ্টান মত

ওল্ড টেস্টামেন্টে দুরকম চিন্তাধারা দেখা যায়—একটি শান্তিমূলক[১] ও আর একটি পুরোদস্তুর জঙ্গীভাবাপন্ন। জঙ্গীভাবাপন্ন চিন্তাই ওল্ড টেস্টামেন্টে প্রাধান্য পেয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্টের ঈশ্বর যুদ্ধ এবং পাইকারী হত্যাকাণ্ড দুই-ই সমর্থন করেন। জঙ্গীভাবাপন্ন হওয়ার জন্যই জাতিটা বিনষ্ট হয়ে গেল।

যুদ্ধ সঙ্গত কিনা তার বিরুদ্ধে ও সমর্থনে নানাপ্রকার বিবৃতি যীশুর কথা থেকে উদ্ধার করে যীশুর সত্যকার উপদেশ কি তা বোঝা যাবে না। যীশুর সত্যকার উপদেশ বোঝার জন্য তাঁর চরিত্র ও আচরণের সাহায্য নিতে হবে। এদিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয় যে যীশু সকল প্রকার হিংসা বর্জন করেছেন এবং জাতিসমূহের ইচ্ছা পূরণ করার উপায় স্বরূপ যুদ্ধকে স্বীকার করেন নি। যীশু যখন ওল্ড টেস্টামেন্টের উপদেশ "হত্যা করো না" উদ্ধার করেন তখন তিনি তা বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করেন। তিনি বলেছেন, "যে ভাইয়ের উপর রাগ করে সে বিচারের সম্মুখীন হবে।" নিউ টেস্টামেন্টের উপদেশমূলক গল্পসমূহের একটি জঙ্গীবাদীদের অন্ধতা নিয়ে বলা হয়েছে। যতক্ষণ বলবান লোক সশস্ত্র হয়ে তার বাড়ী রক্ষা করে ততক্ষণ তার সম্পত্তি নিয়ে শান্তি থাকে, কিন্তু যখন তার থেকে শক্তিশালী কোন লোক তাকে পরাভূত করে, তখন সে তার সমস্ত অস্ত্র হরণ করে আর তার

১ ম্যাথিউ পঞ্চম, ৪৩-৪৫, লিউক নবম, ৫১-৫৬

সম্পত্তি লুট করে নেয়।[১]

যীশু যে ঈশ্বরকে সকলের পিতা বলে ঘোষণা করলেন সেটা যে কত বড় যুগান্তকারী ব্যাপার তা যে সমস্ত জাতিরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তাদের ব্যবহারে চাপা পড়ে গেল। পাহাড়ের উপর থেকে উপদেশ (Sermon on the mount) হতাশার বাণী বলে মনে করা হল। এই উপদেশ যদি আদৌ প্রযোজ্য হয় তবে যেন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নয়, এইরূপও মনে করা হল। যীশুর উপদেশাবলী "যে তোমার ডান গালে চড় মারবে তার দিকে বাঁ গাল বাড়িয়ে দাও", "মন্দের সঙ্গে বিরোধ করো না", "যে তরবারি গ্রহণ করবে সে তরবারির সঙ্গেই বিনষ্ট হবে", "আমার রাজত্ব যদি ইহলোকের হয় তো আমার অনুচরেরা যুদ্ধ করতে পারে, কিন্তু আমার রাজত্ব তো ইহলোকের নয়" ইত্যাদি নাকি ব্যক্তিগত ব্যাপারে খাটে, রাষ্ট্রগত ব্যাপারে নয়। যেহেতু ব্যক্তিগত ব্যাপারে রাগ করে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা থেকে উদারতাই বেশী ফলপ্রসূ। যীশু শাস্ত্রকার ছিলেন না এবং তাঁর অপ্রতিরোধ বিরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে অবস্থিত ছোট দলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। য শু সাধারণ আইনের ধারা তুলে দিতে চান নি। সুসম্বন্ধ সমাজ থেকে জবরদস্তি একেবারে বর্জন করা যায় না। খ্রীষ্টান রাষ্ট্রেও চোর-ডাকাতের দলকে দমন করতে হবে এবং আক্রমণকারীদের থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হবে। সশস্ত্র প্রতিরোধ যীশুর সুসমাচারের সঙ্গে অসঙ্গত নয়। যীশু নিজেই চোরাজিন, বেথসৈডা এবং কাপেনেমি শহরকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। স্ক্রাইব ও ফারিসীদের বিরুদ্ধে তিনি খুবই তিক্ততা প্রকাশ করেছেন। তিনি মন্দির থেকে টাকার দালালদের (money changers) চাবুক মেরে তাড়িয়েছেন। "যীশু ঈশ্বরের মন্দিরে গেলেন এবং যারা মন্দিরে বসে ব্যবসা চালায় তাদের তাড়িয়ে দিলেন, টাকার দালালদের টেবিলগুলো উল্টে দিলেন আর যারা ঘুঘু পাখি বিক্রী করে তাদের আসনগুলোও ফেলে দিলেন।" এরকম ব্যবহার যীশুর কোমল ও দরদী স্বভাবের সঙ্গে ঠিক সুসঙ্গত নয়, বুদ্ধ বা গান্ধীর কাছে এরকম ব্যবহার আমরা চিন্তাও করতে পারি না, অথচ এই ব্যবহারই হিংসা সমর্থন করার জন্য প্রচার করা হয়। জঙ্গী-বাদীরা বেছে বেছে যীশুর সেই দিকটাতেই জোর দিয়েছে, যে দিক থেকে যীশু মুক্তিকে একটা গোষ্ঠীগত ব্যাপার বলে স্থির করেছিলেন, অর্থাৎ মাত্র ইহুদীদের জন্য —সামারিটানদের জন্যও নয় ; যে যীশু হেরডকে খ্যাঁকশিয়াল বলে গালাগালি দিয়েছিলেন, মিষ্টি ডুমুরগাছকে গালাগাল দিয়েছিলেন, সাইরো-ফিনিসিয়ান স্ত্রীলোকদের কটু কথা বলেছিলেন, আর ফারিসীদের বিষধর সর্প, ভণ্ড, লোভী মিথ্যাবাদী বলে গালাগাল দিয়েছিলেন,—যদিও তিনি তাদের অতিথি হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর যে রাষ্ট্রনৈতিক অভ্যুত্থান ঘটবে বলে তিনি অনুমান করেন সে সম্বন্ধে তিনি তাঁর অনুচরদের উপদেশ দেন যে তারা যেন সময় এলে নিজেদের পোশাক বিক্রয় করে তলোয়ার কেনে। "আমি শান্তি পাঠাবার জন্য আসি নি, তলোয়ারের জন্য এসেছি।" তিনি ঘোষণা করলেন, "যারা এই সব ছোট বাচ্চাদের ক্ষতি করবে, তাদের গলায়

১ লিউক একাদশ, ২১-২২

যাঁতা ঝুলিয়ে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া ভাল।" তিনি অন্যায়ের প্রতি ছিলেন ভয়ঙ্কর এবং অনুতপ্ত পাপীদের প্রতি ক্ষমাহীন। মানবজীবনের নানাপ্রকার দ্বন্দ্ব আছে এবং আমাদের দু'রকম মন্দের মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হবে। একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ভালমন্দ তুলনা করে যাতে মানুষের সব চেয়ে বেশী মঙ্গল হয় তাই বেছে নিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে হয় একটা বড় অস্ত্রোপচার করতে হবে না হলেও রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত। খ্রীষ্টধর্ম অহিংসানীতিকে বুকে-সুখে ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়েছে, আর তাদের সম্প্রদায়ের লোকেদের সম্পত্তি, স্ত্রী বা অস্ত্র একেবারে বর্জন করতেও বলে নি।

প্রথম প্রথম খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছিল। জাস্টিন মার্টার, মার্সিয়ঁ, অরিজেন, তের্তুলিয়ান, সিপ্রিয়ান, লাক্‌টানটিউস এবং ইউসেবিউস সকলেই যুদ্ধকে খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে অসঙ্গত বলেছেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় ক্লেমেন্ট (১৯০-২৫৫ খৃঃ অঃ) যুদ্ধের প্রস্তুতিতে আপত্তি করেছেন। তিনি খ্রীষ্টান দরিদ্রের তুলনা করেছেন "অস্ত্রহীন, যুদ্ধত্যাগী, রক্তপাত-বর্জনকারী, অক্রোধী ও শুচি সৈন্যদল"-এর সঙ্গে। তের্তুলিয়ান (১৯৮-২০৩ খৃঃ অঃ) বলেন যে, পিটার যখন মালকুসের কান কেটে নেন তখন যীশু "তরবারির কার্যকে চিরকালের জন্য অভিশাপ দেন।" হিপোলিটাস (২০৩ খৃঃ অঃ) রোম সাম্রাজ্যকে আপোকালিপ্সের চতুর্থ পশু বলে বর্ণনা করেছেন আর তাকে খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের শয়তানী সংস্করণ বলে উল্লেখ করার কারণ হিসেবে তার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির কথা বলেছেন। সাইপ্রিয়ান (২৫৭ খৃঃ অঃ) "রক্তাক্ত শিবিরসহ যত্রতত্র যুদ্ধের ব্যাপ্তি"-র জন্য আক্ষেপ করেছেন। সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান ঐহিক শক্তি দ্বারা নির্যাতিত হয়েও আদি খ্রীষ্টান গুরুরা বলপ্রয়োগের নিন্দা করেছেন। কিন্তু মহান থিওডোসিয়াসের (৩৭৯-৩৯৫ খৃঃ অঃ) সময় যখন খ্রীষ্টধর্মই রাষ্টীয় ধর্মের মর্যাদা লাভ করে তখন খ্রীষ্টধর্ম আদর্শচ্যুত হল এবং তখন থেকেই চার্চ অহিংসা ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগল। তখন থেকেই রাষ্ট্র ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিবাদ প্রায়ই হত এবং তখন হিংসা ভাল কি মন্দ, ধর্মসংস্থার সে বিবেচনা করবার অবকাশ থাকত না। খ্রীষ্টীয় ধর্মসংস্থার প্রথম তিন শতাব্দীতে চার্চ স্পষ্টভাবে যুদ্ধবর্জন নীতি সমর্থন করেছিলেন,—অথচ যখন থেকে সে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করল তখন থেকেই যুদ্ধ তার রক্তগত হল, প্রথম প্রথম যুদ্ধকে শুধু মেনে নেওয়া হত, পরে কিন্তু তাকে সংস্থার পক্ষ থেকে আশীর্বাদও করা হত। সপ্তত্রিংশৎ সূত্রে বলা হল, "ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞায় অস্ত্রধারণ করা ও যুদ্ধে অংশ নেওয়া খ্রীষ্টানদের পক্ষে বৈধ।" এ কথা বলা হয় নি যে জাতিকে ন্যায়যুদ্ধে সাহায্য করা নৈতিক কর্তব্য, কিন্তু যারা তা করবে খ্রীষ্টধর্মের দিক থেকে তাদের কার্যকে বৈধ বলে গণ্য করা হবে। ক্যাথলিকদের মতে সদাচারীদের ন্যায্য কারণে এবং নিঃস্বার্থভাবে অস্ত্রধারণের অধিকার আছে। সেন্ট টমাস আকুইনাস ধর্ম-যাজকদের সৈন্যদের উৎসাহ দিতে বলেছেন, কেননা "লোকেদের ন্যায়যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে উপদেশ দেওয়া ও তার ব্যবস্থা করে দেওয়া ধর্মযাজকদের কর্তব্য।" আজ যে পোপেরা ও আর্চবিশপরা আমাদের বলছেন যে হত্যা করা খ্রীষ্টানদের কর্তব্য, এটা এই ভাব থেকেই এসেছে এবং এ ভাব খ্রীষ্টীয় জগতে বহু শতাব্দী আগেই প্রবেশ

করেছে। ১৯১৫ সালে আর এইচ হেগ্রড্‌ট্‌[১] নামে একজন লিখেছেন "যে নাজারেথের যীশু শত্রুকে প্রেম দিতে বলেছেন, তিনি যদি আজ আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করতেন তবে জার্মানীতেই তাঁর আবির্ভাবের সম্ভাবনা সব চেয়ে বেশী। তিনি যদি সত্যিই জার্মানীতে আবির্ভূত হতেন তাঁকে কোথায় পাওয়া যেত বলে আপনাদের ধারণা? আপনারা কী মনে করেন তিনি ধর্মমঞ্চে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বলছেন, "হে পাপী জার্মানীরা, তোমরা তোমাদের শত্রুকে ভালবাস। কখনই নয়। বরং যে শস্ত্রধারীরা অদম্য ঘৃণা নিয়ে যুদ্ধ করছে, তাদেরই সামনে একেবারে পুরোভাগে থাকতেন। সেইখানেই তিনি রক্তাক্ত হাত আর মারণাস্ত্রদের আশীর্বাদ করতেন, হয়ত নিজেই ন্যায়ের অস্ত্রধারণ করে জার্মানদের শত্রুদের পবিত্রভূমির সীমানা থেকে ক্রমাগত দূরে তাড়িয়ে দিতেন, যেমন করে একবার ইহুদী বণিক ও সুদখোরদের মন্দির থেকে বিতাড়িত করেছিলেন।"

"মন্দকে প্রতিরোধ করো না" এই বাণীর সঙ্গে "বলপূর্বক মন্দকে প্রতিরোধ কর", "অন্য গাল বাড়িয়ে দাও" এই বাণীর সঙ্গে "আবার মার" এই বাণীর সামঞ্জস্য করার চেষ্টা আলোর সঙ্গে অন্ধকারের, ভালোর সঙ্গে মন্দের আপস করার চেষ্টার অনুরূপ। এ আপস চেষ্টা মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতার কাজে নতিস্বীকার মাত্র। ধর্ম সংস্কারের যুগে যুদ্ধের বিরুদ্ধে এক মহৎ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। ইরাসমাস লিখেছিলেন, "যুদ্ধের চেয়ে বেশী অধর্ম, বেশী সর্বনাশা, অন্তঃসারনাশী, বেশী হীন এক কথায় খ্রীষ্টানের তো কথাই নেই, মানুষের বেশী অযোগ্য আর কিছু থাকতে পারে না। যুদ্ধ পাশবিকতার চেয়েও খারাপ, কেননা এক মানুষকে অন্য মানুষ যেমন ভাবে ধ্বংস করে, কোনও বন্য জন্তুও তা পারে না। পশুরা যখন যুদ্ধ করে তখন তারা প্রকৃতিদত্ত অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে কিন্তু আমরা পরস্পরকে হত্যা করার জন্য যে সব অস্ত্র তৈরী করেছি প্রকৃতি তাদের কথা কখনও চিন্তাও করে নি। তা ছাড়া পশুরা সামান্য কারণে কখনও ক্রোধে জ্ঞানহারা হয় না, তারা হয় ক্ষুধার তাড়নায়, নয়ত অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হলে, অথবা নিজেদের বাচ্চাদের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হবার আশঙ্কাতেই ক্রোধোন্মত্ত হয়ে। কিন্তু আমরা তুচ্ছ কারণে রণক্ষেত্রে কি ধ্বংস-লীলারই না অবতারণা করি?" "শত্রুকে ভালবাস" এই নীতিবাক্য আমাদের সহযোগীদের প্রতি একটা ন্যায্য দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করার উপর জোর দেয়। এর অর্থ শুধু এমন অপ্রতিরোধ নয়, যাতে অন্তর্নিহিত ঘৃণা, হিংসা ও বলপ্রয়োগের বাসনা অক্ষুন্ন থেকে যায়, এ হল প্রেমের ভাব। ক্রুশের শিক্ষা এই যে যুদ্ধের মত একটা খারাপ জিনিস পৃথিবী থেকে কখনই উঠে যেতে পারবে না, যদি না আমরা যুদ্ধ যে পরিমাণ যন্ত্রণা আনে তা যুদ্ধ ব্যতিরেকেই সহ্য করতে রাজী থাকি। আমাদের চতুর্দিকে যে বর্বরতা ও হননপ্রবৃত্তি সংসারে রাজত্ব করছে তা থেকে আমাদের যতদূর সম্ভব দূরে থাকতে হবে এই আশায় যে, একদিন আসবে যখন এর চেয়ে উন্নততর ভাব আমাদের মধ্যে প্রাধান্য পাবে। ঘৃণায় উন্মত্ত পৃথিবীতে আমাদের প্রেমের বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

---

১ Thus Spake Germany (Coole & Potter) পৃঃ ৮।

বলা হয় যে মন্দকে শক্তি দিয়েই সংযত করতে হয় এবং সংঘর্ষ ও হিংসাপূর্ণ পৃথিবীতে ন্যায়কে বলপ্রয়োগে রক্ষা না করলে সে ধ্বংস পাবে। কিন্তু প্রেমভাবাপন্ন হলে তার ফল কি হবে তার বিচারের ভার কি আমাদের হাতে? অধর্মের উপর ধর্মের জয়প্রতিষ্ঠা ঈশ্বরের কাজ। আমাদের কর্তব্য হল সর্বদা ও সর্বথা প্রেমের বিধি প্রয়োগ করা। সঙ্কট, কার্যকারিতা, প্রতিপত্তি, সম্মান, নিরাপত্তা প্রভৃতির প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানো ঠিক নয়, কেননা এগুলি ভয় ও অহঙ্কারপ্রসূত। আমরা এক পরম পিতার অস্তিত্বে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি এবং যে ব্যবস্থায় অগণিত মানুষকে চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ধ্বংস করা হয়, তার কাছে নতিস্বীকার করছি। ভগবদ্বিশ্বাসী মাত্রেই যুদ্ধকে অগ্রাহ্য করবেন, কেননা যুদ্ধ জ্ঞান ও প্রেমভাবের বিরোধী। যুদ্ধকে যে ছদ্মবেশই পরানো হোক, আসলে তা এক দল মানুষের আর এক দল মানুষের উপর ধ্বংস ও হত্যার দ্বারা নিজের ইচ্ছা চাপানো ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষের অন্তরেই যুদ্ধের বীজ। দম্ভ, ভয়, হিংসা ও লোভের মধ্যেই তার জন্ম, যদিও ওই সব দুর্বলতাকে জাতীয় পোশাকে ভূষিত করা হয়।

আমরা কি "পবিত্র", "ন্যায্য", "আত্মরক্ষা" মূলক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারি না? যীশুর উত্তর স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন। তাঁর যে শিষ্যেরা পরিত্রাতাকে তাঁর শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল তার থেকে পবিত্র কারণ আর কি হতে পারে? তারা পার্থিব রাজত্বের জন্য যুদ্ধ করতে চায় নি, স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধ করছিল, তাদের কাছে দেশভক্তির আবেদন তুচ্ছ। কিন্তু পৃথিবীকে অস্ত্রপ্রয়োগ করে রক্ষা করা যায় না। পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে কষ্ট সহ্য করতে হবে, ক্রুশের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে হবে। প্রতিশোধ প্রতিহিংসা, তা ব্যক্তিগতই হোক বা জাতিগতই হোক, চলবে না। প্রেমভাব শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্কেই চলবে, আর জনসাধারণের মধ্যে বা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে চলবে না এ কথা বলা চলে না। খ্রীষ্টীয় বিবেক প্রসারিত হচ্ছে আর সেই জন্যই পনেরো বছর আগে ল্যামবেথে যে সম্মেলন হয় তাতে বিশপ ও আর্চবিশপরা মিলে ঘোষণা করেন যে "যুদ্ধ খ্রীষ্টমতের পরিপন্থী"। আমরা অনুভব করতে আরম্ভ করেছি যে আমরা যদি নিজেদের সভ্য মনে করতে চাই তো যুদ্ধকে একেবারে বর্জন করতে হবে। মানবিক বিবেকের বিকাশ বলে একটা জিনিস আছে, তা দিয়েই আমরা ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য আরও ভাল করে বুঝতে পারব।

যুদ্ধের মোহ

আমরা যেটাকে ঠিক বলে জানি সেটাই করতে গিয়ে পৃথিবীতে যত যন্ত্রণা ও নিষ্ঠুরতা ঘটেছে, তত মন্দ কাজ জেনেশুনে করতে গিয়ে হয় নি। চোর, ডাকাত, গুন্ডা পৃথিবীতে যত যন্ত্রণার কারণ হয়েছে, ভাল লোকের ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ কাজ তার থেকে বেশী যন্ত্রণার কারণ হয়েছে। ধর্মযুদ্ধ চার্চের আশীর্বাদপূত। ধর্মাধিকরণ শুধু অপরাধীদেরই যে পীড়ন করেছে তা নয়, সাক্ষীদের কাছ থেকে সত্য তথ্য সংগ্রহ করার জন্যও নিষ্ঠুর পীড়ন করেছে। অতি পরিশ্রম, শিশু শ্রমিক ও

ক্রীতদাস প্রথাও এক সময়ে ন্যায্য বলে মনে করা হত। ভাল ভাল লোকে যুদ্ধকে সভ্য জীবনের স্বাভাবিক ও অক্ষতিকারী অনুষ্ঠান বলে মনে করেন। অথচ আমাদের উত্তরপুরুষরা জাতি হিসাবে আমাদের সামাজিক ব্যবহার সেই রকম বিতৃষ্ণার সঙ্গে দেখবে, যেমন আমরা বাধ্যতামূলক সতীদাহ বা ক্রীতদাস প্রথাকে দেখে থাকি। উত্তরপুরুষদের সেই মনোভাব আমরা যতটা আগে থেকে বুঝতে পারি, মানবজাতির পক্ষে ততই মঙ্গল। এই সব ব্যাপারে কৃত্রিম উপায়ে আমাদের বর্বর অবস্থায় রাখা হয়েছে। দুষ্ট লোক আসল বিপদের কারণ নয়, যে সব দয়ার্দ্র, পরিশ্রমী নাগরিক বরাবর আইন মেনে চলে, তাদের ন্যায় ও অন্যায়-বোধকে যখন ইচ্ছা করে সুবিন্যস্তভাবে বিকৃত করা হয় তখন তারাই জাতিগত-ভাবে উন্মাদের মত ব্যবহার করে বিপদ ঘটায়। সমাজদেহে ত্রুটি যত গভীর ভাবে প্রোথিত থাকে ততই তার বিরুদ্ধে মানুষের বিবেক জাগ্রত করা কঠিন হয়ে ওঠে। মৌলিক ধারণা ও প্রতিষ্ঠিত মানসিক অভ্যাস নির্মূল করার প্রক্রিয়া যন্ত্রণাদায়ক। আমাদের যুদ্ধহীন পৃথিবীর দিকে নিরলসভাবে এগিয়ে যেতে হবে। মানুষের স্বভাব আসলে নমনীয় আর তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এখনও অনাবিষ্কৃত। আগের থেকে ভাল হয়ে আমরা এখন বুঝতে পারি যে আমরা আরও ভাল হতে পারতুম। অবশ্য এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে পৃথিবীতে ভগবানের রাজত্ব কখনও দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু আর এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে সর্বদাই সে সম্ভাবনার দিকে এগোনো যাচ্ছে। পৃথিবী কখনই সম্পূর্ণ মহিমাহীন নয়, যদিও মহিমাটা আশানুরূপ নয়। মানুষের স্বভাব আর প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যে সব দুর্বলতা নিহিত আছে, যার জন্য পৃথিবীতে আগুন জ্বলে গেছে, সেগুলো বুঝতে পারাই অগ্রগতির প্রথম সোপান। শান্তির জন্য আকাঙ্ক্ষাকে আমাদের বিকশিত করতে হবে এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে যুদ্ধের আকর্ষণ লোপ পায়। মনুষ্যস্বভাব মূলতঃ রক্ষণশীল, এমন কি জড়ধর্মী। তীব্রতম প্রয়োজন না হলে তাকে সক্রিয় করা যায় না। অন্তরের ও বাহিরের প্রয়োজনেই মানুষের স্বভাবে পরিবর্তন হয়, পরিবর্তন যদি না হত তো মনুষ্য-প্রজাতি লোপ পেত। মানুষের মনের মত নমনীয় কিছুই নেই, মানুষ এখনও নির্মীয়মাণ, তাকে গড়া এখনও শেষ হয় নি।

সভ্য জাতিরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে যে কোন সমস্যা মীমাংসার জন্য যুদ্ধরূপ পদ্ধতি প্রয়োগ অর্থহীন। আধুনিক যুদ্ধে যে পরিমাণ লোকক্ষয় হয় তা উদ্দেশ্য সাধনের অনুপাতে এত বেশী যে যুদ্ধকে গ্রহণীয় করার জন্য আগের যুগে যে সব যুক্তি দেখানো হত তার কোনোটাই আর সন্তোষজনক বলে মনে হয় না। বলা হয় যে হত্যা করার প্রবৃত্তি ও জীবনকে অসহনীয় করার আকাঙ্ক্ষা মনুষ্য-স্বভাবের অপরিহার্য অংশ। স্পেঙ্গলার বলেন, "মানুষ হিংস্র জন্তু। এ কথা বার বার বলব। যে সব সর্বগুণান্বিত ও সামাজিক নীতিবাদীরা এর উপরে উঠতে চান তাঁরা নখদন্তহীন, কাজেই তাঁরা যে আক্রমণ করতে চান না তা আক্রমণ করতে পারেন না বলেই। যাঁরা পারেন তাঁদের তাঁরা ঘৃণার চক্ষে দেখেন।" "জাতীয়তাবাদ" সম্বন্ধে একখানা সাম্প্রতিক বইতে লেখকরা বলেছেন, "সংঘর্ষের প্রয়োজন

জাতীয়তাবাদের জন্যও নয়, জাতির জন্যও নয়, মানুষের প্রকৃতিতেই সংঘর্ষের কারণ বর্তমান। এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষ অন্য সকলের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধানোর জন্য দল করবে না, এরকম কথা চিন্তা করা অলীক কল্পনা মাত্র।"[১] কিন্তু মানুষ সত্য সত্যই হিংস্র পশু নয় যে সে তার দুর্বল প্রতিবেশীদের সর্বদা গ্রাস করবে। মানুষেরা বিপজ্জনক পশুদের মত নয়। আবার মানুষের আচরণ বেশীর ভাগ শিক্ষালব্ধ, সহজ প্রবৃত্তিজাত নয়। বোলতা বা পিঁপড়ের মত তার আচরণের উৎস জনন-কোষের মধ্যে নয়। সমুদ্র পার হওয়ার জন্য আমাদের পাখা গজায় না, আমরা জাহাজ ও বিমান তৈরী করি। এই গুণের জন্যই মানুষ অন্য সমস্ত প্রাণী থেকে শ্রেষ্ঠ। মানুষ অবস্থাভেদে তার আচরণ বদলাতে পারে। যুদ্ধপ্রীতি সহজ প্রবৃত্তিপ্রসূত নয়, একটা অধিগত মানসিক অভ্যাস। আজকের সমাজ চায় যে আমরা রণক্ষেত্রে কষ্ট পাই ও প্রাণ দেই, যেমন প্রাচীনকালে লোকে প্রায়োপবেশন করত বা জগন্নাথের রথের চাকায় স্বেচ্ছায় পিষ্ট হত। সামাজিক ব্যবস্থায় আমাদের মন বিকৃত হয়ে যায়। কামানের গোলা থেকে সামাজিক বিরোধিতা বেশী ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আমাদের মানসিক অভ্যাসকে সামাজিক প্রথার খাদ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, মনস্তাত্ত্বিক আবহাওয়া পরিবর্তিত করতে হবে।

পশুপালন বিদ্যা মানুষের আয়ত্তে আসার আগে ব্যাধ পশুহনন করে খাদ্য-সংগ্রহরূপ সামাজিক কর্তব্য সমাধা করত। আজ ব্যাধের সে প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তবু লোকে শখ করে শিকার করে, শিকার এখন জীবিকার স্থলে খেলায় পরিণত হয়েছে। সেইরূপ আমাদের চতুর্দিকে যখন বর্বরদের উপদ্রব ছিল তখন যোদ্ধারা আমাদের জীবন নিরাপদ করে রাখত। কিন্তু এখনও কি যুদ্ধের সে প্রয়োজন আছে? মানুষই একমাত্র প্রাণী যে কতকটা তত্ত্বগত কারণে হত্যা করে, কখনও কোন বহুকাল বিস্মৃত ভূমিহরণের সংশোধন করার জন্য, কখনও বা কোন প্রণয়িনীর উপর বালসুলভ আকর্ষণের জন্য, আবার কখনও গৌরব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বা কোন ভৌগোলিক সীমানার প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য। কোন প্রতিষ্ঠান যখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, তখনও বহুদিনের অভ্যাস না ছাড়তে পেরে আমরা আমাদের অধিগত রুচির স্বপক্ষে কাল্পনিক যুক্তি প্রয়োগ করতে থাকি। একসময় যুদ্ধ ছিল রাজাদের পক্ষে শখ ও উচ্চশ্রেণীর পক্ষে ক্রীড়া, এতে সফল হলে সম্মান ও সম্পত্তি পাওয়া যেত।[২] এখন যুদ্ধটাই একটা লক্ষ্য

১ পৃঃ ৩৩৫।

২ চার্লস সেইনোবোস (Charles Seignobos) তাঁর "ইউরোপীয় সভ্যতার উত্থান" নামক পুস্তকে বলেছেন, "(মধ্যযুগে) আমীর-ওমরাহরা যুদ্ধকে দুর্ভাগ্য বলে ভাবত না, এতেই তাদের আনন্দ ছিল। শত্রুর রাজত্ব লুট করা, শত্রুকে বন্দী করে পণ আদায় করা এসবের সুযোগ তারা লোভনীয় বলে মনে করত। অনেক সময় যুদ্ধ না থাকলে একই দেশের আমীর-ওমরাহেরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা করে প্রকৃত যুদ্ধের শখ মেটাতো। এই ছিল টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতার আদিম উৎস। এতে উভয়পক্ষ রণসম্ভার নিয়ে যুদ্ধ করত, পরাজিত পক্ষকে বন্দী করে উদ্ধারপণ আদায় করার রীতি প্রচলিত ছিল।"

হয়ে দাঁড়িয়েছে, একটা উত্তেজক ক্রীড়া আর ধনিকদের স্বার্থসাধক। যারা এখন যুদ্ধে লিপ্ত হয় তারা এমন খারাপ লোক নয় যে যুদ্ধটাকে অন্যায় কাজ ভেবেও করে, তারা ভাল লোক, তাদের বিশ্বাস তারা একটা সৎ কাজই করছে। যতদিন পর্যন্ত শক্তি ও সাফল্য আরাধ্য বলে মনে হবে ততদিন বর্তমান যুগের যান্ত্রিক অমানুষিকতার বেশে জঙ্গী ঐতিহ্য বলবৎ থাকবে। আমাদের শ্রেয়বোধই বদলানো দরকার। আমাদের বুঝতে হবে যে হিংসা গোষ্ঠীমনোভাবের বিরুদ্ধে অপরাধ। পরস্পরের মধ্যে সন্তোষজনক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের উপায়ান্তর চিন্তা করতে হবে। বার্নার্ড শ এক জায়গায় বলেছেন যে, সমাজ যদি সত্যই সভ্য হয় তো বেত মারা শাস্তি উঠে যাবে, কেননা বেত মারতে কেউই রাজী হবে না। কিন্তু বর্তমানে যে কোন ভাল কারারক্ষী এক টাকার জন্য তা করতে রাজী হয়ে যাবে। সে হয়ত এটা পছন্দ করে না, বা দণ্ডবিধির খাতিরে প্রয়োজনীয় বলেও মনে করে না, তবু করবে কেননা এইরকম করাই রেওয়াজ। এ হল সামাজিক প্রত্যাশাকে মেনে নেওয়া। যুদ্ধ এই কারণেই কুৎসিত ও ঘৃণ্য যে আমরা কোন রকম অসদুদ্দেশ্য না নিয়েই তাতে লিপ্ত হই, যুদ্ধ করি নিষ্ঠুরতার উদ্দেশ্যে নয়, করুণা করার উদ্দেশ্য নিয়ে। গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, পৃথিবীর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, আমাদের নারী ও শিশুদের রক্ষার জন্য, আমাদের গৃহরক্ষার জন্য, যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কত না বিচিত্র কারণ। এই সব কারণের যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে।

নরমাংস-ভোজন, পরাজিতের শির-সংগ্রহ, ডাইনী পোড়ানো এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধ যেমন একসময় প্রচলিত থাকলেও এখন ওদের অসামাজিক বলে ধরা হয়, তেমনি যুদ্ধকেও একটা বর্জনীয় আসুরিকতা বলে মনে করা উচিত। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও নীতিবোধের প্রয়োজনীয়তা মানতে হবে। একজন ব্যক্তির পক্ষে যা মন্দ ও অসামাজিক তা রাষ্ট্র দ্বারা প্রযুক্ত হলেই ন্যায্য ও নীতিসিদ্ধ হয়ে উঠতে পারে না। যুদ্ধ আসলে সমষ্টিগত হত্যা ও চৌর্য, কাজেই যতই প্রয়োজনীয় হোক, তা নিশ্চয়ই অন্যায়।

সাহস, ত্যাগ, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং আত্মবলিদানে আগ্রহ ইত্যাদিকে সামরিক গুণ বলে উল্লেখ করা হয়। সমরযন্ত্রের কাছে স্বেচ্ছায় নতিস্বীকার করা থেকেই সৈনিকদের মহত্ত্ব নির্ধারিত হয়। আর এটা সম্ভব হয় যুদ্ধের মহিমা ও বিপদসমূহকে মহাকাব্যিক ধরনের কাল্পনিক চাকচিক্য দেওয়া হয়েছে বলে। যুদ্ধকে প্রগতি ও সভ্যতার উপাদান, গুণ ও সুখের উৎস বলে চিত্রিত করা হয়।[১] প্রাচীনকালে

১ Treitschke বলেছেন, "ওল্ড টেস্টামেন্টে ন্যায় ও পবিত্র যুদ্ধের সার্বভৌম সৌন্দর্যের যে চমৎকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, একমাত্র কয়েকজন মুষ্টিমেয় ভীরু কল্পনা-বিলাসীরাই তার দিকে অন্ধ হয়ে থাকতে পারে। কোন জাতি যদি চিরস্থায়ী শান্তির কাল্পনিক আশায় বিভ্রান্ত হয় তো তারা তাদের গর্বিত স্বাতন্ত্র্যে ধ্বংসের পথে নেবে যাবে, সেখান থেকে উদ্ধারের উপায় থাকবে না। যুদ্ধ পৃথিবী থেকে উঠে যাবে এমন আশা শুধু যে অসম্ভব তাই নয়, নীতিবিরোধী। কল্পনা কর যে যুদ্ধ উঠে গেলে মানবাত্মার অনেক প্রয়োজনীয় ও মহৎ শক্তি অব্যবহারে নষ্ট হয়ে যাবে, আর পৃথিবী অহমিকার একটা বিরাট মন্দির হয়ে উঠবে।" Coole and Potter-এর Thus spake Germany (১৯৪১) পুস্তকেব ৫৯-৬০ পৃষ্ঠা।

যুদ্ধ বর্তমান কালের মুষ্টিযুদ্ধের মত একের সঙ্গে একের দ্বন্দ্বের সমষ্টি ছিল। এই দিক থেকে যুদ্ধ ব্যাপারটা ছিল সহজ। মধ্যযুগেও মানুষ যুদ্ধকে পেশা হিসেবে বরণ করত, প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রসমূহের পক্ষ নিয়ে মানুষ পুরস্কারের বিনিময়ে যুদ্ধ করত, সে যুদ্ধের লক্ষ্যের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক থাকত না। যে সব রাষ্ট্রের হয়ে তারা হত্যা করত তাদের প্রতি তাদের কোন স্বাভাবিক আনুগত্য থাকত না। কিন্তু আসুরিক অস্ত্রপ্রযুক্ত বর্তমান যুদ্ধে সব থেকে অসহায় ও নিরীহ লোকেদের পাইকারি ভাবে হত্যা করা হয়, এর চেয়ে কোন জাতির আর বেশী সর্বনাশ কিছু হতে পারে না। এখন নারী ও শিশু হন্যমানদের প্রথম সারিতে। পাথর থেকে ইস্পাত, ইস্পাত থেকে বারুদ, বারুদ থেকে বিষাক্ত গ্যাস ও রোগের বীজাণু, এইভাবে মানুষের সর্বনাশা বুদ্ধি এগিয়ে চলেছে। বর্তমান যান্ত্রিক যুগের যুদ্ধ তীব্রতায় ও ব্যাপকতায় সভ্যতাকে ধ্বংস করার উপক্রম করেছে। দৈনিক হিংসা ও শত্রুর প্রতি নিরন্তর ঘৃণা প্রচার করে মানুষের মনকে পশুভাবাপন্ন করে তুলছে। এর দ্বারা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নীতিতেও আমাদের সন্ত্রাস সৃষ্টিতে অভ্যস্ত করে তুলছে। যুদ্ধের সময় নৈতিক অবনতি কতখানি হয়, বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তার বর্ণনা করে গেছেন। সেণ্ট অগস্টাইন জিজ্ঞাসা করেছেন, "যুদ্ধের কোন্‌টা নিন্দনীয়? যে সব লোক একদিন মরতোই তারা মরছে বলেই কি যুদ্ধ নিন্দনীয়? ভীরু লোকেরা যুদ্ধকে এর জন্য দোষ দিতে পারে, কিন্তু ধার্মিক লোকেরা তা বলেন না। তাঁরা যুদ্ধের মধ্যে যে ক্ষতি করার ইচ্ছা, অদম্য ঘৃণা, প্রতিশোধস্পৃহা, দুরাকাঙ্ক্ষা ও প্রভুত্ব করার প্রবৃত্তি রয়েছে তাই নিন্দনীয় বলে মনে করেন।" টলস্টয় তাঁর "যুদ্ধ ও শান্তি" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে লিখেছেন, "যুদ্ধের লক্ষ্য হত্যা, তার উপর গুপ্তচরবৃত্তি, বিশ্বাসঘাতকতা এবং বিশ্বাসঘাতকতায় উৎসাহ দান, দেশবাসীর সর্বনাশ, সৈন্যদের রসদ যোগাতে দেশবাসীর সম্পত্তি ডাকাতি বা চুরি করে নেওয়া, প্রতারণা ও মিথ্যাবাদ যাকে সামরিক কৌশল বলা হয়; সৈনিকের পেশায় স্বাধীনতার অভাব অভ্যস্ত হয়ে যায়, তার আকার হল নিয়মানুবর্তিতা, আলস্য, অজ্ঞতা, নিষ্ঠুরতা, ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ ও মাতলামি।" ফ্রেডরিক দি গ্রেট তাঁর মন্ত্রী পোডেভিল্‌স্‌কে লিখেছিলেন, "যদি সৎ লোক হলে আমাদের কিছু লাভ হয় তো আমরা সৎ হব, আর প্রতারণা করলে যদি সুবিধা হয়, তবে আমরা প্রতারক হব।"[১] যুদ্ধের সময় যে যন্ত্রণা ও সন্ত্রাসের উৎসব হয়, আদর্শের যে সর্বব্যাপী অবক্ষয় ঘটে, মানুষে যে কষ্টভোগ করে তার সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, সে কখনও যুদ্ধে বীরত্ব ও বিজয়ের প্রকাশকে বড় করে দেখবে না। যাতে পৃথিবীর কোটি কোটি লোক মৃত্যুমুখে পড়ে, যাতে অগণিত গৃহ ধ্বংস হয় তা নিছক মন্দ। এর মধ্যে সমস্ত অপরাধ কেন্দ্রীভূত। ডিউক অফ ওয়েলিংটন বলেছিলেন, "বিশ্বাস কর তুমি যদি যুদ্ধের একদিন পুরো দেখে থাক তো সর্বশক্তিমান ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে

---

১ দশম, ২৫, ফ্রেডরিক দি গ্রেট আরও বলেন, "শাসকের গোপন উচ্চাকাঙ্ক্ষা লুকোবার সব চেয়ে ভাল উপায় হল শান্তিপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করা এবং সুযোগ বুঝে আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা।" Political Testament (১৭৬৮)

যাতে জীবনে আর তোমাকে যুদ্ধের এক ঘণ্টাও না দেখতে হয়।" লাওৎসে বলেছেন, "বিজয়কে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দিতে অভিনন্দিত করা উচিত।"[১]

যুদ্ধকে অপরিহার্য মন্দ, দুর্ঘটনা, ঈশ্বরের শাস্তি, ভূমিকম্প বা ঝঞ্ঝার মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি নাম দিয়ে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া হয়। বর্বরদের আবির্ভাবকে পঙ্গপাল বা রোগবীজাণুর আক্রমণের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয় যে তাদের আক্রমণকে বলপ্রয়োগেই প্রতিরোধ করতে হবে। যুদ্ধ কিন্তু ঈশ্বর-প্রেরিতও নয়, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেও ঘটে না, মানুষই তার সৃষ্টি করে, আর তারা যে শিক্ষা পায় তাতেই তা সম্ভব হয়। যতদিন পর্যন্ত আমরা শক্তিনীতিতে বিশ্বাস করব ততদিন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হবে। শক্তির লক্ষ্যের কাছে যদি ন্যায় ও সহিষ্ণুতাকে নীচু করে দেখা হয় তো বন্য মনোভাবের বিলোপ ঘটবে না। রাষ্ট্রনৈতিক বাস্তবতার মানে যদি এই হয় যে যুদ্ধকে স্বাভাবিক ঘটনা বলে গ্রহণ করা, তাহলে আমরা মানবের স্বাধীনতাকেই অস্বীকার করব। পৃথিবীতে শান্তি শ্রদ্ধেয় আদর্শ। শান্তির মধ্যে অল্প নিয়তিবাদের উপর স্বাধীন ইচ্ছার জয়।

কেউ কেউ বলেন, ঘরে আগুন লাগলে আগুন দিয়েই আগুন নেবাতে হবে। অন্যেরা বলেন যে, আগুনকে জল দিয়ে নেবাতে হবে। "অস্ত্রকে অস্ত্র দিয়েই দমন করতে হয়।[২] আমরা যদি শক্তিতে শ্রদ্ধাবান হই তা হলে নাৎসীরা মানুষের ইচ্ছাকে দমন করার জন্য শক্তিকে সঠিক, বৈজ্ঞানিক ও নির্দয় ভাবে ব্যবহার করছে বলে আপত্তি করতে পারি না। কিন্তু ফ্যাসিস্টরা যে বলপ্রয়োগ ও ভয় দেখানোর নীতি গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে, সেই নীতি গ্রহণ করে কি তাদের হারাতে পারব? বলা হচ্ছে যে সভ্যতার ঐতিহ্য এখন এক নব বর্বরতার মধ্যে বিপন্ন হয়েছে, কেননা এ বর্বরদের বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক অস্ত্র আগের চেয়ে কল্পনাতীতভাবে বেশী শক্তিশালী। এ বর্বরতার প্রধান লক্ষণ এই যে, এর মতে কলা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও দর্শন সবই শক্তি সংগ্রহের উপায় মাত্র। নর-নারী, শিশু, গৃহ, বিদ্যালয়, ধর্ম কিছুই পবিত্র নয়। জনসমষ্টিই রাষ্ট্রের রূপ আর সমগ্র জঙ্গী পদ্ধতিই তার ক্রিয়া। জঙ্গীবাদী রাজ্যলোলুপ নাৎসী জার্মানীতে শক্তিবাদ চরম বিকাশলাভ করেছে। "আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় আক্রমণ করা" বলে যে লর্ড বাল্ড্উইনের বিখ্যাত ঘোষণা তার অর্থ এই যে, নিজেদের বাঁচতে হলে শত্রুদের থেকে তাড়াতাড়ি নারী ও শিশুদের হত্যা করার প্রচেষ্টা করতে হবে। শত্রুরা যদি বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে আমাদেরও তা করতে হবে। তারা যদি সৈনিকবৃত্তিকে বাধ্যতামূলক করে আমাদেরও তা করতে হবে। শত্রুকে হারাতে হলে, তার গুণ বা দোষগুলি আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। মিত্র শক্তিকেও সামগ্রিক যুদ্ধের দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। গণতন্ত্র, পরমতসহিষ্ণুতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এসব বর্জন করতে হবে সাময়িক ভাবে। শত্রুদের যে সব পদ্ধতি আমাদের ঘৃণার্হ, সেইগুলিই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। অন্যায়কে অন্যায় দিয়েই প্রতিহত করতে করতে আমরা নিজেরাই অন্যায়ের প্রতিমূর্তি

---

১ Book of Tao, একত্রিংশৎ।

২ অস্ত্রম্ অস্ত্রেণ শাম্যতি।

হয়ে পড়ব। শত্রুকে জয় করার বদলে আমরা নিজেদের তাদেরই প্রতিবিম্ব করে তুলছি।[১] স্তালিন রুশবাসীকে যে বাণী দিয়েছেন তাতে এই বিপদের লক্ষণ স্পষ্ট। "শত্রুকে কায়মনোবাক্যে ঘৃণা করতে না শিখলে তাকে হারানো অসম্ভব।"[২] আমরা বলছি যে আমাদের ও শত্রুদের উদ্দেশ্য ভিন্ন কিন্তু আমরা একই উপায় অবলম্বন করছি। আমাদের বিশ্বাস যে ঠান্ডা মাথায় ঘৃণা করে আমরা প্রেমভাবের বিকাশ ঘটাবো, সম্পূর্ণ বাধ্যতা কায়েম করে ব্যক্তিস্বাধীনতার উন্নতি ঘটাবো। এ আসলে অন্যায় ও বিবেকহীনতার প্রতিযোগিতা। এতে আত্মার যে উন্মত্ততা ঘটবে তার কোন ঔষধ নেই। টমাস অ্যাকুইনাস বলেন, "সৎ কাজেও আমাদের সৎ পথে চলতে হবে। অসৎ উপায়ে তা সিদ্ধ হবে না।"

আমরা যুদ্ধ জেতার উদ্দেশ্যে যদি ঘৃণা ও তিক্ততাকে আশ্রয় করি তো শান্তি স্থাপনের সময় তাকে বর্জন করতে পারব না। আমরা শুধু শত্রুদমনের সময় আমাদের আদর্শকে অবহেলা বা বর্জন করব আর সঙ্কট কেটে গেলেই তাদের পুনঃ-

---

১ স্যার এডওয়ার্ড গ্রিগ বলেন, "অস্ত্র গ্রহণ করা মানবতার কাছে অপরাধ, একথা প্রমাণ করতে যদি আমাকে অস্ত্রধারণ করতে হয় তো আমার যে প্রতিবেশী অস্ত্র ধারণ করে প্রমাণ করতে চায় যে সে অস্ত্র ব্যবহারে আমার চেয়ে বেশী পারদর্শী এবং সেজন্য আমাকে শাসনে রাখার অধিকার সে অর্জন করেছে, তার থেকে আমি কোন অংশেই ভাল নই। তার ও আমার উদ্দেশ্য ও পথ একেবারে এক। হয় আমি তাকে জোর করে শাসন করব নয় সে আমাকে শাসন করবে।" দি ফেথ অফ্ অ্যান ইংলিশম্যান।

২ বিসমার্ক ফ্রান্সের উপর জার্মান-ঘৃণা প্রকাশের জন্য বলেন, "ফরাসীদের কাঁদবার জন্য চোখ ছাড়া আর কিছুই রাখা হবে না।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আর্নস্ট টিসানের "ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ঘৃণার স্তোত্র" রচনা করেন।

চিরকালের ঘৃণায়, তাদের ঘৃণা করতে হবে,
সে ঘৃণা কিছুতেই ছাড়ব না,
জলে স্থলে ঘৃণা,
মাথা দিয়ে ঘৃণা, হাত দিয়ে ঘৃণা,
হাতুড়ীর ঘায়ে ঘৃণা, মুকুটকে ঘৃণা,
সাত কোটির ঘৃণায় দমবন্ধ।
আমরা একসঙ্গে ভালবাসি, একসঙ্গে ঘৃণা করি,
আমরা আমাদের শত্রুকে ঘৃণা করি,
আর সে শত্রু শুধু ইংলণ্ড।

(বার্বারা হেন্ডারসন কৃত ইংরাজী অনুবাদ)

অষ্টাদশ শতাব্দীর এক হাঙ্গেরীয় লোকসঙ্গীত এইরূপঃ—

হে মাগ্যার, কোন জার্মানকে খাঁটি ভেবো না,
সে যতই তোমাকে খোশামোদ করুক;
যদিও তোমার ভাল করবার প্রতিজ্ঞা লিখতে তোমার গায়ের
কাপড়ের থেকে বড় চিঠির দরকার হয়,
আর যদিও সে (প্রকাণ্ড হারামজাদা!) তাতে শরতের চন্দ্রের মত
বড় মোহর লাগায়,
তুমি নিশ্চয় জানবে যে তার উদ্দেশ্য খারাপ,
ঈশ্বর তার আত্মাকে নরকে নিক্ষেপ করুন!

প্রতিষ্ঠা করব এরকম যুক্তির মত শোকাবহ ভ্রম আর কিছু হতে পারে না। শত্রুর কাছে থেকে শেখা পদ্ধতি দ্বারা তাদের যদি হারাই, রণক্ষেত্রে বিজয়লাভের জন্য আমরা যদি আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি তো সভ্যতার ঐতিহ্যেরই অবমাননা হবে। যুদ্ধের সময় আবেগ উত্তেজিত হয়, কল্পনা বিকারগ্রস্ত হয়, আমরা প্রলাপ বকতে থাকি, এই মানসিক অবস্থায় কোন রকম সুযৌক্তিক বন্দোবস্ত সম্ভব নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির রণক্ষেত্রে বিজয় হলেও ভার্সাই প্রাসাদে তাঁরা হেরে গিয়েছিলেন। ভার্সাই সন্ধির কথাবার্তার সময় লয়েড জর্জ ক্লেমেঁসোর কাছে একটা স্মারকলিপি দেন। এই লিপি তাঁর লেখা The Truth about the Peace Treaties নামক পুস্তকে ছাপা আছে। তাতে এই কথা বলা হয়েছে, "জার্মানীর উপনিবেশ সকল হরণ করা যায়, তার শস্ত্রসম্ভারকে কমিয়ে পুলিসী কর্তব্যের জন্য যেটুকু দরকার তাতে সীমাবদ্ধ করা যায়, তার নৌবাহিনীকে পঞ্চম শ্রেণীর শক্তির উপযুক্ত করে দেওয়া যায়, তা হলেও সে যদি মনে করে যে ১৯১৯ সালের সন্ধিতে তাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, তা হলে তারা তাদের বিজেতাদের উপর শোধ তুলবেই। চার বৎসরের অতুলনীয় হত্যাকাণ্ডে মানুষের অন্তরে যে অতি গভীর ছাপ পড়েছে তা মহাযুদ্ধের ভয়ঙ্কর অস্ত্রলাঞ্ছিত বৎসরগুলির সঙ্গে সঙ্গেই অপগত হবে না। অতএব যে সব গভীর হতাশা থেকে দেশভক্তি, ন্যায়সঙ্গত আচরণ ও সুবিচার লাভের ভাব তাদের মনে নিরন্তর জাগবে, সেগুলি দূর করতে পারলে শান্তিরক্ষা সম্ভব হবে। কিন্তু বিজয়ের মুহূর্তে যদি ন্যায়বিচারের অভাব বা ঔদ্ধত্য দেখা দেয়, তবে তা কখনও লোকে ভুলবেও না, ক্ষমাও করবে না।"[১] পরে যা ঘটেছে তার জন্য ভার্সাই সন্ধি কম দায়ী নয়। তার পরে যে সব কূটনৈতিক কারসাজি চলতে লাগল, তাতে কোন কোন জাতির নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা, কোন কোন জাতির ভয় ও কাপুরুষতা এমন সঙ্কটময় অবস্থার সৃষ্টি করে, যাতে শেষ পর্যন্ত জাতিদের নেতারা উত্তেজিত হয়ে পাগলের মত পৃথিবীকে জ্বালিয়ে দেয়। এই যুদ্ধটা আমরা জিততে পারি, কিন্তু তাতে শান্তিলাভ হবে কি?

আবার কোন বিবাদের যদি বলপূর্বক মীমাংসাই হয়, সেইটাই কি ন্যায্য মীমাংসা? যে পক্ষে লোকবল, ধনবল ও অস্ত্রবল আছে, সেই দলই জিতবে। তাতে এ প্রমাণ হয় না যে তাদের উদ্দেশ্য সাধু, শুধু এই প্রমাণিত হয় যে তাদের সামরিক শক্তি শ্রেষ্ঠ। কোন্ দিক বেশী শক্তিশালী, এইটাই যুদ্ধ দিয়ে নির্ধারিত হতে পারে, আর কোন সমস্যারই মীমাংসা হতে পারে না। যারা পৃথিবীটাকে নিজেদের সুবিধামত বিন্যস্ত করতে চায় তারা স্বাধীনতা-প্রীতি ও নাগরিক কর্তব্য-পালনের ছদ্মবেশ নিয়ে যান্ত্রিক সভ্যতার রীতিনীতি আয়ত্ত করে নিজেদের অন্যায় স্বার্থ সিদ্ধ করে।

আন্তর্জাতিক জীবনে যুদ্ধ যদি চিরস্থায়ী ব্যাপার হয়ে ওঠে, আমাদের যদি সর্বদা তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় এবং নিরন্তর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে থাকতে হয়

---

১ (১৯৩৮) ৪০৫ পৃঃ।

তো সভ্যতাও স্থায়ীভাবেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। মানুষের কোন অভাবই যুদ্ধ দিয়ে মেটে না। অপরপক্ষে যুদ্ধ থেকে মানুষের অবর্ণনীয় শোক ও দুঃখের উৎপত্তি হয়।

জিজ্ঞাসা করা হয়, এর বিকল্প কি? একটা হীন দাসত্ব, যাতে যা কিছু আদর্শস্থানীয় ও সুরুচিপূর্ণ তা নষ্ট হয়ে যাবে আর আধ্যাত্মিক প্রগতি অসম্ভব হবে, এই রকম ভয়ঙ্কর অন্ধকার অমানুষিক জীবনের কথা চিন্তা করলেও মানুষের মন আঁতকে ওঠে। যুদ্ধ খুব ভয়ানক হলেও তার থেকে ভাল। একমাত্র এই উপায়েই আত্মিক ব্যাপারে মানুষের শ্রদ্ধা বজায় রাখা যায়। গ্রীকেরা জেরজেথ-এর দাস হওয়ার থেকে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ঠিকই করেছিল। তৃতীয় জর্জের দাসত্ব করার থেকে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে আমেরিকানরাও ঠিকই করেছিল। ফরাসী বিপ্লবীরাও মনকে স্বাধীন করার জন্য রক্তপাত করে ভালই করেছিল। আমরাও নাৎসীবাদের বিরুদ্ধাচরণ করে ঠিকই করছি। এসব ন্যায়যুদ্ধ।

কিন্তু মুশকিল এই, সংঘর্ষের সময় উভয় পক্ষই প্রত্যেক যুদ্ধকে ন্যায়যুদ্ধ বলে বর্ণনা করে।[১] ন্যায়বিচার কি? যদি তা ন্যায্য বিতরণ হয় তো সম্পত্তি, সুযোগ কাঁচা মাল, প্রতিপত্তি, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব ইত্যাদির অন্যায় বা বিষম বিতরণ সংশোধন করা উচিত। আর যদি জাতির গুরুত্ব অনুপাতে সম্পত্তির অধিকারই ন্যায়বিচার হয় তো গুরুত্বের মাপকাঠি কি? জনবল? শক্তি? সংস্কৃতি? না শাসনদক্ষতা? কোন নির্দিষ্ট বিধি-শৃঙ্খলা আছে কি যার জন্য আমরা লড়াই করছি? বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার আগে আলাপ-আলোচনা, সালিশী ইত্যাদি উপায়ে আশ্রয় নিতে হবে বলে কোন জাতিকে আমরা বাধ্য করতে পারি

---

১ "এখন ঈশ্বর তোমাদের সকলকে রক্ষা করুন এবং ঈশ্বর যেন ন্যায়ের পক্ষে থাকেন" নেভিল চেম্বারলেন (৩রা মার্চ, ১৯৩৯) এবং "আমরা ভক্তিভরে আমাদের উদ্দেশ্য ঈশ্বরে নিবেদন করি" রাজা ষষ্ঠ জর্জ (৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯)

"ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকুন" (বিরোধী শ্রমিক দলের নেতা গ্রীনউড)। "ঐশ্বরিক শক্তিতে দৃঢ় নির্ভরতা রেখে " (বিরোধী উদারনৈতিক দলের স্যার আর্চিবাল্ড সিনক্রেয়ার)

"আমাদের শুধু এই কামনা যে সর্বশক্তিমান ভগবান যেমন আমাদের অস্ত্রসম্ভারকে আশীর্বাদ করেছেন, তেমনি অন্যদের একটু বুদ্ধি দিন...।" হিটলার (ডানৎসিগ বক্তৃতা)

"আমাদের যুদ্ধে সর্ব্বশক্তিমানের আশীর্বাদ রয়েছে।" প্রেসিডেন্ট মস্‌চিকি (Moscicki)

"যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি তাতে ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন।" ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ ও অন্যান্য ইংরাজ ধর্মগুরুরা।

"ভাবতে গেলে ঈশ্বরের দলে যুদ্ধ করার জন্য নির্বাচিত হওয়া একটা বড় সম্মান।" —ক্যানন সি মর্গান স্মিথ।

"আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি আমাদের বিজয় ত্বরান্বিত করেছেন...আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দিই বহু শতাব্দীর অধিকার তাঁর করুণায় বিনষ্ট হল .."—পোল্যান্ড জয়ের পর জার্মানীর স্পিরিচুয়াল কাউন্সিলের উৎসাহী "বিরোধী" পক্ষের ঘোষণা।

"আমি নিশ্চিত জানি যে আজ যদি খ্রীষ্ট আবির্ভূত হতেন তো তিনি এই যুদ্ধ সমর্থন করতেন।" জজ রিচার্ডসন (নিউ ক্যাসলের বিবেক সংক্রান্ত আপত্তিকারীদের বিচারকদের সভাপতি)

কি ? ন্যায়যুদ্ধ অনাক্রমণাত্মক ও মুক্তিদায়ক। এদের লক্ষ্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও দাসত্বশৃঙ্খল পরানোর চেষ্টাকে প্রতিহত করা। অন্যায় যুদ্ধ হল আক্রমণাত্মক যুদ্ধ ও এর উদ্দেশ্য হল অন্য দেশ অধিকার করা ও অন্য দেশবাসীকে দাস করা। কিন্তু এ দুটোর পার্থক্য কি সব সময় স্পষ্ট বোঝা যায় ? বড়ই জটিল আর আমাদের সে সম্বন্ধে জ্ঞানের উৎস শাসকরা বিষাক্ত করে দেয়, কাজেই কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায় তা বিচার করা কঠিন হয়ে ওঠে। ন্যায় ও অন্যায় এমন সুস্পষ্টভাবে ভাগ করা থাকে না যে এক পক্ষে এদের একটি থাকে আর এক পক্ষে শুধু অন্যটিই থাকে। আসলে কোনটি বেশী ন্যায় আর কোনটি কম ন্যায় এই প্রশ্নই উঠতে পারে। আক্রমণকারী ও আক্রান্তের মধ্যে আসল তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের শত্রুরা রাক্ষস, জীবন্ত শিশু ধরে ধরে খায় এরকম ভাববার কোন কারণ নেই। হয়ত আক্রান্তেরা যে জিনিস রক্ষা করার চেষ্টা করছে, তা আগে তারা অন্যায় ভাবেই গ্রাস করেছিল। হয়ত তারা যা আছে তাই বজায় রাখার চেষ্টা করছে, নূতন ন্যায়নিষ্ঠ সমাজের পত্তনের চেষ্টা করছে না। দখলীকারের স্বত্বের কোন মানে হয় না যদি সমাজে আইন না থাকে, আর অরাজক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কেউই আইনের ধার ধারে না। আমাদের মনে হচ্ছে যদি জার্মান বা জাপানীদের দমন করতে পারি তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এতটা আশাবাদী বা নিশ্চিন্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। গত বিশ্বযুদ্ধের শেষে জার্মানরা দুর্বল ও অবনত হয়েছিল ; বিশ্বযুদ্ধের জন্য সমগ্র অপরাধ স্বীকার করতে জার্মানীকে বাধ্য করা হয়েছিল। জার্মান নৌবাহিনীকে সমুদ্রের তলায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার সৈন্যবাহিনী পুলিসী কাজের উপযুক্ত করে সংখ্যায় এক লক্ষে পর্যবসিত করা হয়েছিল। জার্মানীকে নিরস্ত্র করার সময় পৃথিবীকে সমগ্রভাবে নিরস্ত্রীকরণ করা হবে এরকম আভাস দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরে দেখা গেল ইউরোপের কোন বড় জাতিরই নিরস্ত্রীকরণের কোন বাসনা নেই। ক্ষতিপূরণের জন্য অর্থের এমন একটা বিরাট অঙ্ক ঠিক করা হল যে যারা যুদ্ধ করেছে শুধু তারাই নয় তাদের পুত্র-পৌত্র পর্যন্ত দাসত্ব করতে বাধ্য হবে। স্যার এরিক জেড্ডেসের ভাষায় "জার্মানীকে আমরা এমন ভাবে নিঙড়েছি যে তার ভেতরের বীজগুলিতে ঘষড়ানি লেগেছে।" জার্মানীর চতুর্দিকে ছোট ছোট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে সার (Saar) স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, রাইন দখল করা হয় ও রুঢ় অঞ্চল আক্রমণ করা হয়। এসব শুধু গায়ের জোরের যুক্তিতেই করা হয়। এরকম অবস্থায় যে কোন অভিমানী জাতিই হতাশার গভীরতম কূপে ডুবে যেত এবং তাদের কাছে হিটলার ও নাৎসীদের বিধ্বংসী চঞ্চলতাও গ্রহণীয় মনে হত। "কারণ বর্তমান অবস্থা থেকে যে কোন পরিবর্তনই ভাল।" জাপানের কথাই ধরা যাক, সেখানে প্রতি বর্গমাইলে ৪৬৫ জন লোক, আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৪১ জন। জাপানের জনসংখ্যা প্রতি বৎসর দশ লক্ষ করে বাড়ছে। জীবনমানের ক্রমাবনতি ও শেষ পর্যন্ত অনাহার এই তার ভবিষ্যৎ। কাজেই জাপান আতঙ্কিত, তার কাঁচা মাল চাই নইলে সে মরবে। সে দেখলে রাশিয়া উত্তর ও পশ্চিম দিকে চীনের উপর চড়াও হচ্ছে, চীনের দক্ষিণে ফ্রান্সের এক বিরাট সাম্রাজ্য বিস্তৃত এবং ইয়াংসি উপত্যকার অনেকাংশে

ব্রিটেনের প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত ; জাপানীরা বর্বর রাক্ষস নয়, তারাও সাধারণ লোক, তাদের আশঙ্কা যে তারা যা করছে, তা না করলে তাদের মৃত্যু অবধারিত। জার্মানরা যে ইহুদীদের উপর অত্যাচার করেছে তার জন্য আমরা তাদের উপর বিরক্ত, কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও জাপানীদের প্রবেশের কোন ব্যবস্থা নেই। সেখানে Exclusion Act (বহিষ্করণ আইন) আছে, এর জন্য কোটি কোটি লোকের অন্তরে বিক্ষোভ। নাৎসীরা জাতিবৈষম্যের যে নীতি গ্রহণ করেছে তার পদ্ধতি তারা কোন কোন মিত্রশক্তির কাছেই শিখেছে। লয়েড জর্জ আমাদের অনুরোধ করেছেন যে, ভার্সাই চুক্তি-বিধায়কদের বিচার করার সময় যেন আমরা পরে কোন্ কোন্ জাতি এই চুক্তির ক্ষমতা বা শর্তগুলির অপব্যবহার করেছে তা দিয়ে না করি। "যারা সাময়িকভাবে আইনসঙ্গত অধিকারের অপব্যবহার করে নিজেদের সম্মানজনক কর্তব্যগুলি অবহেলা করে, তারা আইনের ধারাগুলির যে প্রতারণামূলক ব্যাখ্যা করে তা দিয়ে কোন আইনের দোষগুণ বিচার করা যায় না। চুক্তিগুলিকে দোষ দিলে চলবে না। যারা নিজেদের স্বল্পস্থায়ী প্রাধান্যের সুযোগ নিয়ে নিজেদের প্রতিজ্ঞা ও চুক্তি অগ্রাহ্য করে, যারা এখন নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে অসমর্থ তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করছে না, দোষ তাদেরই"।[১] যখন জার্মানরা উইলসনের চৌদ্দ দফার কিস্তিতে অস্ত্রবিরতিতে সম্মত হল তখন বিজয়ী শক্তিরা তাদের প্রতি কি রকম ব্যবহার করেছিল লয়েড জর্জ তার বর্ণনা দিয়েছেন। "জার্মানরা আমাদের অস্ত্রবিরতির শর্তগুলি মেনে নিলে, সে শর্তগুলি যথেষ্ট কঠোর হওয়া সত্ত্বেও তারা তার বেশীর ভাগ শর্তই পূরণ করলে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এক টন খাদ্যদ্রব্যও জার্মানীতে যায় নি। তাদের মাছ ধরতে পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। মিত্রশক্তি অবশ্য এখন প্রধান, কিন্তু এই অনাহারের স্মৃতিই একদিন তাদের বিরুদ্ধে যাবে। জার্মানরা অনাহারে রয়েছে, অথচ রটারডামে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য জলপথে জার্মানীতে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে। মিত্রশক্তিরা ভবিষ্যতের জন্য ঘৃণার বীজ বপন করছে, তারা কষ্টের স্তূপ নির্মাণ করছে, জার্মানীর জন্য নয় নিজেদের জন্যেই।[২] যতদিন পর্যন্ত বর্তমান মনোভাব থাকবে ততদিন রণরঙ্গমঞ্চে একই নাটকের অভিনয় চলবে, কেবল অভিনেতৃবর্গের পরিবর্তন হবে।"

কিন্তু ন্যায় আমাদের পক্ষে, একথা জেনেও কি সব সময় যুদ্ধ করা চলে ? যুদ্ধের একমাত্র শিষ্ট কারণ হতে পারে অবিচার-নিবারণ। এর জন্য যুদ্ধকে মন্দের ভাল বলে ধরতে পারি। কিন্তু জয়ের যদি কোন সম্ভাবনাই না থাকে, তবে সামরিক

১ Truth about the Peace Treaties (1938) পৃঃ ৬।

২ ঐ ২৯৪-৯৫ পৃঃ। সন্ধির শর্তগুলি উপস্থাপিত করা হলে জার্মান প্রতিনিধি দলের নেতা কাউন্টফন ব্রকডর্ফ রান্‌ৎসাউ বলেন "যুদ্ধের অপরাধ হয়ত ক্ষমা করা যায় না, তবুও তারা যখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখন জাতিদের বিবেক জয়লাভের প্রচেষ্টায় জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আবেগের উত্তেজনায় ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিজয়লাভের পর ১১ই নভেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত যে সব লক্ষ লক্ষ লোককে ঠাণ্ডা মাথায় অনাহারে বিনষ্ট করা হচ্ছে খাদ্য সংগ্রহের পথ বন্ধ করে, তাদের কথা ভেবে অপরাধ ও প্রায়শ্চিত্তের কথা যেন বলা হয়। (৬৭৯ পৃঃ)

প্রতিরোধে অকল্যাণ বাড়বে বই কমবে না। কাজেই শক্তির উপর শ্রদ্ধা না রেখে আমাদের উদ্দেশ্যের পিছনে যে শক্তি আছে তার উপরই ভরসা রাখা ভালো।

যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ জিনিস আছে, তা হল দেহস্থিত আত্মার বিনাশ। নাৎসী জগতে হয়ত পূর্বেকার সমস্ত একতার চেয়ে এখন বেশী একতা বিরাজ করে, কিন্তু সে একতা আত্মাহীন একতা, যেমনটা কীটপতঙ্গের জগতে দেখা যায়। জ্ঞান ও প্রেম, বুদ্ধি ও ব্যক্তিগত দায়িত্বের স্বাধীন ব্যবহার প্রভৃতি মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলি সেখানে অনাদৃত, যূথবদ্ধ পশুর অন্ধ সামাজিকতা, কুসংস্কার এবং জাতিবাদ সেখানে আদৃত। তাদের সমস্ত প্রকার দুর্বলতা সত্ত্বেও, মিত্রশক্তিরা মানুষের সন্তোষ ও স্বাধীনতা, সামাজিক শান্তি এবং পৃথিবীর অভাবগ্রস্তদের প্রতি ন্যায়বিচারের দিকে দৃষ্টি দেন। কিন্তু পৃথিবীবাসী কোটি কোটি লোকেব বিশ্বাস যে উভয় পক্ষই প্রাচীন ঐতিহ্যে পরিচালিত এবং এরা উভয়েই অবদমিত লোকেদের ন্যায়বিচার এড়িয়ে যাবে। তারা নিজেদের সম্পত্তি বক্ষার জন্যই যুদ্ধ করছে এবং নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই যুদ্ধের বিভীষিকা বরণ করে নিচ্ছে।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে আমাদের সমগ্র ধাবণারই পরিবর্তন প্রয়োজন। মানব-সমাজে শক্তি ও ক্ষমতাই চরম সত্য নয়। একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডবাসী এক সাধারণ সরকাব শাসিত লোকেদের দল বা সমষ্টির নামই বাষ্ট্র। এক রাষ্ট্র আর এক বাষ্ট্রেব চেযে শক্তিশালী এ কথা যখন বলা হয়, তখন এই কথাই বোঝায় যে কতকগুলি সুবিধা, যেমন জনবল, বিশেষ অবস্থান, আয়ত্তাধীন কাঁচা মাল, অথবা কৃষি ও শিল্পেব উন্নত কৌশল বা উন্নত প্রকাবের অস্ত্র-সম্ভারের জন্য এক দেশের অধিবাসীরা আব এক দেশের অধিবাসীদের জোব করে তারা যা চায় তাই করিযে নিতে পাবে। প্রাচীনকালে অধিকতর দৈহিক শক্তির অধিকারীবা দুর্বল লোকেদেব উপর আধিপত্য কবত, এখন শক্তিশালী বাষ্ট্রগুলি দুর্বল রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য করে। তত্ত্বেব দিক দিয়ে দেখতে গেলে, স্বামী যে স্ত্রীকে ধরে মারে, ডাকাতরা বাস্তার মোড়ে লোককে থামিয়ে তার কাছ থেকে টাকার থলি ছিনিয়ে নেয়, অথবা মালিকরা যে কৌশলে ধর্মঘট ভেঙে দেন, তার সঙ্গে এর তফাৎ কি? শক্তির উপর শ্রদ্ধাই একটা দুষ্ট রোগের মত জগৎকে মুচড়ে মুচড়ে যন্ত্রণা দিচ্ছে। আমাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট করছে।[১] যে জগতে যুদ্ধের অকথ্য পৈশাচিকতা সম্ভব সে জগৎ রক্ষা করার যোগ্য নয়। যে সামাজিক ব্যবস্থা, যে দুঃস্বপ্নের পৃথিবী লাউডস্পীকার, আলোকধারা ও পৌনঃপুনিক যুদ্ধের দ্বারা রক্ষিত তাকে বর্জন করতেই হবে। যুদ্ধ থেকে একটা দুষ্টচক্রের সৃষ্টি হয়। প্রতিশোধ-স্পৃহাজাত চাপানো সন্ধি, তার জন্য বিজিতের ক্ষোভ ও প্রতিহিংসা-স্পৃহা, তা থেকে আবার

১ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দেব ১৯শে ফেব্রুযাবী বিভাবসাইড গির্জাতে Dr Harry Emerson Fosdick বলেছেন, "এ বিষযে আমাদেব সঙ্গে কুকুবদের কত সাদৃশ্য! একটা কুকুব ডেকে ওঠে, অন্যাগুলোও সঙ্গে সঙ্গে উত্তব দেয, তাতে প্রথমটা আবো জোবে ডাকে, অপবেবাও তার সঙ্গে পাল্লা দেয়, ফলে একটা বিবোধেব আবহাওয়া গড়ে ওঠে। একজন তার কুকুরের সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে গিযে অপব কুকুবেব মালিককে বলে 'হাজাব হোক, কুকুর তো মানুষেরই মত।"

যুদ্ধ। আমাদের সকলের মধ্যেই কিছু পরিমাণ বিনয়ের প্রয়োজন। একটা নূতন কৌশল, বৈপ্লবিক কৌশলের দরকার। কাপুলেট ও মণ্টেগুদের পরিবারগত দ্বন্দ্বে নিহত মার্কুসিও মৃত্যুকালীন অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে বলে উঠেছিল, "তোমাদের দুই দলই নিপাত যাক।" সেই তিক্ত গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছিল তখন যখন প্রেম ঘৃণার দুষ্টচক্রকে ছিন্ন করেছিল। নাটকের শেষ অংশে কাপুলেট বলেছেন, "মণ্টেগু ভাই, হাতে হাত দাও।"

আদর্শ সমাজ

যে আদর্শের জন্য আমরা সাধনা করব তা বর্তমানের ব্যবস্থা থেকে উন্নত হবে অথচ মানব জীবনে বাস্তব অবস্থা থেকে সেটা পাওয়া খুব কষ্টসাধ্য হবে না। পৃথিবীকে হঠাৎ মৈত্রীর বিধান মানতে শেখানো যাবে না। আমরা বলছি যে আমাদের শত্রুরা প্রাধান্য স্থাপনের জন্য যুদ্ধ করছে আর আমরা জগৎকে মুক্ত করে নূতন যুগের প্রতিষ্ঠা করতে যুদ্ধ করছি। আমরা শুধু যে জগৎকে নাৎসীবাদের নিগড় থেকে মুক্ত করতে চাই তাই নয়, সেখানে এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে চাই যে ভিন্ন ভিন্ন লোক তাদের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে এবং জগতের ভাণ্ডারে নিজস্ব অবদান রাখতে পারে। গত বহু শতাব্দী ধরে যে চিন্তাভ্যাস ও শোষণপদ্ধতি অনুসরণ করে আসছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তারই মরণযন্ত্রণা প্রকাশ করে। হিটলার যুদ্ধের কারণ নয়, সে লক্ষণ ও কর্মফল। তার প্রাদুর্ভাব আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল। তার পুনরাবৃত্তি রোধ করতে হলে আমাদের পণ করতে হবে যে জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সকল লোককে কাজ করে বাঁচার মত অর্থ উপার্জনের মৌলিক সুবিধা দিতে হবে, যাতে করে শিক্ষা, সম্পত্তি, যোগ্য আশ্রয় এবং নাগরিক স্বাধীনতা সকলের সহজলভ্য হয়। যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য কোন দেশের লোক খেতে পায় না, আর অন্য দেশে লোকে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করতে বাধ্য হয়,[১] একদিকে অবিশ্বাস্য বিলাস আর একদিকে অসহ্য দুর্গতি, তা অবশ্যই দূর করতে হবে। বৈষম্যজনিত অনিশ্চয়তা থেকে আধিপত্য করার স্পৃহা আসে। দুর্বলের উপর জুলুম করার মত সবল লোক যদি না থাকে তো ভয় দেখিয়ে বাধ্য করার প্রশ্ন থাকবে না।

ধর্মীয় মানসিক, আর্থিক বা আনুষ্ঠানিক যে প্রকারেরই হোক লোকে যদি শাসকদের উপর চাপ না দেয় তো তারা যুদ্ধ থেকে বিরত হবে না। সঙ্কটের সময় বেসরকারী সংস্থার লোকেরা সরকারের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে পারে না, কেন

---

১ স্যার জন অর বলেন, 'যুক্তরাজ্য ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এক তৃতীয়াংশ লোক স্বাস্থ্য বজায় রাখার মত যথেষ্ট খাদ্য খেতে পায় না। অন্য দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য বা আশ্রয় নেই এরকম লোকের সংখ্যা আরও বেশী। ব্রিটেন যে সব দেশের কল্যাণের ভার গ্রহণ করেছে, সে-সব দেশের অধিবাসীদের অল্পসংখ্যক লোকই ভদ্রভাবে বাস করতে পারার মত গৃহ এবং স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য পায়।"—Fighting for what? 1942.

না সেটা হবে রাষ্ট্রদ্রোহ। কাজেই আমাদের এমন সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে যার মধ্য দিয়ে সদিচ্ছা ও শক্তির অভ্যাস বিকশিত হবে।

যারা যুদ্ধের আশ্রয় নেয়, তারা অপরাধী নয়, তাদের সত্যকার অভিযোগ আছে। তারা আমাদের অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের নিজস্ব হিংস্র অবিচার দ্বারা প্রতিবাদ জানায়। তাদের উপর রাগ না করে তাদের অপরাধের কারণ আবিষ্কার করা ও তা দূর করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। এ কথা মেনে নিতেই হবে যে বর্তমান জগতে কিছু গভীর অন্যায় রয়েছে। ব্যক্তিগত ও জাতিগত সুবিচারের উদ্দেশ্য নিয়ে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য আমাদের শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

জোর করে কিছু চাপানোর চেষ্টা না করে যদি অভ্যাস, আলোচনা ও যুক্তি প্রদর্শন করে আইন, স্বাধীনতা ও শান্তির একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি তবেই রাষ্ট্রের অবলুপ্তির একটা অর্থ পাওয়া যাবে। খুনে বা ডাকাতের বে-আইনী হিংসার বিরুদ্ধে যেমন আইনসঙ্গত বলপ্রয়োগ এখনকার সকল সমাজেই হয়, শান্তিপূর্ণ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর যে অকারণ আক্রমণ করবে তার প্রতিরোধের জন্যও সেইরকম ব্যবস্থা চাই। লাঠি চালানো বা গুলি করা সুখের নয়, কিন্তু দল বেঁধে গুণ্ডামি করা ও আগুন লাগানোর চেয়ে ভালো। আদর্শ হিসেবে আমরা অরাজকতা দমনের জন্য এই মাত্রায় বলপ্রয়োগেরও বিরোধী, কারণ বলপ্রয়োগ ব্যাপারটিই দুঃখের কিন্তু দুঃখের হলেও তা অপ্রয়োজনীয়। কারণ যদি আমরা ইচ্ছামত আক্রমণকে বিনা বাধায় ধ্বংসকার্য চালাতে দিই তো সমগ্রভাবে অকল্যাণের পরিমাণ বেড়ে যাবে। গায়ের জোরের বেআইনী প্রয়োগ কার্যকরী ভাবে বন্ধ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগও ঠিক নয়। আবার বলপ্রয়োগও যথেষ্ট হওয়া চাই, নয়ত বেআইনী শক্তিই জিতে যাবে। একসময় জাতীয় জীবন ব্যক্তিগত বিরোধজনিত অরাজকতায় পূর্ণ ছিল, এখন আন্তর্জাতিক জীবনে তাই ঘটছে। জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা শিক্ষা ও আইনসঙ্গত বলপ্রয়োগের ভিত্তিতেই সম্ভব হয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যাপারেও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত করতে হবে। ত্রুটিপূর্ণ সমাজে আইনকে বলবৎ করার জন্য শক্তি আছে বলেই অধিক সংখ্যক ভালো লোক সামান্য কয়েকজন মন্দ লোকের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে পারে। নিরস্ত্র আদর্শবাদের কাছে মন্দ পরাভূত হয় না। পাস্কাল (**Pascal**) বলেছিলেন যে বিচারের পিছনে বলের সমর্থন না থাকলে বিচার শক্তিহীন।[১] যতদিন পর্যন্ত সুবিচার অগ্রাহ্য করার মত মানুষ থাকবে ততদিন বিচারের পিছনে শক্তি চাই। জাহাজের মত, বায়ুর ও আবহাওয়ার গতি বুঝে তার সঙ্গে খানিকটা আপস করে চললে আমরা নিরাপদ পোতাশ্রয়ে পৌঁছতে পারব। আন্তর্জাতিক প্রশাসন দ্বারা প্রযুক্ত শক্তি বলের নগ্ন প্রকাশ নয়। সমাজ-ব্যবস্থার সৃজনীশক্তি মুক্ত করার জন্যই বলের ব্যবহার। প্রত্যেক

---

১ "বিচারকের পিছনে শক্তি না থাকলে, তিনি অক্ষম আর শক্তির পিছনে ন্যায়বিচার না থাকলে তা হয় স্বেচ্ছাচার। বলহীন বিচারের কোন দাম নেই, কেননা তার অপব্যবহার করার লোক সব সময়েই থাকবে। ন্যায়বিচার-হীন শক্তিকে যে নিন্দিত করা হয়, তাহা ঠিকই করা হয়। ন্যায় ও শক্তি একসঙ্গে চলা চাই, যাতে যা ন্যায্য তা শক্তিপূর্ণ হয় আর যা শক্তিপূর্ণ তা ন্যায্য হয়।"—চিন্তাধারা।

সামাজিক ক্রিয়া থেকেই তার নৈতিক সমর্থন উদ্ভূত। শক্তির রাজত্বে যে অরাজকতা বিবাদ করে এবং যে অবস্থায় জাতিকে বহু অস্ত্র সজ্জিত হয়ে থাকতে হয়, তা বদলাতেই হবে। আন্তর্জাতিক নৈরাজ্য থেকেই দাসসাম্রাজ্য ও হিটলারের উদ্ভব। আইন, সহযোগিতা ও শান্তির ভিত্তিতে গঠিত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংস্থা এর স্থানে বসাতে হবে। আমাদের বিচারকের শক্তিবৃদ্ধি করতে হবে, মামলাকারীর নয়। শান্তিপূর্ণ সহযোগিতাব্যঞ্জক আন্তর্জাতিক সংস্থাই যদি আমাদের কাম্য হয়, তাহলে সাম্রাজ্যেব অধিকারী শক্তিরা নিজেদের যে সকল আর্থিক সুযোগ সুবিধা আগের আমলে গায়ের জোরে দখল করেছিল তা তাদের ছাড়তে হবে।

এবকম কথা উঠেছে যে কোন কোন ভৌগোলিক অঞ্চলে সেখানকার রাষ্ট্রসমূহ মিলে যদি সীমিত রাষ্ট্রসম্মেলন গড়ে তোলে তো যুদ্ধ হবার সম্ভাবনা কমে যাবে। কিন্ত এতে সমস্যার সমাধান হবে না এই কাবণে যে বাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ভূগোল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ জাগতিক সম্বন্ধ এবং জাগতিক প্রতিষ্ঠান বা সবকার ছাড়া তার কাজ চলতে পারে না। লীগ অব নেশনস্ বা জাতিপুঞ্জ বল ও ক্ষমতা থেকে সম্মতি ও সহযোগিতাব্যঞ্জক আইনের দিকে নিয়ে যাবাব আংশিক প্রচেষ্টা। আন্তর্জাতিক ব্যাপারগুলি আলোচনা, আপস ও আইন ইত্যাদি অহিংস প্রণালীর মারফৎ মীমাংসা করার চেষ্টা এর মধ্যে হতে পারে। কিন্তু মাঞ্চুরিয়া, ইথিওপিয়া, স্পেন, আলবেনিয়া, অস্ট্রিয়াতে লীগচুক্তি ভেঙে পড়ল। মিউনিকের ঘটনার তো কথাই নেই। লীগের কাউন্সিল ও সংসদ গোড়া থেকেই এমন কিছু করতে চাইলেন না যাতে কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অবমানিত হয়। বার্নার্ড শ'র নাটঝ জেনেভার (Geneva) চরিত্র হেগের আন্তর্জাতিক আদালতের প্রধান বিচারক যে কঠোর মন্তব্য করেছেন তা যুক্তিহীন নয়।[১] মিঃ নেভিল চেম্বারলেন তাঁর রেডিও বক্তৃতাতে বলেছেন, "একটি ছোট জাতি যখন বৃহত্তর, অধিকতর শক্তিশালী প্রতিবেশীর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যায়, তখন ক্ষুদ্র জাতিটির প্রতি আমাদের যতই সহানুভূতি থাক, তার জন্য আমরা সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে দিতে পারি না। যুদ্ধ যদি করতেই হয় তো এর চেয়ে ব্যাপকতর প্রশ্নের জন্য করাই ভাল।" "আমি যদি নিশ্চিত বিশ্বাস করতুম যে কোন শক্তি তার শক্তির ভয় দেখিয়ে সারা পৃথিবীতে আধিপত্য করতে

---

১ স্যার অর্ফিউস মিডল্যান্ডাবঃ কিন্তু শক্তিবর্গ যখন লীগে যোগ দেন তখন এরকম একটা পদ্ধতির কথা নিশ্চয়ই স্থির ছিল না?

প্রধান বিচাবকঃ আমার মতে শক্তিবর্গ যখন লীগে যোগ দেন তখন কিছু না ভেবেই দেন। তাঁবা প্রেসিডেন্ট উইলসনকে খুশী করার জন্য চুক্তিপত্র না পড়েই সই করে দিলেন। আর যুক্তবাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট উইলসনকে অগ্রাহ্য কবার জন্য চুক্তিপত্র না পড়েই তাতে স্বাক্ষব দিতে বিবত হন। তাব পব থেকে শক্তিপুঞ্জ লীগ না থাকলে যা হত ঠিক সেই-বকম ব্যবহারই কবে বলেছেন, যখন নিজেদেব স্বার্থের প্রয়োজনে দরকার তখনই লীগের কথা ভাবছেন।

স্যাব অর্ফিউসঃ তা ছাড়া আব কিভাবে তাঁবা লীগের ব্যবহার কববেন?

প্রধান জজঃ জাতিদেব মধ্যে ন্যায়বিচাব ও শৃঙ্খলা বজায় বাখাব জন্য ব্যবহাব কবতে পাবতেন। পৃঃ ৪০।

চাইছে তা হলে অবশ্যই তার বিরোধিতা করতুম"।[১] এসব কথা কিন্তু জাতিপুঞ্জ সৃষ্টিকালে নিষ্পন্ন চুক্তিসম্মত নয়। এ বরং আগের আমলের শক্তিসমূহের ভারসাম্য বজায় রাখার নীতি। বেলজিয়াম বা চেকোশ্লোভাকিয়াকে বাঁচাবার জন্য ব্রিটেন যুদ্ধ করতে যাবে না। কোন প্রতিবেশী যদি বেশী ক্ষমতাদৃপ্ত হয়ে ওঠে তবে অবশ্য যুদ্ধ করে তার শক্তিহানি করতেই হবে, তা সে হিটলারই হোক, কাইজারই হোক বা নেপোলিয়নই হোক। আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের চেয়ে জাতীয় স্বার্থপ্রণোদিত উদ্দেশ্যই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। হেরল্ড নিকলসন বলেছেন, "শক্তিসাম্য", "ক্ষুদ্রশক্তির রক্ষা" ইত্যাদি যে নামেই অভিহিত করা হোক, আসলে ব্রিটেন সুস্থ ও সহজ জৈব প্রবৃত্তি অর্থাৎ আত্মরক্ষারূপ সহজ প্রবৃত্তিবশেই যুদ্ধ করছে। লীগ নিষ্ফল হল, কারণ লীগে যারা যোগ দিয়েছিল তারা গায়ের জোরে যে অধিকার পেয়েছিল, তা ছাড়তে রাজী হল না। লীগকে অন্যায় ব্যবস্থা বজায় রাখার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল এবং আগেকার ক্ষমতার রাজনীতিকে একটা সম্ভ্রান্ত রূপ দেবার চেষ্টা চলছিল। ব্যক্তির নিঃস্বার্থ ব্যবহারের চেয়ে জাতীয় নিঃস্বার্থ ব্যবহার দুর্লভ। তা ছাড়া লীগের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। লীগ যেন ফাঁকা আওয়াজ করার বন্দুক। লীগকে কার্যকরী করতে হলে তার স্থায়ী কর্তৃত্ব চাই। একদিকে লীগকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করার জন্য আইন-কানুন প্রস্তুত করতে হবে আর একদিকে সেই সব আইনকানুন অনুযায়ী তাদের পারস্পরিক বিবাদের মীমাংসা করতে হবে। লীগকে রাষ্ট্রসমূহের বর্তমান সম্পর্ককে আমূল পরিবর্তন করার ক্ষমতা দিতে হবে। যে কোন জাতিপুঞ্জের বিধানসভা, বিচারালয় ও শাসকমণ্ডলী থাকা চাই। কারণ কোন জাতিই তার নিজের বিচারক হতে পারে না, নিজের অন্যায়ের শাস্তিও নিজে দিতে পারে না। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তিগত অন্যায় আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য স্বার্থহীন সরকারী শক্তি সমর্থিত আইনসঙ্গত সুবিচারের ব্যবস্থা আছে, সেই রকম আন্তর্রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও এক আন্তর্জাতিক পুলিসবাহিনী প্রয়োজন। কোন রাষ্ট্র যদি রাষ্ট্রপুঞ্জের আইন অমান্য করে বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেয়, তবে বাকি রাষ্ট্রগুলো গায়ের জোরেই তাকে কৃতকর্মের কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য করবে। বর্তমান অবস্থায় লীগ যুদ্ধ করে যুদ্ধ নিবারণ করার চেষ্টা করছে, এরকম অভিযোগ করা যুক্তিযুক্ত নয়। কথাটা ঠিক হলেও বর্তমান যুগে একেবারে বলপ্রয়োগ বর্জন করা যাবে না। মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাল ও মন্দের মধ্যে নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে না, মন্দ আর মন্দতরের মধ্যে নির্বাচন করার প্রশ্ন উঠতে পারে। জাগতিক সম্মেলনের (World Commonwealth) আইন সমর্থিত শক্তিপ্রয়োগের চেয়ে রাষ্ট্রসমূহের অনিয়মিত শক্তির ব্যবহার অনেক অনেক খারাপ। আমরা আইনের রাজত্ব ও সহযোগিতার প্রণালীমত কাজ করতে পারি না, যদি না শেষ পর্যন্ত যারা হিংসার আশ্রয় নেয় তাদের কাছে জোর করেই আইনের মীমাংসা কার্যকরী করতে পারি। আন্তর্রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য হিন্দু শাস্ত্রে সাম (মৈত্রী), দান (তোষণ),

---

১ ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৯।

ভেদ (বিভেদ সৃষ্টি) ও দণ্ড (সশস্ত্র প্রতিরোধ)-এর ব্যবস্থা দিয়েছেন। আমরা যদি এক পদক্ষেপেই অহিংস হতে চাই তবে ব্যর্থ হব। কিন্তু আমরা যদি ধীর পদক্ষেপে অহিংসার দিকে অগ্রসর হই তবে হয়ত অহিংস হতে পারব।

আর একটা আপত্তি এই যে, আজকের জাতি-রাষ্ট্ররা একজনের বিরুদ্ধে আক্রমণকে সকলের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে স্বীকার করতে চায় না। সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে এমন স্বার্থ-সাম্য নেই যে তারা একযোগে লীগের কাজের সমর্থন করবে। মিত্রশক্তিদের মধ্যে আদর্শগত মিল আছে। তারা যুদ্ধের সময় একটি সংস্থা গঠন করতে পারে, যার কার্যকরী অঙ্গ হবে গণ-নির্বাচিত পার্লামেণ্ট বা কংগ্রেস। তার পর যুদ্ধের পর অন্য দেশও তার সদস্য হতে পারবে। এক নূতন সমাজ জন্মগ্রহণ করার চেষ্টা করছে, আর পুরানো ব্যবস্থা তাতে বাধার সৃষ্টি করছে। যারা অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তারা বিপ্লবের পক্ষে লড়াই করছে। আমরা যদি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে আমাদের লক্ষ্য বলে স্থির করে থাকি তবে তা আয়ত্ত করার উপায়েরও ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। স্থায়ী শান্তিলাভের অন্য কোন পথ নেই।

শ্রেয়োবোধ সংক্রান্ত শিক্ষা

আমাদের সভ্যতা যদি বিনষ্ট হয় তো কি করলে তাকে রক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য সে দুর্ঘটনা হবে না। রোগী মুমূর্ষু হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহারে আপত্তি থেকেই তা ঘটবে। শান্তিপূর্ণ নব সমাজ ও সুবিন্যস্ত স্বাধীনতার তত্ত্ব বোঝার মত মানসিক উদ্যম ও সামাজিক কল্পনাশক্তির অভাব রয়েছে আমাদের। সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার যোগ্য কথাই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই ও পূর্ণতর সমাজ গঠনে সাহায্য করা শিক্ষার উদ্দেশ্য। এ পৃথিবী বর্বরতা ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয় না। যুদ্ধ সুখী ভবিষ্যতের অভিব্যক্তির অপরিহার্য সোপান নয়। অভিব্যক্তিবাদের যেমন ধারণা, আমরা সামাজিক পরিবেশের তেমন অসহায় ক্রীড়নক নই। সামাজিক নিষ্ফলতা ব্যক্তিগত নিষ্ফলতারই প্রতিফলন। লীগ যদি নিষ্ফল হয়ে থাকে তো লীগকে সফল করার ইচ্ছা ছিল না বলেই তা হয়েছে। ব্যক্তি নাগরিকদের মনোভাব ও চিন্তাপ্রণালীকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এগিয়ে যেতে পারে না। রাষ্ট্রনৈতিক বুদ্ধি সামাজিক পরিপক্কতা ব্যতীত পরিপক্ব হতে পারে না। বাইরে থেকে সামাজিক প্রগতি ঘটানো যায় না। মানুষের অন্তরঙ্গ তুরীয় অভিজ্ঞতা দিয়েই তা নির্ধারিত হয়। মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের জন্য, শ্রেয়োবোধ বদলানোর জন্য, শাশ্বতের দাবীর কাছে অন্তরাত্মাকে সমর্পণের জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। আমরা সকলে একই নক্ষত্রপুঞ্জ দেখি, একই আকাশের নীচে স্বপ্ন দেখি, একই গ্রহে সহযাত্রী; এবং চরম সত্যের খোঁজে যদি আমরা বিভিন্ন পথ ধরে চলি তো তাতে কিছু আসে যায় না। সত্তার রহস্য এত গভীর যে তা উদ্ঘাটন শুধু একটি মাত্র পথেই হতে পারে না।

চরখা থেকে অন্তর্দহনযন্ত্র যন্ত্র সবই সামাজিক ব্যবহারের উপায় মাত্র, তাদের কোন নিজস্ব নৈতিক মূল্য নেই। তারা যদি উচ্চতর নৈতিক উদ্দেশ্যের সহায়ক হয় তবেই তারা মূল্যবান হবে। প্রগতির উপায়গুলি নিজেরাই প্রগতির লক্ষ্য নয়। নিত্যের বদলে অনিত্যকে বড় করে দেখা, সারকে বাদ দিয়ে আকস্মিককে প্রাধান্য দেওয়া, স্থায়ীর বদলে অস্থায়ীতে মনোনিবেশ করার যে বিকৃত অভ্যাস তা একমাত্র শক্তিমান শিক্ষাই প্রতিরোধ করতে পারে। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের নব নব আধ্যাত্মিক জন্ম হয়, শিক্ষাই অন্তর-রাজ্যে প্রবেশের পথ। বাহ্য মহিমা অন্তর আলোকেরই প্রতিফলন। শিক্ষা ধরে নেয় যে পরম শ্রেয় কি তা নির্ধারিত হয়েছে এবং তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ আমাদের কর্তব্য। আমাদের এমন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে যা রাষ্ট্রের চেয়ে গভীর ও ব্যাপক। সে সম্প্রদায় কি রকম হবে তা আমাদের আদর্শের উপর নির্ভর করে। আমরা যদি উদারনৈতিক হই তো মানবতাই আমাদের আদর্শ, যদি রক্ষণশীল হই তো জাতিই আমাদের আদর্শ, যদি সমভোগবাদী হই তো পৃথিবীর ভূমিহারা সম্প্রদায় আমাদের আদর্শ, আর যদি নাৎসী হই তো বংশই আমাদের আদর্শ। রাষ্ট্র কখনই চরম লক্ষ্য নয়, এর থেকে ব্যাপক সম্প্রদায় আছে যারা আমাদের গভীরতম আনুগত্য দাবি করে।

চিন্তাশীল লোক ও লেখকদের রাষ্ট্রনৈতিক কর্মের চরম লক্ষ্যের কথা বিবেচনা করতে হবে। তাঁদের মধ্য দিযে সমাজ নিজেকে জানে ও নিজের সমালোচনা করে। সমাজের মূল্যের তাঁরাই অভিভাবক। এই মূল্যই হল সমাজের চরিত্র ও আসল জীবন। তাঁদের কাজ হল সমাজের আসল আত্মা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান দেওয়া যাতে আমরা আধ্যাত্মিক অসাড়তা ও মানসিক ইতরতার হাত থেকে বাঁচতে পারি। পৃথিবীর লোকেদের মধ্যে মৈত্রী ও সৌভ্রাত্রের ভাব বিকশিত করতে তাঁদেরই সাহায্য করা উচিত। অ্যারিস্টটল বলেছেন, মৈত্রী ছাড়া সুবিচার হতে পারে না। প্রখ্যাত চিন্তানায়কেরা সমগ্র মানবগোষ্ঠীর চেয়ে ক্ষুদ্রতর কোন সম্প্রদায়কে নিজেদের প্রেমের পাত্র বলে মানতে রাজী হন না। সমগ্র পৃথিবী তাঁদের কাছে এক পরিবার।

গ্যাটের পক্ষে ফরাসীদের ঘৃণা করা সম্ভব হয় নি। তিনি একেরমানকে লিখেছিলেন, "আমি যুদ্ধ ভালও বাসি না, যুদ্ধ করিও না, কাজেই আমার পক্ষে এরকম গান যেন নড়বড়ে মুখোশ পরার মত। আমার কবিতাতে কোনও ভান করি নি। আমার ঘৃণা না থাকলে ঘৃণার কবিতা লিখব কি করে? আর তোমাকে বলতে বাধা নেই, আমি ফরাসীদের ঘৃণা করি নি, যদিও তাদের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছি। আমার কাছে সভ্যতা ও বর্বরতার পার্থক্য একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। যে জাতি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সভ্য জাতি এবং যার কাছে আমি নিজে অনেক কিছু শিখেছি, তাকে আমি কি করে ঘৃণা করব? মোটের উপর জাতিগত বিরোধ বড় অদ্ভুত বস্ত। সভ্যতার নিম্নতম স্তরে এ জিনিসটা খুব প্রবল ও সক্রিয় ছিল। কিন্ত একটা স্তর আছে যেখানে এ জিনিসটা অদৃশ্য হয়, যেখানে আমরা জাতিদের ঊর্ধ্বে গিয়ে দাঁড়াতে পারি, সেখানে প্রতিবেশী জাতির সুখ-দুঃখ নিজেদের সুখ-দুঃখের মতই অনুভব করতে পারি।" সাধারণ গ্রহণযোগ্য ভাষায় ছদ্মবেশী ঘৃণাই দেশভক্তি নামে পরিচিত এবং একে সাধারণ

লোকের কাছে ডোরাকাটা পোশাকে রৌপ্যপদকে ও সুমিষ্ট সঙ্গীতে উপস্থাপিত করা হয়। বিশ্বপ্রেম চরম আদর্শ, দেশপ্রেম তাতে পৌঁছবার উপায় মাত্র। আমাদের শত্রুরাও মানুষ। আনন্দ ও যন্ত্রণায় তাদের প্রতিক্রিয়া আমাদেরই মত। অন্তরের দিক থেকে আমরা ভ্রাতা-ভগ্নী। আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য ও শক্তি পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং যে পৃথিবী অসহ্যভাবে কোলাহলমুখর ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে, সেই পৃথিবীর পাগলাগারদে আমাদের অস্থির হয়ে উঠতে হবে। এই পৃথিবীকে প্রজ্ঞা দ্বারা চালিত করতে হবেই।

বুদ্ধিজীবীদের রাষ্ট্রনীতিতে ও শাসনকার্যে সক্রিয় অংশ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের প্রাথমিক কর্তব্য চিন্তার সততার দ্বারা সমাজসেবা করা। রাষ্ট্রনৈতিক সম্প্রদায়ের সীমা অতিক্রম করে যে দায়িত্ববোধ ও সামাজিক চেতনা, তার উদ্বোধনই বুদ্ধিজীবীদের কাজ। যারা সমাজকে এইভাবে সেবা করতে পারবে তাদের রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে না আসাই উচিত। প্রত্যেক সমাজেই এমন অল্প-সংখ্যক কয়েকজন লোক আছেন যাঁদের রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করলে নিজেদের প্রতিভাকে বিকৃত করবেন, নিজের প্রতি অবিচার করবেন। যেখানে আছেন সেখান থেকেই নিজেদের প্রতিভাকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁরা সমাজের অজ্ঞতা বিদূরিত করতে সহায়তা করবেন। পৃথিবী থেকে স্বতন্ত্র থাকাই তাঁদের অবদানের শর্ত। তাঁদের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যেরই সেবা করা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রে সামাজিক ও মননাত্মক প্রচেষ্টাকে রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যের অধীন বলে মনে করে। নূতন যুগের রাষ্ট্রনীতি ধর্মের স্থলাভিষিক্ত। সামাজিক মুক্তির ভবিষ্যদ্বাণী তার মন্ত্র। একনায়কতন্ত্রের আধ্যাত্মিক জনক বুদ্ধিজীবীরাই। তাঁরাই যদি সংস্কৃতির মূল্যকে বর্জন করে আধ্যাত্মিক মূল্যের শ্রেষ্ঠতাকে অস্বীকার করেন তো যে রাষ্ট্রীয় নেতারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য দায়ী তাদের দোষ দেওয়া যায় না। জাহাজের কাপ্তেন যদি যাত্রীদের স্বার্থের চেয়ে জাহাজের নিরাপত্তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন তবে আমরা তাকে দোষ দিতে পারি না। রাষ্ট্র একটা উপায় মাত্র, লক্ষ্য নয়। কতিপয় লোক পরম শ্রেয়ের জন্যই জীবনধারণ করেন। তাদের কাছে ইহজীবন ও তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন মূল্য নেই। রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক মূল্য আপেক্ষিক ও গৌণ। এরা লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ মাত্র। তত্ত্বজ্ঞানী আমাদের অদৃশ্যকে দেখতে সাহায্য করেন, ইহলোকেই শাশ্বতকে ব্যক্ত করেন। ইহলোকের মূল্য সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন, শ্রেয়কে আয়ত্ত করাই তাঁদের সাধনা। তাঁরা নিজেরা বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য দেখতে পেয়েছেন আর অন্যদেরও তা দেখান। তাঁরা আমাদের সৌভ্রাত্রবোধের কাছে আবেদন করেন। তাঁদের অন্তরে সাহস আছে, আত্মার শিষ্টতা আছে, নির্ভীকের হাস্য আছে। সোসাইটি অফ ফ্রেন্ডস্-এর টমাস নেলর "তাঁর মহাপ্রয়াণের দু ঘন্টা আগে প্রদত্ত শেষ ইচ্ছায়" বলেছিলেন ঃ

"মনের এমন একটা ভাব আছে, যা আমি অনুভব করি, তা মন্দ করে বা মন্দ কাজের প্রতিশোধ নিয়ে কোন আনন্দ পায় না, বরং চরম উদ্দেশ্যসিদ্ধির আশায় সব কিছু সহ্য করতে আনন্দ পায়। সমস্ত ক্রোধ ও সংঘর্ষকে অতিক্রম করে বেঁচে

থাকা, সমস্ত দম্ভ ও নিষ্ঠুরতা ও যা কিছু নিজের বিপরীত তা ধ্বংস করাই তার আশা। সমস্ত প্রলোভনের শেষ সে দেখতে চায়। নিজের মধ্যে কোন অন্যায় চিন্তা সে পোষণ করে না। অন্যদের চিন্তায়ও অন্যায়ের স্থান আছে বলে সে মনে করে না। সে যদি প্রতারিত হয়, তাহলে তা সহ্য করে।...এই ভাবের জন্মই দুঃখের মধ্যে, কারুর করুণার প্রত্যাশা না করেই তার উৎপত্তি, শোক বা অত্যাচারেও সে নালিশ করে না। কষ্ট পেয়েই তার আনন্দ, কেননা সুখের পৃথিবীতে তার কোন স্থান নেই। আমি সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হবার পর তাকে পেয়েছি। যারা গুহায় ও নির্জন জায়গায় থাকে তাদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করছি।"

গান্ধী

ক্বচিৎ কখনও লোকোত্তর স্তরেব অসাধারণ মহাত্মাব দেখা পাওয়া যায়, যিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে স্পষ্টতর ভাবে প্রতিফলিত করেন ও আরও সাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের নির্দেশ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন। অন্ধকার ও অব্যবস্থিত জগতে তিনি উজ্জ্বল দীপশিখার ন্যায় বিরাজ করেন। আজকের ভারত আগের চেয়ে ভাল, কেননা এখানে ঐশী শিখা বহন করে এক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছে। তার কৃচ্ছ্রতার মধ্যে ভারতের আহত অভিমান মূর্তি নিয়েছে আর ভারতীয় প্রজ্ঞার শাশ্বত ধৈর্য তাঁর সত্যাগ্রহে প্রতিফলিত হচ্ছে। তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল দুর্দমনীয় তেজ, প্রায় অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তি, আর সত্য ও ন্যায়েব প্রতি অতি মানবিক আসক্তি। গান্ধী যে পবিত্রতম আদর্শ আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন তার থেকে উন্নততর এবং অনুপ্রেরণাদায়ক আদর্শ মানুষ এখনও পর্যন্ত পায় নি। তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাব মালিন্য-বিনাশী পূতশিখার ন্যায় অনেক খাদ জ্বালিয়ে দিয়ে খাঁটি সোনা প্রকাশিত করেছে। তাঁর সমস্ত জীবন যা কিছু অনাধ্যাত্মিক তার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম। অনেকে তাঁকে পেশাদার রাষ্ট্রনৈতিক বলে উড়িয়ে দেন ও বলেন যে সঙ্কটের সময় তিনি ভুল করে বসেন। এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে রাষ্ট্রনীতি পেশা বটে এবং ডাক্তার বা উকিলের মত রাষ্টনীতিজ্ঞকেও সাধারণের কাজ নিপুণভাবে চালাবার জন্য শিক্ষা নিতে হয়। অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে রাষ্ট্রনীতি একটা সাধনা এবং রাষ্ট্রনীতিবিদ তাঁর দেশবাসীকে উদ্ধার করার ব্রত সম্বন্ধে সচেতন এবং তাদের একটা সাধারণ আদর্শের প্রতি প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট। এরকম লোক হয়ত সরকারী ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিফল হতে পারেন, কিন্ত তিনি তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে সাধারণ উদ্দেশ্যের প্রতি অজেয় শ্রদ্ধা ও আগ্রহের বীজ বপনে সফল হতে পারেন। ক্রমওয়েল ও লিঙ্কনের মত নেতারা দুয়েরই মিলন ঘটিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একই সঙ্গে সামাজিক আদর্শ মূর্ত হয়েছিল, আবার সাধারণের ব্যাপারকে তাঁরা নিপুণভাবে পরিচালিত করতে পেরেছিলেন। গান্ধী হয়তো শাসন-নৈপুণ্যে যথেষ্ট পারদর্শী নন, কিন্তু দ্বিতীয় অর্থে তিনি সত্যিই রাজনীতিক। সব চেয়ে বড় কথা, তিনি নূতন জগৎ, পূর্ণতর জীবন ও ব্যাপকতর চেতনার মুখপাত্র। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা ধর্মের ভিত্তিতে দারিদ্র্য ও বেকারীমুক্ত যুদ্ধ ও রক্তপাতশূন্য জগৎ

গড়লে পারি। "এই জগতে অতীতকালের থেকে ঈশ্বরে গভীরতর ও মহত্তর ভক্তি বিরাজ করবে।" তিনি বলেন, "ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে পৃথিবীর অস্তিত্বই ধর্মের উপর নির্ভর করে। আগামী কালের সমাজ নিশ্চয়ই অহিংসার ভিত্তিতে গঠিত হবে। এ লক্ষ্যকে এখন দূর বলে, কল্পনার স্বপ্নরাজ্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই লক্ষ্য অনধিগম্য নয়, কারণ এর জন্য এখন থেকেই আমরা চেষ্টা করতে পারি। অন্য কারো দিকে না চেয়ে কোন ব্যক্তি ভাবীকালের জীবন—অহিংস জীবন-যাপন করতে আরম্ভ করতে পারে। আর যা এক ব্যক্তি পারে তা অনেক ব্যক্তির মিলিত গোষ্ঠী কি পারবে না? সমস্ত জাতি কি পারবে না? লক্ষ্য সম্পূর্ণ আয়ত্ত হবে না মনে করে লোকে কাজ আরম্ভ কবতে অনেক সময় ইতস্ততঃ করে। এই রকম মনোভাবই সমস্ত রকম প্রগতির পক্ষে সব চেয়ে বড় বাধা এবং প্রত্যেক লোকই ইচ্ছা থাকলে এ বাধাকে অতিক্রম করতে পারে।"[১] পরিবেশ অতি শক্তিশালী ও আমরা অসহায়—এ রকম মত ত্যাগ করতে হবে।

শাশ্বত কল্যাণ যদি সময় থাকতে আয়ত্ত করতে হয় তো এমন পন্থা অবলম্বন করা উচিত যা স্বতঃই ভাল। সাধনা সংক্ষেপ কবতে গেলে বা জোর করে যা স্বতঃই মন্দ তাব আশ্রয় নিলে সাধনার বিফলতা অনিবার্য। অপরাধীকে জোর কবে সংযত কবা আর তার নীতিবোধের কাছে আবেদন করার মধ্যে শেষোক্ত উপায়টিই বরণীয়। বলা যেতে পাবে যে দৈহিক জুলুম যদি খারাপ হয় তো নৈতিক জুলুমই বা ভাল কিসে? জুলুম জুলুমই, তাব প্রকৃতি হিংস্র। জুলুম প্রেম নয়। একটিও গুলি না কবে বা লাঠি না চালিয়েও জনতাকে তাদেব ইচ্ছা বা ন্যায়বোধের বিপক্ষে কোন বিশেষ প্রকাবের কাজ করতে বাধ্য করানো যায। তবু নৈতিক আবেদনই শ্রেয়তর, কেননা তাতে গ্রহণ বা বর্জনের স্বাধীনতা থাকে।

অহিংসা কাপুরুষতা বা দুর্বলতা ঢাকবার অজুহাত নয়, বরং ক্ষমতার প্রকাশ। যাদের সাহস, সহ্যশক্তি ও বলিদানের মনোভাব আছে তারাই অস্ত্র ব্যবহার না করে নিজেকে সংযত করতে পারে। গায়ের জোর খাটাতে গেলে ফল কি হবে ভেবে অহিংসা নীতি গ্রহণ করা বিপজ্জনক। গান্ধী স্বাধীনতার উর্ধ্বে প্রাণকে স্থান দেন, একথা ভুল। গান্ধী জানেন যে দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করা বা মরা, অর্থাৎ আধিভৌতিক অমঙ্গল সহনীয় ও বরণীয় হয় যদি তদ্বারা মঙ্গলের উৎপত্তি হয়। লোককে ধ্বংস করে লাভ নেই, তাদের আচরণ ধ্বংস করতে হবে। বর্তমান শাসক-গোষ্ঠীকে বিনষ্ট করার পরও যদি বর্তমান ব্যবস্থা বজায় থাকে তো কিছুই লাভ হল না। রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করাই সব থেকে অমঙ্গলজনক নয়। তার থেকেও খারাপ হল সেই সামাজিক ব্যবস্থা যাতে সবল দুর্বলের কাছে গায়ের জোর দেখাতে পারে। হিটলাররা সামাজিক দুষ্টক্ষতের বাহ্যপ্রকাশ মাত্র। এই ক্ষত শুধু ওষুধ দিয়ে বা কেটে ফেলে সারানো যাবে না। সমাজকে বাঁচাতে হলে বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, কিন্তু এই প্রতিরোধ মিথ্যা ও প্রতারণাকেও দমন করবে। নিন্দিত জীবনের থেকে মৃত্যু বেশী খারাপ নয়।

---

১ লিবার্টি (লণ্ডন)

অহিংস প্রতিরোধের জন্য শৃঙ্খলা ও মনোবল দরকার। কিন্তু যুদ্ধের জন্যও ওই দুটি গুণ অপরিহার্য। মানুষে যদি রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে তো অহিংস প্রতিরোধেও সেই সাহস ও আদর্শনিষ্ঠা দেখাতে পারে। এই ধরনের প্রতিরোধে যে ক্ষতি হয়, যুদ্ধে তার থেকে বেশী ক্ষতি হতে পারে।

অপ্রতিরোধীদের দেশ নষ্ট হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয় কিন্তু প্রতিরোধেরও সেই ফল হতে পারে। যারা বিবেকের দংশনের জন্য অস্ত্রধারণে অনিচ্ছুক তাদের বিচারপতিরা প্রশ্ন করেন যে যদি জার্মানরা তাদের স্ত্রী, মাতা বা ভগ্নীকে ধর্ষণ করতে আসে তারা তখন কি করবে? তারা অবশ্যই বাধা দেবে কিন্তু তা বলে জার্মানদের স্ত্রী, কন্যা ও ভগ্নীদের হত্যা করবে না। উপমাটি খুব যুক্তিযুক্ত নয়। আক্রান্ত ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বলপ্রয়োগ করে আত্মরক্ষার চেষ্টা যুদ্ধের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কারণ, যুদ্ধে নিরপরাধ লোকেদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করা হয়। গান্ধীর অহিংসা সক্রিয় শক্তি, তবে সাহসীর অস্ত্র, দুর্বলের নয়। "যদি রক্তপাত হয়ই তো আমাদের রক্তপাত হোক। হত্যা না করে মরার জন্য প্রয়োজনীয় শান্ত সাহসের চর্চা কর। প্রয়োজন হলে নিজের ভাইয়ের হাতে মৃত্যুবরণ করেও মানুষ স্বাধীন জীবন লাভ করতে পারে, তাকে হত্যা করে নয়। প্রেম অন্যকে পোড়ায় না, নিজেই আনন্দে পোড়ে, এমন কি তাতে যদি শেষে মৃত্যুও ঘটে, তবুও সে পোড়ে।"

অহিংসা মানে অকল্যাণকে মেনে নেওয়া নয়। গান্ধী জানেন, অন্যায়কে স্বীকার করে নেওয়াই সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য, অন্যায়ের পাত্র হওয়া নয়। প্লেটোর দার্শনিক জনতার উন্মত্ততা দেখে লোকে যেমন ঝড়বৃষ্টির সময় প্রাচীরের পাশে আশ্রয় নেয়, তেমনি ইচ্ছা করেছিলেন যে আসন্ন অমঙ্গল থেকে আত্মরক্ষার জন্য সংসার ছেড়ে পালিয়ে যাবেন। গান্ধী তাঁর অনুগামীদের প্লেটোর দার্শনিকের উদাহরণ অনুসরণ করতে বলেন না। অহিংসা নিষ্ক্রিয়তা নয়। আমরা জনকল্যাণের সঙ্গে অসহযোগিতা করে প্রতিরোধ করতে পারি। ভারতের ইতিহাসে অহিংস অসহযোগের অনেক উদাহরণ আছে: রাজার অবাধ ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে মহাজনরা দোকান বন্ধ করেছে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ট্যাক্স বসানের প্রতিবাদে কাশীর ব্রাহ্মণেরা উপবাস করেছে, আক্রমণকারী দুর্বৃত্তদের হাত থেকে নিজেদের মানরক্ষার্থে রাজপুত রমণীরা আগুনে ঝাঁপ দিয়েছেন। এই সব উদাহরণে মানুষের আত্মিক শক্তি অমঙ্গল পরাভূত করতে কত ক্ষমতা রাখে তা বোঝা যায়। শক্তিশালী মাংসপেশী, সর্ববিধ্বংসী অস্ত্র ও আসুরিক বিষাক্ত গ্যাস অহিংস প্রতিরোধের অস্ত্র নয়; তার নির্ভর নৈতিক সাহসের, আত্মসংযমের বিশেষ করে সেই চেতনার উপর যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে, সে যতই পশু স্বভাবের হোক, ব্যক্তিগতভাবে যতই বিরুদ্ধভাবাপন্ন হোক, করুণার প্রজ্বলিত শিখা, ন্যায়ানুরাগ, সততা ও সত্যের প্রতি শ্রদ্ধার মধ্যে প্রকাশিত হয় যদি যথার্থ পথ অনুসরণ করা যায়। রোমকদের অবসর বিনোদনের জন্য কুস্তিগীরদের হত্যা বন্ধ করতে টেলিমেকাসের বলিদান প্রয়োজন হয়েছিল।

গান্ধী তাঁর অহিংস পদ্ধতি ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রয়োগ করেন। আমরা যদি স্বাধীন নরনারী হিসাবে বাঁচতে না পারি তো সন্তুষ্ট চিত্তে আমাদের মরাই ভাল। ভারতে ব্রিটিশ শাসন, বেশীর ভাগ ভারতীয় জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত

ও সত্যকারের সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সহযোগিতা না দিলে তার পতন অনিবার্য। এই রকম অহিংস অসহযোগের ভিন্ন ভিন্ন ধারা আছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে যা খাটে, বহিরাক্রমণের বেলাও তা খাটে। কথা উঠেছে, যুদ্ধ যেখানে সামগ্রিক সেখানে যুযুধান ব্যক্তিরা পরস্পরকে সামনাসামনি দেখতে পায় না, যেখানে গণহত্যা দূর থেকে সংঘটিত হয় সেখানে অহিংস অসহযোগের মধ্যে বীরত্ব থাকতে পারে কিন্তু সাফল্যের সম্ভাবনা নেই। জাপানীরা আক্রমণ করলে ভারতবাসীরা যদি বলপূর্বক বাধা না দিয়ে শিশু-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকে তাদের জন্য কোন কাজ করতে, তাদের খাদ্য সরবরাহ করতে বা কোন রকমের সুবিধা দিতে অস্বীকার করে এবং তার ফলস্বরূপ বেত্রাঘাত, কারাবরণ, বন্দুকের গুলি এবং অন্যান্য প্রকারের অহিংস অত্যাচার সহ্য করতে পারে, তা হলে শত্রু নিশ্চয়ই হার মানবে। কিন্তু এই নীতি গ্রহণ করলে যে পরিমাণ বীরত্ব, সাহস এবং সহ্যশক্তি দেখাতে হবে তার তুলনা যুদ্ধেও পাওয়া যায় না। বিদেশী আক্রমণকারীরা পুলিস, পিয়ন ইত্যাদি পদের জন্য লোক পাবে না। গোটা দেশকে জেলখানায় পোরা যায় না, সমস্ত দেশবাসীকে গুলি করেও মারা যায় না। কয়েকজনকে মেরে তারপর হতাশ হয়ে সে পথ পরিত্যাগ করতেই হবে। রাজস্ব আদায় হবে না, ডকমজুরদের মধ্যে ধর্মঘট হবে ইত্যাদি।[১] লোকে যদি মেনে না নেয় তো কোন শাসনব্যবস্থাই চলতে পারে না।[২] ভারতের প্রতিরোধ ফলপ্রসূ হবে। কিন্তু এসব করবার সময়

---

১ বর্তমান অবস্থাতেও শত্রুর সঙ্গে অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করতে হবে। সেনানায়ক সংঘের উপপ্রধান জেনারেল মোল্‌সওয়ার্থ ১৯৪২-এর মার্চ মাসে দিল্লীর রোটারী ক্লাবের ভাষণে বলেনঃ ভারতে সকলেই জিজ্ঞাসা করছে জাপানীদের কি করে ঠেকানো যাবে! এই বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রের সৈন্যদলের দিক থেকে বলতে পারি যে, যে কটি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ভারতের নিরাপত্তার জন্য রক্ষা করা দরকার তা আমরা করব, কিন্তু সব স্থান আমাদের আয়ত্তে রাখতে পারব না। কাজেই ভারতের বাকি অংশে যেখানে মূল সৈন্য নৌবাহিনী বা বিমানবাহিনী থাকবে না সেখানে কি হবে? আমরা সকলকে অস্ত্র যোগাতে পারব না। অপরপক্ষে জাপানীদের বিব্রত করার, বিলম্বিত করার ও আক্রমণ নিষ্ফল করার নানা উপায় সম্বন্ধে জনতাকে অনেক শিক্ষা দিতে পারি। হয়ত নীচের দিকে নেতাও নেই নেতৃত্বও নেই তবু আমার মনে হয় জাপানী আক্রমণ ব্যর্থ হতে পারে যদি আমাদের লোককে এইভাবে দীক্ষিত করতে পারি—"ওদের যেতে দেওয়া হবে না"। এরকম মনোভাব তখনই গড়ে উঠতে পারে যদি বুদ্ধিজীবীরা মজুর ও কৃষাণদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে পারেন।

২ চেকেরা যখন ১৯৩৮ সালের অক্টোবরে আত্মসমর্পণ করলে, তখন তাদের প্রতি গান্ধীর বাণী দ্রষ্টব্যঃ "আমি চেকদের কিছু বলতে চাই, কেননা তাদের দুরবস্থায় আমার দৈহিক ও মানসিক ক্লেশের কারণ হয়েছে এবং আমার মনে যে সব চিন্তা উঠছে সে সব যদি তাদের সঙ্গে ভাগ করে না নিতে পারি তো আমার পক্ষে কাপুরুষতা হবে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে ছোট ছোট জাতিরা হয় সর্বাধিনায়কদের অধীনে থাকবে, নয়ত ইউরোপের শান্তিতে অনবরত ব্যাঘাত ঘটবে। সর্বপ্রকার সদিচ্ছা সত্ত্বেও ইংলণ্ড বা ফ্রান্স তাদের রক্ষা করতে পারবে না। তারা যদি ওদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে তো অদৃষ্টপূর্ব রক্তপাত ও ধ্বংসলীলা ঘটবে। আমি যদি চেক হতুম তাহলে এই দুটি জাতিকে আমার দেশরক্ষা করার কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দিতুম। অথচ আমাকে বাঁচতে হবে। আমি কোন জাতি বা সংঘের দাসত্ব করতে পারব না। আমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, নইলে আমি মৃত্যুবরণ

অত্যাচারীদের প্রতি সর্বপ্রকার ঘৃণা বর্জন করতে হবে এবং তাদের প্রতি মনোভাব প্রসন্ন রাখতে হবে, তাহলে তার মধ্য দিয়েই দেশ পবিত্র, মহান ও স্বাধীন হবে।[১]

করব। যুদ্ধ করে জেতবার আশা শুধু দুঃসাহসিকতা। কিন্তু আমি যদি আমার স্বাধীনতা-হরণকারীর ইচ্ছা পালন করতে অস্বীকার করে সেই প্রতিরোধের চেষ্টায় নিরস্ত্র মৃত্যুকে বরণ করি, তবে তা হঠকারিতা হবে না। অবশ্য তাতে আমার দেহ নষ্ট হবে, কিন্তু আমার আত্মা বা মান বাঁচবে। বর্তমান অসম্মানজনক সন্ধিই আমার সুযোগ। আমি আমার অসম্মান বর্জন করে সত্যিকার স্বাধীনতা পাবার জন্য সচেষ্ট হব। কিন্তু একজন বন্ধু বলছেন, 'হিটলারের দয়ামায়া নেই, তোমার ভাবগত প্রচেষ্টা তার কাছে মোটেই কাজ দেবে না।' আমি বলি, 'তোমার কথা হয়ত ঠিক। কোন জাতি অহিংস প্রতিরোধ ব্রত গ্রহণ করেছে তার নজীর ইতিহাসে নেই। হিটলার যদি অন্যের কষ্টে বিচলিত না হয় না হবে। তাতে আমার কোন মূল্যবান বস্তু নষ্ট হবে না। রক্ষা করবার উপযুক্ত এক-মাত্র বস্তু মর্যাদা। তা হিটলারের করুণার তোয়াক্কা রাখে না। তবু অহিংসায় বিশ্বাস থাকায় আমি তার সম্ভাবনাকে সীমিত করতে পারব না। এ পর্যন্ত সে ও তার মত লোকেরা চিরকালের এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কাজ করে আসছে যে মানুষকে জোর করে বশ করা যায়। নিরস্ত্র পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুরা যদি সর্বপ্রকার তিক্ততা বর্জন করে অহিংস প্রতিরোধ চালায় তো সেটাও তাদের কাছে একটা অভিনব অভিজ্ঞতা হবে। তাদের মন উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর শক্তির কাছে সাড়া দেবে না, এ কথা কে জোর করে বলতে পারে? আমার মত তাদেরও আত্মা আছে।' কিন্তু আর এক বন্ধু বলছেন 'তুমি যা বলছ তা তোমার পক্ষে খাটে। কিন্তু সাধারণ লোকে তোমার এই অভিনব আহ্বানে সাড়া দেবে এ কি করে আশা কর? তারা যুদ্ধ করতে শিখেছে। ব্যক্তিগত বীরত্বে তারা পৃথিবীতে কারুর চেয়ে কম নয়। এখন তাদের অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে অহিংস প্রতিরোধ শেখাতে যাওয়া আমার বৃথা।' তোমার কথা হয়ত ঠিক। কিন্তু আমার অন্তরের বাণী আমাকে শুনতেই হবে। আমার বাণী আমার দেশের লোকের কাছে উপস্থিত করবো। এই অবমাননা আমার মনের এত গভীরে প্রবেশ করেছে যে তার নির্গমনের ব্যবস্থা করতেই হবে। আমার মনের আলোতেই আমার কাজ করতে হবে। আমার বিশ্বাস আমি যদি চেক হতুম তো এইভাবেই আচরণ করতুম। আমি প্রথম যখন সত্যাগ্রহ শুরু করি তখন আমি নিঃসঙ্গ ছিলুম। তখন আমাদের তের হাজার পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু একটা সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। যে জাতির বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়িয়েছিলুম সে জাতি আমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করবার ক্ষমতা রাখত। আমার কথা কেউ শুনবে কিনা জানতুম না। প্রেরণা এল বিদ্যুৎ-ঝলকের মত। তের হাজারের সকলেই সংগ্রামে রাজী হয় নি। অনেকে পেছিয়ে গেল। কিন্তু জাতির মর্যাদা বাঁচল। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ ইতিহাসের নব অধ্যায়ের পত্তন করলে। ডাঃ বেনেসকে আমি দুর্বলের অবলম্বন দেখাচ্ছি না, বীরের অস্ত্র উপহার দিচ্ছি। পার্থিব শক্তি যত বড়ই হোক তার কাছে নত হওয়ার দৃঢ় অস্বীকৃতি আর তা মনের কোনরকম তিক্ততা না নিয়ে এবং এই পূর্ণ বিশ্বাসে যে আত্মিক শক্তিই বেঁচে থাকে, আর কিছুই থাকে না,—এর চেয়ে বড় বীরত্ব আর কিছু নেই।"

১ বার্টর্যান্ড রাসেল তাঁর "ওয়ার এন্ড নন্‌রেজিস্ট্যান্স" গ্রন্থে বলেছেন,—'ধরা যাক, আক্রমণকারী সেনাদল লন্ডনে এসে বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে রাজাকে ও হাউস অব কমন্স থেকে সদস্যদের বিতাড়িত করলে। বার্লিন থেকে কয়েকজন দক্ষ আমলাকে আনা হবে হোয়াইট হলের আমলাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে যে কি ভাবে কলটুরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হবে। এরকম নিরীহ জাতকে চালাতে কোনরকম সঙ্কটের আশংকা থাকবে না, এবং যে সব কর্মচারী বর্তমানে আছে তাদের নিজ নিজ পদেই প্রথমটা বহাল করা হবে। এখনকার রাষ্ট্র চালানো একটা জটিল ব্যাপার। কাজেই অন্তর্বর্তী কালে যারা

অহিংস প্রতিরোধও এক ধরনের প্রতিরোধ এবং সেইজন্যই তা জুলুম। সশস্ত্র প্রতিরোধের চেয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? ফলেন পরিচীয়তে। যারা জোর করে, তাদের নৈতিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। যে মেজাজ শত্রুদের বিরুদ্ধে ক্রোধে উন্মত্ত হওয়াটা উপভোগ করে সে মেজাজ উৎসাহযোগ্য নয়। মনে মনে সকলেরই গর্ব থাকে যে আমরা বেশ ভাল লোক, আর শত্রুরা ঘৃণ্য। এই ঘৃণার দাসত্ব থেকে মুক্তি না পেতে পারলে আমাদের কোন প্রগতি সম্ভব হবে না। অহিংস প্রতিরোধে অন্ততঃ এমন কোন নূতন অমঙ্গলের সৃষ্টি হবে না যাতে কোন কাম্য মঙ্গল বাধাপ্রাপ্ত

এখানকাব বর্তমান ব্যবস্থাব সঙ্গে পরিচিত তাদেব রাখাই ভাল।

কিন্তু এই সন্ধিক্ষণে জাতি রণক্ষেত্রে যে সাহস দেখিয়েছে, তাই যদি দেখাতে পারে তো সংকট শুরু হয়ে যাবে। যাবা এখন সবকারী পদ অধিকার কবে আছে তারা জার্মানদেব সঙ্গে সহযোগিতা কবতে অস্বীকাব কববে। তাদেব উচ্চপদস্থ কয়েকজনকে কয়েদ করা হবে, হযত বাকীদেব শিক্ষা দেওযাব জন্য গুলিও কবা হবে। কিন্তু অন্যবা তাতেও যদি বিচলিত না হয়, তাবা যদি আগেকাব ইংবাজ পার্লামেণ্ট ও সরকাবেব আইন ও আদেশ মতই কাজ কবতে থাকে, তাহলে সমস্ত সবকাবী কর্মচাবী, এমন কি সামান্য ডাকহবকবাকে পর্যন্ত তাড়িয়ে দিযে, জার্মানদেব এনে তাদেব শূন্যস্থান পূর্ণ কবতে হবে।

ববখাস্ত কর্মচাবীদেব সকলকে কযেদ কবা বা গুলি কবা সম্ভব হবে না। কোন যুদ্ধ হযনি বলে এবকম পাইকাবী পাশবিকতাব প্রশ্ন উঠবে না। আব হঠাৎ একেবাবে শূন্য থেকে এক বিবাট প্রশাসনিক যন্ত্র তৈবী কবা জার্মানদেব পক্ষে শক্ত হবে। তাবা যে হুকুমই জারী কবুক লোকজন নিঃশব্দে তা অগ্রাহ্য কবে চলবে। তাবা যদি হুকুম দেয যে স্কুলে স্কুলে জার্মান ভাষা শেখাতে হবে তো শিক্ষকবা এমন ভাবে এড়িয়ে যাবেন যেন ওবকম কোন হুকুম আসে নি। শিক্ষকদেব যদি ববখাস্ত কবা হয তো অভিভাবকবা ছেলে-মেয়েদেব স্কুলে পাঠাবেন না। তাবা যদি বলে যে ইংবাজ যুবকদেব সামরিক কার্য কবতে হবে তো যুবকবা সোজাসুজি অস্বীকাব কববে, কযেকজনকে গুলি কবে মাবাব পব জার্মানদের হতাশ হযে সে প্রচেষ্টা বন্ধ কবতে হবে। তাবা যদি বন্দবে বন্দবে আমদানি শুল্ক আদায কবতে চেষ্টা কবে তো জার্মান শুল্ক কর্মচাবী আনতে হবে, আব তাতে সমস্ত ডক শ্রমিকবা ধর্মঘট কবে এইভাবে বাজস্ব আদায অসম্ভব কবে তুলবে। তারা যদি বেল চালাতে চায তো বেল শ্রমিকবা ধর্মঘট কববে। যে দিকে হাত দেবে তাই অচল হযে যাবে এবং কিছুদিনেব মধ্যে তাদেবও মাথায ঢুকবে যে জনগণেব সঙ্গে বোঝাপড়া না হলে ইংলণ্ড থেকে কিছুই পাবাব আশা নেই।

আক্রমণ ঠেকানোব এই পদ্ধতিব জন্য অবশ্যই কাঠিন্য ও শৃঙ্খলা প্রযোজন হবে। কিন্তু যুদ্ধেও তো এ দুটি জিনিসেব দবকার হয। বহু যুগ ধবে যুদ্ধ কাজে লাগবে বলে এই দুটি জিনিস মানুষেব মনে জাগাবাব জন্য শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হযেছে। এই জিনিসগুলি এইভাবে এত সর্বব্যাপী হযে পড়েছে যে প্রতি সভ্য দেশেই প্রায সকল লোকই সবকার যে সময উপযুক্ত মনে কবে সেই সময রণক্ষেত্রে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়। শিক্ষাব দ্বারা যে সাহস ও আদর্শনিষ্ঠা এখন যুদ্ধে ব্যয়িত হচ্ছে তা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের খাতে চালিয়ে দেওয়া যায়। ইংলণ্ডের বর্তমান যুদ্ধে কি ক্ষতি হবে তা আমি জানি না, তবে যুদ্ধ শেষ হবার আগে তা যদি দশ লক্ষে পৌঁছয় তো আশ্চর্য হবাব নেই। নিষ্ক্রিয প্রতিবোধে এব চেযে অনেক কম ক্ষতিস্বীকার কবে আক্রমণকারী সৈন্যদলকে বুঝিযে দেওয়া যাবে যে ইংলণ্ডে বিদেশী শাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। এবং একবার এই কথা বুঝিয়ে দিতে পারলে তা চিবকালেব জন্য প্রচলিত থাকবে, মধ্যে মধ্যে যুদ্ধেব দুর্ঘটনার সন্দেহজনক ফলাফলেব উপব নির্ভব করতে হবে না।"

হতে পারে। আমরা নিজেদের নৈতিক অবনতি না ঘটিয়েও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে পারি।

সমগ্র জগতে যখন বর্বর মনোবৃত্তি ছায়াপাত করেছে, গান্ধী তখন আমাদের উচ্চতর সত্তার কাছে আবেদন করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে সহিষ্ণুতার উদ্দেশ্য আছে, প্রচেষ্টার একটা লক্ষ্য আছে। গান্ধী জানেন যে জীবন ও সত্যের সঙ্গে আমাদের সমস্ত সম্পর্ক যদি নূতন করে না দিতে পারি, তা হলে অকল্যাণের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ করতে আমরা সক্ষম হবো না। কোন্‌টা ঠিক তা আমাদের অন্তর থেকে মীমাংসা করতে হবে। যাই ঘটুক না কেন, আমরা যেন আমাদের অন্তরের সততার কাছে অপরাধী না হই। আমরা সমস্ত পৃথিবীকে অযৌক্তিক তাড়াহুড়ো করে সর্বোচ্চ স্তরে তোলবার চেষ্টা করব না। হিন্দুশাস্ত্রের শিক্ষা এই যে আমরা সমগ্রভাবে আদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা বর্জন করতে পারব না। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সমগ্র মানবজাতির বিবেক আত্মপ্রকাশ করেছে, তাঁরা সতত পৃথিবীকে উচ্চতর শ্রেয়োবোধের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং তাতে সাধারণ লোকেও সাড়া দিতে পারছে। সন্ন্যাসীদের কাছে সমস্ত রকম সশস্ত্র শক্তি-বর্জন একটি পরম তত্ত্ব। তাঁরা ভয় ও ক্রোধ সম্পূর্ণ পরিহার করেছেন এবং মানুষ যে সব ঐহিক বস্তুর জন্য লড়াই করে তাঁদের কাছে সে সব বস্তুর কোন দামই নেই। এই 'অসাধারণ' মহাত্মারা আইনের আদান-প্রদানের উর্ধ্বে। তাঁরা রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা অতিক্রম করে যুদ্ধ যে অকল্যাণের একথা প্রমাণ করেন কিন্তু তাঁরা একথা অন্য লোকের ওপর চালিয়ে তাদেব আইনেব আশ্রয়চ্যুত করতে পারেন না। যারা অত্যাচারী তাদের বিরুদ্ধে তাঁদের দাবী তাঁরা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের মতাবলম্বী নয় এমন লোককে তাঁদের মত গ্রহণ করতে তাঁরা বাধ্য করতে পারেন না। নীতিগতভাবে অহিংস অসহযোগ তখনই সার্থক হবে যখন আমরা মনে করতে পারব যে জাতি সত্যই এই নীতি অনুযায়ী কাজ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু যে সামান্য কয়জন লোক শান্তির কথা শুধু ভাবেন ও বলেনই না, সমস্ত অন্তর দিয়ে তাতে বিশ্বাস করেন, তাঁরা সংকটের সময় রণক্ষেত্রের শিবিরের বদলে কারাগার শ্রেয় মনে করেন। তাঁদের প্রাচীরের ধারে দাঁড় করিয়ে গায়ে থুতু দিলে বা ঢিল মারলে বা গুলি করলেও তাঁরা আপত্তি করেন না।

আমরা যদি অহিংস প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত না থাকি, তাহলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ না করার থেকে জোর করে প্রতিরোধ করা ভাল। "যেখানে হিংসা বা কাপুরুষতা ভিন্ন গত্যন্তর নেই, সেখানে হিংসাই ভাল। হত্যা না করে শান্ত ভাবে মরার সাহস আমি সঞ্চয় করতে চাই। কিন্তু যার সে সাহস নেই, তাকে আমি বলি যে জাতিকে নির্বীর্য করার চেয়ে মেরে মরা ভাল। কাপুরুষোচিত ভাবে অসম্মানের অসহায় পাত্র হয়ে পড়া বা থাকার চেয়ে আমার মতে ভারতের সম্মান রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণও ভাল।"

গান্ধী কোন অন্ধ মতে বিশ্বাসী নন। "আমি বলি না যে চোর ডাকাত তাড়াতে বা যে জাতি আক্রমণ করবে ভারতবর্ষকে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে বলপ্রয়োগ বর্জন করতে হবে। কিন্তু বলপ্রয়োগ ভাল ভাবে করতে হলে, আমাদের

আত্মসংযম শিক্ষা করতে হবে। তুচ্ছতম কারণে পিস্তল হাতে করাটা ক্ষমতার বদলে দুর্বলতার লক্ষণ। ঘুষোঘুষি করা বলপ্রয়োগের শিক্ষা নয়, পুরুষত্বহীনতার লক্ষণ। আমার অহিংসা নীতিতে কখনও বলক্ষয় হতে পারে না, কিন্তু একমাত্র এই উপায়েই বিপদের সময় জাতি ইচ্ছা করলে ঐক্যবদ্ধভাবে ও সুশৃঙ্খলভাবে বলপ্রয়োগ করতে পারে।"[১] "আমার অহিংসায় বিপদেব মধ্যে প্রিয়জনকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে যাবার স্থান নেই। হিংসা ও কাপুরুষের মত পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে আমি হিংসাকেই শ্রেয় বলি। অন্ধ লোককে যেমন সুন্দর দৃশ্য দেখতে শেখানো যায় না, তেমনি কাপুরুষের কাছে অহিংসার বাণী প্রচার করা বৃথা। এবং আমাব নিজেব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, যারা হিংসাতে অভ্যস্ত তাদের কাছে অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে আমার কোন অসুবিধা হয় নি। আমি যখন বহু বৎসব ধরে কাপুরুষ ছিলুম, তখন আমি হিংসার আশ্রয় নিতুম। আমি যখন কাপুরুষতা ত্যাগ কবলুম তখন থেকে অহিংসাকে মূল্যবান মনে করতে আরম্ভ করলুম।"[২]

মৃত্যুভয়ে ভীত লোক, যাব প্রতিরোধেব ক্ষমতাই নেই, তাকে অহিংসা শেখানো যায না। অসহায় ইঁদুর অহিংস নয়, কেননা সে বিড়ালেব ভক্ষ্য। সে তার হন্তাকে পাবলে খুশিমনে হত্যা কবে, কিন্তু সে সর্বদা পালাতে চায। তাকে আমরা কাপুরুষ বলতে পারি না, কেননা প্রকৃতি তাকে ঐবকম ব্যবহাবেব জন্য ঐভাবেই গড়েছে। কিন্তু মানুষ যদি বিপদে পড়ে ইঁদুরের মত ব্যবহার করে, তাহলে তাকে সঙ্গত ভাবেই কাপুরুষ বলা হয়। সে তাব অন্তবে হিংসা ও ঘৃণা পোষণ করে এবং নিজেদের আহত হবার সম্ভাবনা না থাকলে তাব শত্রুকে সে মেবে ফেলতেই প্রস্তুত। অহিংসা তার কাছে অজ্ঞাত এবং এ সম্বন্ধে তার কাছে বক্তৃতা দেওয়া নিষ্ফল। সাহস তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাকে অহিংসা বোঝাবার আগে, যে আক্রমণকারী তাকে ধ্বংস করতে যাচ্ছে তাব সামনে দৃঢ়পদে দাঁড়াতে এবং প্রয়োজন হলে মৃত্যুবরণ করতে শেখাতে হবে। যদিও আমি কাউকে প্রতিশোধ নিতে সত্যসত্যই সাহায্য করব না, তবু আমি কাপুরুষকে তথাকথিত অহিংসার আশ্রয় নিতে দেব না। অহিংসা কি বস্তু তা না জেনে অনেকে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে যে প্রতিরোধ করার থেকে পালিয়ে যাওয়া ভাল, বিশেষ করে যদি প্রাণের ভয় থাকে। অহিংসার

---

১ ইযং ইণ্ডিযা ২৯শে মে ১৯২৪

২ ইযং ইণ্ডিয়া ২৯শে মে ১৯২৪, "আমার অহিংসা মন্ত্র অত্যন্ত সক্রিয়। এব মধ্যে কাপুরুষতা, এমন কি দুর্বলতারও স্থান নেই। হিংস্র লোক একদিন হিংসা পরিত্যাগ করবে, এরকম আশা করা যায়, কিন্তু কাপুরুষের কোন আশা নেই। আমি এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় অনেকবার বলেছি যে আমরা যদি দুঃখবরণ করে অর্থাৎ অহিংস উপাযে আমাদের নিজেদেব, আমাদের স্ত্রীলোকদের বা আমাদের মন্দিরগুলো রক্ষা করতে সমর্থ না হই তো, যদি আমবা মানুষ হই তো যুদ্ধ করেই তাদেব রক্ষা করব। (ঐ ১৬ই সেপ্টেম্বব, ১৯২৭)। পৃথিবীটা সম্পূর্ণভাবে যুক্তি দিয়ে চলে না। জীবনের মধ্যেই খানিকটা হিংসার ব্যাপাব আছে আমাদেব সব চেযে কম হিংসাব পথ বেছে নিতে হবে।" (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪)।

শক্তক হিসাবে এরকম অপবিত্র বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আমায় যতদূর সম্ভব সাবধান থাকতে হবে। মানুষের আয়ত্তে অহিংসার থেকে বড় অস্ত্র আর কিছু নেই। মানুষের বুদ্ধিতে যত শক্তিশালী বিধ্বংসী অস্ত্র বেরিয়েছে অহিংসার শক্তি তাদের থেকেও বেশী। ধ্বংস করা মানবিক রীতি নয়। প্রয়োজন হলে ভাইয়ের হাতে মৃত্যুবরণ করে, তাকে মেরে নয়, মানুষ মুক্তজীবনের অধিকারী হয়। যে কোন কারণেই হোক না কেন, মানুষকে হত্যা বা আঘাত করা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।"[১] "লোকে যতই দুর্বল হোক, তার পক্ষে পালানো লজ্জার কথা। সে নিজের মত পরিত্যাগ করবে না এবং নিজ স্থানেই মৃত্যুবরণ করবে। এই হল অহিংস বীরত্ব। যে যতই দুর্বল হোক, যেটুকু শক্তি তার আছে তাই প্রয়োগ করে তার প্রতিপক্ষকে সে আঘাত করবে এবং প্রতিপক্ষকে হারাবার চেষ্টায় সে মরবে। এ বীরত্ব, কিন্তু অহিংসা নয়। যখন কোন লোকের বিপদের সম্মুখীন হওয়া কর্তব্য, তখন যদি সে পালায় তবে কাপুরুষতা হবে। প্রথম ক্ষেত্রে মানুষের মনে প্রেম ও করুণা বজায় থাকবে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় ক্ষেত্রে বিতৃষ্ণা, অবিশ্বাস ও ভয় থেকে যাবে।"[২]

"অহিংসা নীতি দুর্বল ও কাপুরুষের জন্য নয়, এটা বীর ও শক্তিমান পুরুষের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত। বীরোত্তম পুরুষ অন্যকে হত্যা না করে নিজে নিহত হবার সাহস রাখে। আর সে যে হত্যা বা আঘাত করা থেকে বিরত থাকে, তা এই জ্ঞানে যে আঘাত হানা ঠিক নয়।"[৩]

"কারুর যদি সাহস না থাকে, আমি চাই সে মেরে মরার বিদ্যাটাই শিখুক- বিপদ দেখে পালিয়ে যাওয়ার থেকে তা ভাল।... কেননা শেষের ক্রিয়ায় পালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে মানসিক হিংসায় অপরাধী। সে পালায় কেননা মারতে গিয়ে নিজে মরার সম্ভাবনার ঝুঁকি নেবার সাহস নেই।"[৪] এসব কথাই হিন্দুমতের প্রতিধ্বনি।

ঐহিক জীবন সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা থাকলেও মানতে হয় যে এই ধারণা সম্পূর্ণ নয়, আমাদের সর্বদা আদর্শ ও সম্ভাব্যের মধ্যে আপস করে চলতে হয়। ঈশ্বরের রাজ্যে কিন্তু কোন আপস নেই, তা ব্যবহারিকতা দিয়ে সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু পৃথিবীতে নির্মম প্রাকৃতিক নিয়মাবলী রয়েছে। মানুষের আবেগ রয়েছে, তারই ভিত্তিতে আমাদের সুবিন্যস্ত জগৎ তৈরী করতে হবে। জগৎ সম্পূর্ণতার স্বাভাবিক আবাসস্থল নয়। এখানে আকস্মিকতা ও ভ্রান্তির রাজত্ব। যা ভাল ও মহৎ তা প্রায়ই অব্যক্ত থেকে যায়, যা বিকৃত ও অসঙ্গত তাই প্রাধান্য লাভ করে। এই অন্ধকারের মাথার ওপর আধ্যাত্মিক জগৎ দীপ্যমান জ্যোতিতে বিরাজিত। দুঃখ কষ্ট ও সঙ্কটের মধ্য দিয়ে আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হয়। যখন আমরা বাস্তব

---

১ হরিজন, ৩০শে জুলাই, ১৯৩৫।
২ ঐ ১৭ই আগস্ট, ১৯৩৫।
৩ ঐ ২০শে জুলাই, ১৯৩৭।
৪ ঐ ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৮।

ঘটনার সম্মুখীন হই, তখন কতখানি অমঙ্গল বর্জন করব সে সমস্যা থাকে না, প্রশ্ন ওঠে, বার্কের অনবদ্য ভাষায়, কতখানি অমঙ্গল আমরা মেনে নেব।

সমাজের প্রগতিতে তিনটি স্তর দেখা যায়, প্রথমটিতে মাৎস্যন্যায়, তখন মারামারি ও স্বার্থপরতা প্রকট, দ্বিতীয়টিতে আইনের রাজত্ব, কাছারি, পুলিস ও জেলখানা সমন্বিত নিরপেক্ষ বিচারের প্রাধান্য, আর শেষের স্তরে অহিংসা ও স্বার্থহীনতা, আইন ও প্রেম এক হয়ে গেছে। সভ্য মানবসমাজের শেষোক্ত স্তরই লক্ষ্য এবং সে সাধনা সিদ্ধিলাভের দিকে অগ্রসর হবে যদি সেই ধরনের নরনারীর সংখ্যা সমাজে বাড়ে, যাঁরা বলের উপর ভরসা যে শুধু বর্জন করেছেন তাই নয়, রাষ্ট্র যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে পারে বা কেড়ে নিতে পারে তারও তাঁরা তোয়াক্কা করেন না। এঁরা বাচ্যার্থে গৃহ পরিত্যাগ করেছেন এবং ব্যক্তিগত উচ্চাশাও বিসর্জন দিয়েছেন। এঁরা রোজ মৃত্যুবরণ করছেন যাতে পৃথিবীতে শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। গান্ধী এইরকম একজন লোক। আজ যে সব বাস্তববাদীরা জগৎকে তাঁর মত লোকের কথা অগ্রাহ্য করতে বলছে তাদের নাম যখন সবাই ভুলে যাবে তখনও গান্ধীর স্মৃতি উজ্জ্বল থাকবে। যদিও এখন তাঁর আদর্শে পৌঁছানো অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, তবু তা সিদ্ধ হবে। এঁদের কথাই কবি বলেছেন:

তোমার মহৎ সহায়,
তোমার বন্ধু দিব্যানন্দ, যন্ত্রণা,
প্রেম আর মানুষের অজেয় মন।

তিনি আজ স্বাধীন নন। তাঁর মত লোকের দেহটা ক্রুশে বিদ্ধ করা সহজ, কিন্তু তাঁর মধ্যে সত্যের ও প্রেমের যে ঐশী জ্যোতি বিচ্ছুরিত তাকে নেবানো যাবে না। একদিন তিনি নিজের প্রাণ দিয়ে তাঁর দেশবাসীকে প্রাণ দান করবেন। সংসার একদিন তাঁর দিকে ফিরে দেখে তাঁকে এই বলে প্রণতি জানাবে যে তিনি ছিলেন অনাগত যুগের মানুষ এবং সেজন্যই অন্ধকার ও বর্বর জগতেও আলোর রশ্মি দেখতে পেয়েছিলেন।